বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে ফুরফুরার আলিমগণের অবদান

(Contribution of Ulamas of Furfura to Preach and Spread Islam in Bangladesh)

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ইব্ন হোছাইন
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক
আবরার আহমদ
পি এইচ. ডি. গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নং- ০২/ ২০১৬ - ২০১৭
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

পি এইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ-২০১৯
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

<u>অঙ্গীকার নামা</u>

আমি এ মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ. ডি. ডিগ্রী অর্জনের নিমিত্তে উপস্থাপিত **"বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে ফুরফুরার আলিমগণের অবদান"** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক **ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ইব্‌ন হোছাইন**, অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করেছি। এটা আমার একক মৌলিক গবেষণাকর্ম। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যলয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী/ ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ অথবা এর অংশ বিশেষ উপস্থাপন করিনি।

(আবরার আহমদ)
পি এইচ.ডি. গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

<u>প্রত্যয়ন পত্র</u>

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, আবরার আহমদ, পি এইচ. ডি. গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পি এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভের নিমিত্তে উপস্থাপিত **"বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে ফুরফুরার আলিমগণের অবদান"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করেছে। আমি এর পান্ডুলিপিগুলো আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি। আমার জানা মতে, গবেষকের উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভের সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী/ ডিপ্লোমা লাভের জন্য অথবা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। সুতরাং, গবেষককে পি এইচ. ডি. ডিগ্রী প্রদানের নিমিত্তে অভিসন্দর্ভটি পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণের জন্য জমা নেয়ার সুপারিশ করছি।

(ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ইব্‌ন হোছাইন)
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পরম করুণাময় আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের অশেষ মেহেরবাণীতে অবশেষে "বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে ফুরফুরার আলিমগণের অবদান" শীর্ষক পি এইচ. ডি. অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপন করলাম। যথাসময়ে বিধি মুতাবিক অভিসন্দর্ভটি লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে উপস্থাপন করতে পেরে আমি মহান আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের শানে শুকরিয়া আদায় করছি এবং মানবতার মহান শিক্ষক নবী কারীম (স.) এর পাক শানে দরূদ ও সালাম পেশ করছি। যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ইব্‌ন হোছাইন, অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রতি। কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি আমার গবেষণাকর্মের জন্য অসামান্য ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার করেছেন। তাঁর নিরন্তন উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের ফলেই আমার গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। এবং তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও দিকনির্দেশনার ফলে অভিসন্দর্ভটি মানসম্পন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। আমার এ গবেষণাকর্মের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও এর অধ্যায় উপাধ্যায় বিন্যস্তকরণ এবং অবয়ব ও ভাবসৌন্দর্য বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে তাঁর নিরলস আন্তরিক সহযোগিতায়। এজন্য আমি তাঁর প্রতি চির কৃতজ্ঞ ও ঋণী। সে সাথে আমি তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। আমার বিভাগের অন্যসব শিক্ষকের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। কারণ তাঁরা সেমিনার এবং বিভিন্ন সময় আমার গবেষণায় পরামর্শ দিয়েছেন এবং আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

এ সময়ে গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে স্মরণ করছি আমার শ্রদ্ধেয় বাবা মরহুম আলহাজ্ব মাওলানা আবদুর রহমান ফারুকী যাঁর দোয়া আজ আমার জীবন চলার একমাত্র পাথেয় এবং যার কর্মচাঞ্চল্য আমার প্রেরণা। সাথে সাথে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার শ্রদ্ধেয়া মা মরহুমা জনাবা আলিমা বেগমকে যিনি আজীবন আমাদের সুখের জন্য নিজের সুখকে কুরবানী করেছেন। আমাদের মানুষ করার জন্য যিনি ছিলেন অকৃপণ।

সন্তানের সুখ-সমৃদ্ধি কামনায় তাঁদের নিরন্তর প্রয়াস আমার জীবনের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। তাঁদের অপরিসীম ত্যাগ এবং একান্ত দোয়ার কারণেই আজ আমি জীবনের এতটুকু পথ পাড়ি দিতে সক্ষম হয়েছি। আজ এমনই এক স্মরণীয় মূহুর্তে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে আমার বাবা-মা ও আমার অপ্রাপ্ত বয়স্ক বড় ছেলে মরহুম নাজমুছ ছাকিবের পবিত্র আত্মার শান্তি ও মুক্তি কামনা করছি।

আমি গভীর ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জনাচ্ছি আমার শ্রদ্ধেয় শ্বশুর আলহাজ্ব মাওলানা নূর মোহাম্মদ এবং শ্রদ্ধেয়া শাশুড়ী জনাবা নূরজাহান বেগমকে যাঁরা নিজেরা অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও আমার এ গবেষণাকর্মের সময় আমাকে দিক-নির্দেশনা দিয়ে সক্রিয় রেখেছেন।

বিশেষভাবে আমি কৃতজ্ঞ আমার সহধর্মিণী জনাবা মোবাশ্বেরা আখতার মুন্নির কাছে তাঁর অপরিসীম ত্যাগ ও প্রেরণা আমাকে এ গবেষণা কাজে সাহস যুগিয়েছে। আমি বার বার হতাশ হলেও তিনি আমার মনে আশার আলো জ্বেলেছেন। এছাড়া আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের এবং আমার শ্বশুরের পরিবারের সকল সদস্য-সদস্যাকে যাঁরা বিভিন্নভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। বিশেষভাবে আমার স্নেহের ছোট ছেলে সুহাইল আহমদ তোহাকে যে কম্পোজ করা ও প্রুফ দেখা সহ নানান কাজে আমাকে সাহায্য করেছে। আমার বন্ধু এ.কে. এম. এমদাদুল হক মামুন ও আমার ছোট ভাগ্নপতি রিয়াজ উদ্দীন ফরহাদকে কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁরা আমাকে অনেক তথ্য ও মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন।

আমার একান্ত স্নেহের ছোট ভাই ইফতেখার হাছান ও শামীম, সায়েম, আসিফ, মাহবুবকে ধন্যবাদ ও শোকর জানাই। যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম আমার এ কাজকে সহজ করে দিয়েছে।

আমার অভিসন্দর্ভটি রচনায় আমি বিশেষভাবে বিভিন্ন বিষয়ের উপর লিখিত দেশী-বিদেশী লিখকদের রচনার সাহায্য নিয়েছি। এজন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে আমি যথাস্থানে পাদটীকা ও উদ্ধৃতিতে সেসব লিখকের নাম ও তাঁদের গ্রন্থ বা প্রবন্ধের নাম উল্লেখ করেছি। তবুও এখানে আরেকবার লিখকদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই।

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংকেত

স.	=	সাল্লাল্লাহু ‘আলায়হি ওয়া সাল্লাম
আ.	=	‘আলায়হিস সালাম
রা.	=	রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু
র.	=	রহমাতুল্লাহি ‘আলায়হি
ইং	=	ইংরেজি
বাং	=	বাংলা
হি.	=	হিজরী
খ্রী.	=	খৃষ্টাব্দ
ড.	=	ডক্টর
খ.	=	খন্ড
পৃ.	=	পৃষ্ঠা
অনু.	=	অনুবাদ
ইফাবা	=	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
p.	=	page
Ibid	=	(Ibidem) in the same place; from the same source.
Op.cit	=	Operac-citrae
Ed.	=	Edited/ Editor

Dhaka University Institutional Repository

আরবী বর্ণের বাংলা প্রতিবর্ণায়ন

আরবী	=	বাংলা
ا	=	অ/আ
ب	=	ব
ت	=	ত
ث	=	স
ج	=	জ
ح	=	হ
خ	=	খ
د	=	দ
ذ	=	য
ر	=	র
ز	=	য
س	=	স
ش	=	শ
ص	=	স
ض	=	দ/য
ط	=	ত
ظ	=	য
ع	=	‘
غ	=	গ
ف	=	ফ
ق	=	ক্ব/ক্
ك	=	ক
ل	=	ল
م	=	ম
ن	=	ন
و	=	ও/ব
ه	=	হ্
ء	=	’
ى	=	য়

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে ফুরফুরার আলিমগণের অবদান

(Contribution of Ulamas of Furfura to Preach and Spread Islam in Bangladesh)

ভূমিকা..........০৮

প্রথম অধ্যায়

কুর'আন ও হাদীসের আলোকে ইসলামের প্রচার ও প্রসার..........১২

১ম পরিচ্ছেদ : সৃষ্টি হিসেবে মানুষের কর্তব্য..........১৬

২য় পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র পথে ত্যাগ ও পরীক্ষা..........২০

৩য় পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র দিকে আহবান ও নবীগণ..........২৫

৪র্থ পরিচ্ছেদ : মুসলিম উম্মাহ্‌র কর্তব্য..........৩২

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশে ইসলামের আগমন..........৩৪

১ম পরিচ্ছেদ : বণিকদের ইসলাম প্রচার..........৩৪

২য় পরিচ্ছেদ : স্থল পথে ইসলামের আগমন..........৩৮

৩য় পরিচ্ছেদ : ইসলাম প্রচারের দ্বিতীয় পর্যায়..........৪৯

৪র্থ পরিচ্ছেদ : ইসলাম প্রচারের তৃতীয় পর্যায়..........৫৯

তৃতীয় অধ্যায়

ঐতিহাসিক ফুরফুরা..........৬৬

১ম পরিচ্ছেদ : পরিচয় ও মুসলিম বিজয়ের পূর্বে ফুরফুরা..........৬৬

২য় পরিচ্ছেদ : বালিয়া-বাসন্তী বিজয়ের সময়কাল..........৭২

৩য় পরিচ্ছেদ : প্রথম খলীফা আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর বংশধরগণ যেভাবে ফুরফুরায় এলেন.....৭৮

৪র্থ পরিচ্ছেদ : ফুরফুরা বিজয়ী মনসুর বাগদাদী থেকে মুজাদ্দিদে যামান (র.)..........৮০

চতুর্থ অধ্যায়

ফুরফুরার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পীর মুজাদ্দিদে যামান হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (র.) ও বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে তাঁর অবদান..........৮৪

১ম পরিচ্ছেদ : পরিচয়, শিক্ষা ও কর্ম জীবন..........৮৪

২য় পরিচ্ছেদ : বিভিন্ন দেশে হিদায়াতী কার্যক্রম..........৯৩

৩য় পরিচ্ছেদ : ওছীয়তনামা..........৯৯

৪র্থ পরিচ্ছেদ : মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর খলীফাগণ..........১২৮

পঞ্চম অধ্যায়

ফুরফুরার অন্যান্য পীর সাহেবগণ ও বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে তাঁদের অবদান..........১৪২

১ম পরিচ্ছেদ : আবু নসর মুহাম্মদ আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.)..........১৪২

২য় পরিচ্ছেদ : আবুল আনসার মু. আবদুল কাহ্‌হার সিদ্দিকী (র.)..........১৭১

৩য় পরিচ্ছেদ : আবু বকর আবদুল হাই মিশকাত সিদ্দিকী..........১৯০

ষষ্ঠ অধ্যায়

ফুরফুরার আলিমগণ..........১৯৪

সপ্তম অধ্যায়

ফুরফুরার স্বর্ণযুগ..........২২৩

অষ্টম অধ্যায়

পাকশী দারুস শরীয়ত কমপ্লেক্স ও মিরপুর দারুস্‌সালাম মার্কাজ..........২৩৭

১ম পরিচ্ছেদ: আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.)-এর অমর কীর্তি পাকশী দারুস শরীয়ত কমপ্লেক্স......২৩৭

২য় পরিচ্ছেদ : আবদুল কাহ্‌হার সিদ্দিকী (র.)-এর শ্রেষ্ঠ অবদান দারুস্‌সালাম মার্কাজ..........২৪৩

নবম অধ্যায়

ইসলামের প্রচার ও প্রসারে ফুরফুরার অন্যান্য আলিমগণের অবদান..........২৬১

উপসংহার..........৩০১

গ্রন্থপঞ্জি..........৩০৪

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহ্ তা'আলার, যিনি নিখিল বিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা, মালিক এবং শাসক। যিনি অসীম জ্ঞান, অনুগ্রহ ও ক্ষমতা বলে এ বিশ্বজাহান পরিচালনা করছেন। যিনি মানব সৃষ্টি করে তাকে দান করেছেন জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধির ন্যায় অমূল্য শক্তি আর সমাসীন করেছেন দুনিয়ায় তাঁর খিলাফতের মর্যাদায়। যিনি মানবের প্রকৃতির মাঝে ভাল এবং মন্দ চেনার যোগ্যতা তৈরী করে দিয়েছেন। মানুষ ভালোটি গ্রহণ করলে পরকালে পুরস্কৃত হবে পক্ষান্তরে মন্দটি গ্রহণ করলে সে তিরস্কৃত হবে। এ জন্য দুনিয়াতে তার গোমরাহ ও হিদায়েতের বিষয়টি প্রকৃতির ওপর ছেড়ে না দিয়ে যুগে যুগে পথহারা মানুষকে সঠিক পথে আনার জন্য এবং মানব কুলের সামনে আল্লাহ্ তা'আলার চূড়ান্ত প্রমাণ পেশ করার জন্য তিনি নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। যাতে কিয়ামতের দিন মানুষ আল্লাহ্র সামনে এ অযুহাত পেশ করতে না পারে যে, ভাল ও মন্দের রাস্তা তাদের জানা ছিলো না। এ জন্য তারা গোমরাহিতে নিমজ্জিত হয়েছে। এ কথাটি পবিত্র কুর'আনে নিম্নোক্ত আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে :

رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما-

"অর্থাৎ সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী রাসূল প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূল আসার পর আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মানুষের কোনো অভিযোগ না থাকে। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (আল কুর'আন,০৪: ১৬৫) অন্যত্র বলা হয়েছে :

ياأهل الكتاب قدجاءكم رسولنايبين لكم على فترة من الرسل ان تقولوا ماجاءنا من بشيرونذير- والله على كل شيء قدير-

"অর্থাৎ হে কিতাবীগণ! রাসূল প্রেরণে বিরতির পর আমার রাসূল তোমাদের নিকট এসেছে। সে তোমাদের নিকট স্পষ্ট ব্যাখ্যা করছে যাতে তোমরা বলতে না পারো, 'কোন সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী আমাদের নিকট আসেনি।' এখন তো তোমাদের নিকট একজন সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী এসেছে। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।" (আল কুর'আন, ০৫: ১৯)

নবী-রাসূলগণের আগমনের ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ নবী হলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (স.) তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার মানবকে একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান দান করলেন। যা কিয়ামত পর্যন্ত গোটা মানব জাতির অবস্থা, পরিবেশ ও প্রয়োজনের সাথে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ। এ জীবন বিধানের নামই হলো ইসলাম।

এ জীবন বিধানের যেদিন শুভ সূচনা হলো তথা জিবরীল আমীনের মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (স.) হেরা গুহায় সর্বপ্রথম ঐশীবাণী প্রাপ্ত হলেন। ঘটনার আকস্মিকতায় হযরত মুহাম্মদ (স.) ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে নিজ গৃহে ফিরে গিয়ে জীবন নাশের আশংকায় কম্বল দিয়ে নিজেকে আচ্ছাদিত করে রাখলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে রিসালাত ও তাবলীগের দায়িত্ব স্বরণ করিয়ে দিয়ে দ্বিতীয়বার জিবরীল (আ.) কে ওহী নিয়ে পাঠালেন :

ياايهاالمدثر – قم فانذر – وربك فكبر-

"অর্থাৎ হে বস্ত্রাচ্ছাদিত ওঠো, আর সতর্ক করো এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো।" (আল কুর'আন, ৭৪: ১-৩)

সে মুহূর্ত থেকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) সব ধরনের ভয়ভীতির উর্ধ্বে থেকে দীনে হকের প্রচার ও প্রসারের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। আল্লাহ্ তা'আলা এ দায়িত্ব আরো সুন্দর ও সুচারুরূপে পালন করার জন্য একাধিকবার তাঁকে তাকীদ করেছেন। আল্লাহ্ বলেছেন :

ياايهاالرسول بلغ ماانزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لايهدى القوم الكافرين -

"অর্থাৎ হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার করো; যদি না করো তবে তো তুমি তাঁর বার্তা প্রচার করলে না। আল্লাহ্ তোমাকে মানুষ হতে রক্ষা করবেন, নিশ্চয়ই তিনি কাফের সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান করেন না।" (আল কুর'আন, ০৫: ৬৭) তিনি আরো বলেছেন :

Dhaka University Institutional Repository

الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولايخشون احداالا الله وكفى بالله حسيبا -
"অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার করতো এবং তাঁকে ভয় করতো, আর আল্লাহ্‌কে ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করতো না, (কেননা মানুষের) হিসাব নেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাই যথেষ্ঠ।" (আল কুর'আন, ৩৩: ৩৯) অন্যত্র আল্লাহ্ আরো বলেছেন :

فلذالك فادع واستقم كماامرت ولاتتبع اهواءهم وقل امنت بماانزل الله من كتاب وامرت لاعدل بينكم الله ربناوربكم -
"অর্থাৎ সুতরাং তুমি তাঁর দিকে আহবান করো ও তাতেই দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকো যেভাবে তুমি আদিষ্ট হয়েছো এবং তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। বলো, আল্লাহ্ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আমি তাতে বিশ্বাস করি এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করতে। আল্লাহ্ই আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদেরর প্রতিপালক।" (আল কুর'আন, ৪২: ১৫)

আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (স.) কে গোটা বিশ্বের হিদায়াত দানের জন্য পাঠিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ (স.) নবুওয়াত প্রাপ্তি থেকে শুরু করে ইন্তিকাল পর্যন্ত গোটা মানব জাতির হিদায়াতের জন্য ঐশী দায়িত্ব পরিপূর্ণ ভাবে সম্পাদন করেছেন। এ সত্যকেই পবিত্র কুর'আনে সূরা মায়েদার নিম্নোক্ত আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে :

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا -
"অর্থাৎ আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাংগ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম।" (আল কুর'আন, ০৫: ০৩)

রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর অনুপস্থিতিতে মানবতার পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে উম্মত দান করেছেন । এবং উম্মতকে এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁরা যেন রাসূলের রেখে যাওয়া দীনে হকের প্রচার ও প্রসার করতে থাকেন। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন :

وكذالك جعلنكم امة وسطا لتكونوا شهداءعلى الناس -
"অর্থাৎ এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থি জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষীরূপ হবে।" (আল কুর'আন, ০২: ১৪৩) তিনি আরো বলেছেন :

قل الله شهيد بينى وبينكم واوحى الى هذاالقران لانذركم به ومن بلغ -
"অর্থাৎ বলো, আল্লাহ্ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী এবং এ কুর'আন আমার নিকট প্রেরিত হয়েছে যেন তোমাদেরকে এবং যার নিকট তা পৌঁছবে তাদেরকে এদ্বারা আমি সতর্ক করি।" (আল কুর'আন, ০৬: ১৯) এ উম্মতের দায়িত্ব হচ্ছে প্রতিটি দেশ, জাতি এবং ভিন্ন ভাষাভাষি লোকদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া। যেহেতু মুহাম্মদ (স.) এর পরে আর কোনো নবী আসবেন না, তাই সৃষ্টিকূলের হিদায়াত ও দীনে হকের চূড়ান্ত প্রমাণ পেশ করার দায়িত্ব চিরকালের জন্য তাঁর উম্মতের ওপর অর্পণ করা হয়েছে।

এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মাদীর একটি দলকে সত্য দীনের ওপর সব সময়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছেন, যা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন : "আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা হকের ওপর অবিচল থাকবে যারা তাদেরকে অপমান করবে তারা তাঁদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।" (সহীহ বুখারী, কিতাবুত তাওহীদ, হাদীস নং- ২৯) যুগে যুগে সত্য সন্ধানী লোকদেরকে তাঁরাই পথ দেখাবেন এবং যতই বিপর্যই আসুক না কেন তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর ও তাঁর সাহাবীদের জীবনাদর্শ জীবন্ত রাখবেন। উম্মতের অধিকাংশের গোমরাহীর সময়ও তাঁরা সৃষ্টিকূলকে সত্য দীনের দিকে অহবান জানাতে থাকবেন এবং মানব সৃষ্ট সকল বিকৃতির সংশোধন করার চেষ্টা করবেন। রিসালাতের এ দায়িত্বের কারণে উম্মতে মুহাম্মাদীকে শ্রেষ্ঠ উম্মত বলে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেছেন :

كنتم خيرامة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكروتؤمنون بالله -

Dhaka University Institutional Repository

"অর্থাৎ তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎকার্যের নির্দেশ দান করো, অসৎকার্যে নিষেধ করো এবং আল্লাহে বিশ্বাস করো।" (আল কুর'আন, ০৩: ১১০) অপর একটি আয়াতে এ দায়িত্ব পালনকারীদেরকে সফল হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে :

ولتكن منكم امة يدعون الى الخيرويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون -

"অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে এমন এক দল হোক যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দিবে ও অসৎকার্যে নিষেধ করবে; এরাই সফলকাম।" (আল কুর'আন, ০৩: ১০৪)

এ সফলকাম দলটি ইসলামের শুরু থেকেই দীন প্রচার ও প্রসারের মিশন নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁরা কখনও বিজয়ীর বেশে কখনও ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আবার কখনও শুধুমাত্র ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গমন করেন।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায়, বাংলাদেশে ইসলামের আগমন উপরোক্ত তিনটি মাধ্যমেই ঘটেছে। আলোচ্য গবেষণায় সর্বশেষ মাধ্যমটি তথা সূফী, অলী, যাঁরা কেবলমাত্র ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য এ অঞ্চলে আগমন করেছেন তাঁদের মধ্য থেকে ফুরফুরার আলিমগণের তথা খলীফাগণের অবদান নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ বা গবেষণা করা হবে।

বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে ফুরফুরার আলিমগণের অবদান বিষয়ক কোন গবেষণা আমার জানামতে হয়নি। বিধায়, এ অভাব কিছুটা পুরণের জন্যই আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। তাছাড়া হাদীসের ভাষ্যমতে 'আলিমগণ হলেন নবীগণের ওয়ারিশ।' তাই চিন্তাবিদ, কর্মবীর ও আদর্শ আলিমগণের ভাবধারা, ক্রিয়া-কর্ম ও জীবন-চরিত তুলে ধরা আমাদের ধর্মীয় দায়িত্ব। এ দায়িত্ব কিছুটা পালন করে পূণ্য হাসিলের প্রত্যাশা করা বোধ হয় অন্যায় কিছু হবে না। এ দিকটিও আমার গবেষণা কাজে প্রেরণা যুগিয়েছে। মূলত: এ দিকগুলো বিবেচনা করেই বাংলাদেশ সহ বিশ্ববাসীর নিকট উল্লিখিত আলিমগণের অবদান তুলে ধরাই হচ্ছে আমার এ গবেষণা কর্মের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

মানুষের জীবন যেমন ব্যাপক তাদের জীবন বিধানের পরিসরও তেমনি বিরাট। আর এ মানবজাতিকে মহান আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে পরিগণিত করেছেন। তাঁর ভাষায় :

ولقدكرمنا بنى ادم وحملنهم فى البروالبحرورزقنهم من الطيبات وفضلنهم على كثيرممن خلقنا تفضيلا -

"অর্থাৎ আমি অবশ্যই আদম সন্তানদের মর্যাদা দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে আমি তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি এবং তাদের পবিত্র (জিনিসসমূহ দিয়ে) আমি রিয্ক এর ব্যবস্থা করেছি, অতঃপর আমি অন্য যতো কিছু সৃষ্টি করেছি তার অধিকাংশের ওপরই আমি তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।"(আল কুর'আন, ১৭: ৭০) সর্বোত্তম উপাদানে সৃষ্টি মানবজাতিকে আল্লাহ্ বলগাহীন ভাবে পৃথিবীতে বিচরণের বিন্দুমাত্র অবকাশ দেননি। তিনি মানুষকে লক্ষ্য করে বলেছেন :

افحسبتم انما خلقنكم عبثاوانكم الينا لاترجعون -

"অর্থাৎ তোমরা কি (সত্যি সত্যিই) এটা ধরে নিয়েছো যে, আমি তোমাদের এমনিই অনর্থক পয়দা করেছি এবং তোমাদের (কখনই) আমার কাছে একত্রিত হতে হবে না ?"(আল কুর'আন, ২৩:১১৫)

আর এ দায়িত্বপ্রাপ্ত লোকদের অন্যতম হচ্ছেন আলিম সম্প্রদায়, যেহেতু তাঁরা হচ্ছেন নবী-রাসূলগণের ওয়ারিশ। তাঁদের কাজ হচ্ছে, বিশ্বনবীর ভাষায় :

عن عبدالله ابن عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بلغوا عنى ولو اية وحدثوا

عن بنى اسرائيل ولا حرج ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار-

'অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এরশাদ করেন :"আমার পক্ষ থেকে একটি শব্দও যদি তোমরা শিখে থাকো, তবে তা জনতার নিকট পৌঁছে দাও আর বনী ইসরাঈল সম্পর্কে আলোচনা করো, তাতে কোনো দোষ নেই। যে ব্যক্তি আমার প্রতি ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা আরোপ করে, তার নিজ

Dhaka University Institutional Repository

চিরস্থায়ী ঠিকানা জাহান্নামে সন্ধান করা উচিত।" (সহীহ বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া, হাদীস নং-৫০) আল্লাহ্ আলিমগণের দায়িত্ব সম্পর্কে বলেন :

وماكان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفرمن كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعواااليهم لعلهم يحذرون -

"অর্থাৎ মু'মিনদের কখনো (কোন অভিযানে) সবার একত্রে বের হওয়া ঠিক নয়; (তারা) এমন কেনো করলো না যে, তাদের প্রত্যেক দল থেকে কিছু কিছু লোক বের হতো যাতে করে তারা জ্ঞানানুশীলন করতো, অতঃপর যখন তারা (অভিযান শেষে) নিজ জাতির কাছে ফিরে আসতো, তখন তাদের জাতিকে তারা (আযাবের) ভয় দেখাতো, আশা করা যায় এতে তারা সতর্ক হয়ে চলবে।" (আল কুর'আন, ০৯:১২২)

এ জন্য বিশ্বের যে কোন অঞ্চলের যে কোন ভাষার এবং যে কোন বর্ণের লোক হোক না কেনো তিনি যদি আলিম হন, তা হলে তাঁর দায়িত্ব হচ্ছে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে নিজেকে উৎসর্গ করা। এ সকল আলিমগণের মধ্য থেকে 'বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে ফুরফুরার আলিমগণের অবদান' সম্পর্কিত গবেষণার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে প্রতিয়মান হয়েছে। এ কারণে এ বিষয়ে উচ্চতর গবেষণা করার প্রয়োজনীয়তা আন্তরিকভাবে অনুভব করছি। বিধায় অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে ঐকান্তিকতার সাথে একনিষ্ঠভাবে উচ্চতর এ গবেষণা কর্মে মনোনিবেশ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

কুর'আন ও হাদীসের আলোকে ইসলামের প্রচার ও প্রসার

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন ও পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থার নাম। এতে বিশ্বজগতের সৃষ্টি, ধ্বংস, ইহকালের সব প্রয়োজনীয় বিষয়, মৃত্যু ও মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সবকিছুই সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মানবজীবনের এমন কোনো দিক-বিভাগ নেই যা ইসলামে আলোচনা করা হয়নি। আল্লাহ্‌র নিকট গহণযোগ্য এবং মানবজাতির জন্য কল্যাণকর একমাত্র প্রমাণসিদ্ধ, নির্ভরযোগ্য ও সর্বাধুনিক জীবনব্যবস্থা হচ্ছে এটি। কেবলমাত্র ইসলামকে গ্রহণ করেই মানবজাতি দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতে মুক্তি অর্জন করতে পারে। তাই তিনি মানবজাতির জীবন বিধান হিসেবে একমাত্র ইসলামকেই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তাঁর ভাষায় :

ان الدين عندالله الاسلام -

"অর্থাৎ ইসলাম আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র দীন।"[১]

আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম ভিন্ন অন্য কোনো পন্থা, বিধান, আইন-কানুন তাঁর নিকট একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। মহান আল্লাহ্ বলেন :

ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهوفى الاخرة من الخاسرين -

"অর্থাৎ কেহ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনও কবুল করা হবে না এবং সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।"[২] তাই আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীন কর্তৃক মনোনীত ও পছন্দনীয় 'দীন' ইসলামকে পৃথিবীতে রূপায়িত. প্রচারিত, প্রসারিত ও প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সৃষ্টিকূলের সেরা জীব হিসেবে মানুষকে তাঁর একান্ত খলীফা বা প্রতিনিধি রূপে প্রেরণের ইচ্ছা ফিরিশ্‌তাদের নিকট ব্যক্ত করলেন। আদম (আ.) সৃষ্টি আল্লাহ্‌র সে ইচ্ছারই বাস্তবায়ন। তাঁর ভাষায় :

واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الارض خليفة -

"অর্থাৎ স্মরণ করো, যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশ্‌তাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করতেছি'।"[৩]

খলীফা তাকেই বলা হয়, মালিকের অধীনতা স্বীকার করে যিনি মালিকের দেয়া ক্ষমতা-ইখতিয়ার প্রয়োগ করেন। খলীফা কখনো মালিক হতে পারে না। মালিকের ইচ্ছানুযায়ী ক্ষমতা-ইখতিয়ার প্রয়োগ করাই হচ্ছে তাঁর কর্তব্য।[৪]

খলীফাহ্ রূপে নতুন এক সৃষ্টিকে পৃথিবীতে পাঠানো হবে, আল্লাহ্‌র এ সিদ্ধান্ত জানার পর ফিরিশ্‌তাদের মনে খট্‌কা সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্ বলেন :

قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء -

"অর্থাৎ তারা (ফিরিশ্‌তারা) বললো, আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে ?"[৫]

ফিরিশ্‌তাগণ এটা বুঝেছিলো যে, এ নতুন জীবকে ক্ষমতা-ইখতিয়ার দেয়া হবে। তবে এটা তারা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলো না যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ যেখানে বিশ্বজাহানের শৃঙ্খলা বিধান করছেন সেখানে তাঁর সৃষ্ট কোন জীব পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানকার শৃঙ্খলা বিঘ্নিত না হয়ে পারে কীভাবে ? ফিরিশ্‌তাগণ আরো বলে,"আমরাই তো আপনার প্রশংসামূলক তাস্‌বীহ্ পাঠ এবং আপনার পবিত্রতা বর্ণনার কাজ করছি।" আল্লাহ্‌র ভাষায় :

---

১. আল কুর'আন, ০৩ : ১৯
২. আল কুর'আন, ০৩ : ৮৫
৩. আল কুর'আন, ০২ : ৩০
৪. এ কে এম নাজির আহমদ, *আল্লাহ্‌র দিকে আহবান* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০২খ্রী.), পৃ. ০১
৫. আল কুর'আন, ০২: ৩০

Dhaka University Institutional Repository

ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك -

"অর্থাৎ আমরাই তো আপনার সপ্রশংস স্তুতিগান ও পবিত্রতা ঘোষণা করি।"[৬]

আল্লাহ্ ফিরিশ্তদেরকে কোনো ইখতিয়ার দেননি। আল্লাহ্র কোনো নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করার ইচ্ছা বা ক্ষমতা তাদের নেই। তাদেরকে বিশ্বজাহানের বিভিন্ন বিভাগের বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। তারা তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে চলছে। তাদের কাজের কোনো ত্রুটিতে অসন্তুষ্ট হয়েই আল্লাহ্ নতুন সৃষ্টি করছে কিনা, এটা ছিলো তাদের মনের দ্বিতীয় খট্কা। এই খট্কা দূর করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ বলেন :

انى اعلم مالاتعلمون -

"অর্থাৎ আমি জানি যা তোমরা জনো না।"[৭]

এ কথার মাধ্যমে আল্লাহ্ ফিরিশ্তাদেরকে এটা বুঝালেন যে, আদম (আ.)-এর সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা অবশ্যই আছে। যে উদ্দেশ্যে ফিরিশ্তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে সে উদ্দেশ্যে নয়, বরং ভিন্নতর উদ্দেশ্যে আদম (আ.) কে সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। কোনো সৃষ্ট জীবকে ক্ষমতা-ইখতিয়ার দিলে সে যেখানে নিযুক্ত হবে, সেখানে শৃঙ্খলা বিনষ্ট না হয়ে পারে কি করে ? এ খট্কা দূর করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ একটি মহড়ার আয়োজন করেন। বিশ্বজাহানের বিভিন্ন বস্তুর নাম বলার জন্য আল্লাহ্ ফিরিশ্তাদের প্রতি আহবান জানান। ফেরেশ্তাগণ অকপটে স্বীকার করে যে, তাদেরকে যে জিনিসের যতটুকু জ্ঞান দেয়া হয়েছে তার বাইরে অন্য কোনো জ্ঞান তাদের একেবরেই নেই। অতঃপর আল্লাহ্ আদম (আ.) কে বললেন, "তুমি এসব বস্তুর নাম বলে দাও। অল্লাহ্র ভাষায় :

وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئونى باسماءهؤلاء ان كنتم صادقين -

"অর্থাৎ এবং তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, তৎপর তিনি-সমুদয় ফিরিশ্তাদের সম্মুখে প্রকাশ করলেন এবং বললেন, 'এ সমুদয়ের নাম আমাকে বলে দাও যদি তোমরা সত্যবাদী হও'।"[৮]

আদম (আ.) সকল বস্তুর নাম অকপটে বলে দিলেন। এ মহড়ার মাধ্যমে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন একথা সুস্পষ্ট করে দিলেন যে, তিনি যাকে ক্ষমতা-ইখতিয়ার দিচ্ছেন তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক জ্ঞান দেয়া হচ্ছে। তাঁকে ক্ষমতা-ইখতিয়ার দেয়াতে যে বিপর্যয়ের আশংকা রয়েছে তা প্রকৃত ব্যাপারের একটি দিক মাত্র। তাতে কল্যাণের একটি সম্ভাবনাময় দিক রয়েছে। এবার আল্লাহ্ ফেরেশ্তাদেরকে আদমের নিকট অবনত হতে নির্দেশ দেন। তিনি বলেন :

واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين -

"অর্থাৎ যখন ফিরিশ্তাদের বললাম, 'আদমকে সিজ্দা করো', তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজ্দা করলো; সে অমান্য করলো ও অহংকার করলো। সুতরাং সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হলো।"[৯]

বিশ্বজাহানের বিভিন্ন প্রাণী ও বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করছে ফিরিশ্তাগণ। খলীফাহ্ হিসেবে ক্ষমতা-ইখতিয়ার প্রয়োগ করতে গেলে আদম (আ.) ও তাঁর সন্তানদেরকে প্রাণী ও বস্তু জগতের অনেক কিছু ব্যবহার করতে হবে। এক্ষেত্রে ফিরিশ্তাগণ তাদের স্বাভাবিক কর্তব্য পালনের তাকীদে আদম (আ.) ও তাঁর সন্তানদেরকে বাঁধা দিলে জটিলতার সৃষ্টি হবে। তাই আল্লাহ্ নিজের পক্ষ থেকেই ফিরিশ্তদেরকে এভাবে আদম (আ.)-এর অনুগত করে দেয়া ছিলো বিচক্ষণতারই দাবী।

৬. আল কুর'আন, ০২: ৩০
৭. আল কুর'আন, ০২: ৩০
৮. আল কুর'আন, ০২: ৩১
৯. আল কুর'আন, ০২: ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

এবার আসে ইবলীসের অবনত হওয়ার কথা। ইবলীস জিন জাতির অন্তর্ভূক্ত। নিরবচ্ছিন্নভাবে আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত করে সে ফিরিশ্‌তাদের অনুরূপ মর্যাদা লাভ করে। তাই ফিরিশ্‌তাদের সাথে মিলিত হয়ে আদম (আ.)-এর নিকট অবনত হওয়ার নির্দেশ তার জন্যও প্রযোজ্য ছিলো।

আল্লাহ্‌র নির্দেশ শুনার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিশ্‌তাগণ অদম (আ.)-এর নিকট অবনত হয়। কিন্তু ইবলীস মাথা উঁচিয়ে থাকে। জিন হয়েও 'ইবাদাতের বদৌলতে ইবলীস ফিরিশ্‌তার অনুরূপ মর্যাদা লাভ করে। কিন্তু তার মনে গোপন একটি ব্যাধি বাসা বাঁধে। সে ব্যাধির নাম অহংকার। এ অহংকারের কারণেই সে খলীফা হিসেবে আদম (আ.)-এর নিযুক্তিতে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তাই সে আদমের অনুগতও হতে রাজী হয়নি। আল্লাহ্ বলেন :

مامنعك الا تسجد اذ امرتك قال اناخير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين -

"অর্থাৎ আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম তখন কী তোমাকে নিবৃত করলো যে, তুমি নত হলে না ? সে বললো, আমি তাঁর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; অমাকে অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করেছো এবং তাঁকে কর্দম দ্বারা সৃষ্টি করেছো।"[১০]

আল্লাহ্‌র নির্দেশ মানতে না পারার পেছনে ইবলীসের অহংকারই যে একমাত্র কারণ ছিলো তা এখানে ব্যক্ত হয়েছে। ইবলীস এ যুক্তি দেখায় যে সে শ্রেষ্ঠতর উপাদানের তৈরী হওয়ার কারণে নিকৃষ্টতর উপাদানের তৈরী আদমের নিকট মাথা নত করতে পারে না। অহংকারের কারণেই ইবলীস এ যুক্তি বেছে নেয়। সরল মনে স্রষ্টার নির্দেশ পালনই যে তার জন্য শোভনীয় ছিলো, এ সহজ কথাটি সে ভুলে যায়।

স্রষ্টা তো মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। তাঁর প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশই বিশ্বসৃষ্টি। তাঁর বিশ্ব পরিকল্পনায় তিনি কোন্ সৃষ্টিকে কোন্ স্থান দেবেন, কোন্ সৃষ্টিকে কোন্ মর্যাদা দেবেন এটি তাঁর একান্তই নিজস্ব ব্যাপার।

সৃষ্টির কর্তব্য হচ্ছে শুধুমাত্র স্রষ্টার নির্দেশ পালন। স্রষ্টার কাছ থেকে নির্দেশ এসেছে এটা জানার পর সে নির্দেশ পালনে সামান্যতম বিলম্ব না করাই সৃষ্টির পক্ষে শোভনীয়। প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র কোনো নির্দেশের তাৎপর্য কারো নিকট বোধগম্য না হলেও তার অনুসরণের মধ্যেই যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে, তা বিশ্বাস করে সে মুতাবিক পদক্ষেপ নেয়াই সৃষ্টির কর্তব্য।

ইবলীস এ সোজা পথে এলো না। সে আল্লাহ্‌র নির্দেশের ত্রুটি আবিষ্কার করতে গেলো। শ্রেষ্ঠ উপাদানের সৃষ্টি এ যুক্তিতে ভর করে সে, যিনি তাকে সৃষ্টি করলেন তাঁরই নির্দেশ পালনে অস্বীকৃতি জানিয়ে বসলো। ইবলীসের এ অবাঞ্ছিত আচরণে মহান আল্লাহ্ রাগান্বিত হন। তিনি ইবলীসকে তাঁর সান্নিধ্য থেকে সরে যাবার নির্দেশ দেন। আল্লাহ্ বলেন:

فاهبط منها فمايكون لك ان تتكبرفيها فاخرج انك من الصاغرين -

"অর্থাৎ এ স্থান হতে নেমে যাও, এখানে থেকে অহংকার করবে, এটা হতে পারে না। সুতরাং বের হয়ে যাও, তুমি অধমদিগের অন্তর্ভূক্ত।"[১১]

আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনকে এতো বেশী অসন্তুষ্ট হতে দেখেও ইবলীস সাবধান হলো না। সে অহংকারে এতোই মেতে ছিলো যে, এ অবস্থাতেও সে আল্লাহ্‌র নিকট নত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলো না। আল্লাহ্‌র আনুগত্য পরিহার করে অবাধ্যতার পথে দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হওয়াকে সে শ্রেয় মনে করলো। অতঃপর সে মহান আল্লাহ্‌র নিকট পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত বেঁচে থাকার সুযোগ চেয়ে নিলো এবং আদম সন্তানদেরকে আল্লাহ্‌র অবাধ্য বান্দায় পরিণত করার চেষ্টা চালাতে লাগলো। আল্লাহ্‌র ভাষায় :

انظرنى الى يوم يبعثون– قال انك من المنظرين - قال فبما اغويتنى لا قعدن لهم صراطك المستقيم - ثم

لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايما نهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين -

---

১০. আল কুর'আন, ০৭: ১২
১১. আল কুর'আন, ০৭: ১৩

Dhaka University Institutional Repository

“অর্থাৎ সে বললো, ‘পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও।’ তিনি বললেন, ‘যাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হলে।’ সে বললো, ‘তুমি আমাকে শাস্তিদান করলে, এ জন্য আমিও তোমার সরল পথে মানুষের জন্য নিশ্চয়ই ওঁত পেতে থাকবো; অতঃপর আমি তাদের নিকট আসবই তাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ, দক্ষিণ ও বাম দিক হতে এবং তুমি তাদের অধিকাশংকে কৃতজ্ঞ পাবে না।”[১২]

ইবলীস অহংকারের বশবর্তী হয়ে বিদ্রোহের পতাকা উড়ালো। অথচ তার গুমরাহীর জন্য সে আল্লাহ্‌কেই দায়ী করে বসলো। অর্থাৎ তার দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র অন্যায় নির্দেশই তার বিদ্রোহের ক্ষেত্র রচনা করেছে। সংশোধিত হবার সর্বশেষ সুযোগটিও সে পদদলিত করলো এবং আল্লাহ্‌র পথ থেকে আদম সন্তানদেরকে বিপথে নিয়ে যাবার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবার দৃঢ় সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করলো। ইবলীসের এসব উদ্ধত্যপূর্ণ উক্তির জবাবে আল্লাহ্ তাকে এক কঠোর সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দেন। তিনি বলেন :

اخرج منهامذموما مدحورا - لمن تبعك منهم لاملئن جهنم منكم اجمعين -

“অর্থাৎ এ স্থান হতে ধিকৃত ও বিতাড়িত অবস্থায় বের হয়ে যাও; মানুষের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবই।”[১৩]

এভাবে দূর অতীতের কোনো এক সময়ে আল্লাহ্‌র এক সৃষ্টি ইবলীস তাঁরই নির্দেশ অমান্য করে বসে এবং আদম (আ.) ও আদম সন্তানদের দুশমনী করাকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে। সেদিন থেকে আদম সন্তানেরা ইবলীসের পক্ষ থেকে চিরস্থায়ী দুশমনীর সম্মুখীন।

১২. আল কুর'আন, ০৭: ১৪-১৭
১৩. আল কুর'আন, ০৭: ১৮

Dhaka University Institutional Repository

১ম পরিচ্ছেদ
সৃষ্টি হিসেবে মানুষের কর্তব্য

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের এক অপূর্ব সৃষ্টি হচ্ছে মানুষ। যাঁদেরকে তিনি জবাবদিহী বিহীন, প্রত্যাবর্তনহীন, নিরর্থক, নিছক কোনো প্রাণী হিসেবে পৃথিবীতে পাঠাননি। আল্লাহ্ বলেন :

افحسبتم انماخلقنكم عبثًا وانكم الينالا ترجعون -

"অর্থাৎ তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না।"[১৪]

বরং তাঁদেরকে খিলাফতের মত এক মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার জন্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এবং সে দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য জ্ঞান দান করেছেন। কিন্তু সে জ্ঞান খুবই সীমিত। অল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের জ্ঞানের তুলনায় সে জ্ঞান এতোই তুচ্ছ যে, তা হিসাবের মধ্যেই আসে না।

এ সীমিত জ্ঞানের সাহায্যে কোনো নির্ভুল জীবন বিধান রচনা করা মানুষের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। আবার দুনিয়ায় অবস্থানকালে সঠিক পথের সন্ধান না পেয়ে মানুষ ইবলীসের শিকারে পরিণত হবে, সেটাও আল্লাহ্র অভিপ্রেত নয়। তাই মানুষের জন্য জীবন বিধান রচনার দায়িত্ব আল্লাহ্ নিজেই নিয়েছেন। প্রথম মানব হযরত আদম (আ.) এবং তাঁর স্ত্রীকে পৃথিবীতে পাঠানোর প্রাক্কালে আল্লাহ্ মানুষের জন্য জীবন বিধান পাঠানোর ও'য়াদা করেছেন। মহান আল্লাহ্র ভাষায় :

اهبطوا منها جميعا- فامايا تينكم منى هدى فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون -

"অর্থাৎ তোমরা সকলেই এ স্থান হতে নেমে যাও। পরে যখন আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সৎপথের কোনো নির্দেশ আসবে তখন যারা আমার সৎপথের নির্দেশ অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় নাই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"[১৫]

একেতো সীমিত জ্ঞানের অধিকারী হবার কারণে মানুষের পক্ষে কোনো নির্ভুল ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান রচনা করা সম্ভবপর নয়। তদুপরি আল্লাহ্র কাছ থেকে জীবন বিধান আসার পর অন্য কোনো জীবন বিধান রচনা করা এবং সে মুতাবিক জীবন যাপন করার অধিকারও মানুষের নেই।

আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন বিধান উপেক্ষা করে মানুষ যদি অন্য কোনো জীবন বিধান রচনা করে এবং সে অনুযায়ী জীবন যাপন করে তবে তো মানুষ ইবলীসের যথার্থ শাগরিদেই পরিণত হয়। ইবলীসের মতোই সে বিদ্রোহী বলে গণ্য হয়। তখন ইবলীসের মতোই তার ওপরও আল্লাহ্র অভিশাপ নেমে আসে। জীবন বিধান হিসেবে মহান আল্লাহ্র নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবন বিধান হচ্ছে ইসলাম। তাঁর ভাষায় :

ان الدين عندالله الاسلام -

"অর্থাৎ ইসলাম আল্লাহ্র নিকট একমাত্র দীন।"[১৬]

বাস্তব অবস্থা যখন এই তখন আপন মনের ইচ্ছা-বাসনা অথবা অন্য কোনো ব্যক্তির ইচ্ছা-বাসনার আনুগত্য না করে মানুষের জন্য শোভনীয় হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ্র ইচ্ছা-বাসনার আনুগত্য করা। এছাড়া অন্য কোনো আনুগত্যই আল্লাহ্র পছন্দনীয় নয়। আল্লাহ্ বলেন :

ومن يبتغ غيرالاسلام دينا فلن يقبل منه– وهوفى الاخرة من الخاسرين -

"অর্থাৎ কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনও কবুল করা হবে না এবং সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।"[১৭]

---

১৪. আল কুর'আন, ২৩: ১১৫
১৫. আল কুর'আন, ০২: ৩৮
১৬. আল কুর'আন, ০৩: ১৯
১৭. আল কুর'আন, ০৩: ৮৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতপক্ষে বিশ্বজাহানের যাবতীয় সৃষ্টি আল্লাহ্র নির্দেশের নিকট মাথা নত করে আছে। আল্লাহ্র নির্ধারিত আইনগুলো মেনে বিশ্বলোকের সবকিছু নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। সামগ্রীকভাবে বিশ্বজাহান আল্লাহ্র আইন মেনে চলছে বলেই বিশ্বের সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করছে। বিশ্বব্যাপী আল্লাহ্র যে সব আইন কার্যকর রয়েছে সেগুলোর সাথে সংগতিশীল আইন তৈরি করা মানুষের সাধ্যের বাইরে। আবার নিজেদের জন্য জীবন বিধান রচনা করে তার সাথে সংগতিশীলরূপে বিশ্বলোকের সব আইনকে নতুনভাবে সাজিয়ে নেয়াও সাধ্যাতীত। এমতাবস্থায় বিনা দ্বিধায় আল্লাহ্র বিধান মেনে চলার মধ্যেই মানুষের কল্যাণ নিহিত। মহান আল্লাহ্ বলেন :

افغير دين الله يبغون وله اسلم من فى السموات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون -

"অর্থাৎ তারা কি চায় আল্লাহ্র দীনের পরিবর্তে অন্য দীন ? যখন আকাশে ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সমস্তই স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। আর তাঁর দিকেই তারা প্রত্যানীত হবে।"[১৮]

আল্লাহ্র বিধান মেনে না নেয়ার মানেই কুফ্র। যারা এ কুফ্র অবলম্বন করে তাদের পরিণাম ভয়াবহ। পৃথিবীর জীবনে কুফ্র অবলম্বন করেও আখিরাতের জীবনে কোনো না কোনো প্রকারে নাজাত পাওয়া যাবে, এ ধারণা পোষণ নিতান্তই বোকামী। আল্লাহ্ বলেন :

ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملءالارض ذهبا ولوافتدى به - اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين -

"অর্থাৎ যারা কুফ্রী করে এবং কাফিররূপে যাদের মৃত্যু ঘটে তাদের কারও নিকট হতে পৃথিবী-পূর্ণ স্বর্ণ বিনিময় স্বরূপ প্রদান করলেও তা কখনও কবূল করা হবে না। এরাই তারা যাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে; এদের কোনো সাহায্যকারী নেই।"[১৯]

ইবলীসের দুশমনী থেকে আত্মরক্ষা করা ও আখিরাতের আযাব থেকে নাজাত পাওয়ার উপায় হচ্ছে বিশুদ্ধ মন নিয়ে আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করা এবং আল্লাহ্র বিধান মুতাবিক জীবন গড়ে তোলা। আত্মরক্ষার এই নির্ভুল পথেই রাব্বুল 'আলামীন বিশ্বমানবতাকে আহবান জানাচ্ছেন এভাবে। তাঁর ভাষায় :

ياايهاالناس قدجاءكم الرسول بالحق من ربكم فامنوا خيرا لكم وان تكفروا فان لله مافى السموات والارض– وكان الله عليما حكيما -

"অর্থাৎ হে মানব ! রাসূল তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে সত্য এনেছে; সুতরাং তোমরা ঈমান আনো, এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। এবং তোমরা অস্বীকার করলেও আসমান ও যমীনে যা আছে সব আল্লাহ্রই এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, পজ্ঞাময়।"[২০]

মু'মিনের কর্তব্য

আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনে কেবল ব্যক্তি চরিত্র গঠনের তৎপরতা চালিয়েই কোনো ব্যক্তি আল-ইসলামের পূর্ণাঙ্গ দাবী পরিপূরণ করতে পারে না। ইসলাম শুধুমাত্র ব্যক্তি জীবন নিয়ন্ত্রণ করার কিছু নিয়ম-কানুনের নাম নয়। এটি একটি সর্বব্যপ্ত জীবন বিধান। জীবনের সকল বিভাগ সম্পর্কেই তার রয়েছে সুস্পষ্ট পথ-নির্দেশ।

ব্যক্তি জীবনে ইসলামের কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলা যতখানি সহজ, সমাজ জীবনে ইসলামের অনুশাসন প্রবর্তন করা ততখানিই কঠিন। পথের এ কঠিনতা দূর করেই অল্লাহ্র অনুগত বান্দাহদেরকে সমাজের সকল ক্ষেত্রে ইসলামকে বিজয়ী আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। একেই বলা হয় ইকামতে দীন।

---

১৮. আল কুর'আন, ০৩: ৮৩
১৯. আল কুর'আন, ০৩: ৯১; ০৫: ৩৬
২০. আল কুর'আন, ০৪: ১৭০

Dhaka University Institutional Repository

ইকামতে দীন কোনো সহজসাধ্য কাজ নয়। এর জন্য প্রয়োজন পরিকল্পিত বিরামহীন সংগ্রাম। ইকামতে দীনের জন্য পরিচালিত সর্বাত্মক সংগ্রামকেই আল কুর'আন الجهاد فى سبيل الله বা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ নামে আখ্যায়িত করেছে। বাংলা ভাষায় একে বলা হয় ইসলামী আন্দোলন। ইকামতে দীনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত সকল কর্মকান্ড বিশ্লেষণ করলে সর্বপ্রথম যে বিষয়টির ওপর স্বাভাবিকভাবেই দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়, তা হচ্ছে الدعوة الى الله বা আল্লাহ্‌র দিকে আহবান। একজন মু'মিন ইসলামী আদর্শ ছাড়া অন্য কোনো আদর্শ বা মানব রচিত বিধানের দিকে আহবান করার সামন্যতম কোনো অনুমতি ইসলামে নেই। আল্লাহ্ বলেন :

وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله- ذالكم وصكم به لعلكم تتقون -

"অর্থাৎ এবং এ আমার সরল পথ। সুতরাং তোমরা এ পথেরই অনুসরণ করবে এবং বিভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন করবে। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন, যেন তোমরা সাবধান হও।"[২১] আল্লাহ্ আরো বলেন :

فذالكم الله ربكم الحق فماذا بعدالحق الا الضلال فانى تصرفون -

"অর্থাৎ তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের সত্য প্রতিপালক। সত্য ত্যাগ করার পর বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কী থাকে ? সুতরাং তোমরা কোথায় চালিত হচ্ছ।"[২২]

আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন অন্যত্র বলেন :

وانزلنا اليك الكتب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عماجاءك من الحق - لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا- ولوشاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن ليبلوكم فى ما اتكم فاستبقوا الخيرات - الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون -

"অর্থাৎ আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি এর পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের প্রত্যায়নকারী ও সংরক্ষকরূপে। সুতরাং আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে তুমি তাদের বিচারনিষ্পত্তি করো এবং যে সত্য তোমার নিকট এসেছে তা ত্যাগ করে তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরী'আত[২৩] ও স্পষ্ট পথ[২৪] নির্ধারণ করেছি। ইচ্ছে করলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে এক জাতি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন তদ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান। সুতরাং সৎকর্মে তোমরা প্রতিযোগিতা করো। আল্লাহ্‌র দিকেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছিলে, সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন।"[২৫]

বিশ্বনবী (স.) বলেন :

عن الحارث الاشعرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم وان صام وصلى و زعم انه مسلم -

অর্থাৎ হারেসুল আশ'য়ারী (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন : " যে ব্যক্তি জাহিলিয়াতের (ইসলামী আদর্শ বিরোধী) নিয়ম-নীতির দিকে আহবান জানায়, সে জাহান্নামী হবে। যদিও সে রোজা রাখে, সালাত আদায় করে এবং নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করে।"[২৬]

---

২১. আল কুর'আন, ০৬: ১৫৩
২২. আল কুর'আন, ১০: ৩২
২৩. দীনের বিধানসমূহ, উদ্ধৃত, সম্পাদনা পরিষদ, আল-কুরআনুল করীম (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ২০১৬ খ্রী.), পৃ. ১৬৯
২৪. منهاج সরল পথ, উদ্ধৃত, মাওলানা আবদুর রহমান কাশগরী গং, আল-কুরআনুল করীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯
২৫. আল কুর'আন, ০৫: ৪৮
২৬. ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী, *জামে' আত-তিরমিযী*, হাদীস নং- ২৮৬৩: *হাদীস সম্ভার*, হাদীস নং- ১৮৪২

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ্ (স.) অন্যত্র বলেন :

عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذالك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلا لة كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذالك من اثامهم شيئا -

অর্থাৎ আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি সত্যের দিকে ডাকে তার জন্য সত্যের অনুসারীদের বিনিময়ের সমান বিনিময় রয়েছে। এতে তাদের বিনিময় হতে কিছু কম করা হবে না। আর যে ভ্রান্ত পথের দিকে আহবান করে, তার জন্য উক্ত পথের অনুসারীদের সমান পাপ হতে থাকবে। এর মধ্যে তাদের অনুসারীদের পাপ কিছুমাত্র কম হবে না।"[২৭]

ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য নিজে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান পোষণ করাই যথেষ্ট নয়, সে ঈমানের আলো অন্যদের মাঝে বিকশিত করাও একান্ত প্রয়োজন। প্রতি যুগেই ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও কর্মীগণ নিষ্ঠার সাথে এ কর্তব্য পালনের চেষ্টা করেছেন।

২৭. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, হদীস নং- ৬৬৯৭, ১৬১২

Dhaka University Institutional Repository

২য় পরিচ্ছেদ
আল্লাহ্‌র পথে ত্যাগ ও পরীক্ষা

পৃথিবীর যে কোনো আদর্শ তার অনুসারীদের নিকট ত্যাগ ও কুরবানী দাবী করে। ইসলামও তার অনুসারীদের নিকট চরম ত্যাগ ও কুরবানী দাবী করেছে। তাই যুগে যুগে ঈমানদার লোকেরা ইসলামী আদর্শ পৃথিবীতে বাস্তবায়িত করার জন্য তাঁদের জান, মাল, ইজ্জত, আব্রু আল্লাহ্‌র পথে কুরবানী করে বাতিল সমাজ ব্যবস্থার সাথে মুকাবিলা করেছে।[২৮] এ বিষয়ে মহান অল্লাহ্‌ বলেন :

الذين امنوا يقاتلون فى سبيل الله والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا -

“অর্থাৎ যারা মু'মিন তারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে এবং যারা কাফির তারা তাগূতের পথে যুদ্ধ করে। সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো; শয়তানের কৌশল অত্যন্ত দুর্বল।[২৯] আল্লাহ্‌ আরো বলেন :

احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون - ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين -

“অর্থাৎ মানুষ কি মনে করে যে, ‘আমরা ঈমান এনেছি’ এ কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেয়া হবে ? অমি তো এদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম; আল্লাহ্‌ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন[৩০] কারা সত্যবাদী এবং তিনি অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা মিথ্যাবাদী।”[৩১] আল্লাহ্‌ অন্যত্র বলেন :

ولنبلونكم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشرالصابرين -

“অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করবো। তুমি সু সংবাদ দাও ধৈর্যশীলগণকে।”[৩২] আল্লাহ্‌ আরো বলেন :

ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصرالله الا ان نصرالله قريب -

“অর্থাৎ তোমরা কি মনে করো যে, তোমরা জন্নাতে প্রবেশ করবে– যদিও এখনও তোমাদের নিকট তোমাদের পূর্ববর্তীদের অনুরূপ অবস্থা আসে নি ? অর্থ-সংকট ও দুঃখ-ক্লেশ তাদেরকে স্পর্শ করেছিলো এবং তারা ভীত ও কম্পিত হয়েছিলো। এমনকি রাসূল এবং তাঁর সঙ্গে ঈমান আনয়নকারীগণ বলে উঠেছিলো, ‘আল্লাহ্‌র সাহায্য কখন আসবে ?’ জেনে রেখো আল্লাহ্‌র সাহায্য নিকটে।”[৩৩]

রাসূলুল্লাহ্‌ (স.) এরশাদ করেন :

عن خباب بن الارت قال شكونا الى النبى صلى الله عليه وسلم وهو متواسد بردة له فى ظل الكعبة فقلنا الا تستنصر لنا الا تدعو الله لنا؟ قال: كان الرجل فيمن قبلكم يحفرله فى الارض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على راسه فيشق اثنين وما يصده ذالك عن دينه يمشط بامشاط الحديد مادون لحمه من

২৮. অধ্যাপর মাওলানা হারুনুর রশীদ খান, কুরআন ও হাদীসের আলোকে পূর্ণাঙ্গ মানব জীবন (ঢাকা: প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স, ১৯৭৯ খ্রী), পৃ. ২৭২
২৯. আল কুর'আন, ০৪: ৭৬
৩০. এ স্থলে يعلمن শব্দটির অর্থ ‘প্রকাশ করে দিবেন।’ –কাশ্‌শাফ, কুরতুবী, সাফওয়াতুল বায়ান: উদ্ধৃত, সম্পাদনা পরিষদ, *আল-কুরআনুল করীম* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ২০১৬ খ্রী.), পৃ. ৬৪০
৩১. আল কুর'আন, ২৯: ২,৩
৩২. আল কুর'আন, ০২: ১৫৫
৩৩. আল কুর'আন, ০২: ২১৪

Dhaka University Institutional Repository

عظم او عصب ومايصده ذالك عن دينه والله ليتمن هذه الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله او الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون -

অর্থাৎ খাব্বাব ইব্‌ন আরত (রা.) হতে বর্ণিত। একদা আমরা নবী কারীম (স.)-এর নিকট (আমাদের দুঃখ দুর্দশা ও অত্যাচার নির্যাতন সম্পর্কে) অভিযোগ করলাম। তখন তিনি তাঁর চাদরটিকে বালিশ বানিয়ে কা'বা ঘরের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আমরা তাঁকে বললাম, আপনি কি আমাদের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করবেন না? আপনি কি আল্লাহ্‌র নিকট আমাদের জন্য দু'আ করবেন না? তখন তিনি বললেন : "তোমাদের পূর্বেকার ঈমানদার লোকদের অবস্থা ছিলো তাদের কারো জন্যে গর্ত খোড়া হতো এবং সে গর্তের মধ্যে তার শরীরের অর্ধাংশ পুঁতে তাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হতো। অতঃপর করাত এনে তার মাথার ওপর স্থাপন করা হতো এবং তাকে দ্বিখন্ডিত করে ফেলা হতো। কিন্তু এ অমানুষিক অত্যাচার তাকে তার দীন থেকে ফেরাতে পারতো না। কারো শরীর লোহার চিরুনী দ্বারা আঁচড়িয়ে হাড় পর্যন্ত মাংস ও স্নায়ু তুলে ফেলা হতো, কিন্তু এতেও তাকে তার দীন থেকে ফেরাতে পারতো না। আল্লাহ্‌র কসম, এ দীন অবশ্যই পূর্ণতা লাভ করবে। তখন যে কোনো উষ্ট্রারোহী সান'আ থেকে হাজরামাউত পর্যন্ত দীর্ঘ পথ নিরাপদে সফর করবে। এ দীর্ঘ সফরে সে আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকেও ভয় করবে না; এবং মেষ পালের ব্যাপারে নেকড়ে ছাড়া অন্য কারো ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা খুবই তাড়াহুড়ো করছো।"[৩৪] রাসূলুল্লাহ্ (স.) আরো বলেন :

عن انس قال النبى صلى الله عليه وسلم: ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان الله تعالى اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضى فله الرضى ومن سخط فله السخط -

অর্থাৎ আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। নবী (স.) বলেছেন : "বিপদ ও পরীক্ষা যতো কঠিন হবে, তার প্রতিদান ততো মূল্যবান। আর যখন কোনো জাতিকে ভালোবসেন, তখন অধিক যাচাই ও সংশোধনের জন্য তাদেরকে বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। অতঃপর যারা আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তকে খুশি মনে মেনে নেয় এবং ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ্ তাঁদের ওপর সন্তুষ্ট হন। আর যারা এ বিপদ ও পরীক্ষায় আল্লাহ্‌র ওপর অসন্তুষ্ট হয়, আল্লাহ্‌ও তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন।"[৩৫]

অপর এক দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে :

عن صهيب؛ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك فيمن كان قبلكم ، وكان له ساحر ، فلما كبر قال للملك: انى قد كبرت فابعث الي غلاما اعلمه السحر ، فبعث اليه غلاما يعلمه ، فكان فى طريقه اذا سلك راهب ، فقعد اليه وسمع كلامه فاعجبه فكان اذا اتى الساحر ، مربالراهب وقعد اليه فاذا اتى الساحر ضربه فشكى ذالك الى الراهب فقال: اذا خشيت الساحر فقل: حبسنى اهلى واذا خشيت اهلك فقل: حبسنى الساحر فبينما هو كذالك اذ اتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال: اليوم اعلم الساحر افضل ام الراهب افضل؟ فاخذ حجرا فقال: اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضى الناس فرماها فقتلها ومضى الناس فاتى الراهب فاخبره فقال له الراهب: اي بني انت اليوم افضل منى قد بلغ من امرك ما ارى وانك ستبلى فان ابتليت فلا تدل علي وكان الغلام يبرئ الاكمه والابرص ويداوي الناس من سائر الادواء فسمع جليس للملك كان قد عمي، فاتاه بهدايا كثيرة ، فقال: ما ههنا لك اجمع، ان انت شفيتني، فقال اني لا اشفي احدا، انما يشفي الله، فان انت امنت بالله دعوت الله فشفاك، فامن بالله فشفاه الله فاتى الملك فجلس اليه كما كان يجلس ، فقال له الملك: من رد

৩৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল বুখারী, *সহীহ আল বুখারী*, হাদীস নং-৩৬১২
৩৫. আবূ ঈসা তিরমিযী, *জামে' আত-তিরমিযী*, হাদীস নং- ২৩৯৬

Dhaka University Institutional Repository

عليك بصرك ؟ قال ربي ، قال: اولك رب غيري ؟ قال ربي وربك الله ، فاخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام ، فجيئ بالغلام ، فقال له الملك: اي بني! قد بلغ من سحرك ما تبرئ الاكمه والابرص وتفعل وتفعل، فقال: اني لا أشفي احدا ، انما يشفي الله ، فاخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب ، فجيئ بالراهب ، فقيل له: ارجع عن دينك فابى فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق راسه ، فشقه به حتى وقع شقاه ، ثم جيئ بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك فابى ، فوضع المنشار في مفرق راسه ، فشقه به حتى وقع شقاه ، ثم جيئ بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك فابى ، فدفعه الى نفر من اصحابه فقال: اذهبوا به الى جبل كذا وكذا ، فاصعدوا به الجبل ، فاذا بلغتم ذروته ، فان رجع عن دينه والا فاطرحوه ، فذهبوا به فصعدوا به الجبل ، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت ، فرجف بهم الجبل فسقطوا ، وجاء يمشي الى الملك، فقال له الملك: ما فعل اصحابك ؟ كفانيهم الله ، فدفعه الى نفر من اصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه فى قرقور ، فتوسطوا به البحر ، فان رجع عن دينه والا فاقذفوه ، فذهبوا به فقال اكفنيهم بما شئت، فانكفات بهم السفينة فغرقوا، وجاء يمشي الى الملك فقال له الملك: ما فعل اصحابك ؟ فقال كفانيهم الله ، فقال للملك: انك لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به ، قال: وما هو ؟ قال: تجمع الناس فى صعيد واحد، وتصلبني على جذع ، ثم خذ سهما من كنانتي ثم وضع السهم فى كبد القوس ثم قل: بسم الله رب الغلام ثم ارمني فانك اذا فعلت ذالك قتلتني ، فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم اخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال: بسم الله رب الغلام ثم رماه فوضع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات فقال الناس: امنا برب الغلام ، امنا برب الغلام ، امنا برب الغلام ، فاتي الملك فقيل له: ارايت ماكنت تحذر؟ قد والله! نزل بك حذرك ، قدامن الناس ، فامر بالاخدود بافواه السكك فخدت واضرم النيران وقال: من لم يرجع عن دينه فاحموه فيها او قيل له اقتحم ، ففعلوا حتى جاءت امراة ومعها صبي لها ، فتقاعست ان تقع فيها ، فقال لها الغلام: يا امه! اصبري ، فانك على الحق -

অর্থাৎ সুহায়েব (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন : “তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতের মধ্যে এক বাদশাহ্ ছিলো। তার ছিলো এক যাদুকর। যাদুকর যখন বৃদ্ধ হয়ে গেলো তখন সে বাদশাহ্‌কে বললো, আমি তো বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি। অতএব আমার নিকট এক যুবককে পাঠিয়ে দিন, যাতে তাকে যাদুমন্ত্র শিখিয়ে দিতে পারি। বাদশাহ্ যাদুমন্ত্র শিখাবার উদ্দেশ্যে তার নিকট একজন যুবককে পাঠিয়ে দিলো। যুবকের রাস্তার ধারেই ছিলো একজন ধর্মযাজক। যুবক তাঁর কাছে বসে তাঁর কথা শুনলো এবং তাঁর কথা তার কাছে খুবই ভালো লাগলো। অতএব যুবক যখনই যাদুকরের নিকট যেতো, সে রাস্তায় ধর্মযাজকের কাছে গিয়ে বসতো। এরপর যাদুকরের কাছে গেলে যাদুকর তাকে মারধর করতো। যুবক ধর্মযাজকের নিকট যাদুকর সম্পর্কে অভিযোগ করলে ধর্মযাজক তাকে বললেন, যখন তুমি যাদুকরের মারধরের আশংকা করো তখন বলবে, আমাকে আমার স্বজনেরা বিরত রেখেছিলো। আর যখন তোমার স্বজনদেরকে ভয় করো তখন বলবে, আমাকে যাদুকর আসতে বিরত রেখেছে। এভাবে সে আসা যাওয়া করছিলো। ঘটনাক্রমে একদিন রাস্তায় বিরাটকায় জন্তু উপস্থিত, যা মানুষের যাতায়েতের পথ রোধ করে রেখেছিলো। যুবক মনে মনে বললো, আজ আমি দেখবো, যাদুকর শ্রেষ্ঠ নাকি ধর্মযাজক শ্রেষ্ঠ ? তখন সে একটা পাথর হাতে নিয়ে বললো, হে আল্লাহ্! যদি ধর্মযাজকের কাজ তোমার কাছে যাদুকর অপেক্ষা প্রিয় হয়ে থাকে, তবে তুমি এ জন্তুকে পাথর দ্বারা মেরে ফেলো, যাতে লোকজন যাতায়াত করতে পারে। এরপর সে পাথর নিক্ষেপ করলে জন্তুটা মারা গেলো এবং লোকজন পার হয়ে গেলো। যুবক ধর্মযাজককে এসে ব্যাপারটা জানালে ধর্মযাজক বললেন, বৎস! আজ তুমি আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়ে গেলে। আমি

Dhaka University Institutional Repository

যতটুকু দেখছি তোমার কাজ সিদ্ধ হয়েছে, তবে তোমাকে অচিরেই কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। যদি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হও, তবে আমার সম্পর্কে কিছু জানাবে না। যুবক আল্লাহ্‌র হুকুমে জন্মান্ধ ও শ্বেতরুগী আরোগ্য করতো এবং মানুষের যাবতীয় রোগের চিকিৎসা করতো। রাজার এক সভাসদ (মন্ত্রী) অন্ধ ছিলো। তাঁর কানে এ খবর পৌছলে সে বহু উপঢৌকন নিয়ে যুবকের কাছে এসে বললো, তুমি যদি আমাকে আরোগ্য করতে পারো তবে যা কিছু আমি এনেছি সবই তোমাকে দান করবো। যুবক বললো, আমি কাউকে আরোগ্য করতে পারি না। একমাত্র আল্লাহ্‌ই আরোগ্য করেন। তুমি যদি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনো তবে আমি আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করবো। তাহলে তিনি আরোগ্য করবেন। একথা শুনে ঐ সভাসদ ঈমান আনলো। অতঃপর আল্লাহ্ তাকে আরোগ্য করলেন। ভালো হয়ে সে পূর্বের ন্যায় রাজার কাছে এসে বসলো। রাজা তাঁকে দেখে (বিস্মিত হয়ে) জিজ্ঞেস করলো, তোমার চোখ কে ফিরিয়ে দিলো ? মন্ত্রী বললো, আমার রব আল্লাহ্। রাজা জিজ্ঞেস করলো, আমি ছাড়াও তোমার কোনো রব আছে নাকি ? মন্ত্রী বললো, আমার ও আপনার রব আল্লাহ্। উত্তর শুনে রাজা তাকে পাকড়াও করলো এবং তাকে কঠিন শাস্তি দিতে লাগলো। শাস্তির কষ্টে সে যুবকের কথা বলে দিলো। অতঃপর যুবককে উপস্থিত করে রাজা বলালো, বেটা! তোর যাদু সম্পর্কে আমি সংবাদ পেলাম। যাদু দিয়ে তুই জন্মান্ধ ও শ্বেতরুগী আরোগ্য করছিস। আরো কি কি করছিস! যুবক বললো, আমি কাউকে আরোগ্য করতে পারি না, একমাত্র আল্লাহ্‌ই আরোগ্য করেন। উত্তর শুনে রাজা তাঁকে পাকড়াও করে কঠিন শাস্তি দিতে লাগলো। শাস্তির তীব্রতায় অবশেষে যুবক ধর্মযাজকের কথা বলে দিলো। এরপর ধর্মযাজককে উপস্থিত করা হলো। তাঁকে বলা হলো, তুমি তোমার ধর্ম থেকে ফিরে আসো। ধর্মযাজক অস্বীকার করলে রাজা করাত এনে তাঁর মাথার তালুর মাঝখানে স্থাপন করে তাঁকেও দ্বিখন্ডিত করলো। অতঃপর যুবককে উপস্থিত করে তাকেও বলা হয়, তুমি তোমার ধর্ম ছেড়ে দাও। সে অস্বীকার করলে রাজা তার একদল সহচরের হাতে তাঁকে অর্পণ করে আদেশ করলো, একে অমুক পাহাড়ে নিয়ে যাও এবং যখন পাহাড়ের শীর্ষদেশে পৌঁছবে, তখন তাঁকে ধর্ম ত্যাগ করতে বলবে। যদি ধর্ম ত্যাগ করে তবে তো ভালো, অন্যথায় তাঁকে পাহাড়ের ওপর থেকে নিচে নিক্ষেপ করবে। আদেশ পেয়ে তারা তাঁকে নিয়ে পাহাড়ের ওপরে আরোহন করলো। এ সময় যুবক আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করলো, হে আল্লাহ্! তোমার যা ইচ্ছা আমার ও এদের ব্যাপারে তুমিই ব্যবস্থা গ্রহণ করো। এরপর পাহাড়ে বিরাট কম্পন সৃষ্টি হলে তারা সব নিচে পতিত হয়ে মারা গেলো। অবশেষে যুবক নিরাপদে রাজার নিকট পৌঁছলো। রাজা জিজ্ঞেস করলো, তোমার সাথীদের কী হলো ? যুবক বললো, আল্লাহ্ আমাকে তাদের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। এরপর রাজা তাঁকে তার আর একদল সহচরের কাছে অর্পণ করে বললো, একে নিয়ে যাও এবং একটা নৌকাতে উঠিয়ে সমুদ্রের মাঝখানে নিয়ে যাও। সমুদ্রের মাঝখানে পৌঁছলে তাঁকে ধর্ম ত্যাগ করতে বলবে। যদি ত্যাগ করে তো ভালো, অন্যথায় তাঁকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। আদেশ পেয়ে তারা তাঁকে সমুদ্রের মাঝখানে নিয়ে গেলো। এ সময় যুবক আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করলো, হে আল্লাহ্! তোমার ইচ্ছানুযায়ী আমাকে এদের হাত থকে বাঁচাও। সঙ্গে সঙ্গে নৌকা উল্টে গিয়ে তারা সবাই ডুবে মরলো। যুবক নিরাপদে পদব্রজে রাজার নিকটে এসে পৌঁছলো। রাজা তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, তোমার সঙ্গীদের অবস্থা কী হলো ? যুবক বললো, আল্লাহ্ আমাকে তাদের থেকে বাঁচিয়েছেন। অতঃপর যুবক রাজাকে বললো, তুমি আমাকে কিছুতেই মারতে পারবে না যে পর্যন্ত তুমি আমার পরামর্শ মতো কাজ না করো। রাজা জিজ্ঞেস করলো তা কেমন ? যুবক বললো, প্রথমে সব লোক এক স্থানে একত্রিত করবে। আর আমাকে একটা শুলিকাষ্ঠে ঝুলাবে। এরপর আমার থলি থেকে একটা তীর বের করে তা কামানের মাঝখানে স্থাপন করবে। অতঃপর 'বিছমিল্লাহি রব্বিল গোলাম' বলে তা আমার প্রতি নিক্ষেপ করবে। যখন তুমি এরূপ করবে তখনই আমাকে মারতে পারবে। এ কথা শুনে রাজা সব লোককে এক জায়গায় একত্র করলো এবং তাঁকে শুলে ঝুলালো। অতঃপর তাঁর থলি থেকে একটা তীর বের করে কামানের মাঝখানে তা স্থাপন করলো। অবশেষে 'বিছমিল্লাহি রব্বিল গোলাম' বলে তাঁর দিকে নিক্ষেপ করলো। তীর গিয়ে তাঁর কানের নিম্নাংশে পৌঁছলে যুবক নিজ হাত কানের নিম্নাংশে তীরের স্থানে রেখে প্রাণত্যাগ করলো। রাজ্যের সবলোক এ দৃশ্য দেখে ঘোষণা করলো, আমরা সবাই এ যুবকের প্রভুর ওপর ঈমান আনলাম, আমরা সবাই এ যুবকের প্রভুর ওপর ঈমান আনলাম, আমরা সবাই এ যুবকের রবের ওপর ঈমান আনলাম। এরপর রাজা ঘটনাস্থলে পৌঁছলে তাকে বলা হলো, তুমি যে আশঙ্কা করছিলে, আল্লাহ্‌র কসম; সে আশঙ্কাই তোমার ওপর পতিত হয়েছে। সবলোক তো ঈমান এনে ফলেছে। এরপর সে (রাজা) আদেশ করলো, রাস্তার মোহনায় বিরাট গর্ত খনন করো এবং তাতে আগুন জ্বালাও। তার আদেশে বিরাট গর্ত খনন করা হলো এবং তাতে আগুন জ্বালানো হলো। অতঃপর আদেশ করলো, যারা ঐ ধর্ম থেকে ফিরে না আসবে তাদেরকে এর মধ্যে পুড়িয়ে ফেলো অথবা তাদেরকে বলা হলো– এর মধ্যে প্রবেশ করো। যুবকের অনুগামীরা তাই করলো।

Dhaka University Institutional Repository

শেষ পর্যন্ত এক মহিলা একটা শিশুকে নিয়ে অগ্নিগহ্বরের নিকট এসে তাতে ঝাঁপ দিতে ইতস্তত করছিলো। দুধের শিশু তাকে বললো, 'ওহে মা! ধৈর্যধারণ করুন! আপনি সত্য ধর্মে কায়েম আছেন।"[৩৬]

মু'মিন হচ্ছে আল্লাহ্‌র সৈনিক

মু'মিনের দু'টো দায়িত্ব; আল্লাহ্‌র বিধান নিজে পালন করবে এবং এ বিধান কেউ যেনো লংঘন করতে না পারে, তা প্রতিহত করবে। আল্লাহ্ বলেন :

ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذالك هوالفوزالعظيم -

"অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মু'মিনদের নিকট হতে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন, তাদের জন্য জান্নাত আছে এর বিনিময়ে। তারা আল্লহ্‌র পথে যুদ্ধ করে, হত্যা করে ও নিহত হয়। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুর'আনে এ সম্পর্কে তাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রয়েছে। নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কে আছে ? তোমরা যে সওদা করেছো সে সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং এটাই তো মহা সাফল্য।"[৩৭]

আল্লাহ্ আরো বলেন :

فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحيوة الدنيا بالاخرة ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما -

"অর্থাৎ সুতরাং যারা আখিরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রয় করে তারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করুক এবং আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করলে সে নিহত হোক অথবা বিজয়ী হোক আমি তাকে মহা পুরস্কার দান করবোই।"[৩৮]

আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন :

واعدوا لهم ماستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شئ فى سبيل الله يوف اليكم وانتم لا تظلمون -

"অর্থাৎ তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে– এতদ্‌দ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহ্‌র শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে এবং এতদ্ব্যতীত অন্যদেরকে যাদেরকে তোমরা জানো না, আল্লাহ্ তাদেরকে জানেন। আল্লাহ্‌র পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে দেয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি যুল্‌ম করা হবে না।"[৩৯]

রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন :

عن ابى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر-

অর্থাৎ আবূ সা'ঈদ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন : "স্বৈরাচারী যালেম শাসকের সামনে সত্য কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ।"[৪০]

---

৩৬. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং- ৭২৯৩, অনুবাদ: মাওলানা আ.স.ম. নূরুজ্জামান গং (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৫ খ্রী.), খন্ড- ০৮, পৃ. ৫৬৮
৩৭. আল কুর'আন, ০৯: ১১১
৩৮. আল কুর'আন, ০৪: ৭৪
৩৯. আল কুর'আন, ০৮: ৬০
৪০. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াযীদ আল কাযবানী, *সুনান ইবনে মাজা*, হাদীস নং- ৪০১১; জামে আত-তিরমিযী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২১৭৪

Dhaka University Institutional Repository

৩য় পরিচ্ছেদ
আল্লাহ্‌র দিকে আহবান ও নবীগণ

মানুষের যাবতীয় অনৈসলামিক ধ্যান-ধারণা ও জীবন বিধান বিসর্জন দিয়ে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসার উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন নবী-রাসূলগণ। আর তাঁদের সকলেরই দা'ওয়াতের মূলমন্ত্র ছিলো আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত ও তাগূতকে বর্জন। সে লক্ষ্যে মহান আল্লাহ্ মানুষকে তাঁর একান্ত বান্দায় রূপান্তরিত করতে প্রতিটি জাতির মধ্যে নবী বা রাসূল পাঠিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন :

ولقد بعثنا فى كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت -

"অর্থাৎ আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত করার ও তাগূতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি।"[৪১] তাগূতকে বর্জনের নির্দেশনা দিয়ে আল্লাহ্ বলেন :

فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لانفصام لها - والله سميع عليم -

"অর্থাৎ যে তাগূতকে[৪২] অস্বীকার করবে ও আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান আনবে সে এমন এক মজবুত হাতল ধরবে যা কখনও ভাংবে না। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময়।[৪৩]

নবী-রাসূল প্রেরণের এ ধারাবাহিকতার সর্বশেষ ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন জনাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (স.)। যাঁকে তিনি সঠিক পথের দিকনির্দেশনা ও সত্য দীন সহকারে তৎকালীণ প্রচলিত সকল দীনের উপর বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার এক কঠিন দায়িত্ব দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। মহান আল্লাহ্‌র ভাষায় :

هوالذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون -

"অর্থাৎ তিনিই তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত ও সত্য দীনসহ সকল দীনের ওপর এটাকে শ্রেষ্ঠত্ব দানের জন্য, যদিও মুশরিকগণ তা অপছন্দ করে।"[৪৪]

নিম্নে কয়েকজন নবী-রাসূলের দাওয়াতী তৎপরতা তুলে ধরা হলো।

নূহ 'আলাইহিস্ সালাম

প্রাচীন ইরাকের কুর্দিস্তান অঞ্চলে প্রেরিত হন হযরত নূহ 'আলাইহিস সালাম। দিন-রাত পরিশ্রম করে তিনি সে অঞ্চলের অধিবাসীদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে এগিয়ে আসার আহবান জানাতে থাকেন। তাঁর এ তৎপরতার বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ্ বলেন :

ولقدارسلنا نوحاالى قومه انى لكم نذيرمبين - ان لاتعبدوا الا الله انى اخاف عليكم عذاب يوم اليم -

"অর্থাৎ আমি তো নূহ্‌কে তার সম্প্রদায়ের নিকট পাঠালাম। সে বলেছিল,[৪৫] 'আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী। যাতে তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কিছুর 'ইবাদাত না করো; আমি তোমাদের জন্য এক মর্মন্তুদ দিবসের শাস্তি অশঙ্কা করি।"[৪৬]

ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম

পরবর্তীকালে ইরাকের 'উর নগর রাষ্ট্রে নমরূদের পৃষ্ঠপোষকতায় ইবলীসী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। নমরূদ এবং তার রাষ্ট্রের অধিবাসীদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে আহবান জানানোর জন্য প্রেরিত হন ইবরাহীম (আ.)। তাঁর

---

৪১. আল কুর'আন, ১৬: ৩৬
৪২. তাগূতের আভিধানিক অর্থ সীমালংঘনকারী, দুষ্কিতির মূল বস্তু, যা মানুষকে বিভ্রান্ত করে ইত্যাদি। শয়তান, কল্পিত দেবদেবী এবং যাবতীয় বিভ্রান্তিকর উপায়-উপকরণ 'তাগূতের' অন্তর্ভুক্ত। উদ্ধৃত, *আল-কুরআনুল করীম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬
৪৩. আল কুর'আন, ০২: ২৫৬
৪৪. আল কুর'আন, ৬১: ০৯
৪৫. 'সে বলিয়াছিল' কথাটি এ স্থলে উহ্য রহিয়াছে; উদ্ধৃত: *আল-কুরআনুল করীম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭
৪৬. আল কুর'আন, ১১: ২৫,২৬

Dhaka University Institutional Repository

আব্বাই ছিলেন সেখানকার ইবলীসী জীবন ব্যবস্থার প্রধান উপদেষ্টা। সে জন্য তাঁর আব্বার নিকট তিনি সর্বপ্রথম দাওয়াতে হক পেশ করেন। মহান আল্লাহ্র ভাষায় :

يابت انى قدجاءنى من العلم مالم ياتك فاتبعنى اهدك صراطا سويا -

"অর্থাৎ হে আমার পিতা ! আমার নিকট তো এসেছে জ্ঞান যা তোমার নিকট আসেনি; সুতরাং আমার অনুসরণ করুন, আমি আপনাকে সঠিক পথ দেখাব।"[৪৭]

'উরবাসীদেরকে সম্বোধন করে ইবরাহীম (আ.) বলেন :

يقوم انى برىء مما تشركون - انى وجهت وجهى للذى فطر السموت والارض حنيفا ومانامن المشركين -

"অর্থাৎ হে আমার সম্প্রদায় ! তোমরা যাকে আল্লাহ্র[৪৮] শরীক করো তার সাথে আমার কোনো সংশ্রব নেই। আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফিরাচ্ছি যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।"[৪৯]

ইবরাহীম (আ.) স্বীয় কওমকে সম্বোধন করে আরো বলেন। আল্লাহ্র ভাষায় :

وابراهيم اذ قال لقومه اعبدواالله واتقوه ذالكم خيرلكم ان كنتم تعلمون -

"অর্থাৎ স্মরণ কর, ইবরাহীমের কথা, সে তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলো, 'তোমরা আল্লাহ্র 'ইবাদাত করো এবং তাঁকে ভয় করো; তোমাদের জন্য এটাই শ্রেয় যদি তোমরা জানতে!।"[৫০]

হূদ 'আলাইহিস্ সালাম

প্রাচীন আরবের এক প্রতাপশালী জাতি ছিলো 'আদ জাতি। কুফ্রী জীবনধারায় এ জাতি ছিলো অভ্যস্ত। এ জাতিকে আল্লাহ্র দিকে আহবান জনানোর জন্য প্রেরিত হন হূদ (আ.) তাঁর দাওয়াতী তৎপরতার বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ্ বলেন :

والى عاد اخاهم هودا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره ان انتم الا مفترون -

"অর্থাৎ 'আদ জাতির নিকট তাদের ভ্রাতা[৫১] হূদকে পাঠিয়েছিলাম, সে বলেছিলো, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র 'ইবাদাত করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নেই। তোমরা তো কেবল মিথ্যা রচনাকারী।"[৫২]

সালিহ 'আলাইহিস্ সালাম

প্রাচীন আরবের এক অঞ্চলে ছিলো সামূদ জাতির বাস। এ জাতির লোকেরা ছিলো অত্যন্ত প্রতাপশালী। বিভিন্ন শিল্প-কর্মে বিশেষ করে ভাস্কর্য শিল্পে সারা দুনিয়ায় তাদের জুড়ি ছিলো না। পাথরের পাহাড়-শ্রেণি খোদাই করে প্রাসাদ বানিয়ে তারা তাতে বসবাস করতো। তারা ইবলীসের শাগরিদ ছিলো। এ পাপী কাওমকে আল্লাহ্র দিকে আহবান জানাবার জন্য প্রেরিত হন সালিহ (আ.)। কুর'আনুল কারীমে তাঁর দাওয়াতী কাজের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। আল্লাহ্ বলেন :

والى ثمود اخاهم صالحا قال ياقوم اعبدواالله مالكم من اله غيره -

---

৪৭. আল কুর'আন, ১৯: ৪৩
৪৮. এ স্থলে 'আল্লাহ্' শব্দটি উহ্য রয়েছে; উদ্ধৃত: *আল-কুরআনুল করীম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩
৪৯. আল কুর'আন, ০৬: ৭৮,৭৯
৫০. আল কুর'আন, ২৯: ১৬
৫১. এখানে 'ভ্রাতা' দ্বারা স্বজাতি-ভ্রাতা বুঝানো হয়েছে, সহোদর ভ্রাতা নয়; উদ্ধৃত: *আল-কুরআনুল করীম*, পৃ. ৩৪২
৫২. আল কুর'আন, ১১: ৫০, ৫৮, ৫৯

Dhaka University Institutional Repository

"অর্থাৎ আমি সামূদ জাতির নিকট তাদের ভ্রাতা সালিহ্‌কে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিলো, 'হে আমার সম্প্রদায়! 'তোমরা আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত করো, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নেই।"[৫৩]

শু'য়াইব 'আলাইহিস্ সালাম

আরবের আরেক প্রাচীন জনগোষ্ঠির নাম ছিলো মাদইয়ান জাতি। তাবুক এবং এর নিকটবর্তী বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ছিলো এদের বাস। তারাও আল্লাহ্‌কে ভুলে নানা পাপাচারে ডুবে গিয়েছিলো। তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে আহবান জানাবার জন্য প্রেরিত হন শু'য়াইব (আ.)। তাঁর দাওয়াতী কাজ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন :

والى مدين اخاهم شعيبا قال ياقوم اعبدواالله مالكم من اله غيره - ولا تنقصوا المكيال والميزان انى اراكم بخير وانى اخاف عليكم عذاب يوم محيط -

"অর্থাৎ মাদইয়নবাসীদের নিকট তাদের ভ্রাতা শু'য়াইবকে আমি পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিলো, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত করো, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ্ নেই, মাপে ও ওজনে কম করো না; আমি তোমাদেরকে সমৃদ্ধিশালী দেখছি, কিন্তু আমি তোমাদের জন্য আশঙ্কা করছি এক সর্বগ্রাসী দিবসের শাস্তি।"[৫৪]

ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম

কেনান বা ফিলিস্তিনের এক নেক সন্তান ছিলেন বালক ইউসুফ (আ.)। ঈর্ষাপরায়ণ ভাইদের চক্রান্তের শিকার হয়ে তিনি নির্জন, নিঝুম মরুভূমির এক কুয়াতে নিক্ষিপ্ত হন। এক ব্যবসায়ী কাফিলা পানির সন্ধানে সে কুয়ার নিকটে এসে বালক ইউসুফ (আ.)-কে উদ্ধার করে। কাফিলার লোকেরা মিশরে পৌঁছে সেখানকার এক প্রভাবশালী ব্যক্তির নিকট তাঁকে বিক্রি করে দেয়। নির্বিঘ্নে কাটছিলো ইউসুফ (আ.)-এর দাস জীবন। কিন্তু তাঁর ক্রমবিকশিত দেহ সৌষ্টব ও সৌন্দর্য তাঁর মনিবের স্ত্রীকে প্রেমাসক্ত করে তোলে। স্ত্রীলোকটি তাঁর সঙ্গে যৌন অপরাধে লিপ্ত হতে আহবান জানায়।

ইউসুফ (আ.) ছিলেন নবীর পুত্র। তিনি নিজেও ছিলেন আল্লাহ্‌র একজন একান্ত অনুগত বান্দাহ্। আবার তিনি ভাবী নবীও ছিলেন। তিনি তাঁর মনিবের স্ত্রীর এ আহবানে সাঁড়া দিলেন না। এতে স্ত্রীলোকটি ভীষণ ক্ষেপে যায় এবং তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্তে মেতে ওঠে। সে ইউসুফের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা ঠুকে দিলে তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন।

ইতিমধ্যে ইউসুফ (আ.) নবুওয়্যাত লাভ করেন। কারাগারে কয়েদীরাই তখন তাঁর সঙ্গী। এরা মোটেই ভালো লোক ছিলো না। সে সমাজের উচ্চশ্রেণীর এবং নীম্নশ্রেণীর সবাই ছিলো পাপী, সে সমাজ থেকে অপরাধী গণ্য হয়ে যারা কারাগারে আসে তারা যে কি জঘন্য চরিত্রের লোক তা সহজেই অনুমেয়।

ইউসুফ (আ.) এ অধঃপতিত আদম সন্তানগুলোকে টার্গেট বানিয়ে দাওয়াতী কাজ শুরু করেন। দু'জন কয়েদীর উদ্দেশ্যে তিনি যে দাওয়াতী ভাষণ পেশ করেন তা আল-কুর'আনে পরিবেশিত হয়েছে। ভাষণের একাংশে তিনি বলেন :

يصاحبي السجن ءارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار- ماتعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ماانزل الله بها من سلطان - ان الحكم الالله- امر الا تعبدوا الا اياه - ذالك الدين القيم ولكن اكثر الناس لايعلمون -

"অর্থাৎ হে কারা সঙ্গীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন প্রতিপালক শ্রেয়, না পরাক্রমশালী আল্লাহ্ ? তাঁকে ছেড়ে তোমরা কেবল কতগুলি নামের 'ইবাদাত করছো, যে নামগুলি তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রেখেছো; এ গুলির কোন প্রমাণ

---

৫৩. আল কুর'আন, ১১: ৬১
৫৪. আল কুর'আন, ১১: ৮৪

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ্ পাঠাননি। বিধান দেয়ার অধিকার কেবল আল্লাহ্রই। তিনি আদেশ দিয়েছেন অন্য কারো 'ইবাদাত না করতে, কেবল তাঁর ব্যতীত; এটাই শাশ্বত দীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা অবগত নয়।"[৫৫] ইউসুফ (আ.) পরবর্তী সময়ে মিশরের শাসক হন। তাঁর শাসনকালে বনী ইসরাইলগণ কেনান বা ফিলিস্তিন থেকে মিশরে এসে বসবাস শুরু করে।

মূসা 'আলাইহিস্ সালাম

দেখতে না দেখতে কেটে গেলো কয়েক শতাব্দী। ইতিমধ্যে বনী ইসরাইল পাপাচারী জাতিতে পরিণত হয়। মিশরের যালিম ফের'আউনের সাথেও তাদের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে। এ সময়ে মূসা (আ.) মিশরে প্রেরিত হন। তাঁর সামনে একদিকে ছিলো বনী ইসরাইল, অন্যদিকে ছিলো ফির'আউন ও তার সম্প্রদায়। উভয় সম্প্রদায়কে আল্লাহ্র দিকে আহবান জানানোর দায়িত্ব অর্পিত হলো তাঁর ওপর। মহান আল্লাহ্ বলেন :

ولقدارسلنا موسى باياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور- وذكرهم بايام الله - ان فى ذالك لايات لكل صبار شكور- واذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم اذ انجاكم من ال فرعون يسومونكم سوءالعذاب ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم - وفى ذالكم بلاء من ربكم عظيم -

"অর্থাৎ মূসাকে আমি তো আমার নির্দেশসহ প্রেরণ করেছিলাম এবং বলেছিলাম,[৫৬] 'তোমার সম্প্রদায়কে অন্ধকার হতে আলোর দিকে আনয়ন করো, এবং তাদেরকে আল্লাহ্র দিবসগুলির[৫৭] দ্বারা উপদেশ দাও।' এতে তো নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক পরম ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য। স্মরণ করো, মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিলো, তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ করো যখন তিনি তোমাদেরকে রক্ষা করেছিলেন ফির'আউনী সম্প্রদায়ের কবল হতে, যারা তোমাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিতো, তোমাদের পুত্রগণকে যবেহ করতো ও তোমাদের নারীগণকে জীবিত রাখতো; এবং এতে ছিলো তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক মহা পরীক্ষা।"[৫৮]

আমি মূসাকে আরো নির্দেশ দিয়ে বললাম :

اذهب الى فرعون انه طغى -

"অর্থাৎ ফির'আউনের নিকট যাও, সে তো সীমালংঘন করেছে।"[৫৯] মূসা ফির'আউনকে সম্বোধন করে বললেন :

ان ادوا الى عبادالله - انى لكم رسول امين - وان لا تعلوا على الله انى آتيكم بسلطان مبين -

"অর্থাৎ সে বললো, 'আল্লাহ্র বান্দাদেরকে আমার নিকট প্রত্যার্পণ করো। আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। এবং তোমরা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করো না, আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত করছি স্পষ্ট প্রমাণ।"[৬০]

ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম

ফিলিস্তিনে আবির্ভূত হন ঈসা (আ.)। তিনি তাঁর কাওমকে আল্লাহ্র দিকে আহবান জানাতে গিয়ে বলেন :

ان الله ربى وربكم فاعبدوه - هذا صراط مستقيم -

---

৫৫. আল কুর'আন, ১২: ৩৯,৪০

৫৬. 'এবং বলিয়াছিলাম' এ কথাটি আরবীতে উহ্য রয়েছে; উদ্ধৃত: *আল-কুরআনুল করীম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯০

৫৭. ايام বহবচন, একবচনে يوم এর শাব্দিক অর্থ দিবস বা দিন। আরবী বাগধারায় ايام বলিতে যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্বলিত অতীত ইতিহাসকে বুঝায়। এখানে সে সকল দিবস যাতে জাতিসমূহের উত্থান-পতন, জয়-পরাজয় ইত্যাদি সংঘটিত হয়েছিল অথবা সে দিনগুলি, ইসরাঈলীরা মিশরে বন্দী অবস্থায় ভীষণ বিপদে দিন অতিবাহিত করতেছিল এবং আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে রক্ষা করিছেন; উদ্ধৃত: *আল-কুরআনুল করীম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯১

৫৮. আল কুর'আন, ১৪: ০৫,০৬

৫৯. আল কুর'আন, ২০: ২৪

৬০. আল কুর'আন, ৪৪: ১৮, ১৯

Dhaka University Institutional Repository

"অর্থাৎ আল্লাহ্ই আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক; সুতরাং তোমরা তাঁর 'ইবাদাত করো, এটাই সরল পথ।"[৬১]

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (স.)

নবুওয়্যাতের তাস্বীহ্মালার সর্বশেষ দানা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (স.)। তিনি শেষ নবী আবার বিশ্বনবীও। আজকের পৃথিবীর সব মানুষের জন্যই তাঁকে রাসূল করে পাঠানো হয়েছে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (স.) সুদীর্ঘ ২৩ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়ে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। তাঁর কর্মকান্ড বিশ্লেষণ করলে প্রথমেই যে বুনিয়াদী বিষয়টি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হচ্ছে 'আদ্দা'ওয়াতু ইলাল্লাহ্' অর্থাত আল্লাহ্র দিকে আহবান। এ দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রতি অনেকগুলো আয়াত নাযিল করেন।

প্রথম ওহী প্রাপ্তির প্রতিক্রিয়া সামলাতে গিয়ে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (স.) চাদর মুড়ে দিয়ে রয়েছিলেন। সে সময়টিতে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে গুরুগম্ভীর নির্দেশ এলো :

ياايهاالمدثر- قم فانذر- وربك فكبر-

"অর্থাৎ হে বস্ত্রাচ্ছাদিত![৬২] ওঠো, সতর্ক করো, এবং প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো।"[৬৩] অন্যত্র বলা হয়েছে :

ياايها الرسول بلغ ماانزل اليك من ربك - وان لم تفعل فما بلغت رسالته - والله يعصمك من الناس - ان الله لايهدى القوم الكافرين -

"অর্থাৎ হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা আবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার করো; যদি না করো তবে তো তুমি তাঁর বার্তা প্রচার করলে না।[৬৪] আল্লাহ্ তোমাকে মানুষ হতে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।"[৬৫] আল্লাহ্ আরো বলেন :

ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى احسن - ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهواعلم بالمهتدين -

"অর্থাৎ তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান করো হিক্মাত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং ওদের সঙ্গে তর্ক করবে উত্তম পন্থায়। তোমার প্রতিপালক তাঁর পথ ছেড়ে কে বিপথগামী হয়, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কারা সৎপথে আছে তাও তিনি সবিশেষ অবহিত।"[৬৬] আল্লাহ্ আরো বলেন :

فلذالك فادع واستقم كماامرت ولاتتبع اهواءهم -

"অর্থাৎ সুতরাং তুমি তাঁর দিকে আহবান করো ও তাতেই দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকো যেভাবে তুমি আদিষ্ট হয়েছো এবং তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না।"[৬৭] অল্লাহ্ অন্যত্র বলেন :

قل هذه سبيلى ادعو الى الله - على بصيرة انا ومن اتبعنى وسبحان الله وما انا من المشركين -

---

৬১. আল কুর'আন, ১৯: ৩৬
৬২. আল কুর'আন, ৭৩: ০১ এর টিকায় বলা হয়েছে, প্রথম যখন ওহী নাযিল হয়েছিল তখন রাসূলুল্লাহ্ (স.) এ অভিনব অভিজ্ঞতায় কিছুটা শংকিত হয়েছিলেন এবং বাড়ি ফিরে এসে বলেছিলেন, زملونى আমাকে বস্ত্র দ্বারা আবৃত কর। এ ঘটনার কিছু দিন পরেই অবতীর্ণ এ সূরাটিতে আল্লাহ্ তাঁকে مزمل বলে সম্বোধন করেন। পরবর্তী সূরাতেও একই ধরনের সম্বোধন (مدثر বস্ত্রাচ্ছাদিত)- এর পূনরাবৃত্তি হয়েছে। উদ্ধৃত: *আল-কুরআনুল করীম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬৩
৬৩. আল কুর'আন, ৭৪: ১-৩
৬৪. কারো নিকট অপ্রীতিকর হলেও তা প্রচারে তিনি আদিষ্ট হয়েছেন। উদ্ধৃত: আল-কুরআনুল করীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪
৬৫. আল কুর'আন, ০৫: ৬৭
৬৬. আল কুর'আন, ১৬: ১২৫ ও ০২: ১২৯
৬৭. আল কুর'আন, ৪২: ১৫

Dhaka University Institutional Repository

"অর্থাৎ বলো, এটাই আমার পথ : অল্লাহ্‌র প্রতি মানুষকে আমি আহবান করি সজ্ঞানে– আমি এবং আমার অনুসারিগণও। আল্লাহ্‌ মহিমান্বিত এবং যারা আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।[৬৮]

আল্লাহ্‌র রাসূলের গোটা জীবন আমাদের সামনে। আদ্‌দা'ওয়াতু ইলাল্লাহ্‌র দায়িত্ব তিনি কীভাবে পালন করেছেন ইতিহাস তার বিবরণ পেশ করছে। মক্কার এমন কোনো ঘর ছিলো না যেখানে তিনি দা'ওয়াত নিয়ে যাননি। শুধু মক্কা শহরই নয়, এর নিকটবর্তী জনপদগুলোতেও তিনি ছুটে গিয়েছেন সেখানকার লোকগুলোকে আল্লাহ্‌র দিকে আহবান জনাতে।

এ চিন্তাতেই তিনি সদা মশগুল থাকতেন। প্রতিটি সুযোগেরই তিনি সদ্ব্যবহার করতেন। একাজে তিনি এতো বেশী একাগ্রচিত্ত ছিলেন যে, লোকেরা তাঁর এ অবস্থাকে স্বাভাবিক অবস্থা বলে ভাবতেই পারতো না। তাই তাদের কেউ কেউ তাঁকে বলতো মাজনূন বা পাগল। তিনি পাগল ছিলেন না, ছিলেন কর্তব্য পালনে পাগলপারা। তাঁর দা'ওয়াতের মোদ্দা কথা ছিলো এমন। আল্লাহ্‌র ভাষায় :

الا تعبدوا الا الله اننى لكم منه نذيروبشير- وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤت كل ذى فضل فضله - وان تولوا فانى اخاف عليكم عذاب يوم كبير-

"অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যের 'ইবাদাত করবে না, অবশ্যই আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা। আরো যে, তোমরা তোমাদের প্রাতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো ও তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করো, তিনি তোমাদেরকে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য উত্তম জীবন উপভোগ করতে দিবেন এবং তিনি প্রত্যেক গুণীজনকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দান করবেন। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে আমি তোমাদের জন্য আশংকা করি মহাদিবসের শাস্তির।"[৬৯]

ঈসায়ী ষষ্ঠ শতাব্দীর পুঞ্জিভূত জাহিলিয়াত দূর করার জন্য আল্লাহ্‌ রাব্বুল 'আলামীন সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌ (স.) কে নবুওয়্যাত দান করেন। সুদীর্ঘ তেইশ বছর ওহী প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে সংগ্রাম করে তিনি গোটা 'আরব থেকে জাহিলিয়াত অপসারিত করে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্যের বিকাশ ঘটান। মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের সুন্দরতম পরিবেশ দুনিয়ার সুবিস্তৃত অঞ্চলের মানুষের মানবিক চেতনা নতুনভাবে জাগিয়ে তোলে। অল্প সময়ের মধ্যে তিনটি মহাদেশের বিশাল এলাকার অধিবাসীগণ ইসলামী জীবন বিধান গ্রহণ করে।

এ অবস্থা দেখে সেদিন ইবলীসের চেহারা নিশ্চয়ই কালো হয়ে গিয়েছিলো। ইবলীস তার চক্রান্ত চালাতে থাকে। মানুষের মনে মনে নানাবিধ সন্দেহ সংশয়, দ্বিধা-দ্বন্দ এবং খট্‌কা সৃষ্টি করে সে ধীরে ধীরে তাদেরকে ইসলাম থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নেয়। মানুষের মনে এমন সব ধ্যান ধারণা সৃষ্টি করে যার ফলে মানুষ নাস্তিকতাবাদ, সংশয়বাদ, সর্বেশ্বরবাদ, বহু ইশ্বরবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ, সমাজবাদ প্রভৃতির গোলক ধাঁধায় পড়ে যায়। আল্লাহ্‌ প্রদত্ত জীবন বিধানের প্রতি কেউ কেউ দেখায় উদাসীনতা, কেউবা ঘোষণা করে বিদ্রোহ। সমাজ থেকে ইসলাম বহুদূরে সরে গেলো। এরি ফলশ্রুতিতে সমাজ আজকের চেহারা লাভ করেছে। সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর সর্বত্র আজ মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্ব চলছে। বিভিন্ন ইজমের ষ্টীম রোলার মানুষকে নিষ্পেষিত করছে।

মানব সমাজে যখন ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠিত থাকে না, তখন প্রতিষ্ঠিত থাকে ইবলীসী বিধান। সে অবস্থায় অধিক শক্তিশালী কোনো মানুষ অথবা মানবগোষ্ঠী সাধারণভাবে সকল মানুষের প্রভু সেজে বসে। এসব শক্তিধর ব্যক্তি নিজেদের ইচ্ছা বাসনা বা খেয়াল খুশি মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয়। অচিরেই সমাজ যুল্‌ম নির্যাতনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হতে শুরু করে। এসব মানুষের পক্ষে যেহেতু সত্য ও ন্যায়ের সঠিক মানদন্ড নির্ণয় করা সম্ভব হয় না, সেহেতু অনেক ক্ষেত্রেই অসত্য সত্যে এবং অন্যায় ন্যায়ে পরিণত হয়ে যায়; পাপ পুণ্যের তারতম্য মনের গভীরে অবস্থান করলেও বাস্তব জীবনে তা আর বড্ড একটা দেখা যায় না। ফলে যিনা, নারী ধর্ষণ, নরহত্যা ও সম্পদ হরণের মতো বড় পাপ কাজগুলোও সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়।

৬৮. আল কুরআন, ১২: ১০৮
৬৯. আল কুর'আন, ১১: ২-৪

Dhaka University Institutional Repository

সমাজে বেহায়াপনা ও উলঙ্গপনা বেড়ে যায়। সংস্কৃতির নামে নাচ ও অশ্লীল গান প্রচলিত হয়। সমাজের শিল্প সাহিত্য ও গণ মাধ্যমগুলো যৌন সুড়সুড়ি দেয়ার হাতিয়ারে পরিণত হয়। দেশের শিক্ষা হয়ে পড়ে উদ্দেশ্যহীন। মানুষেরা হয়ে ওঠে চরমভাবে অত্মপূজারী। শোষণের আকাংখা মানুষকে পেয়ে বসে। এমতাবস্থায় অপরাপর জন্তু-জানোয়ার আর মানুষের মধ্যে পার্থক্য তেমন একটা থাকে না। এ অবস্থার নাম আইয়্যামে জাহিলিয়্যাত। মানব সমাজে যখনই আইয়্যামে জাহিলিয়াত জেঁকে বসেছে তখনই আল্লাহ্ নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন।

শান্তি ও স্বস্তির আজ দারুন অভাব। মানুষের কোনো মূল্য নেই খুন খারাবী চলছে ব্যাপকভাবে। মদের ব্যবসা জমজমাট। মাতালের অভাব নেই। অবৈধ যৌনাচার সাধারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জারজ সন্তানের ভারে পৃথিবীর অগ্রভাগ কেঁপে উঠেছে। যৌনতাই আজকের সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রধান বিষয়। অজকের সংগীতগুলোতে যৌনতারই প্রাধান্য। শিক্ষাঙ্গণে চলছে নৈতিকতা বিবর্জিত শিক্ষার দৌরাত্ম। আজকের চিন্তাবিদদের অনেকেই মানুষকে বাঁদরের সন্তান প্রমাণ করতেই ব্যস্ত। 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি চলছে সবখানে। আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে মিনিটের মধ্যে কয়েক লক্ষ লোক ধ্বংস করার জন্য এটম বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা সাজিয়ে রাখা হয়েছে সারি সারি। নিউট্রন বোমা তৈরীর কাজ চলছে। চারদিকে আজ অশান্তি, অস্বস্তি, অসাম্য, অনিয়ম, অনৈতিকতা, ভাংগন আর ধ্বংসযজ্ঞ। পৃথিবীতে আবার নেমে এসেছে ঘোর জাহিলিয়্যাত। এ জাহিলিয়্যাত দূরীভূত করার জন্য নবী-রাসূলগণের ওয়ারিশ হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন 'আলিমগণ।

বিশ্বনবীর ভাষায় :

عن ابى الدرداء رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة وان الملئكة لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم وان العالم ليستغفرله من فى السموات ومن فى الارض حتى الحيتان فى جوف الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وان العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء عليهم السلام لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر-

অর্থাৎ জালীলুল কদর সাহাবী হযরত আবূ দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি 'ইল্‌ম সন্ধান করার উদ্দেশ্যে পথ চলবে, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে যাওয়ার পথ সহজ ও সুগম করে দিবেন এবং ফিরিশ্‌তাগণ 'ইল্‌ম সন্ধানীর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তাদের পাখা বিছিয়ে দেন। 'আলিমের জন্য অসমান-যমীনের সব অধিবাসীই আল্লাহ্‌র নিকট গুনাহ মাফের জন্য দু'আ করে, এমনকি পানির ভিতরের মাছও। শুধুমাত্র 'ইবাদাতকারী অপেক্ষা 'আলিম ততো বেশি মর্যাদাবান, যতো বেশি মর্যাদা পুর্ণিমা রাতের চন্দ্রের সমগ্র তারকার তুলনায়। 'আলিমগণ নবীদের ওয়ারিশ– উত্তরাধিকারী এবং নবীগণ কোনো টাকা-পয়সা রেখে যাননি; তাঁরা রেখে গিয়েছেন শুধুমাত্র 'ইল্‌ম। অতএব যে লোক এ 'ইল্‌ম গ্রহণ করলো, সে পূর্ণ অংশই গ্রহণ করলো।"[৭০]

৭০. আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আস-সাজিসতানী, *সুনানু আবী দাউদ*, হাদীস নং- ৩৬৪১

Dhaka University Institutional Repository

৪র্থ পরিচ্ছেদ
মুসলিম উম্মাহ্‌র কর্তব্য

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (স.) সর্বশেষ নবী। এটা সুনিশ্চিত যে, আল্লাহ্ আর কোনো নবী পাঠাবেন না। তবে তাই বলে আল্লাহ্ বিশ্ব-মানবতাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেননি। তিনি সর্বশেষ আসমানী কিতাব কুর'আনুল কারীমকে সংরক্ষণ করার দায়িত্ব নিজেই নিয়েছেন। তদুপরি শেষ নবীর শিক্ষাকেও অবিকৃতভাবে মওজুদ রেখেছেন। তিনি বলেন :

انا نحن نزلنا الذكروانا له لحافظون -

"অর্থাৎ আমিই কুর'আন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্যই আমি তার সংরক্ষক।"[৭১]

নবীর অবর্তমানে আল কুর'আন এবং নবীর শিক্ষাকে অবলম্বন করে এ নুতন জাহিলিয়্যাতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হবে নবীর অনুসারীদেরকে। জাহিলিয়্যাতের সয়লাবে ডুবে যাওয়ার পরিণতি সম্পর্কে লোকদেরকে সাবধান করা এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে আহবান জানানো এমন প্রত্যেক ব্যক্তিরই অবশ্য কর্তব্য, যে আল কুর'আনের সাথে পরিচিত হয়েছে। সংগ্রাম ছাড়া ইবলীসের দুশমনীর হাত থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। ইবলীসী চিন্তা, ইবলীসী মন-মানসিকতা ইবলীসী কার্যকলাপ থেকে নিজকে এবং সমাজের অপরাপর মানুষকে পবিত্র করার সংগ্রাম চালানোই মুক্তির পথ। আল্লাহ্ চান প্রত্যেক মু'মিন এ ভূমিকা সঠিকভাবে পালন করুক।

যে মু'মিন আল্লাহ্‌র দিকে লোকদেরকে অহবান জনানোর কাজে আত্মনিয়োগ করে, আল্লাহ্ তাঁকে ভালোবাসেন। যে কথাগুলো দ্বারা একজন মু'মিন সমাজের মানুষকে আল্লাহ্‌র দিকে ডাকে সে কথাগুলোকে আল্লাহ্ আল কুর'আনে 'সর্বোত্তম' কথা বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন:

ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال اننى من المسلمين -

"অর্থাৎ কথায় কে উত্তম ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা যে আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষকে আহবান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে,'আমি তো অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত।"[৭২]

প্রিয় নবী (স.) সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন এ মৌলিক দর্শন প্রতিষ্ঠিত করতে। আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেছেন :

اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الارض مستقرومتاع الى حين -

"অর্থাৎ তোমরা একে অপরের শত্রুরূপে নেমে যাও, পৃথিবীতে কিছুকালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রইলো।"[৭৩]

দুনিয়ার প্রকৃত মর্যাদা যে আখিরাতের তুলনায় কতটা নগন্য, মূল্যহীন তা বোঝাতে মহান আল্লাহ্ কখনও মাছির ডানা, কখনও বা মৃত ছাগলের পঁচে যাওয়া দেহের সাথে তুলনা করেছেন। প্রতি মুহূর্তে মানুষের মনে এ অনুভূতি পাকাপোক্ত করতে চেয়েছেন যে দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী, আখিরাত অনন্ত। দুনিয়ার কাজের সীমানা অসীম, ফল ভোগের সময় অনিশ্চিত, কিন্তু আখিরাতে কাজের জন্য সময় নেই। বরং দুনিয়ার কাজের জন্য অনন্ত পুরষ্কার বা শাস্তি ভোগের কেন্দ্রস্থল হচ্ছে এ আখিরাত। এ উপলব্ধি গভীরতা মানুষের মনে দুনিয়ার দেহের চাহিদাকে ভুলে আত্মার খোরাক খুঁজতে থাকলো। আর অন্তরের সে পরম প্রশান্তিকে লাভ করলো আল্লাহ্‌র ভালোবাসায়, রাসূলের অনুসরণ আর কল্যাণকর কাজে।

আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কের প্রকৃত রূপ

যে অল্লাহ্‌কে ভালোবাসে সে এমন কিছুকে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারে না যা আল্লাহ্ ভালোবাসেন না। আর যে আল্লাহ্‌র ভালোবাসা লাভ করে তাকে সারা পৃথিবীও লোভ দেখিয়ে কাছে টানতে পরে না। আল্লাহ্‌র রাসূল (স.)

৭১. আল কুর'আন, ১৫: ০৯
৭২. আল কুর'আন, ৪১: ৩৩
৭৩. আল কুর'অন, ০২: ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের মনে আল্লাহ্‌র প্রতি সে ভালোবাসাই জাগিয়ে তুললেন, যার ফলে যে মানুষ রাতের পর রাত অশ্লীলতা, মদ, জুয়ায় কাটিয়ে দিতো; সে ব্যক্তি-ই সব আহবান উপেক্ষা করে তাহাজ্জুদ পড়ে সিজদায় চোখের বাঁধভাঙ্গা জোয়ারে নিজেকে সিক্ত করতো। যে ব্যক্তি প্রতারণা, চুরি, ডাকাতি করে অন্যের সম্পদ লুট করতো সে ব্যক্তিই নিজে অভুক্ত থেকে স্বীয় খাবার তাঁরও চেয়ে গরীব দুঃখীকে দান করতো। যে ব্যক্তি প্রতিদিন নুতন নুতন 'আতর বা সুগন্ধি ব্যবহার আর পোশাকের বিলাসিতায় মত্ত থাকতেন। তিনি সব দান করে মৃত্যুর সময় এক কাপড়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন।

কী সে শক্তি, কী সে ভালোবাসার টান যা সবগুলো মানুষকে এমনভাবে বদলে দিলো? এটি মহান রাব্বুল 'আলামীনের অসীম ভালোবাসার শক্তি যা পৃথিবীতে মাত্র একভাগ বিদ্যমান। বাকী নিরানব্বই ভাগ অমাদের জন্য তিনি তাঁর কাছে রেখে দিয়েছেন।

শুধু কি ভালোবাসার জোরে এ তুমুল আলোড়ন ? না! বরং ভয়, ভালোবাসা আর জবাবদিহিতার এক মিশ্র অনুভূতি যা সবসময় অন্তরে দায়বদ্ধতা তৈরী করে ও প্রেরণা যোগায়। যা হাশরের ময়দানে জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে উৎরে যাওয়ার প্রেরণা, পৃথিবীতে সঠিক ভূমিকা রাখায় প্রভুর সন্তুষ্টি পাওয়ার উদ্দীপনা আর কল্যাণের পথে যথাযথ ভূমিকা রেখে প্রভুর পক্ষ থেকে মুহসীন বা সর্বোচ্চ মু'মিনের মর্যাদা পাওয়ার তীব্র আকাংখা জন্মায়। যে ভালোবাসা অনন্ত জীবনে চিরস্থায়ী সুখ প্রাপ্তি আর পুরষ্কারের সন্ধান দেয়। এমন কে আছে যে এ ভালোবাসা থেকে বুঝে শুনে নিজেকে বঞ্চিত করে!

তাই হযরত মুহাম্মাদ (স.)-এর সংগী হিসেবে দেখেছি এক সময়ের ধনাঢ্য ব্যবসায়ী হযরত 'আবদুর রহমান বিন 'আওফ (রা.), 'উমর (রা.), খাদীজা (রা.) ও মুস'আব (রা.)। আবার একই সাথে হযরত 'আলী (রা.) এর মতো কিশোর, যায়েদ, বেলাল (রা.) এর মতো ক্রীতদাস, হযরত আবূ বকর (রা.) এর মতো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। ইনারা দুনিয়ায় যেমন মর্যাদাই পান না কেনো আখিরাতের অনন্ত মর্যাদার হাতছানি তাঁদেরকে দুনিয়ায় কখনো তাঁদের নফ্‌সকে এতটুকু প্ররোচিত করার সুযোগ দেয়নি। আর তাই তাঁরা জন্নাতে যাওয়ার মর্যাদা লাভ করেছেন।[৭৪]

৭৪. এ কে এম নাজির আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়
বাংলাদেশে ইসলামের আগমন

ইসলামের প্রচার ও প্রসার

আমাদের সকলেরই জানা যে, হযরত মুহাম্মদ (স.) হচ্ছেন শেষ নবী, তৌহিদবাদী সভ্যতা-সংস্কৃতির শেষ শিক্ষক ও সত্য ধর্ম ইসলামের সর্বশেষ প্রচারক। নবুওয়্যাত লাভ করার পর ২৩ বছর ধরে তিনি সত্য ধর্ম প্রচার করে যান। তৌহিদবাদের ভিত্তিতে একটি নতুন সমাজ গঠন করেন। ১৩ বছরের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও সাধনায় একটি আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে বিশ্ব মানবতার রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনের সুষ্ঠু পরিচালনার ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে মানুষকে পরিচালনা করাই ছিল তাঁর দায়িত্ব। নিজের জীবদ্দশায় এ দায়িত্ব তিনি পুরোপুরি পালন করে গিয়েছেন। তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর সুশিক্ষিত সাহাবাগণ, সাহাবাগণের কাছ থেকে সত্যের আলোকে উদ্দীপিত তাবেয়ীগণ, তাবেয়ীগণের কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত তাবে-তাবেয়ীগণ এবং এভাবে পর্যায়ক্রমে মুসলমানদের বিভিন্ন দল ইসলামের সত্য বাণী ও তৌহিদবাদী সমাজ ব্যবস্থার কাঠামো নিয়ে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে ও এলাকায় ছড়িয়ে পড়েন।

১ম পরিচ্ছেদ
বণিকদের ইসলাম প্রচার

ইসলামের আগমনের পূর্ব থেকেই আরবরা ব্যবসায়-বাণিজ্যে পারদর্শী হবার এবং বাণিজ্যোপলক্ষে দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকার সাথে তাদের যোগাযোগ থাকার কারণে অতি অল্প দিনের মধ্যেই ইসলাম প্রচারকদের মাধ্যমে ইসলামের সত্য বাণী দুনিয়ার বিস্তৃত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। ইসলাম প্রচারের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, এক একজন ব্যবসায়ী এ ক্ষেত্রে এক একজন ধর্মপ্রচারকের দায়িত্ব পালন করেছেন। এর কারণ ইসলামী আদর্শবাদের কাঠামো এমনভাবে রচিত হয়েছে, যার ফলে ইসলামের সত্যের আলোকে অন্যের হৃদয়দেশ উদ্ভাসিত করে তোলা প্রত্যেক মুসলমানের ধর্মীয় ও বিশ্বাসগত দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রথম যুগের মুসলমানরা তাঁদের এ দায়িত্ব সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তাই প্রথম যুগেই ইসলামের সত্য বাণী পশ্চিমে মরক্কো, স্পেন, পর্তুগাল থেকে পূর্বে সুদূর চীন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। মুসলিম বিজেতাগণের দেশ জয় অভিযান এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করলেও দুনিয়ায় এমন কয়েকটি দেশ রয়েছে যেখানে কোনোদিন কোনো মুসলিম বিজেতার আগমন হয়নি এবং একমাত্র ইসলাম প্রচারকদের নিঃস্বার্থ সত্যপ্রচার আকাঙ্খা ও নিষ্কলুষ চরিত্র মাধুর্যই সে সব দেশে ইসলামকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। পূর্ব ও দক্ষিণ ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ জাভা, সুমাত্রা, বোর্নিও তথা সমগ্র ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও মালদ্বীপের নাম এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।[৭৫]

বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে এভাবেই মুসলিম বণিকদের সাহায্যে প্রথম যুগেই ইসলামের সত্য বাণী প্রবেশ করে বলে ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন। তবে শক্তিশালী ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমাণাদির অভাবে এ যুগকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করা সম্ভবপর নয়। দক্ষিণ ভারতের মালাবারের অন্তর্গত চের দেশের রাজা চেরুমল পেরুমল শেষ নবী (স.)-এর জীবদ্দশায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। মুসলিম বণিকদের মাধ্যমেই যে মালাবারে ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল এতে সন্দেহ নেই। তাহলে দেখা যায়, হিজরী প্রথম শতকের প্রারম্ভেই (খৃস্টীয় সপ্তম শতকে) ভারতের পশ্চিম উপকূল ইসলামের সত্য বাণীর সংস্পর্শে আসে। নিশ্চয়ই আরব বণিকদের জাহাজ কেবলমাত্র ভারতের পশ্চিম উপকূলে এসে থেমে যায়নি। কারণ তৎকালে আরবদের বানিজ্য পূর্বে চীন উপকূল পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। আর সপ্তম শতকে বঙ্গোপসাগর বহির্বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। কাজেই সপ্তম শতকে অর্থাৎ হিজরী প্রথম শতকের শুরুতেই আরব বণিকদের জাহাজ বাংলার উপকূলীয় বন্দরসমূহে নোঙ্গর করেছে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে।

---

৭৫. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০ খ্রী.), পৃ. ৬৪

Dhaka University Institutional Repository

উপরন্তু আরব দেশ, এশিয়া ও ইউরোপের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হওয়ায় এশিয়া ও ইউরোপের বাণিজ্যের চাবিকাঠি ছিল আরবদের হাতে। ভারতের উপকূলীয় বানিজ্যে তাদের ছিল একচেটিয়া আধিপত্য। ভারত থেকে তারা প্রধানত গরম-মসলা, গজদন্ত ও নানাবিধ মূল্যবান রত্ন ইউরোপের বাজারে রপ্তানী করতো। গরম মসলা উৎপন্ন হতো সরন্দীপ (সিংহল) ও তার নিকটবর্তী ভারতের দক্ষিণ এলাকায়। কিন্তু হাতীর জন্য বঙ্গ (বাংলাদেশ) প্রাচীনকাল থেকে বিখ্যাত। আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণকালে আমরা বঙ্গরাজ্যের চার সহস্র সুজজ্জিত হস্তি সেনার কথা শুনি। আরবী ইতিহাস গ্রন্থে বঙ্গরাজ দেবপালের (৮১০-৮৪৫ খৃ.) পঞ্চাশ হাজার হস্তির উল্লেখ দেখি।[৭৬] হাজার বছর আগে লেখা চর্যাপদগুলোয় আমরা হাতীর স্বচ্ছন্দ উল্লেখ দেখি। চতুর্দশ শতকের পরিব্রাজক ইবনে বতুতা তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে আরকান (বরহনকার) ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে হাতীর প্রাচুর্যের উল্লেখ করেছেন।[৭৭] ষোড়শ শতকের ঐতিহাসিক আবুল ফজল তাঁর 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে লিখেছেন, "বাঙ্গালার পূর্বে ও দক্ষিণে আরখংগ (আরাকান) নামে একটি বিরাট দেশ আছে। চাটগাঁও হচ্ছে তার সামুদ্রিক বন্দর। এখানে হাতী প্রচুর পাওয়া যায়।"[৭৮] কাজেই হাতীর দাঁত চট্টগ্রাম বন্দর দিয়েই যে বিদেশের বাজারে রপ্তানী হতো এবং এ হাতীর দাঁত সংগ্রহ করার জন্য আরব বণিকদেরকে চট্টগ্রাম বন্দরে আসতে হতো এতে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই।

১৪৯৮ খৃস্টাব্দে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা কর্তৃক আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূল দিয়ে ভারতে আসার পথ আবিষ্কার এবং অন্য একজন পর্তুগীজ নাবিক কলম্বাস কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত এশিয়া-আফ্রিকা-ইউরোপের স্থল ও সামুদ্রিক বাণিজ্যে আরব বণিকদের পূর্ণ আধিপত্য ছিল। কর্ডোভা থেকে শুরু করে চীন সাগরের উপকূল পর্যন্ত স্থল ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের সমস্ত কেন্দ্রস্থলে তাদের যাতায়াত ছিল। আরব ও ইরানের ইতিহাস পাঠে প্রথম শতক থেকে অষ্টম শতক পর্যন্ত শত শত খ্যাতিমান মুসলিম ভূগোলবিদ ও বিশ্ব পর্যটকের নাম পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এ ভূগোলবিদগণের অনেকেই নিজেদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আবার অনেকে প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণীর সাহায্যে নিজেদের গ্রন্থ রচনা করেন। আরব ভূগোলবিদদের বর্ণনায় বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে সমন্দর নামক একটি বন্দরের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন ইবনে খুরদাবা তাঁর 'আল মাসালিক ওয়াল মামালিক' গ্রন্থে বলেন ঃ "কাসরুত (কামরূপ) থেকে সমন্দরে চন্দন কাঠ মিষ্ট পানির মাধ্যমে (নদীপথে) পনের বিশ দিনের মধ্যে আনিত হয়।"[৭৯] আল ইদ্রিসী তাঁর 'নুযহাতুল মুশতাক' গ্রন্থে বলেন ঃ "সমন্দর একটি বড় শহর, বাণিজ্যকেন্দ্র ও সমৃদ্ধশালী স্থান। এখানে অনেক লাভবান (ব্যবসায়-বাণিজ্যে) হওয়া যায়। এ বন্দর কনৌজের অধীন। এটা এমন এক নদীর তীরে অবস্থিত যা কাশ্মীর দেশ থকে উদ্ভূত। এখানে চাউল ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী বিশেষ করে গম পাওয়া যায়। পনেরো দিনের দূরত্বে অবস্থিত কামরূত (কামরূপ) থেকে এখানে চন্দন কাঠ এমন নদী পথে আনা হয় যার পানি সুমিষ্টি। এ শহরের (সমন্দর) এক দিনের দূরত্বে একটি দ্বীপ আছে যেখানে অনেক লোকের বাস এবং দেশের সকল ব্যবসায়ী রীতিমত সেখানে যাতায়াত করে।"[৮০] ড. আবদুল করীম তাঁর 'চট্টগ্রামে ইসলাম' গ্রন্থে এ সমন্দরকে চট্টগ্রামের সাথে অভিন্ন বলে প্রমাণ করেছেন।[৮১] ইবনে বতুতা তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে বিভিন্ন স্থানে বাঙ্গালার সূক্ষ্মসুতি বস্ত্রের (মসলিন) উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন দেশ সফরকালে তিনি ও তাঁর সহযাত্রী বণিকদল বিদেশী রাজা ও শাসকগণকে অন্যান্য উপহার দ্রব্যের সঙ্গে বাংলার সূক্ষ্মসুতি বস্ত্রাদি অবশ্যই উপহার দেন। বলা বাহুল্য, বাংলার এ সূক্ষ্মবস্ত্র (মসলিন) ও চন্দন কাঠ আরব বণিকদের কাছে সুপরিচিত ছিল। এ মসলিন ঢাকায় তৈরি হতো এবং চট্টগ্রাম বন্দর দিয়েই বিদেশে রপ্তানী হতো।

ডক্টর এ রহীম তাঁর 'সোশ্যাল এ্যান্ড কালচার হিস্ট্রী অব বেঙ্গল' গ্রন্থে বাংলার উপকূলভাগে আরব বণিকদের আগমন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে বলেছেন যে, চাটগাঁয়ের সাথে আরবদের সম্পর্ক অতি প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে, এমনকি চাটগাঁ নামটা আসলে তাঁদেরই দেয়া। গঙ্গার ব-দ্বীপে বা শেষ প্রান্তে এ স্থানটির

৭৬. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (চট্টগ্রাম: মুহাম্মদীয়া কুতুবখানা, ১৩৯২ বাং.), পৃ. ৫২
৭৭. ইবনে বতুতা, *আজায়েবুল আসফার*, অনুবাদ: খান বাহাদুর মুহাম্মদ হোসাইন এম. এ (দিল্লী: সুলতানিয়া কুতুবখানা, ১৯১৩ খ্রী.), পৃ. ৩৮৯
৭৮. আবদুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫
৭৯. আল ইদ্রিসী, *নুযহাতুল মুশতাক* (কলকাতা: ন্যাশনাল লাইব্রেরী, ১৯৯০ খ্রী.), পৃ. ৫৮
৮০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯
৮১. ড. আবদুল করীম, *চট্টগ্রামে ইসলাম* (চট্টগ্রাম: মুহাম্মদীয়া কুতুবখানা, ১৯৮০ খ্রী.), পৃ. ৪-৫

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থিতি বলে আরব বণিকরা এর নাম দেয় শাতি-উল-গঙ্গ (গঙ্গার শেষ প্রান্ত বা তীর)। তা থেকে কালক্রমে চাটগাঁও ও চিটাগং-এ রূপান্তর ঘটেছে।[৮২]

চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাথে যে অতি প্রাচীন কাল থেকে আরব বণিকদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল তার স্বপক্ষে প্রমাণস্বরূপ আরাকান রাজবংশীয় উপাখ্যান 'রাদজাতুয়ে' বর্ণিত একটি উপাখ্যান পেশ করা যেতে পারে। ড. আবদুল করীম তাঁর 'চট্টগ্রামে ইসলাম' গ্রন্থে এ উপাখ্যানটি উল্লেখ করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ "এ সময়ের শেষ ভাগে কান-রাদজাগীর বংশধর মহত ইঙ্গত চন্দয়ত সিংহাসনে আরোহন করেন। এ রাজা বাইশ বছর রাজত্ব করার পর মারা যান। কথিত আছে যে, তাঁর সময়ে কয়েকটি কু-ল অর্থাৎ বিদেশী জাহাজ রনবী (বর্তমানে রামরী) দ্বীপের সাথে সংঘর্ষে ভেঙ্গে পড়ে এবং মুসলমান আরোহীদেরকে আরাকানে পাঠানে হয়। সেখানে তারা গ্রামাঞ্চলে বসবাস শুরু করেন।"[৮৩]

অষ্টম ও নবম শতকে আরবীয় মুসলমান বণিকরাই এ পথে চীন পর্যন্ত বাণিজ্য করতেন। কাজেই এ বিদেশী মুসলমানরা আরব বণিকদল ছাড়া যে আর কেউ হতে পারে না, তাতে সন্দেহ নেই। পাহাড়পুরের প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য আমাদের এ সিদ্ধান্তকে আরো শক্তিশালী করে। রাজশাহী জেলার অন্তর্গত পাহাড়পুরের প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের ফলে বৌদ্ধ রাজা ধর্মপাল প্রতিষ্ঠিত সোমপুর বিহারে বাগদাদের আব্বাসীয় বাদশা হারুনুর রশীদের আমলের একটি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। মুদ্রাটিতে ১৭২ হিজরী সনের তারিখ খোদিত রয়েছে। এ সময় বাংলার বৌদ্ধ নৃপতি ধর্মপালের শাসন চলছিল ধর্মপাল ৭৭০ থেকে ৮১০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। আরাকানের রাজা মহত ইঙ্গত চন্দয়ত ও ধর্মপাল সমসাময়িক ছিলেন। অন্যদিকে সম্প্রতি কুমিল্লা জেলার ময়নামতিতে খনন কার্যের ফলেও কতিপয় আরবীয় মুদ্রা আবিস্কৃত হয়েছে। ধর্মপালের পুত্র দেবপালের রাজত্বের পর ময়নামতিতে শক্তিশালী দেববংশীয় বৌদ্ধ রাজারা রাজত্ব করেন।

আরাকানের রামরী দ্বীপে আরবীয় মুসলিম বণিকদের জাহাজ ভাঙ্গার ঘটনার সাথে এ মুদ্রাগুলোর সম্পর্ক থাকা বিচিত্র কিছুই নয়। কারণ স্বাভাবিকভাবেই ধারণা করা যেতে পারে যে, মুদ্রাগুলো সেগুলোতে উল্লিখিত সময়েই বাংলায় নীত ছিল। রামরী দ্বীপে জাহাজ ভাঙ্গার ঘটনাটিও ঘটে ৭৮৮ থেকে ৮১০ খৃস্টাব্দের মধ্যে। সম্ভবত আরব বণিকদল বাংলার বৃহত্তর নদী গঙ্গার উপকূল বেয়ে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ব্যবসায়-বাণিজ্য করতেন এবং তাঁদের মাধ্যমেই পাহাড়পুরের সোমপুর বৌদ্ধ বিহারে এ মুদ্রাটি আমদানি হয়। কেবলমাত্র ব্যবসায়-বাণিজ্য করাই মুসলিম বণিকদের লক্ষ্য ছিল না, এ সঙ্গে তাঁরা নিজেদের ওপর অর্পিত ইসলাম প্রচারের দায়িত্বও পালন করে যেতেন। যে সত্যের আলোকে তাঁদের হৃদয়দেশ উদ্ভাসিত হয়েছে–অন্ধকারে নিমজ্জিত দুনিয়ার প্রতিটি মানুষকে সে আলোকে সন্ধান দেয়া তাঁরা নিজেদের ধর্মীয় ও মানবিক কর্তব্য বলে মনে করতেন। কাজেই এ বণিকদের মধ্য থেকে অতি উৎসাহী কেউ কেউ ধর্মালোচনা ও ধর্ম প্রচারার্থে তৎকালীন বাংলার শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় কেন্দ্র পাহাড়পুরের সোমপুর বিহার ও ময়নামতির শালবন বিহারে গিয়ে থাকবেন এবং তাঁদের কাছ থেকেই এ মুদ্রাগুলো সংশ্লিষ্ট বৌদ্ধ বিহারসমূহে আমদানি হয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে। ড. এনামুল হক তাঁর 'পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম' গ্রন্থে এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত বক্তব্য পেশ করেছেন :

"আমাদের বিশ্বাস কোনো ইসলাম প্রচারকের দ্বারা পহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহারে খলীফার এ মুদ্রা নীত হয়। সম্ভবত তিনি এ মুদ্রা সঙ্গে নিয়ে তথায় প্রচার করতে গমন করেন। তিনি বৌদ্ধদের হাতে প্রাণ হারিয়েছিলেন এবং তাঁর মুদ্রাটি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের হস্তগত হয়েছিল।"[৮৪]

বাংলার উপকূল থেকে নিয়ে অভ্যন্তরভাগ পর্যন্ত আরব বণিকদের যাতায়াত সম্পর্কে ড. এ. রহীম তাঁর গ্রন্থে ইবনে খুরদাবা, মাসউদী, আল ইদ্রিসী প্রমুখ আরব ভূগোলবিদ ও পর্যটকদের মতামত উদ্ধৃত করে গঙ্গার এ ব-দ্বীপ অঞ্চলের সাথে আরব বণিকদের প্রাচীনতম সম্পর্কের কথা প্রমাণ করেছেন। আলোচনার শেষাংশে তিনি মন্তব্য

---

৮২. D. A. Rahim, *Social and Cultlre History of Benggal*, উদ্ধৃত: আবদুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭
৮৩. ড. আবদুল করীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫-১৬
৮৪. ড. এনামুল হক, *পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম* (কলকাতা: আশরাফিয়া লাইব্রেরী, ১৯৭৫ খ্রী.); পৃ. ৪৪

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন ঃ “উপরোক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, মেঘনার মোহনা থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত উপকূলীয় অঞ্চলে আরবীয় বণিকদের আগমন হয়েছিল।”[৮৫]

বস্তুত বাংলার উপকূল অঞ্চলে আরব বণিকদের আগমনের মাধ্যমেই এ দেশে ইসলামের সূত্রপাত হয়। আরব বণিকগণ স্ত্রী-পরিজন নিয়ে বিদেশ সফরে বের হতেন না। কাজেই দীর্ঘ সফরের মধ্যে কোনে স্থানে তাঁরা প্রয়োজন মতো বিরতি করতেন এবং স্বাভাবিক চাহিদা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট দেশের বিধর্মী মহিলাদের বিবাহ করতেন। অবশ্যই ইসলামী শরীয়তের নির্দেশানুসারে ইসলামে দীক্ষিত না করে তাঁরা যে এ সব মহিলাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতেন না, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কাজেই এভাবে বহু স্থানীয় মহিলা ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। চতুর্দশ শতকে পৌঁছে মুসলমানদের বাণিজ্য ও ভূ-পর্যটনে ভাটা পড়তে থাকে। তবুও এ ভাটার যুগে মরক্কো দেশীয় মুসলিম পর্যটক ইবনে বতুতা (জন্ম ৭০৩ হিজরী ও মুত্যু ৭৭৮ হিজরী) তাঁর সফরনামায় উল্লেখ করেছেন যে, তিনি গ্রানাডায় ভারতীয়দের সাথে এবং ভারতে গ্রানাডাবাসীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। মরক্কোর অন্তর্গত সাব্তার অধিবাসী জনৈক ব্যক্তির সাথে তিনি সাক্ষাৎ করেন চীনের কুনচুন ফু শহরে এবং ঐ ব্যক্তির এক ভাইয়ের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয় সুদানের সিজিলমাসা শহরে। এ দু'টি শহরকে একটি সরল রেখায় যুক্ত করলে মধ্যখানে নয় হাজার মাইলের ব্যবধান হয়। আরাকানে তিনি দেখেন বাংলার ও ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানদের কলোনি। মালদ্বীপে তিনি এক বাংঙ্গালী মুসলিম বংশের রাজত্ব দেখেন। ইবনে বতুতা তাঁর সফরনামায় বলেছেন ঃ “পরমাশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এ যে, এ দ্বীপপুঞ্জের (মালদ্বীপ) বাদশাহ হচ্ছেন খাদীজা নাম্নী জনৈকা মহিলা। তিনি সুলতান জালাল উদ্দীন উমর ইবনে সুলতান সালাহুদ্দীন সালেহ বাঙ্গালীর কন্যা। তাঁর দাদা বাদশাহ ছিলেন, অতঃপর তাঁর পিতা বাদশাহ হন।”[৮৬] খান বাহাদুর মুহাম্মদ হোসাইন সাহেব, ‘আজায়েবুল আসফার’ এর ভূমিকায় নবম শতকের পর্যটক সায়রাকীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, চীনের ফু-চু শহরে এক বিদ্রোহ চলাকালে দেড় লক্ষ মুসলমান নিহত হয়। এ মুসলমানরা সবাই ছিল বিদেশাগত।

ইসলামের আবির্ভাবের পর আরবদের বাণিজ্যভিত্তিক অর্থনীতি একদিকে মুসলমানদের আধিপত্য বিস্তারে এবং অন্যদিকে ইসলাম প্রচারে সহায়ক হয়। তাই প্রথম যুগে বাংলার উপকূল অঞ্চলে আরবীয় মুসলিম বণিকদের আগমন ও ইসলাম প্রচার মোটেই বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। এ দীর্ঘ আলোচনায় এ কথাই প্রমাণ করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম অঞ্চলে আরবীয় মুসলমানরা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন বলে কেউ কেউ মনে করে থাকেন।[৮৭] কিন্তু ড. আবদুল করীম তাঁর ‘চট্টগ্রামে ইসলাম’ গ্রন্থে এ ধারণা সংশয়মুক্ত নয় বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।[৮৮] তবে আরব বণিকরা চট্টগ্রামে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন না করলেও প্রাচীন কাল থেকে আরবদের যোগাযোগের ফলে চট্টগ্রামের সংস্কৃতিতে তাঁদের গভীর প্রভাব লক্ষ্যণীয়। চট্টগ্রামী ভাষায় প্রচুর আরবী শব্দ ব্যবহৃহ হয়। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবী শব্দের তুলনায় এর সংখ্যা দ্বীগুণেরও অধিক বলা যেতে পারে। চট্টগ্রামী ভাষায় ক্রিয়াপদের পূর্বে ‘না’ সুচক শব্দের ব্যবহার আরবী ভাষার প্রভাবের ফল। চট্টগ্রামী লোকদের মুখের আদল অনেকেই আরবদের অনুরূপ বলে মনে করেন। চট্টগ্রামের অনেক পরিবার নিজেদেরকে আরব বংশোদ্ভূত বলে দাবি করে। চট্টগ্রামের কোনো কোনো এলাকা যেমন আল করণ, সুলক বহর, বাকালিয়া ইত্যাদি আজও আরবী নাম বহন করছে। এ সবই চট্টগ্রাম তথা বাংলা উপকূলীয় অঞ্চলের সাথে আরব বণিকদের প্রাচীনতম যোগাযোগের প্রমাণ। আরবী ভাষা, আরবীয় সংস্কৃতি ও আরবীয় রক্তের মিশ্রণই এ এলাকায় ইসলামের ব্যাপক বিস্তৃতির সহায়ক হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে।

---

৮৫. আবদুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১
৮৬. ইবনে বতুতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১
৮৭. ড. এনামুল হক ও ড. আবদুল করীম, *আরাকান রাজ সভায় বাঙলা সাহিত্য* (কলকাতাঃ ন্যাশনাল লাইব্রেরী, ১৯৭৮ খ্রী.), পৃ. ৩২১
৮৮. ড. আবদুল করীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬-২৭

Dhaka University Institutional Repository

২য় পরিচ্ছেদ
স্থল পথে ইসলামের আগমন

স্থলপথে প্রধানত সিন্ধুর পথে ইসলাম সমগ্র হিমালয়ান উপমহাদেশে প্রবেশ করে। তিরানব্বই হিজরীতে মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.)-এর আমলে পনেরো হিজরী সনের মধ্যভাগ থেকেই সিন্ধু অভিযান শুরু হয়। সমসাময়িক ঐতিহাসিক বালাজুরী তাঁর 'ফাতহুল বুলদান' গ্রন্থে এর বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। ইতিপূর্বে উসমান ইবনে আবুল আবী সাকাফী, তাঁর ভাই মুগীরা সাকাফী, হারেস ইবনে মুররা আবদী প্রমুখ সেনাপতি বার বার সিন্ধু সীমান্তে অভিযান পরিচালনা করে এর বিভিন্ন এলাকা দখল করে নেন। এমনকি ৪৪ হিজরীতে আমীর মু'আবিয়া (রা.)-এর শাসনামলে সেনাপতি মুহাল্লাব ইবনে আবী সুফ্‌রী সিন্ধু সীমান্ত অতিক্রম করে মুলতান ও কাবুলের মধ্যবর্তী বান্না ও আহওয়াজ নামক স্থানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। মুহাল্লাবের পর আবদুল্লাহ ইবনে সাওয়ার, রাশেদ ইবনে আমর জাদীদী, সিনান ইবনে সালানাহ, আব্বাস ইবনে যিয়াদ ও মুনযির ইবনে জারূদ আবদী বারবার হিন্দুস্তান সীমান্তে অভিযান পরিচালনা করেন। এ সব অভিযানে মুসলমানরা কখনও সাফল্য আবার কখনও ব্যর্থতার সম্মুখীন হন। তবে হিন্দুস্তান জয়ের স্বপ্ন তাঁরা কখনও বিস্মৃত হতে পারেনি। এর কারণ হিন্দুস্তান বিজয় সম্পর্কে নবী করীম (স.)-এর নিশ্চয়তা দান। ভারত বিজয় সম্পর্কে সাহাবী হযরত সাওবান (রা.) নবী করীম (স.)-এর এক বাণী উদ্ধৃত করেছেন, তাতে বলা হয়েছে :

عصابتان من أمتى أحرزهم الله من النار عصابة تغزوا الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عليهما السلام -

"অর্থাৎ, আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত দু'টি সেনাদলকে আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামের আগুন থেকে নিষ্কৃতি দেবেন। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে হিন্দ (ভারত) আক্রমণকারী সেনাদল আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে হযরত ঈসা ইবনে মার্‌য়াম (আ.)-এর সহযোগী সেনাদল।"[৮৯]

অন্য এক বর্ণনায় সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন :

وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الهند فان أدركتها أنفق فيها نفسي ومالى فان أقتل كنت من أفضل الشهداء وإن أرجع فانا أبو هريرة المحرر-

"অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (স.) আমাদেরকে হিন্দুস্থানের জিহাদের (ভারত অভিযানের) ওয়াদা দিয়েছিলেন। যদি আমি তা (ঐ যুদ্ধের সুযোগ) পাই, তাহলে আমি তাতে আমার জান-মাল ব্যয় করবো। আর যদি আমি তাতে নিহত হই, তাহলে আমি শ্রেষ্ঠ শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হবো। আর যদি আমি সহি সালামতে ফিরে আসতে পারি তাহলে আমি হবো আযাদ বা জাহান্নাম হতে মুক্ত আবূ হুরায়রা।"[৯০]

শেষ নবী (স.) কর্তৃক এভাবে ভারত অভিযানে উদ্বুদ্ধ হবার কারণে মুসলমানরা সাময়িক সাফল্য ও একাধিকবার ব্যর্থতার পরও ভারত অভিযান চালিয়ে এসেছে। অবশেষে ৯৩ হিজরীতে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ সাকাফী ইরাকের গভর্নর নিযুক্ত হবার পর তিনি মাত্র সতের বছরের যুবক মুহাম্মদ ইবনে কাসিম সাকাফীকে সেনাপতি করে সিন্ধু অভিযানে প্রেরণ করেন। মুহাম্মদ ইবনে কাসিম সমগ্র সিন্ধু জয় করে পাঞ্জাবের মুলতান পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং অবশেষে এ শহরটিও জয় করে দেন। মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের এ অভিযানে চার হাজার ভারতীয় জাঠ সৈন্যও তাঁর সহযোগী হয়। পথিমধ্যে পুরাতন ব্রাহ্মণাবাদ জয় করে যখন তিনি অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন সাওয়ান্দার বাসীরাও তাঁর সাথে মিলিত হয়। সাওয়ান্দার বাসীরা সবাই তখন মুসলমান ছিল।

এভাবে দেখা যায় হিজরী প্রথম শতকেই ইসলাম ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। মুহাম্মদ ইবনে কাসিম যে নগর জয় করতেন সেখানে মসজিদ নির্মাণ করেন, মুসলমানদেরকে জায়গীর দান করেন এবং চার হাজার মুসলমানের বসবাসের ব্যবস্থা করেন। মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের অভিযানের পূর্ব থেকেই স্থল পথে ভারতে

৮৯. আবূ আবদুর রহমান আহমাদ ইব্‌ন শু'আয়ব আন-নাসাঈ, *সুনান আন-নাসাঈ*, হাদীস নং- ৩১৭৫
৯০. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩১৭৩

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদের আগমন শুরু হয়। মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের পর এ আগমন দ্রুততর হয় এবং অষ্টম শতকের মধ্যেই সিন্ধু ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন এলাকায় মুসলমানদের উপনিবেশ ও বসতি গড়ে ওঠে। ধর্মীও সামাজিকভাবে নিগৃহীত পশ্চিম ভারতের বহু সংখ্যক বৌদ্ধ ও হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করে।

অষ্টম শতকের বাংলার বৌদ্ধ সম্রাট ধর্মপাল সিন্ধু নদ ও পাঞ্জাবের উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত জয় করেছিলেন বলে জানা যায়। সমগ্র উত্তর ভারত জয় করার পর তিনি তৎকালীন ভারতের রাজধানী হিসেবে বিবেচিত কান্যকুব্জে বিরাট রাজ্যাভিষেক দরবার করেন। মালদহের নিকটবর্তী খালিসপুর নামক গ্রামে প্রাপ্ত ধর্মপালের তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, তাঁর এ রাজ্যাভিষেক দরবারে ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তি, গান্ধার ও কীর প্রভৃতি দেশের রাজা উপস্থিত ছিলেন।[৯১] এ রাজ্যগুলির মধ্যে যবন রাজ্যটি সম্ভবত সিন্ধুনদের তীরবর্তী কোনো মুসলমান অধিকৃত রাজ্য বলে রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছেন।[৯২]

এ থেকে প্রমাণ হয়, অস্টম শতকের শেষের দিকে এবং নবম শতকের গোড়ার দিকে সিন্ধুর মুসলিম রাজ্যের সাথে বঙ্গরাজ তথা বাংলার যোগাযোগ ছিল। নিশ্চয়ই মুসলিম ও বঙ্গরাজের মধ্যে দূত বিনিময় হতো। বাগদাদে তখন ছিল হারুনুর রশিদের রাজত্বকাল। হারুনুর রশিদের রাজত্ব মাকরান হয়ে সিন্ধুদেশ অবধি বিস্তৃত ছিল। কাজেই সিন্ধুর মুসলিম রাজ্যের যে নৃপতি ধর্মপালের দরবারে এসেছিলেন তিনি নিশ্চয়ই হারুনুর রশিদ নিযুক্ত কোনো গভর্নর ছিলেন। এ হিসেবে হারুনুর রশিদের সাথে ধর্মপালের যোগাযোগের উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা যায়। কাজেই এ সময় বাগদাদ ও বাংলার মধ্যে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল বলে অনুমান করা যায়। এমনকি বাগদাদ ও বাংলার সাংস্কৃতিক সম্পর্ক এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল যার ফলে উভয় দেশের মনীষী ও পন্ডিতবর্গ বন্ধুদেশে গমন করে সংশ্লিষ্ট দেশ ও জাতির চিন্তাধারা সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করেছিলেন। ইতিপূর্বে পাহাড়পুর ও ময়নামতিতে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের ফলে প্রাপ্ত হারুনুর রশিদের আমলের যে মুদ্রার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাও উভয় দেশের এ সম্পর্কের কথাই প্রমাণ করে।

এ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, অষ্টম-নবম শতক থেকেই স্থলপথে বাংলাদেশ ইসলামের সংস্পর্শে আসতে থাকে। কিন্তু এ সময়কার এমন কোনো ঐতিহাসিক সুস্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় না, যা থেকে এ কথা প্রমাণ করা যেতে পারে যে, এ দেশে কোন্ পর্যায়ে ইসলামের আগমন হয়েছিল, কারা ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং বাংলার মানুষের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে কি পরিমাণ সাঁড়া পাওয়া গিয়েছিল। তবে একাদশ শতক থেকে এ দেশে ইসলাম প্রচারের কিছু কিছু ঘটনা আমরা জানতে পারি এবং এও জানতে পারি যে, একাদশ শতকের অনেক পূর্ব থেকেই এ দেশের বিভিন্ন এলাকায় ইসলামের যথেষ্ট প্রচার হয়েছিল। এ সময় ইসলাম বাংলার চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হয় এবং অচিরেই এ উর্বর এলাকায় ইসলাম ধর্মের রূপ লাভ করে।

সূফী আলিম ও মুজাহিদগণের ইসলাম প্রচার

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, একাদশ থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত এ দেশে ইসলাম প্রচারের ঢেউ চলতে থাকে। তবে এর গতি সব সময় সমান থাকেনি। এ প্রেক্ষিতে এ সাত'শ বছরকে তিন পর্যায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথম পর্যায় অর্থাৎ একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকের প্রথম পাদকে যদি ইসলাম প্রচারের শৈশব ও কৈশর বলা যায়, তাহলে দ্বিতীয় পর্যায়ে ত্রয়োদশ শতকের দ্বিতীয় পাদ ও চতুর্দশ শতককে বলতে হয় ইসলাম প্রচারের যৌবনকাল এবং পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে এ প্রচারের ধারা মন্দীভূত হতে থাকে। নানা প্রকার বাধা-বিপত্তি ও সময় ইসলাম প্রচারের সাথে বিরাট প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের সাথে সূফী ও আলিমগণের নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আরব, ইয়েমেন, ইরান, খোরাসান, মধ্য এশিয়া ও উত্তর ভারত থেকে এ সূফী ও আলিমগণ বাংলায় আগমন করেন। বাংলায় ইসলাম প্রচারের ইতিহাসে তাঁরা এক বিস্ময়কর অবদান রেখে গেছেন। ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁদের অনেকে একাকী এ দূরদেশে পাড়ি দিয়েছেন। আবার অনেকে নিজের অনুচরবর্গসহ এ অজ্ঞাত-অপরিচিত দেশে

৯১. শ্রী অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, *গৌড়লেখমালা*, পৃ. ২১-২২; উদ্ধৃত: আবদুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০
৯২. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩-৪৪

Dhaka University Institutional Repository

আবহাওয়ার যাবতীয় প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করেও বসতি স্থাপন করেছেন। চতুর্দশ শতকের পর্যটক ইবনে বতুতা বাংলায় খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য জিনিসপত্রের মূল্য কম দেখে বিস্ময়াভিভূত হয়েছিলেন কিন্তু বাংলার আবহাওয়া তাঁকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। তাই তিনি মন্তব্য করেছিলেন ঃ "দেশটি ভিজা ও অন্ধকার এবং খোরাসানবাসীদের মতে ঐশ্বর্যসম্ভার পরিপূর্ণ দোযখ।"[৯৩]

প্রথম যুগের অনেক সূফী-আলিম সমুদ্রপথে এদেশে আগমন করেন। বাংলার সমুদ্র পথ আরবদের কাছে সুপরিচিত থাকা এবং বাংলার সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকার সাথে আরবদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠাই ছিল এর মূল কারণ। সমগ্র হিমালয়ান উপমাহাদেশের মধ্যে বঙ্গ-বদ্বীপে ইসলামের দ্রুত প্রসার ও অভূতপূর্ব সাফল্যের এ-ও প্রধান কারণ। এ সূফী আলিমগণের সংখ্যা কত ছিল তার সঠিক কোনো পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা এখনো সম্ভব হয়নি। তবে তাঁদের সংখ্যা শতের সীমা পেরিয়ে যে হাজারে পৌঁছেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এদের মধ্য থেকে মাত্র কয়েকজনের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা যায়। অনেকের কেবলমাত্র নামটুকুই জানা যায়। আবার অনেকের নামটুকু জানাও সম্ভবপর হয়নি।

শুধু আবহাওয়াই প্রতিকূল ছিল তাই নয়, দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও ছিল ইসলাম প্রচারকদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। স্বাভাবিক কারণেই হিন্দু রাজারা ইসলাম প্রচারকদেরকে সুনজরে দেখতে পারেনি। তারা এ সব প্রচারকের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালাতে থাকে, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে সমরিক শক্তি প্রয়োগ করে তাঁদের কার্যধারা ব্যাহত করার প্রয়াস পায়। ফলে ইসলাম প্রচারক সূফী আলিমদের অনেককে এ দেশের হিন্দু সামন্ত রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করতে হয়। এ যুদ্ধে কেউ কেউ শহীদও হয়ে যান। কিন্তু তাঁদের জীবন, কর্ম, চরিত্র ও চিন্তা চতুষ্পার্শ্বস্থ অমুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে এবং পরবর্তীকালে ইসলাম প্রচারের ধারাও অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে। ফলে ধীরে ধীরে সংশ্লিষ্ট এলাকা ইসলামের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সূফী ও দরবেশগণের অনেকেই নিজেদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ও অলৌকিক শক্তির (কারামত) সাহায্যে সাধারণ মানুষকে সম্মোহতি করেন বলে জানা যায়। কিন্তু জনগণের ব্যাপক হারে ইসলাম গ্রহণের মূলে এ অলৌকিক শক্তির তাড়না যতটুকু ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল ইসলামের অন্তর্নিহিত সম্মোহনী ও আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাব। ইসলামের মূলনীতি ও প্রধান আদর্শ অনাবিল এক ঈশ্বরবাদ (তৌহিদবাদ) এবং নরপূজা, প্রতীকপূজা, পৌত্তলিকতা ও অবতারবাদের অভিশাপমুক্ত একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র ইবাদাত বন্দেগীর মাধ্যমে মানুষকে তার যথার্থ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে বর্ণ, সম্প্রদায় ও অস্পৃশ্যতায় কলুষমুক্ত এক ভ্রাতৃসমাজে পরিণত করার আদর্শই বাংলার ধর্ম বিভ্রান্ত ও সামাজিক ক্ষেত্রে নিগৃহীত জনগোষ্ঠিকে পতঙ্গের ন্যায় ইসলামের আলোক-রশ্মির দিকে ধাবিত করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

ইসলাম প্রচারের প্রথম যুগে একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকের প্রথম পাদে এ সূফী ও আলিমগণ কোনো রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেননি। বরং তাঁদের ইসলাম প্রচার পরবর্তীকালে মুসলিম রাজশক্তির প্রতিষ্ঠায় সহযোগী শক্তির কাজ করেছিল। ত্রয়োদশ শতকে বাংলায় মুসলিম রাজশক্তির অভ্যুদয়ের পর ইসলাম প্রচারের ধারা বন্যার বেগে এগিয়ে চলে। চতুর্দশ শতক পর্যন্ত এ গতি ভাটা পড়েনি। কিন্তু পঞ্চদশ শতকে হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবন আন্দোলন এবং কোনো কোনো মুসলিম সুলতানের এতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতার কারণে ইসলাম প্রচার আন্দোলনের গতির তীব্রতা কমে আসে। তবুও সপ্তদশ শতক পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকে একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বকালে চট্টগ্রাম জেলা, ময়মনসিংহ জেলার মদনপুর, ঢাকা জেলার বিক্রমপুর ও সোনারগাঁও, পাবনা জেলার শাহজাদপুর, বগুড়া জেলার মহাস্থান, মালদহ জেলার পাণ্ডুয়া ও দেওকোট এবং বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট প্রভৃতি স্থান ছিল ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র। এ আমলে যে সকল সূফী ও মুজাহিদ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলায় আগমন করেন তন্মধ্যে প্রধান কয়েকজন হচ্ছেন–

১. শাহ সুলতান বল্‌খী,
২. শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমী,
৩. বাবা আদম শহীদ,
৪. মাখদুম শাহ দৌলা,

---

৯৩. ইবনে বতুতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৭

Dhaka University Institutional Repository

৫. শাহ নেয়ামতুল্লাহ,
৬. শাহ মাখদুম রূপোশ ও
৭. বায়েজিদ বোস্তামী ও ফরিদুদ্দীন শক্করগঞ্জ।[৯৪]

ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্যায়

শাহ সুলতান বল্‌খী

হযরত শাহ সুলতান বলখী মাহীসাওয়ার প্রথমে ঢাকা জেলার হরিরামপুর নগরে এবং পরে বগুড়া জেলার মহাস্থান বা মস্তান গড়ে ইসলাম প্রচার করেন। প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্ধন রাজ্যের রাজধানী এ মহাস্থানে অবস্থিত ছিল। তখন এ নগরের নাম ছিল পৌণ্ড্রনগর। প্রাচীন বৌদ্ধ ও হিন্দু সংস্কৃতির কেন্দ্র এ মহাস্থানে হযরত শাহ সুলতান বল্‌খী মাহীসওয়ারের মাযার অবস্থিত। প্রথম যুগে যে সকল একনিষ্ঠ ইসলাম প্রচারক বাংলায় আগমন করেছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। কিংবদন্তির অন্তরালে তাঁর ইতিহাসের প্রায় সবটুকুই অন্তর্হিত হয়ে গেছে। তা থেকে যতটুকু উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তা নিম্নে তুলে ধরা হলো :

কথিত আছে, তিনি বল্‌খের আসগর নামে কোনো রাজার পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসনে আরোহন করেন। রাজপ্রাসাদের আমোদ-প্রমোদ ও বিলাসিতায় গা-ভাসিয়ে দেন। ফলে রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন থেকে গাফেল হয়ে পড়েন এবং দেশে অত্যাচার ও যুল্‌মের রাজত্ব শুরু হয়। এ সময় এমন একটি ঘটনা ঘটে যা তাঁর সমগ্র জীবনের মোড় ফিরিয়ে দেয়। রাজকীয় সোফায় শায়িত থাকার জন্য রাজপ্রাসাদের জনৈকা ক্রীতদাসীকে তিনি বেত্রাঘাতের শাস্তি দান করেন। ক্রীতদাসীকে যখন বেত্রাঘাত করা হয় তখন যন্ত্রণায় কাতর হয়ে সে চিৎকার করে ওঠে, হায়! এক মুহূর্তের আরামের জন্য যদি আমার এ চরম শাস্তি হয়ে থাকে তাহলে না জানি প্রতিদিনকার আমোদ-প্রমোদ, বিলাসিতা ও দুনিয়ার সর্বাধিক আরাম-আয়েশ উপভোগ করার কারণে রাজার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে কী পরিমাণ শাস্তি অপেক্ষা করছে। ক্রীতদাসীর এ যন্ত্রণা নিঃসৃত অভিযোগ বাণী রাজার হৃদয়ের গভীর তন্ত্রীতে আঘাত করে। তিনি গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে পড়েন। কয়েক দিনের মধ্যে তিনি রাজকার্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন এবং মানসিক শান্তির সন্ধানে সিংহাসন ত্যাগ করে দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করে দামেশ্‌কে চলে আসেন। এখানে তিনি বিখ্যাত সূফী শায়খ তাওফীকের মুরীদ হন। প্রায় ৩৬ বছর পীরের খিদমত করার এবং আধ্যাত্ম সাধনায় নিয়োজিত থাকার পার পীর কর্তৃক বাংলায় ইসলাম প্রচারে আদিষ্ট হন। বাংলার অধিবাসীরা তখন ছিল হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পৌত্তলিক।[৯৫]

হযরত শাহ সুলতান বল্‌খী সমুদ্রপথে বাংলায় আগমন করেন। তিনি মৎস্যাকৃতি নৌকায় চড়ে এদেশে আগমন করেন বলে তাঁকে মাহীসাওয়ার বা মৎস্যারোহী বলা হয়। বাংলার উপকূলে এসে তিনি সন্দীপে অবতরণ করেন। সেখানে কিছুদিন অবস্থান করার পর জনবহুল হরিরাম নগর রাজ্যে (ঢাকার হরিরামপুর) আগমন করেন। তৎকালে বলরাম নামে এক হিন্দু রাজা হরিরাম নগরে রাজত্ব করতেন। তিনি কালীদেবীর উপাসনা করতেন। নগরে পৌঁছে হযরত শাহ সুলতান সোজা রাজার মন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে ছোট, বড়, মাঝারি বহু মূর্তির মাঝখানে কালী-করালীর একটি বিরাট মূর্তি স্থাপিত ছিল। মন্দিরে পৌঁছেই তিনি উচ্চঃস্বরে আযান-ধ্বনি উচ্চারণ করলেন। আযানের আশ্চার্য মহিমায় মন্দিরের মূর্তিগুলো একের পর এক ভেঙ্গে পড়তে লাগলো এবং টুকরো টুকরো হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো। এ অলৌকিক ঘটনার কথা অনতিবিলম্বে রাজার কানে গিয়ে পৌঁছলো। তিনি ভীত হয়ে দরবেশকে রাজ্য থেকে বিতাড়নের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। রাজা দরবেশকে নগর থেকে বহিষ্কার করার জন্য সেনাবাহিনী পাঠালেন। কিন্তু সেনাবাহিনী তাঁর কিছুই ক্ষতি করতে পারলো না। অবশেষে রাজা বলরাম নিজেই দরবেশের মোকাবিলায় অবতীর্ণ হলেন। কিন্তু রাজা নিহত হওয়া ছাড়া দরবেশের কোনো ক্ষতি করতে পারলেন না। রাজার মন্ত্রী দরবেশের কাছে উপস্থিত হলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন, দরবেশ মন্ত্রীকে রাজ্যের সিংহাসন দান করলেন।

---

৯৪. আবদুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪
৯৫. রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস* (কলকাতা: ন্যাশনাল লাইব্রেরী, ১৩৭৩ বাং.), পৃ. ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

হরিরাম নগরে অবস্থানকালে হযরত শাহ সুলতান বগুড়ার অন্তর্গত মহাস্থানের অত্যাচারী ক্ষত্রিয় শাসক পরশুরামের কথা জানতে পারলেন। তিনি শুনলেন, পরশুরামের অত্যাচারে প্রজাগণ অতিষ্ট হয়ে ওঠেছে। বিশেষত মুসলমানদের ওপর তিনি নির্মম অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছেন। পরশুরামের রত্নমণি নামে এক সুন্দরী কন্যা ছিল এবং শীলাদেবী নামে এক জাদুবিদ্যায় পারদর্শিনী যোগসিদ্ধা ভগ্নী ছিল। রাজা তার আরধ্য দেবী কালী-করালীর মন্দিরে প্রতিবছর একটি করে নরবলি দিতেন। জাদুবিদ্যা ও তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধি লাভের জন্য শীলাদেবী প্রতিদিন মন্দিরে এ কালীদেবীর পূজা করতেন। হরিরাম নগরে বসে হযরত শাহ সুলতান এ সব কথা শুনে তাদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করতে মনস্থ করলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি মহাস্থান অভিমুখে রওয়ানা হলেন। মহাস্থানে পৌঁছে তিনি রাজার কাছে নিজের ক্ষুদ্র জায়নামাজটি বিছাবার উপযোগী এক চিলতে জায়গা চাইলেন। রাজা ইতিপূর্বে রাজ্যের বাইরে দরবেশের কার্যাবলী সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তাই তিনি ভাবলেন, দরবেশের মনষ্কামনা পূর্ণ করলে হয়তো তিনি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং রাজা ও রাজশক্তির বিরুদ্ধে কোনো ক্ষতিকর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে উদ্যোগী হবেন না। তাই তিনি কোনো প্রকার দ্বিধা না করেই দরবেশের দাবি পূরণ করলেন। কিন্তু মহা বিস্ময়ের সাথে সবাই প্রত্যক্ষ করলো যে, দরবেশের জায়নামাজখানা প্রসারিত করার সাথে সাথেই তা রাজ প্রাসাদের চতুর্দিকের সমস্ত জায়গা ঘিরে ফেললো। এ আশ্চর্যজনক ঘটনায় রাজা ভীত হয়ে পড়লেন এবং তাঁর ভগ্নী শীলাদেবীর সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করলেন। শীলাদেবী তার জাদুর সাহায্যে দরবেশকে পরাস্ত করবেন বলে ভাইকে প্রতিশ্রুতি দিলেন। অতঃপর দরবেশের বিরুদ্ধে তিনি জাদু ও তান্ত্রিক সাধনার অস্ত্র নিক্ষেপ করতে লাগলেন। কিন্তু দরবেশের কেরামতির সামনে সব বিফলে গেল। শীলাদেবী পরাজিত ও ভীত হয়ে কালীদেবীর মন্দিরে প্রবেশ করে দ্বার রুদ্ধ করে দিলেন।

দরবেশকে শক্তিপূর্ণভাবে বহিষ্কারে অক্ষম হয়ে রাজা এবার সেনাবাহিনীর আশ্রয় নিলেন। কিন্তু দরবেশের বিরুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হলেন। রাজার পরে তাঁর মন্ত্রীও রাজার পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিহত হলেন। এভাবে যুদ্ধে জয়লাভ করে দরবেশ শীলাদেবীর সন্ধানে রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। সেখানে তিনি রাজকন্যা রত্নমণিকে ইসলামে দীক্ষিত করলেন এবং শীলাদেবী কালী মন্দিরে আত্মগোপন করেছেন বলে জানতে পারলেন। দরবেশ কালী মন্দিরের দিকে অগ্রসর হলেন। শীলাদেবী তার ভ্রাতৃকন্যা রত্নমণির ভাগ্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে করতোয়া নদী পার হয়ে পলায়ন করার সংকল্প করলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি মন্দির থেকে বের হয়ে নদীর তীরে উপস্থিত হলেন। কিন্তু তার পূর্বে দরবেশকে সে স্থানে উপস্থিত দেখে ভীতবিহ্বল চিত্তে নদী বক্ষে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। করতোয়ার যে স্থানে শীলাদেবী আত্মহত্যা করেছিলেন তা আজও শীলাদেবীর ঘাট নামে পরিচিত। অতঃপর দরবেশ পরশুরামের সেনাপতি সুরখাবের সাথে রত্নমণির বিবাহ দিলেন।[৯৬]

এভাবে মহাস্থানে ইসলাম বিজয়ীর আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। মহাস্থান বিজয়ের পর দরবেশ সেখানে একটি মসজিদ ও আস্তানা নির্মাণ করে ইসলাম প্রচার কেন্দ্র গড়ে তোলেন। এ স্থান থেকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত তিনি ইসলাম প্রচার করেছিলেন এবং মৃত্যুর পর এখানেই সমাহিত হন। মহাস্থান অর্থ বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ জায়গা। হাজার হাজার বছর থেকে এ স্থানটি পরিচিত ও প্রসিদ্ধ বলে এর নাম মহাস্থান হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। আবার কেউ কেউ মনে করেন স্থানটির আসল নাম 'মহা স্নান' অর্থাৎ বিখ্যাত স্নানের জায়গা। এ স্থানে শীলাদেবীর ঘাটটি বর্তমানে হিন্দুদের একটি তীর্থ ক্ষেত্র। 'পৌষনারায়ণী যোগের' সময় এখানে করতোয়ার তীরে প্রতি বছর একটি মেলা বসে এবং হাজার হাজার হিন্দু তীর্থযাত্রী শীলাদেবীর ঘাটে স্নান করে পূণ্য অর্জন করে। স্থানীয় মুসলমানরাও মেলায় যোগদান করে রাজা পরশুরামের বিরুদ্ধে হযরত শাহ সুলতান বলখীর বিজয়-উৎসব পালন করে। তারা এ জন্য এ স্থানে নামাজ পড়ে ও ইসলাম অনুমোদিত অন্যান্য অনুষ্ঠান পালন করে।[৯৭] স্থানীয় মুসলমানদের মতে এ স্থানটির নাম 'মস্তান নগর।' মস্তানগর নামটি সম্রাট আওরঙ্গজেবের ১০৯৬ হিজরীর একটি সনদেও দেখা যায়। আবার কেউ কেউ মনে করেন, মস্তান নগর নামটি বাংলাদেশের ফকীর আন্দোলনের সরদার মজনু শাহ মস্তানের নামের সাথে জড়িত। এ ফকীর সরদার ১৭৬৩ খৃস্টাব্দ থেকে ১৭৮৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে মহাস্থানকে তাঁর আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কর্মকেন্দ্র রূপে ব্যবহার করেন। প্রায় ২৫ বছর যাবত মজনু শাহ উত্তর ও পূর্ব বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃটিশ বিরোধী ফকীর আন্দোলন পরিচালনা করেন।

---

৯৬. রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১
৯৭. ড. এনামুল হক, A History of Sufism in Bengal. পৃ. ২০৮, উদ্ধৃত: আবদুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

Dhaka University Institutional Repository

স্থানীয় জনশ্রুতিতে এ দরবেশকে শাহ সুলতান বল্‌খী হিসেবে পাওয়া যায়। কিন্তু এতে দরবেশের আসল নামের সন্ধান পাওয়া যায় না। কারণ সূফী সম্প্রদায়ের সবাইকে 'শাহ' নামে অভিহিত করা হয়। আর সুলতান বল্‌খী অর্থাৎ বল্‌খের সুলতান। কাজেই এ দরবেশের আসল নামটি কি? এ আসল নামটির পরিচয় পাওয়া যায় ১০৯৬ হিজরীতে সম্রাট আওরঙ্গজেবের প্রদত্ত সনদে। সম্রাট আওরঙ্গজেবের এ সনদটি শাহ সুলতান বল্‌খীর দরগাহের খাদেম সাইয়েদ মোহাম্মদ তাহের, সাইয়েদ আবদুর রহমান ও সাইয়েদ মোহাম্মদ রেজাকে প্রদত্ত এক শাহী ফরমানে পাওয়া যায়। এ ফরমানে পীরোত্তর সম্পত্তির স্বীকৃতি দিয়ে দরবেশকে 'মীর সাইয়েদ সুলতান মাহমুদ মাহিসাওয়ার' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ফরমান থেকে জানা যায়, তিনি বল্‌খের সুলতান ছিলেন না। বল্‌খের সুলতান সূফী শ্রেষ্ঠ হযরত ইবরাহীম আদহামের ঘটনাটি সম্ববত তাঁর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। মীর সাইয়েদ সুলতান মাহমুদ মাহিসাওয়ার ৪৩৯ হিজরীতে মহাস্থানে আগমন করেন বলে কথিত আছে। কিন্তু এ তারিখ কতদূর সঠিক তা নির্ণয় করার কোনো মানদন্ড আদৌ খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে তিনি যে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার অনেক আগেই এ দেশে এসে ইসলামের আলো জ্বালিয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। স্থানীয় জনশ্রুতিতে তাঁর আগমনের পূর্বে রাজা পরশুরামের মুসলমানদের ওপর অত্যাচারের যে কাহিনী শোনা যায় তা থেকে ইসলামের প্রথম যুগে সমুদ্র ও স্থল পথে এ দেশে আরবদের ইসলাম প্রচার সম্পর্কিত বক্তব্য আরো শক্তিশালী হয়।

তবে কিংবদন্তির কাহিনীতে হরিরাম নগর ও মহাস্থানে রাজা বলরাম ও রাজা পরশুরামের সাথে দরবেশের যুদ্ধের যে কাহিনী ব্যক্ত হয়েছে তা দরবেশের অলৌকিক ক্ষমতার বেড়াজালে পরিবেষ্টিত হয়ে নিছক একটি অলৌকিক ঘটনা রূপে চিত্রিত হয়েছে। অথচ ইসলামের ইতিহাসে এর একটিও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না যে, কোনো সেনাবাহিনী অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া সেনাপতি একাই নিছক অলৌকিক ক্ষমতা বলে কোনো যুদ্ধ জয় করেছেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ্ (স.) নিজেও যুদ্ধের জন্য অস্রশস্ত্র তৈরি করেছেন, সেনাবাহিনীকে সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত করেছেন এবং সেনাদল নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। কাজেই হযরত শাহ সুলতান বল্‌খী অবশ্যই রাজা বলরাম ও পরশুরামের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। দেশের বিক্ষুব্ধ ও হিন্দু শাসনে উৎপীড়িত এবং নিপীড়িত বৌদ্ধ, অনার্য ও নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু জনগোষ্ঠী তাঁর সাথে সহযোগিতা করেছিল। তাদের সশস্ত্র সহযোগিতায় তিনি এ হিন্দু রাজাদের যুল্‌ম ও নিপীড়ন থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করেছিলেন এবং এ সঙ্গে ইসলামের আলোকে তাদের হৃদয়দেশ আলোকিত করেছিলেন। রাজা পরশুরামের অত্যাচার প্রসঙ্গে ড. এম. এ রহীম তাঁর 'সোশ্যাল এন্ড কালচারাল হিস্ট্রী অব বেঙ্গল' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন :
"জনশ্রুতি থেকে জানা যায়, রাজা পরশুরাম অত্যাচারী ছিলেন এবং তিনি বিশেষভাবে মুসলিম প্রজাদের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত নির্মম। ফলে জনগণের মধ্যে বিক্ষোভ ধুমায়িত হয়ে ওঠেছিল। এ থেকে এইচ বিভারিজ অনুমান করেছেন যে, রাজার এহেন অত্যাচার ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধেই শাহ সুলতান মাহিসাওয়ার জনগণের একটা বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এমনকি নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরাও এ গণবিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল।"[৯৮]

শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমী

ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা মহকুমার অন্তর্গত মদনপুর গ্রামে হযরত শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমীর মাযার অবস্থিত। এ মাযারের রক্ষণাবেক্ষণের যে নিষ্কর সম্পত্তি রয়েছে তার স্বীকৃতি দিয়ে ১০৮২ হিজরীতে বাদশাহ শাহজাহানের পুত্র বাঙ্গালার সুবাদার শাহ সুজা এক সনদ প্রদান করেছিলেন। ফার্সী ভাষায় লিখিত এ শাহী সনদে উল্লেখিত হয়েছে যে, শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমী ৪৪৫ হিজরীতে তাঁর মুর্শিদ সাইয়েদ শাহ সুর্খখুল আনতিয়াহ সহ মদনপুরে আগমন করেন। এ ফার্সী দলিল থেকে এ কথাও জানা যায় যে, স্থানীয় কোচ রাজা দরবেশকে বিষপান করতে দেন। তিনি নির্দ্বিধায় তা গলধঃকরণ করেন। তাঁর এ অলৌকিক শক্তি দেখে কোচ রাজা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং দরবেশ ও তাঁর ভবিষ্যৎ আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারীদের খেদমতের জন্য সমগ্র গ্রাম উৎসর্গ করেন। এ ব্যাপারে হযরত শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমী সম্পর্কে স্থানীয় এলাকার জনসাধারণের মধ্যে যে কিংবদন্তি প্রচলিত রয়েছে তা হচ্ছে–

---

৯৮. ড. এম. এ. রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

ময়মনসিংহে প্রবেশ করে হযরত শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমী মদনপুরে আস্তানা গাড়েন। তৎকালে এলাকার জনৈক শক্তিশালী কোচ রাজা রাজত্ব করতেন। দরবেশ ও তাঁর কতিপয় সঙ্গ-সাথী ছাড়া এ এলাকায় তৎকালে আর কোনো মুসলমান ছিল না। দরবেশের মাযারের পাশেই তাঁর এ শিষ্য-সাথীদের কবরও বিদ্যমান রয়েছে। মদনপুরে বসতি স্থাপন করার পর তিনি নিজের বহু অলৌকিক কার্য-কলাপের মাধ্যমে স্থানীয় জনসাধারণকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করতে থাকেন। কথিত আছে, যে ব্যক্তি তাঁর সাথে একবার সাক্ষাৎ করেছে সে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং তাঁর সক্রিয় ও প্রাণ উৎসর্গকারী শিষ্য শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অল্পকালের মধ্যে কোচ রাজার কানেও এ কথা গেল। তিনি দরবেশের সাফল্যে প্রমাদ গুনলেন। দরবেশকে রাজ দরবারে ডেকে পাঠালেন। রাজ দরবারে উপস্থিত হয়ে দরবেশ রাজা ও তাঁর পরিষদবর্গকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানালেন। ইসলামের মহাত্ম প্রমাণ করার জন্য রাজা দরবেশকে এক পাত্র বিষ পান করতে দিলেন। দরবেশ 'বিসমিল্লাহ্' বলে বিনা দ্বিধায় বেশির ভাগ বিষ পান করে নিলেন এবং অবশিষ্টাংশ তাঁর শিষ্য সাথীদেরকে অল্প অল্প করে পান করতে দিলেন। বিষ পানে দরবেশ ও তাঁর শিষ্যদের কোনো ক্ষতি হলো না দেখে রাজা, তাঁর পরিষদবর্গ ও দরবারে উপস্থিত সবাই ইসলাম গ্রহণ করলেন। দরবেশের অলৌকিক কর্ম-ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে উক্ত কোচ রাজাই সমগ্র মদনপুর গ্রামটি দরবেশকে পীরোত্তর সম্পত্তিরূপে দান করেন।

হযরত শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমী মদনপুরে আগমনের যে তারিখ বর্ণিত হয়েছে তাকে কোনোক্রমেই অগ্রহণযোগ্য বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না। কারণ তা একটি ঐতিহাসিক সত্য। ১৮২৯ সালে সরকার যখন মদনপুর স্টেট পূনর্দখল করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন তখন হযরত শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমীর মাযারের মুতাওয়াল্লী পূর্ব বর্ণিত সনদটি পেশ করেন। হযরত রুমীই যে ময়মনসিংহ এলাকার প্রাচীনতম ইসলাম প্রচারক উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে।

বাবা আদম শহীদ

বিস্ময়কর ও চমকপ্রদ কিংবদন্তির নায়ক বাবা আদম শহীদ বাংলায় আগমনকারী প্রথম যুগের মুজাহিদ সূফীগণের অন্যতম। অন্যান্য সূফী সম্পর্কে জানা যায় যে, তাঁরা একাকী বা কতিপয় শিষ্য-শাগরিদসহ এ দেশে পাড়ি জমিয়েছিলেন এবং নিজেদের আধ্যাত্মিক শক্তি ও ইসলামের অন্তর্নিহিত অনাবিল সত্যের জোরে পৌত্তলিকতার এ কেন্দ্রভূমিতে তৌহিদের বাণী প্রচার করেছিলেন। কিন্তু বাবা আদম শহীদ সম্পর্কে জানা যায় যে, যথারীতি একটি ছোটখাটো সেনাবাহিনী নিয়ে তিনি বাংলার মাটিতে আস্তানা গেড়েছিলেন। ইতিহাসের বিচারে এটা কতদূর সত্য এবং বখতিয়ার খলজির বঙ্গ বিজয়ের পূর্বে একটি মুসলিম সেনাবাহিনীর সমুদ্রপথে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে যাওয়া কতদূর বাস্তবধর্মী তা বিচার্য হলেও পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় বাবা আদম সম্পর্কিত কিংবদন্তি ও জনশ্রুতি আশ্চার্যজনক বিস্তৃতি লাভ করেছে। বিভিন্ন মুখে ও বিভিন্নভাবে এ কিংবদন্তিগুলো শ্রুত হলেও এগুলোর মধ্যে একটা অদ্ভুত রকমের মিল দেখা যায়। এ কিংবদন্তিগুলোর মধ্য থেকে ঐতিহাসিক সত্য বাছাই করার জন্য নিম্নে এর সংক্ষিপ্ত সার পেশ করা হলো।

রাজা বল্লাল সেনের রাজত্বকালে (১১৫৮-১১৭৯ খৃ.) গো কোরবানীর অপরাধে নির্যাতিত জনৈক মুসলিম হজ্জযাত্রীর মুখে তার নির্যাতনের কাহিনী শুনে বাবা আদম শহীদ একটি ছোটখাটো সেনাবাহিনী নিয়ে ঢাকা জেলার (তৎকালীন) বিক্রমপুর পরগনার অন্তর্গত আবদুল্লাহপুর গ্রামে উপস্থিত হন। গ্রামে তাঁবু স্থাপন করে আহার্যের আয়োজন করার জন্য তাঁর সৈন্যরা একটি গরু জবেহ করে। অকস্মাৎ একটি চিল মুসলিম শিবির থেকে এক টুকরা গরুর গোশত ছোঁ মেরে নিয়ে রাজার সেনা শিবিরের উপর দিয়ে উড়ে যেতে থাকে। এ সময় অন্য একটি চিল এসে প্রথম চিলটির থাবা থেকে গোশ্তের টুকরাটি ছিনিয়ে নিতে চায়। গোশ্তের টুকরাটি নিয়ে শূন্যে উভয় চিলের লড়াই বেঁধে যায়। ফলে এক সময় গোশ্তের টুকরাটি মাটিতে পড়ে যায়। হিন্দু সেনারা বুঝতে পারে যে, এটা কোনো জবেহ করা গরুর গোশ্ত এবং তারা অবিলম্বে রাজা বল্লাল সেনকে এ সংবাদটি অবগত করায়। রাজা বল্লাল সেন তৎকালে বিক্রমপুরের রাজত্ব করতেন। রাজা এ ব্যাপারে তদন্ত করে জানতে পারলেন যে, যবনরা (মুসলমানরা) তাঁর সাথে যুদ্ধ করার জন্য সেনাদলসহ আগমন করেছে। কাজেই তিনি সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে যবনদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন। যবন ও হিন্দুদের মধ্যে পনেরো দিন ব্যাপী ঘোরতর যুদ্ধ চললো। চতুর্দশ দিবসে হিন্দুরা তাদের বিপুল পরিমাণ ক্ষতি অনুভব করলো এবং যবনদেরকে অজেয় মনে করলো। সেনাবাহিনীর হতাশা লক্ষ্য করে পঞ্চদশ দিবসে রাজা বল্লাল সেন স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে

সেনাবাহিনী পরিচালনা করলেন। কিন্তু যুদ্ধে বিজয়লাভ সম্পর্কে রাজা নিজে নিশ্চিত ছিলেন না। পরাজয় ঘটলে যাতে মুসলিম বাহিনীর হাতে রাজপরিবারের মহিলাদের কোনোরূপ অমর্যাদা হতে না পারে এ জন্য তিনি যুদ্ধ যাত্রার প্রাক্কালে রাজ অন্তঃপুরে একটি অগ্নিকুন্ড (চিতা) প্রজ্বলিত করে গেলেন এবং পরিবারস্থিত মহিলাদেরকে পরাজয়ের সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথেই চিতায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহুতি দেবার নির্দেশ দিয়ে গেলেন। যুদ্ধে পরাজয়ের বার্তা বহন করার জন্য তিনি একজোড়া সংকেতবাহী কবুতরকে পোশাকের নিচে সংগোপনে রেখে গেলেন।
রাজা নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার কারণে যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেলো। মুষ্টিমেয় মুসলিম সেনা বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করতে করতে একের পর এক শাহাদাত বরণ করলো। অবশেষে বাবা আদম তাঁর অসাধারণ শৌর্য ও বিক্রমের পরিচয় দিয়ে একাই যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুসেনার বিরুদ্ধে অস্ত্র চালনা করতে থাকলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি অনুভব করলেন যে, তাঁর শাহাদাত নিকটবর্তী। কাজেই তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে তাঁর শেষ নামাযে রত হলেন। সুযোগ বুঝে রাজা ত্বরিত গতিতে অগ্রসর হয়ে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। রাজা বার বার তাঁর ঘাড়ে তরবারির আঘাত করতে লাগলেন। কিন্তু রাজা আশ্চার্য হয়ে দেখলেন যে, তাঁর শত আঘাত দরবেশের ঘাড়ে একটুও আঁচড় কাটতে পারেনি। রাজার বারংবার আঘাতের মধ্যেও দরবেশ তাঁর নামায পড়ে যেতে থাকেন। নিশ্চিন্তে নামায শেষ করার পর দরবেশ রাজাকে বললেন, নিজের তরবারি ত্যাগ করে আমার তরবারি নিয়ে আমার ঘাড়ে আঘাত করুন। দরবেশের নির্দেশমতো রাজা দরবেশের শিরচ্ছেদ করলেন।[৯৯] এভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমানদের সবাই শাহাদাত বরণ করলেন।

যুদ্ধে জয়লাভ করে রাজা আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন। তার সারা শরীর ও পোষাক রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রাসাদে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে তিনি রক্তাক্ত শরীর ও পোষাক ধুয়ে ফেলতে মনস্থ করলেন। নিকটেই একটি পুকুর ছিল। তিনি সেদিকে এগিয়ে গেলেন। পুকুরের কিনারে পৌঁছে তিনি একের পর এক সমস্ত পোষাক খুলে ধুয়ে ফেললেন। কিন্তু অভাবিত বিজয়ের আনন্দে পোষাক অভ্যন্তরের সংগোপনে রক্ষিত কবুতর দু'টির কথা তিনি একেবারেই বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলেন। রাজার অমনোযোগিতার কারণে কবুতর দু'টি মুক্তি পেয়ে রাজপ্রাসাদ অভিমুখে উড়ে গেলো। প্রাসাদবাসী রমণীরা সংকেতবাহী কবুতর দেখে অগ্নিকুন্ডে ঝাঁপিয়ে পড়লো। স্নান শেষে রাজা নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। তিনি ত্বরিত গতিতে রাজপ্রাসাদ অভিমুখে ধাবিত হলেন। কিন্তু সেখানে ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গেছে। সে এক হৃদয় বিদারক কান্ড। রাজা দেখলেন, তাঁর পরিবার-পরিজন সবাই অগ্নিকুন্ডে প্রাণ দিয়েছে। কেউ বেঁচে নেই। দুঃখে ও অনুশোচনায় তিনি নিজেও জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এভাবে যুদ্ধে জয়ী হয়ে রাজা বল্লাল সেন সপরিবারে আগুনে পুড়ে মরে 'পোড়া রাজা' উপাধি লাভ করলেন। এ উপাধি নিয়েই তিনি আজও জনগণের মধ্যে পরিচিত হয়ে আসছেন। আর অন্যদিকে রাজার হস্তে নিহত হয়ে বাবা আদম লাভ করলেন শহীদ উপাধি।[১০০] দরবেশ শাহাদাত বরণ করলেও তাঁর সাধনা ও আদর্শ সফল হলো। সমগ্র এলাকায় ইসলাম বিজয় লাভ করলো।

মাখদুম শাহ দৌলা

পাবনা জেলার শাহজাদপুরে হযরত মাখদুম শাহ দৌলা শহীদের মাযার রয়েছে। তিনি ইয়েমেনের শাসনকর্তা, রাসূলে করীম (স.)-এর অন্যতম সাহাবী হযরত মু'আজ ইবনে জাবাল (রা.)-এর বংশধর ছিলেন।[১০১] তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত কিংবদন্তিতে বলা হয়েছে যে, আরবের অন্তর্গত ইয়ামান থেকে নিজের এক ভাই, তিন বোন ও বহু আনুচরসহ তিনি বাংলায় আগমন করেন। দলবলসহ শাহজাদপুরে এসে তিনি একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। প্রতিদিন তাঁর হাতে দলে দলে লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। স্থানীয় হিন্দু রাজা তাঁদের ইসলাম প্রচারের খবর শুনে নানাভাবে তাঁদেরকে উৎপীড়ন করতে থাকে। অবশেষে একদিন রাজার লোকজন দরবেশের আস্তানা আক্রমণ করে এবং উভয়পক্ষে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যুদ্ধে মুসলমানগণ জয়লাভ করলেও দরবেশ ও তাঁর একুশ জন অনুচর শহীদ হন। দরবেশের মাযারের কাছেই এ একুশ জন অনুচরের মাযার রয়েছে। দরবেশের অবশিষ্ট মুরীদগণ অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে ইসলাম প্রচার শুরু

---

৯৯. গোলাম আহমদ মোর্তজা, *ইতিহাসের ইতিহাস* (ভারত: বিশ্ব বঙ্গীয় প্রকাশন, ১৯৭৮ খ্রী.), পৃ. ৫৯
১০০. গোলাম আহমদ মোর্তজা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩
১০১. মুন্সী গোলাম হোসাইন খান, *সিয়ারুল মুতাআখখিরীন* (হুগলী: হোদায়াতুল মুসলিমীন লাইব্রেরী, ২০০১ খ্রী.), পৃ. ৮১

করেন। ফলে অল্পকাল মধ্যেই পাবনা ও বগুড়া জেলায় ইসলাম বিস্তার লাভ করে। শাহজাদপুরের বর্তমান মুসলিম অধিবাসীদের মধ্যে মাখদুম শাহদৌলার অন্যতম ভাগিনেয় খাজা নূরের বংশধর বলে কথিত।

মাখদুম শাহদৌলা শহীদ বাংলায় আসার পূর্বে বুখারায় গিয়ে জালালুদ্দীন বুখারীর সাথে সাক্ষাৎ করেন বলে জানা যায়। তিনি পারস্যের বিখ্যাত মরমী কবি মাওলানা জালালুদ্দীন রুমীর ওস্তাদ শামসুদ্দীন তাবরিজীর শিষ্য ছিলেন। জালালুদ্দীন বুখারী ১১৯৬ থেকে ১২৯১ খৃ. পর্যন্ত জীবিত ছিলেন বলে 'আইন-ই-আকবরী' ও 'তাজকিরায়' উল্লেখিত হয়েছে। আর শামসুদ্দীন তাবরিজী ১২৪৭ খৃ. মৃত্যুবরণ করেন বলে জানা যায়। তাহলে এ কথা স্পষ্টভাবে বলা যেতে পারে যে, মাখদুম শাহদৌলা শহীদ ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধের শেষের দিকে বাংলায় আগমন করেন। কারণ জালালুদ্দীন বুখারী কমপক্ষে ৪০ বছর বয়ঃক্রমের পূর্বে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করতে পারে না। যদি ১২৩৬ খৃ. তাঁর ৪০ বছর বয়সের সময় মাখদুম শাহদৌলা শহীদ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে থাকেন তাহলে শামস তাবরিজী এরপরও সাত বছর বেঁচে ছিলেন। এ ক্ষেত্রে ১২৪০-এর পরেও তাঁর পক্ষে শামস তাবরিজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করা সম্ভব। কাজেই সম্ভবত ১২৪০ খৃস্টব্দের পরেই তিনি বাংলায় আগমন করেছিলেন।[১০২]

মাখদুম শাহদৌলা শহীদের মাযার সংলগ্ন মসজিদের ব্যয় নির্বাহের জন্য মুসলিম সুলতানগণ ৭২২ বিঘা জমি ওয়াক্ফ করেন। বর্তমানে এ ওয়াক্ফ সম্পত্তিটি বিদ্যমান রয়েছে। উত্তর বঙ্গ অঞ্চলে মাখদুম শাহদৌলা শহীদের মাযারটি অন্যতম তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

শাহ নেয়ামতুল্লাহ

যতদূর জানা যায়, পূর্ববঙ্গে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বে শাহ নেয়ামতুল্লাহ ঢাকা অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। তিনি কোথা থেকে আগমন করেছিলেন সে সম্পর্কে তেমন কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে প্রচলিত কিংবদন্তি থেকে অনুমিত হয় যে, মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বেই তিনি ঢাকা অঞ্চলে আগমন করেছিলেন।

কিংবদন্তি থেকে জানা যায়, তিনি ঢাকা নগরী সন্নিহিত এলাকায় ইসলাম প্রচারে অগ্রসর হলে স্থানীয় প্রভাবশালী হিন্দুরা নানাভাবে তাঁকে বাঁধা দিতে থাকে। একদিন তিনি ইবাদাতে মশগুল ছিলেন এমন সময় হিন্দুরা দেবমূর্তি নিয়ে ঢাকঢোল পিটিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হয়। তারা প্রতিমা বিসর্জন দেবার জন্য শোভাযাত্রা নিয়ে যাচ্ছিল। দরবেশের আস্তানার কাছে এসে তারা বাদ্যের আওয়াজ বৃদ্ধি করে ভীষণ শোরগোলের সৃষ্টি করে। ফলে দরবেশের ইবাদাতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। তিনি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে মূর্তিগুলির প্রতি আঙ্গুলি নির্দেশ করেন। ফলে পথের উপরই মূর্তিগুলো ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। শোভাযাত্রীরা ভীত হয়ে পলায়ন করে। এ অভাবনীয় দৃশ্য হিন্দুদের মনে ভাবান্তর দেখা দেয়। এ ঘটনার পর দলে দলে হিন্দুরা তাঁর আস্তানায় এসে ইসলাম গ্রহণ করে বলে শোনা যায়।[১০৩]

বর্তমান ঢাকা নগরীর পুরানা পল্টন এলাকায় দিলকুশা বাগে শাহ নেয়ামতুল্লাহর মাযার অবস্থিত। মাযারের পার্শ্বে পাঠান আমলে নির্মিত একটি প্রাচীন মসজিদ বিদ্যমান। শাহ নেয়ামতুল্লাহ নামের সঙ্গে 'বুতশিকন' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। মনে হয় তাঁর আঙ্গুলি হেলনে হিন্দু দেবমূর্তি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাওয়ার কারণে পরবর্তীকালে তাঁকে এ উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

শাহ মাখদুম রূপোশ

রাজশাহী অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে হযরত শাহ মাখদুম রূপোশের দান অতুলনীয়। এ অঞ্চলে আগমনকারী ইসলাম প্রচারকদের মধ্যে তাঁকে সবচেয়ে প্রাচীন বলে অনুমান করা হয়। রাজশাহীর দরগাহ পাড়া নামক স্থানে সরকারী কলেজ প্রাঙ্গনে তাঁর মাযার অবস্থিত। মাযারগাত্রে খোদিত নামফলকে তাঁকে 'সাইয়েদ সনদ শাহ

১০২. রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১
১০৩. আবদুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬

দরবেশ' নামে উল্লেখ করা হয়েছে।[১০৪] আসলে এগুলোর কোনটিই তাঁর নাম নয়, উপাধি বিশেষ। মোগল বাদশাহ হুমায়ুনের আমলে (১৫৩০-১৫৫৬ খৃ.) মাযার সন্নিহিত এলাকাকে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি হিসেবে দান করা হয়। তারও অনেক পরে ইরানের শাহ আব্বাস শফবীর (১৫৮৭-১৬২৯ খৃ.) শাগরিদ আলী কুলী বেগ ১৬৩৪ খৃ. মাযারটি নির্মাণ করেন। ১৯০৪ সালে মাযারের তদানীন্তন খাদেম জনাব গোলাম আকবর রাজশাহী জেলা কোর্টে দরগাহ সম্পত্তি পরিচালনা সম্পর্কিত যে বিবৃতি দেন তা থেকে হযরত শাহ মাখদুমের বাংলায় আগমন কাল চিহ্নিত করা যেতে পারে। ড. এনামুল হক তাঁর 'সূফীজম ইন বেঙ্গল' গ্রন্থে লিখেছেন, "মাখদুম সাহেবের নাম হযরত শাহ রূপোশ। তাঁর অন্য নাম কি ছিল তা আমি জানি না। তাঁর ইন্তিকালের তারিখও আমার স্মরণ নেই। মাযার সন্নিহিত সম্পত্তিটি ১০৪৪ হিজরীর পূর্বে প্রদত্ত হয়নি। আর আমি যে সমস্ত কাগজপত্র দাখিল করেছি তাতে আমি এ উল্লেখ করেছি যে, হযরত রূপোশ ঐ সময়ের ৪৫০ বছর পূর্বে জীবিত ছিলেন।"[১০৫]

অবশ্যই রূপোশ কোনো নাম বা নামের অংশ হতে পারে না । এটিও উপাধি বিশেষ। রূপোশ ফার্সী শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে অবগুণ্ঠনাবৃত মুখ। অর্থাৎ যিনি কোনো নেকাব বা কাপড় দিয়ে চেহারা ঢেকে রাখেন। কাজেই এ সাক্ষ্য থেকেও হযরত শাহ মাখদুম রূপোশের আসল নাম জানা সম্ভব নয়। তবে যথাযথভাবে তা কাগজে-কলমে কার্যকর রূপ নেয় ১৬৩৪ খৃস্টাব্দে। এখানে খাদেম সাহেবের কথা অনুযায়ী জানা যায় যে, ১৬৩৪ খৃস্টাব্দের ৪৫০ বছর পূর্বে শাহ মাখদুম রূপোশ জীবিত ছিলেন। এ কথা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে বলতে হয় যে, হযরত শাহ মাখদুম রূপোশ ১১৮৪ খৃ. রাজশাহীতে ইসলাম প্রচারের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তুর্কীদের বাংলা অভিযানের পূর্বে যে সব ইসলাম প্রচারক বাংলায় আগমন করে সম্পূর্ণ বিরোধী পরিবেশে ইসলামের সত্যবাণী প্রচার করে এ দেশে ইসলামের ভিত গড়ে তুলেছিলেন শাহ মাখদুম রূপোশকে তাঁদের অন্যতম বলা যেতে পারে। সম্ভবত এ জন্যই তাঁকে রাজশাহী অঞ্চলের সূফী ও ইসলাম প্রচারকদের ওস্তাদ বলা হয়।

আধুনিক রাজশাহী শহরটি মূলত রামপুর ও বোয়ালিয়া দু'টি গ্রামকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেছে। পদ্মার উত্তর পাড়ে অবস্থিত এ রামপুর গ্রামে ছিল কিছু সংখ্যক জেলের বাস। একদিন কয়েজন জেলে নদীতে মাছ ধরছিল, এমন সময় তারা একটা অস্বাভাবিক ঘটনা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলো। তারা দেখলো, লম্বা আলখেল্লা পরা এক ব্যক্তি পায়ে হেঁটে নদী পার হচ্ছেন। তাঁর মাথায় পাগড়ি, পায়ে খড়ম ও হাতে একটি লাঠি। তিনি দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে আসছেন। এ দৃশ্য দেখে জেলেরা তাদের সমস্ত কাজ বন্ধ রেখে দ্রুত তাঁর কাছে পৌঁছে গেলো। ততক্ষণে তিনি গ্রামে পৌঁছে গিয়েছিলেন। জেলেরা তাঁর কাছে আশির্বাদ প্রার্থী হলো। তিনি জেলেদের কাছে আহার চাইলেন। তারা তাড়াতাড়ি নিজেদের সাধ্যমতো মাটির পাত্রে করে কিছু খাদ্য আনলো। তিনি খাদ্যের পাত্রগুলো নিজের পাগড়ি দিয়ে ঢেকে দিলেন। অতঃপর হাত তুলে দোয়া করলেন এবং কিছুক্ষণ পর পাগড়িটি সরিয়ে নিলেন। দেখা গেলো খাদ্যগুলো মাছে ও পাত্রগুলো সোনায় পরিণত হয়ে গেছে। দরবেশের অলৌকিক ক্ষমতা দেখে জেলেরা মুগ্ধ হলো এবং ধীরে ধীরে তারা তাঁর ভক্ত শ্রেণীতে পরিণত হলো। অতঃপর এখান থেকে আরো উত্তরে এগিয়ে গিয়ে তিনি নিজের আস্তানা গাড়লেন। এ স্থানটিই বর্তমানে দরগাহপাড়া নামে পরিচিত। এখানে জেলেদের মধ্যে বসে তিনি ইসলাম প্রচারে মনোনিবেশ করলেন।

হযরত শাহ মাখদুম রূপোশ সম্পর্কিত এ কিংবদন্তিটি রাজশাহী অঞ্চলে প্রচলিত। এ কিংবদন্তি থেকে ইসলাম প্রচারের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, তাঁর পূর্বে এ অঞ্চলে কোনো ইসলাম প্রচারক আসেননি। তিনি নিজের চরিত্র, মাধুর্য, ব্যবহার ও আত্মিক শক্তি বলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ইসলাম প্রচারে সাফল্য লাভ করেন। শোনা যায়, তাঁর আত্মিক ক্ষমতার কথা শুনে মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে তাঁর কাছে এসেছে এবং যে ব্যক্তি কিছুদিন তাঁর সাহচর্যে থেকেছে সে-ই ইসলামের আলোকে নিজের হৃদয়ের সমস্ত অন্ধকার দূর করে ধন্য হয়েছে। নতুন মুসলমানরা তাঁকে এতো বেশি ভালোবাসতেন যে, তারা ইসলাম গ্রহণের পর নিজেদের পুরাতন আবাসে ফিরে যাবার চেয়ে তাঁর আস্তানার আশেপাশে নিজেদের আবাস গড়ে তুলতে থাকে। অথবা এমনও হতে পারে যে, ইসলাম গ্রহণের পর অমুসলিম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার কারণে অমুসলিম সমাজের বিরোধিতা এড়াবার জন্য তারা একস্থানে নিজেদের শক্তি জোট গড়ে তুলতে বাধ্য হয়। এভাবে রামপুর গ্রামে স্থান সংকুলান না হওয়ায়

---

১০৪. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২-১১৩
১০৫.ড. এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১

পাশ্ববর্তী বোয়ালিয়া গ্রামেও নতুন মুসলমানদের বসতি গড়ে উঠতে থাকে।[১০৬] পরবর্তীকালে এ এলাকাটিই রাজশাহী নাম ধারণ করে। হযরত শাহ মাখদুম রূপোশ এখানেই ইন্তিকাল করেন। তিনি অবিবাহিত ছিলেন।

বায়েজিদ বোস্তামী ও ফরিদুদ্দীন শক্করগঞ্জ

বাংলার চট্টগ্রাম অঞ্চলেই যে সর্বপ্রথম ইসলামের আগমন হয় বর্তমানে এতে আর কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। ইসলামের প্রথম যুগেই আরব বণিকদের সাহায্যে এ এলাকার অধিবাসীরা প্রথম ইসলামের সংস্পর্শে আসে। এমন কি খৃস্টীয় অষ্টম ও নবম শতকে চট্টগ্রাম বন্দরে মুসলিম আরবদের উপনিবেশ গড়ে ওঠে। দশম শতকের মাঝামাঝি সময়ে চট্টগ্রাম অঞ্চলে ইসলাম ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। আরব ব্যবসায়ী, ইসলাম প্রচারক ও ওলী-দরবেশের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও চরিত্র মাধুর্যে এ অঞ্চলের বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করে। বহু সংখ্যক সূফী ও ওলী-দরবেশের আগমনের কারণেই সম্ভবত চট্টগ্রামকে 'বার আউলিয়ার দেশ' বলা হয়।[১০৭]

প্রাচীন সূফী-দরবেশদের মধ্যে খৃস্টীয় নবম শতকে পারস্যের হযরত বায়েজিদ বোস্তামীর চট্টগ্রাম অঞ্চলে আগমনের কথা শোনা যায়। চট্টগ্রাম শহরের পাঁচ মাইল উত্তরে নাসিরাবাদ গ্রামের এক পর্বত চূড়ায় তাঁর স্মারক সমাধিও দেখা যায়। জনশ্রুতিতে জানা যায়, তৎকালে এ অঞ্চল গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। এ জঙ্গলে হিংস্র জানোয়ার ও জিনদের বসবাস ছিল। হযরত বায়েজিদ বোস্তামী এ অঞ্চলে আগমন করে ইসলাম প্রচার করেন। ফলে এখানে জনবসতী গড়ে ওঠে।

অবশ্য এ জনশ্রুতির সত্যতা প্রমাণ করার মতো এখনও কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে এ কথা সবাই স্বীকার করেন যে, হযরত বায়েজিদ বোস্তামী এখানে ইন্তিকাল করেননি। পারস্যের বিস্তাম নগরে ৮৭৪ খৃ. তাঁর ইন্তিকাল হয়। ড. এনামুল হক তাঁর 'সূফীজম ইন বেঙ্গল' গ্রন্থে চট্টগ্রামের এ বায়েজিদ বোস্তামীকে বগুড়ার শাহ সুলতান বল্‌খী মাহীসাওয়ার বলে অনুমান করেছেন। এ জন্য প্রমাণ স্বরূপ তিনি ড. দীনেশচন্দ্র সেন সংকলিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকার'-এর দু'টি চরণ উদ্ধৃত করেছেন–

"নাসিরাবাদেতে মানি সাহারে সুলতান,
দেশে বৈদেশ হইতে আইসে মোমিন মুসলমান।"[১০৮]

অন্যদিকে শায়খ ফরিদুদ্দীন শক্করগঞ্জের চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচারের ব্যাপারেও কিংবদন্তির আশ্রয় নিতে হয়। চট্টগ্রাম শহর থেকে এক মাইল উত্তরে সুলুক বাহারের পার্বত্য টিলায় 'শায়খ ফরিদের চশমা' নামে একটি ঝরনা দেখা যায়। প্রচলিত প্রবাদ অনুযায়ী শায়খ ফরিদুদ্দীনের সাথে এ ঝরনাটি সম্পর্কিত। সাধারণ মানুষেরা এ শায়খ ফরিদুদ্দীন সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলতে পারে না। তবে শিক্ষিত সমাজ তাঁকে পারস্যের শায়খ ফরিদুদ্দীন আত্তার বলে দাবি করেন। কিন্তু এ দাবির পেছনে কোনো যৌক্তিকতা ও ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমাণ নেই। বরং স্থানীয়ভাবে যে লোকগীতির প্রচলন আছে তা থেকে তাঁকে পাঞ্জাবের শায়খ ফরিদুদ্দীন শক্করগঞ্জ বলে মনে করা যেতে পারে। তবে এ কথা সত্য যে, ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে শায়খ ফরিদুদ্দীন শক্করগঞ্জ চট্টগ্রামে এসেছিলেন এবং এখানে কিছুদিন অবস্থান করে ইসলাম প্রচার করেছিলেন। ফরিদপুর জেলার কিছু এলাকার জনশ্রুতি থেকের জানা যায় যে, শায়খ ফরিদের নামানুসারেই ফরিদপুর জেলা ও শহরের নামকরণ হয়েছে। তিনি এক সময় এ জেলা পরিভ্রমণ করেন এবং এখানে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার করেন।[১০৯]

এসব ঘটনা থেকে অনুমান করা যায়, হযরত শায়খ ফরিদুদ্দীন শক্করগঞ্জ এক সময় পূর্ববঙ্গে এসেছিলেন এবং ফরিদপুর থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত এলাকায় ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

---

১০৬. ইবনে বতুতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩
১০৭. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০
১০৮. ড. এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮-২৩৯
১০৯. ড. আবদুল করীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

৩য় পরিচ্ছেদ
ইসলাম প্রচারের দ্বিতীয় পর্যায়

ইসলাম প্রচারের দ্বিতীয় পর্যায় ত্রয়োদশ শতকের দ্বীতিয় পাদ থেকে শুরু হয় এবং চতুর্দশ শতকের শেষ অবধি এ ধারা অব্যাহত থাকে। ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্যায়ে সূফী ও দরবেশগণকে যেমন বহুতর বাঁধার মোকাবিলা করতে হয়, অত্যাচার, জুলম ও নিপীড়নের মুখে পাহাড় প্রমাণ অবিচলতা নিয়ে এগিয়ে যেতে হয়, স্থানীয় রাজশক্তির কোপানলে পড়ে কোথাও প্রকাশ্য জিহাদে অবতীর্ণ হয়ে শাহাদাত বরণ করতে হয়, ইসলাম প্রচারের দ্বীতিয় পর্যায়েও ঠিক তেমনি এ ধারাগুলোর সবই অপরিবর্তিত থাকে। তবে সকল প্রকার বিরোধিতার তীব্রতা অনেকাংশে হ্রাস পায়। এ সঙ্গে আর একটি আনুকূল্যও এ প্রচারকগণ লাভ করেন। তা হচ্ছে রাজশক্তির সহায়তা। সর্বক্ষেত্রে এ সহায়তা সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য না হলেও একটা অঘোষিত সহায়তা অবশ্যই তাঁরা লাভ করেছেন। এ পর্যায়ে (২য় পর্যায়ে) যাঁদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন–

১. শাহ তুর্কান শহীদ,
২. শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরী,
৩. উলুগ-ই-আজম হুমায়ুন জাফর খাঁ গাজী,
৪. পীর বদরুদ্দীন,
৫. সাইয়েদ আব্বাস আলী মাক্কী ও রওশন আরা,
৬. শাহ বদরুদ্দীন আল্লামা,
৭. কাত্তাল পীর,
৮. শাহজালাল মুজাররাদ,
৯. সাইয়েদ আহমদ কল্লা শহীদ,
১০. শরীফ শাহ,
১১. সাইয়েদ নাসিরুদ্দীন শাহ নেকমর্দান,
১২. শাহ মালেক ইয়ামানী,
১৩. সাইয়েদ হাফেজ মাওলানা আহমদ তান্নুরী,
১৪. রাসতি শাহ,
১৫. শাহ মুহাম্মদ বাগদাদী,
১৬. সাইয়েদুল আরেফীন,
১৭. শাহ লঙ্গর,
১৮. শাহ মুহসিন আউলিয়া।

শাহ তুর্কান শহীদ

দ্বিতীয় পর্যায়ে ইসলাম প্রচারের আলোচনা প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম শাহ তুর্কান শহীদের কথা উল্লেখ করা যায়। উত্তরবঙ্গের বগুড়া জেলায় তিনি নিজের ক্ষেত্র স্থাপন করেন। মুসলিম শসন প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগে তিনি এ দেশে আগমন করেন। উইলিয়াম হান্টারও এ সময়ে বগুড়া জেলার জনৈক তুর্কান শহীদের নাম উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত তখন উত্তরবঙ্গের সর্বত্র মুসলিম রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বগুড়া অঞ্চলে তখনও প্রতাপশালী হিন্দু রাজা রাজত্ব করতেন। ইসলাম প্রচারের জন্য অমুসলিম রাজার বিরুদ্ধে জিহাদ করে তাঁকে শাহাদাত বরণ করতে হয়। কিংবদন্তি থেকে অবশ্য সে অমুসলিম রাজার কোনো সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়নি। তবে করতোয়া নদীর অদূরে শেরপুরে তাঁর (তুর্কান শহীদ) দুটি সমাধি দেখা যায়। কথিত আছে, হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে জিহাদের সময় তাঁর দেহ দ্বিখন্ডিত হয়। তাঁর শির একস্থানে গিয়ে পড়ে এবং দেহ অন্য স্থানে পড়ে। শির যেস্থানে দাফন করা হয় তাকে বলা হয় 'ধড় মোকাম'।[১১০] এভাবে নিজের জীবন দান করে তিনি ইসলাম প্রচারের পত প্রশস্থ করে গিয়েছেন।

---

১১০. Sir Zadhunath Sarkar, History of Bengal (Kalkatta: National Library, 1972), p. 68

শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরী

নাম শরফুদ্দীন। পিতার নাম ইয়াহইয়া। বিহারের মানের শহরের অধিবাসী। পিতা শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরী বিহারের একজন বিখ্যাত আলিম। ১২৬৩ সালে শায়খ শরফুদ্দীন জন্মগ্রহণ করেন। বাল্য কালেই উচ্চ ইসলামী শিক্ষায় পারদর্শিতা লাভ করে তিনি বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দেন। একদিন ঘটনাক্রমে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ আলিম ও পন্ডিত শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামাহ্ দিল্লী থেকে বাংলায় আগমন পথে তাঁদের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। শাগরিদ তাঁর ওস্তাদ নির্বাচন করে নিলেন। শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামাহ্র সাথে শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরীও বিদ্যার্জন ও জ্ঞানানুশীলনের জন্য সুদূর বাংলার সোনারগাঁওয়ে চলে আসলেন। সোনারগাঁওয়ে অধ্যয়ন ও চিন্তা-গবেষণায় তিনি এত তন্ময় থাকতেন যে, বাড়ীর চিঠি-পত্র পর্যন্ত পড়বার অবসর পেতেন না। শিক্ষা শেষ হবার পর তিনি এতদিনকার সযত্নে রক্ষিত চিঠিগুলো খুলে পড়তে শুরু করলে একটির মধ্যে পিতার মৃত্যু সংবাদ পেলেন। দীর্ঘ পনের বছর পর্যন্ত ওস্তাদ আবূ তাওয়ামাহ্র কাছ থেকে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভের পর তিনি শিক্ষা জীবন শেষ করলেন। ওস্তাদ-ছাত্রের সম্পর্ক অন্তরঙ্গ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। ওস্তাদ ছাত্রের মধ্যে নিজের ভবিষ্যত স্বপ্নের রূপায়ণ দেখে ছিলেন। তাই তিনি নিজের কন্যার সাথে তাঁকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করলেন।

শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরী ছিলেন তৎকালীন বাংলার শ্রেষ্ঠ ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্রের উজ্জ্বলতম রত্ন। অচিরেই তাঁর জ্ঞান ও পান্ডিত্বের কথা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ওস্তাদ ও ছাত্র উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সাধনায় সোনারগাঁওয়ের ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্রটি বাংলার মুসলমানদের ইসলামী জীবন ধারায় শ্রেষ্ঠতম অবদান রাখতে সক্ষম হয়। কিন্তু জন্মভূমির আহবানে ১২৯৩ সালে তাঁকে সোনারগাঁও ত্যাগ করতে হয় এবং ওস্তাদের অনুমতি নিয়ে তিনি মানেরে প্রত্যাবর্তন করেন। বিহারে ফিরে গিয়ে তিনি ইসলাম প্রচার ও ইসলামী শিক্ষাদানে ব্রতী হন। তাঁর পান্ডিত্য ও ইসলামী চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে অমুসলিমরা দলে দলে এসে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিল।[১১১]

শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরী রচিত বহু মূল্যবান গ্রন্থ তাঁর গভীর বিদ্যাবত্তা ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পরিচয় বহন করে।

উলুগ-ই-আজম হুমায়ুন জাফর খাঁ গাজী

লাখনৌতি ও সাতগাঁও রাজ্যে অর্থাৎ উত্তর ও পশ্চিম-দক্ষিণ বঙ্গে ইসলাম প্রচরের সাথে যে মুজাহিদের নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তিনি হচ্ছেন উলুগ-ই-আজম হুমায়ুন জাফর খাঁ গাজী। সম্ভবত তিনি লাখনৌতির সুলতান রুকনুদ্দীন কাইকাউসের অধীনে সেনাপতি ছিলেন। সুলতানের নির্দেশে তিনি বহুস্থানে অভিযান চালিয়ে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন। বরেন্দ্র ভূমিতে ইসলাম প্রচারের প্রাচীনতম প্রামাণ্য নিদর্শন হচ্ছে একটি পুরাতন মসজিদ। দিনাজপুর জেলার দেবীকোট নামক স্থানের এ মসজিদটি বর্তমানে অবলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু এর শিলালিপিটি অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। শিলালিপি থেকে জানা যায়, উলুগ-ই-আজম হুমায়ুন জাফর খাঁ বাহরাম ইৎসীনের আদেশে মুলতানবাসী মালিক জিওন্দ কর্তৃক ১২৯৭ খুস্টাব্দের ১৯ অক্টোবর মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল। শিলালিপি থেকে বুঝা যায় যে, মালিক জিওন্দ মুলতানবাসী একজন কারিগর মাত্র। কিন্তু মসজিদ নির্মাণের আদেশ দানকারী উলুগ-ই-আজম জাফর খাঁ নিশ্চয়ই কোনো কারিগর ছিলেন না।

ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত ‘বাংলাদেশের ইতিহাস’-এ অধ্যাপক শ্রী সুখময় মুখপাধ্যায় এ জাফর খাঁকে প্রাচীন কিংবদন্তি অনুসারে লাখনৌতির সুলতান রুকনুদ্দীন কাইকাউসের অধীনস্থ একজন রাজপুরুষ বলে ধারণা পোষণ করেছেন। তবে তিনি মত প্রকাশ করেছেন যে, শিলালিপির সাক্ষ্যের সাথে কিংবদন্তির সাক্ষ্য মিলালে দেখা যায় পরবর্তী সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের আমলেই সাতগাঁও সর্বপ্রথম মুসলিম শক্তি কর্তৃক বিজিত হয়। সম্ভবত সুলতান রুকনুদ্দীন কাইকাউসের আমলে এ অভিযান শুরু হয় এবং এ বিজয় সম্পন্ন হয় শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের আমলে। ইতিপূর্বে সুলতান রুকনুদ্দীন কাইকাউসের নির্দেশে জাফর খাঁ গাজী ত্রিবেনী বিজয় করেন। ত্রিবেনীতে জাফর খাঁ গাজীর মাযারে যে শিলালিপি সংরক্ষিত রয়েছে তা থেকে জানা যায় যে, ত্রিবেনী

১১১. গোলাম আহমদ মোর্তাজা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১

বিজয়ের পূর্বে তিনি মান-নৃপতি নামক জনৈক হিন্দু রাজাকে পরাজিত করে ইসলামে দীক্ষিত করেন। এ ‘মান-নৃপতি’ দিনাজপুরের দেবীকোট অঞ্চলের এমন এক সামন্ত রাজা, যাকে পরাজিত করে বিজয়ের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তিনি ঐ অঞ্চলে পূর্বোল্লিখিত মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন। মনে হয় বরেন্দ্র অঞ্চলে ইসলামের বিজয় অভিযান পরিচালনা কালেই তিনি দক্ষিণে ত্রিবেনীতে রাজা ভূদেবের অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী শোনেন। অতঃপর তাকে শায়েস্তা করার জন্য তিনি ত্রিবেনীতে অভিযান পরিচালনা করেন।[১১২]

হুগলীর পন্ডুয়ায় জাফর খাঁ প্রতিষ্ঠিত একটি সুউচ্চ মিনার আজও সগৌরবে এতদঞ্চলে ইসলামের বিজয়বার্তা ঘোষণা করে যাচ্ছে। ত্রিবেনী বিজয়ের পর এ মিনারটি তিনি নির্মাণ করেন। ১২৯৮ খৃস্টাব্দে তিনি ত্রিবেনীতে (হুগলীর পন্ডুয়া) একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এ মসজিদের শিলালিপিতে জাফর খাঁ গাজীর পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– “তিনি প্রতি অভিযানে ভারতের বিভিন্ন নগর জয় করেন এবং তাঁর সুতীক্ষ্ণ তরবারী ও বর্শার আঘাতে পাষাণ হৃদয় বিধর্মীদের ধ্বংস করেন।” মসজিদ ছাড়াও ত্রিবেনীতে তাঁর দারুল খয়রাত নামে একটি মাদ্রাসা নির্মাণের প্রমাণও পাওয়া যায়। মাদ্রাসা গাত্রে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে তাঁকে “নাসেরুল ইসলাম-ওয়া-শিহাবুল হক্‌কে ওয়াদ্দীন” বলা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি ছিলেন ইসলামের সাহায্যকারী এবং সত্য, ন্যায় ও দীনের উল্কা স্বরূপ।[১১৩]

বস্তুত এ সব থেকে একটি কথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে যায়। তা হচ্ছে এই যে, ইসলামের বিজয়, ইসলাম প্রচার ও ইসলমের প্রতিষ্ঠা তাঁর জীবনের একটি প্রধানতম লক্ষ্য ছিল। এ লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য তিনি বলিষ্ঠ হস্তে তরবারি ধারণ করেছিলেন। তিনি মূলত ছিলেন ইসলামেরই মুজাহিদ। উত্তর ও পশ্চিম-দক্ষিণ বঙ্গে এ অসম সাহসী মুজাহিদ ইসলাম প্রচারের পথে বাঁধাসমূহ অপসারিত করে ইসলামের অগ্রগতির পথ সুগম করেন।

উলুগ-ই-আজম জাফর খাঁ গাজী ১৩১৩ খৃ. ত্রিবেনীতে ইন্তিকাল করেন। সেখানকার একটি প্রস্তর নির্মীত দেবালয়ে তাঁকে সমাহিত করা হয়। বড় খান গাজী ও উগ্ওয়ান খান নামক তাঁর দু’পুত্রও ছিল। তাঁর এক পুত্র রাজা ভূদেবের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁর কবরের পাশে তাঁর এ দু’পুত্রের কবরও রয়েছে।

পীর বদরুদ্দীন

জাফর খাঁ গাজীর সমসাময়িক কালে দিনাজপুর জেলায় হেমতাবাদ নামক স্থানে পীর বদরুদ্দীন নামক সূফী-দরবেশ তাঁর কতিপয় সঙ্গী-সাগরিদসহ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগমন করেন। তাঁর কর্ম-তৎপরতায় স্থানীয় বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ ইসলাম গ্রহণ করে। প্রচলিত স্থানীয় জনশ্রুতি থেকে জানা যায় যে, পীর বদরুদ্দীনের ব্যাপক সাফল্যে রুষ্ট হয়ে স্থানীয় হিন্দু সামন্ত রাজা মহেশ তাঁর ও তাঁর দলবলের উপর অত্যাচার চালাতে থাকেন। ফলে দরবেশ গৌড়ের সুলতানের সাহায্য প্রার্থনা করেন, গৌড়ের সেনাবাহিনীর সহায়তায় যুদ্ধে রাজাকে পরাজিত ও নিহত করে তিনি রাজপ্রাসাদ অধিকার করেন।

মৃত্যুর পর এ রাজপ্রাসাদের মধ্যেই তাঁর দেহ সমাধিস্থ করা হয়। রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ থেকে সংগৃহীত প্রস্তররাজির সাহায্যে তাঁর সমাধী নির্মীত হয়েছে দেখা যায়। মাখদুম গরীবুল ইসলাম তাঁর প্রধানতম শিষ্য ছিলেন। তাঁর কবরের পাশে তাঁর প্রধান প্রধান শিষ্যগণও কবরস্থ হন। পীর বদরুদ্দীনের মাযারে একটি সুন্দর মসজিদও নির্মীত হয়।[১১৪]

সাইয়েদ আব্বাস আলী মাক্কী ও রওশন আরা

বাংলার দক্ষিণাংশে বিশেষ করে চব্বিশ পরগণা ও খুলনা অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের সাথে যে দু’জন মহান সাধক মুজাহিদের নাম বিশেষভাবে জড়িত তাঁরা হচ্ছেন সাইয়েদ আব্বাস আলী মাক্কী ও তাঁর ভগ্নী রওশন আরা। বর্তমান চব্বিশ পরগণা জেলার বশিরহাট মহকুমায় মুসলমানদের একক সংখ্যাগরিষ্টতা তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সাধনার ফল বলা যেতে পারে। বশিরহাট মহকুমার হাড়োয়া নামক গ্রামে সাইয়েদ আব্বাস আলী মাক্কীর

১১২. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭
১১৩. আবদুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩
১১৪. জুলফিকার আলী কিসমতী, *বাংলাদেশের সংগ্রামী ওলামা পীর মাশায়েখ* (কলকাতাঃ মুজাদ্দেদীয়া লাইব্রেরী, ২০০৬ খ্রী.), পৃ. ৫৭

মাযার অবস্থিত। সাধারণ্যে তিনি পীর গোরাচাঁদ নামে পরিচিত। ১২৬৫ খৃ. মক্কা নগরে তাঁর জন্ম হয়। দিল্লীর বাদশাহ গিয়াসুদ্দীন তোগলকের রাজত্বকালে ১৩২১ খৃ. তিনি দিল্লীতে পদার্পণ করেন। বাংলাদেশে বিদ্রোহ দমনার্থে বাদশাহ যখন দিল্লী থেকে অভিযান শুরু করেন তখন তিনি বাদশাহ্র সঙ্গে ১৩২৪ খৃ. বাংলায় আগমন করেন। বিদ্রোহ দমন করে বাদশাহ লাখনৌতিতে দরবার করেন এবং পর বছর ১৩২৫ খৃ. দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু সাইয়েদ মাক্কী বাদশাহ্র সাথে দিল্লীতে ফিরে না গিয়ে বাংলায় অবস্থান করেন। লাখনৌতি থেকে সাতগাঁও রাজ্যে চলে অসেন এবং এখানে ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

জনশ্রুতি থেকে জানা যায়, সাইয়েদ আব্বাস আলী মাক্কী যখন চব্বিশ পরগণা অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন, তখন স্থানীয় শক্তিশালী হিন্দু সামন্ত রাজা চন্দ্রকেতুর সাথে তাঁর সংঘর্ষ হয়। এ সংঘর্ষে তিনি তৎকালীন মুসলিম শাসনকর্তার (সাতগাঁও-এর তৎকালীন গভর্নর মালিক ইজ্জুদ্দীন ইয়াহইয়া) সহায়তায় রাজা চন্দ্রকেতুকে পরাজিত ও নিহত করতে সমর্থ হন। অতঃপর অক্ষয়ানন্দ ও বকানন্দ নামক আরো দু'জন হিন্দু সামন্তের সাথে বিরোধ বাঁধে। বকানন্দ তাঁর হাতে নিহত হলেও তিনি নিজে যুদ্ধে আহত হন। আহত অবস্থায় হাড়োয়ায় প্রত্যাবর্তন করে তিনি মৃত্যুবরণ করে বলে জানা যায়।[১১৫]

সাইয়েদ আব্বাস আলী মাক্কীর ভগ্নী রওশন আরা একজন বিদূষী মহিলা ছিলেন। মক্কা নগরে ১২৭৯ খৃস্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। তিনি ভ্রাতা আব্বাস আলীর সাথে প্রথমে দিল্লী ও পরে বাংলায় আগমন করেন। চব্বিশ পরগণার তারাগুনিয়া গ্রামে অবস্থান করে তিনি ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন বলে জানা যায়। ১২৪২ খৃস্টাব্দে ৬৪ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর পারিবারিক জীবন ও সন্তানাদি সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য জানা যায় না।[১১৬]

শাহ বদরুদ্দীন আল্লামা

নদী প্রধান এ বাংলাদেশে শাহ বদর বা বদর পীরের প্রভাব যে কত বেশি তা বিশেষ করে দক্ষিণ ও পূর্ব বাংলার নদীপথে ভ্রমণ করলে সহজেই উপলব্ধি করা যায়। মুসলমান-হিন্দু নির্বিশেষে আজও বাংলার মাঝি-মাল্লারা নৌকা ছাড়ার পূর্বে বদর পীরের নাম উচ্চারণ করে থাকে। এ বদর পীর হচ্ছেন চট্টগ্রামের শাহ বদরুদ্দীন আল্লামা। চট্টগ্রাম শহরের মধ্যস্থলে বখশী বাজার মার্কেটের দক্ষিণে তাঁর মাযার অবস্থিত। শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরীর একটি পত্রের কারণে শাহ বদরুদ্দীন আল্লামা সম্পর্কে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। এ কারণে কেউ কেউ তাঁকে বিহারের অধিবাসী এবং তিনি বিহারে ইন্তিকাল করেছেন বলে মনে করেন। কিন্তু আসলে তা ঠিক নয়। শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরীর পত্রে যে শাহ বদরুদ্দীনের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর পূর্ণ নাম হচ্ছে শাহ মাখদুম বদরুদ্দীন বদরে আলম জাহেদী। তিনি পঞ্চদশ শতকের লোক। তিনি কিছুদিন মাত্র চট্টগ্রামে অবস্থান করেছিলেন। অতঃপর বিহারে প্রত্যাবর্তন করে ১৪৪০ খৃস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। অথচ এখানে অলোচ্য শাহ বদরুদ্দীন আল্লামা ১৩৪০ খৃস্টাব্দে মুসলমানগণ কর্তৃক সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম বিজয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

প্রচলিত জনশ্রুতি থেকে জানা যায়, পীর বদর যখন চট্টগ্রামে আস্তানা গাড়েন তখন চট্টগ্রামে জিন-পরীদের বাসস্থান ছিল। তাদের অত্যাচারে মানুষের জীবন যাপন দুরূহ হয়ে উঠেছিল। এমনি সময়ে একদিন পীর বদর সমুদ্রপথে চট্টগ্রাম অবতরণ করেন। তিনি চট্টগ্রামবাসীদেরকে জিন-পরীদের দৌরাত্ম থেকে মুক্তি দেন। এ কিংবদন্তির পেছনে যেটুকু সত্য নিহিত রয়েছে তা হচ্ছে এ যে, চট্টগ্রাম তৎকালে মগ-দস্যুদের কেন্দ্রস্থল ছিল এবং বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের আমলে (১৩৩৮-১৩৫০ খৃ.) তার সেনাপতি কদল খান গাজীর সহায়তায় শাহ বদরুদ্দীন আল্লামা ওরফে বদর পীর ও তাঁর সহচরগণ মগদেরকে পরাজিত ও বিতাড়িত করে চট্টগ্রামে মুসলিম শাসনের সূচনা করেন।

কাত্তাল পীর

১১৫. গোলাম আহমদ মোর্তাজা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩
১১৬. আবদুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

চট্টগ্রাম শহরের উত্তর দিকে এ দরবেশের মাযার অবস্থিত। স্থানীয় জনগণের মধ্যে তিনি কাতাল পীর নামে পরিচিত। জনশ্রুতি থেকে জানা যায় যে, তিনি শাহ বদরের সঙ্গী ছিলেন। তাঁর আসল নাম জানা যায় না। সম্ভবত মগদের সাথে যুদ্ধে অসীম বীরত্বের কারণে তিনি কাত্তাল উপাধি লাভ করেন। কারণ আরবীতে 'কাত্তাল' বলতে সাধারণত দুর্দান্ত ও অসম সাহসী যোদ্ধাই বোঝায়, যিনি অসংখ্য শত্রু নিপাত করেন। আর 'কাত্তাল' শব্দটিই মূলত যুদ্ধ, জিহাদ ও হত্যা অর্থে ব্যবহৃত হয়। কাজেই কাত্তাল শব্দটি যে পরবর্তী কালে 'কাতালে' পরিণত হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই।[১১৭]

শাহ বদরের সমসাময়িক আরো কয়েকজন দরবেশের কবর চট্টগ্রামের চন্দনপুরা মহল্লার একটি টিলার উপর অবস্থিত। তাঁদের নাম হচ্ছে, শাহ মোল্লা মিসকিন, শাহ নূর, শাহ আশরাফ, কাবুলী শাহ, বান্দারিয়া শাহ ও শাহ মুবারক আলী। শাহ বদরের আগমনের কয়েক বছর পর শাহ মোল্লা মিসকিনের নেতৃত্বে এ দরবেশগণ চট্টগ্রামে আগমন করেন বলে জানা যায়। তাঁদের মাযারের সন্নিকটে প্রাক-মোগল আমলের একটি মসজিদ দেখা যায়। সম্ভবত বাংলার মুসলিম সুলতানদের মধ্য থেকে কেউ তা নির্মাণ করে থাকবেন।

শাহজালাল মুজাররাদ

পূর্ববঙ্গে ও আসামের পশ্চিমাংশে ইসলাম প্রচারে শাহ জালাল মুজাররাদের দান অতুলনীয়। সমকালীন পর্যটক ইবনে বতুতা লিখেছেন, তাঁর হাতে এ দেশের অধিকাংশ লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে।[১১৮] বস্তুত সিলেট, মোমেনশাহী, ত্রিপুরা, নোয়াখালী ও আসামের পশ্চিমাংশের বিভিন্ন জেলার অধিকাংশ লোক যে তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছে এতে সন্দেহ নেই। এ জেলাসমূহের অধিবাসীদের উপর আজও তাঁর অপ্রতিহত প্রভাব এ কথাই প্রমাণ করে। সিলেট শহরে তাঁর মাযার অবস্থিত। ১৩০৩ খৃ. তিনি সিলেট আগমন করেন। এর কয়েক বছর আগে তিনি গৌড়ে আগমন করেন।

তাঁর জন্মস্থান সম্পর্কে যথেষ্ঠ মতবিরোধ দেখা যায়। সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের আমলে (১৪৯৩-১৫১৯ খৃ.) উৎকীর্ণ দু'খানা শিলালিপি থেকে তাঁর সম্পর্কে জানা যায় যে, সেখানে 'শায়খ জালাল মুজাররাদ ইবনে মুহাম্মদ' নামে তাঁকে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে শায়খ শাহ জালালের পিতার নাম পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর জন্মস্থানের নাম পাওয়া যায় না। ১৫০৫ খৃস্টাব্দে উৎকীর্ণ হোসেন শাহের আমলের তৃতীয় একটি শিলালিপিতে তাঁর সম্পর্কে আরো কিছু অতিরিক্ত তথ্য পাওয়া যায়। জেমস ওয়াইজ শিলালিপিটি আবিষ্কার করেন এবং হেনরী ব্লকম্যান কর্তৃক তা প্রকাশিত হয়। তাতে শাহ জালাল সম্পর্কে বলা হয়েছে, "উচ্চতম মর্যাদা সম্পন্ন ও শ্রেষ্ঠতম আবেদ শাহ জালাল মুজাররাদ কুনয়ায়ী।"[১১৯]

এ বিবরণ থেকে জানা যায় যে, তিনি কুনিয়ার অধিবাসী ছিলেন। কুনিয়া তুরস্কের অধীনস্থ এশিয়া মাইনরে অবস্থিত ছিল। গওস মান্দুরী তাঁর 'গুলজার-ই-আবরার' গ্রন্থে শাহ জালাল সম্পর্কে যে বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন তাও এ বিবরণের সমর্থন করে। গওস মান্দুরী শায়খ আলী শেরের 'শারহ-ই-নুজহাতুল আরওয়াহ' গ্রন্থের ভূমিকা অবলম্বনে শাহ জালাল সম্পর্কে তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করেছেন। শায়খ আলী শের নিজেকে হযরত শাহ জালালের সাথী ও শিষ্য শায়খ নুরুল হুদা আবুল কেরামতের বংশধর বলে দাবি করেন। তাঁর বর্ণনা মতে, শাহ জালাল তুর্কীস্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি সাইয়েদ আহমদ ইয়েসবীর খলীফা ছিলেন। এখানে শাহ জালালের জন্মস্থানের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা তৃতীয় শিলালিপির বর্ণনার সাথে অনেকাংশে মিলে যায়। কারণ শিলালিপিতে উল্লেখিত কুনিয়া এশিয়া মাইনরে অবস্থিত। এশিয়া মাইনর তুর্কীদের অধীনস্থ থাকায় সম্ভবত গওস মান্দুরী একে তুর্কীস্তান মনে করেছেন। 'সুহাইল-ই-ইয়ামান' নামক হযরত শাহ জালাল সম্পর্কিত ফার্সী ভাষায় লিখিত অপর একটি জীবনী গ্রন্থে তাঁকে ইয়ামানের অধিবাসী বলা হয়েছে। 'গুলজার-ই-আবরার' ও 'সুহাইল-ই-ইয়ামান'-এর বর্ণনামতে হযরত শাহ জালাল সারা তুর্কীস্তান ভ্রমণ করেন এবং ইয়ামান, বাগদাদ ইত্যাদি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাসমূহ ভ্রমণ শেষে দিল্লীতে এসে পৌঁছেন। সেখানে নিজামুদ্দীন আউলিয়ার (১২৩৬-১৩২৫ খৃ.) কাছে কিছুদিন অবস্থান করার পর বাংলা অভিমুখে যাত্রা করেন।

১১৭. জুলফিকার আলী কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩
১১৮. ইবনে বতুতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৩
১১৯. আবদুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

তিনি যখন বাংলায় প্রবেশ করেন তখন এখানে ছিল সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের (১৩০১-১৩২২) খৃ.) আমল। সম্ভবত তিনি তখন গৌড়ে অবস্থান করে গৌড় রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ইসলাম প্রচারের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁর সিলেট বিজয় সম্পর্কে 'গুলজার-ই-আবরার' ও 'সুহাইল-ই-ইয়ামান' গ্রন্থদ্বয় একমত। এ উভয় গ্রন্থে সিলেটের রাজা গৌর গোবিন্দের সাথে তাঁর যুদ্ধের কথা উল্লেখিত হয়েছে। শাহ জালালের সিলেট আগমন সম্পর্কে সুহাইল-ই-ইয়ামানের নিম্নোক্ত বিবরণ পাওয়া যায়। শায়খ বুরহানুদ্দীন নামক একজন মুসলমান সিলেটে বাস করতেন। পুত্র সন্তানের জন্ম উপলক্ষ্যে তিনি একটি গরু কোরবানী করেন। এ কথা জানতে পেরে রাজা গৌর গোবিন্দ গো-হত্যার শাস্তিস্বরূপ তাঁর দক্ষিণ হস্ত ছেদন করার ও নবজাত সন্তানটিকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। রাজার আদেশ কার্যকরী হবার পর শাস্তিপ্রাপ্ত মজলুম বোরহানুদ্দীন গৌড়ের সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের দরবারে উপনীত হয়ে এ অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য ফরিয়াদ জানান। সুলতান তাঁর ভাগিনেয় সিকান্দার খানকে সিলেট আক্রমণ করার আদেশ দেন। সিকান্দার খান সেনাবাহিনী নিয়ে সিলেট আক্রমণ করলে রাজা গৌর গোবিন্দের হাতে পরাজয় বরণ করেন। সুলতান তাঁর ভাগিনেয়ের পরাজয়ের খবর শুনে সাতগাঁও-এর গভর্নর নাসিরুদ্দীনকে সিকান্দার খানের সাহায্যার্থে গমনের নির্দেশ দেন। হযরত শাহ জালাল তাঁর ৩৬০ জন শিষ্যসহ তৎকালে সাতগাঁও অঞ্চলে মুশরিক বিধর্মীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে ইসলাম প্রচারের কাজে রত ছিলেন। সিলেটে মুসলিম নির্যাতনের ঘটনা শুনে তিনি তাঁর ৩৬০ জন শিষ্য সমভিব্যাহারে ত্রিবেনী নামক স্থানে সিকান্দার খানের সাথে যোগ দেন।

এবারের যুদ্ধে রাজা গৌর গোবিন্দ শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করেন এবং তিনি আসামের পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করেন। মুসলমানরা সিলেট জয় করে তাকে গৌড়ের আঙ্গীভূত করে। ১৫১২ খৃস্টাব্দে উৎকীর্ণ একটি শিলালিপিতে এ বিজয়বার্তা সুন্দরভাবে উল্লিখিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, "শায়খুল মাশায়েখ মাখদুম শায়খ জালাল মুজাররাদ ইবনে মুহাম্মদের অনুকম্পায় শ্রীহট্ট শহর ও পাশ্ববর্তী এলাকায় ইসলামের প্রথম বিজয় সম্পন্ন হয় সিকান্দার খান গাজীর হাতে এবং সুলতান ফিরোজ শাহ দেহলবীর শাসনামলে ১৩০৩ খৃস্টাব্দে।"[১২০]

এ শিলালিপি থেকে জানা যায়, সর্বপ্রথম ১৩০৩ খৃ. সিকান্দার খান গাজীর হাতে হযরত শাহ জালালের সহযোগিতায় সিলেট বিজিত হয় এবং তখন ছিল ফিরোজ শাহ দেহলবীর শাসনামল। প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে দেখা যায়, রাজা গৌর গোবিন্দের কাছ থেকে সুলতান শামসুদ্দীন সিলেট জয় করেন। আবার সুহাইল-ই-ইয়ামানে বলা হয়েছে, সুলতান সিকান্দার তাঁর মাতুল গৌড়ের সুলতানের নির্দেশে সিলেট জয় করেন।

এ থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, শিলালিপিতে উল্লিখিত ফিরোজ শাহ দেহলবী গৌড়ের সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ ছাড়া আর কেউ নন। তিনি ১৩০১ থেকে ১৩২২ খৃ.পর্যন্ত গৌড়ে রাজত্ব করেন। তিনি ছিলেন দিল্লীর সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবনের প্রপৌত্র। সম্ভবত দিল্লীর রাজবংশের অন্তভূক্ত হবার কারণে তাঁকে 'দেহলবী' বলা হয়েছে। অন্যদিকে শিলালিপিতে উল্লিখিত সিকান্দার খান গাজী ও সুহাইল-ই-ইয়ামানের সুলতান সিকান্দার অভিন্ন। গৌড়ের সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের নির্দেশে তাঁর ভাগিনেয় সিকান্দার খান হযরত শাহ জালাল ও তাঁর ৩৬০ জন সহচর দরবেশ দলের সহযোগিতায় ১৩০৩ খৃ. সিলেট জয় করেন।

সিলেট বিজিত হবার পর শাহ জালাল সেখানেই নিজের কেন্দ্র স্থাপন করেন। তাঁর শিষ্যদলের একাংশ গৌড়ীর সেনাদলের সাথে গৌড়ে ফিরে যান। তাঁরা বাংলার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। অবশিষ্টাংশ তাঁর সঙ্গে অবস্থান করতে থাকেন। তাঁদের সহায়তায় তিনি সিলেট, তার চতুর্পাশ্বস্থ জেলাসমূহ ও আসামে ইসলাম প্রচারের ব্যাপক অভিযান চালান। ফলে বাংলা ও আসামের অগণিত মানুষ তাঁর ও তাঁর সহচরদের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

সাইয়েদ আহমদ কল্লা শহীদ

কুমিল্লা জেলার আখাউড়া রেল-স্টেশনের নিকটবর্তী খড়মপুর গ্রামে হযরত সাইয়েদ আহমদ কল্লা শহীদের মাযার অবস্থিত। নোয়াখালী জেলার শসদিয়া রেল-স্টেশনের কাছে এ দরবেশের একটি আস্তানা রয়েছে। এ থেকে অনুমান কর যায় যে, নোয়াখালী ও কুমিল্লা উভয় জেলায়ই ছিল এ দরবেশের কর্মক্ষেত্র। তিনি এক যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করার পর কেবলমাত্র তাঁর মস্তকটি সমাধিস্থ করা হয় বলেই তাঁকে কল্লা শহীদ বলা হয়।

---

১২০. Journal of Asiatic Society of Bengal, 1992, পৃ. ৪১৩, উদ্ধৃত: আবদুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

তিনি ছিলেন সিলেটের হযরত শাহ জালালের অন্যতম শিষ্য। শাহ জালাল সিলেট জয়ের পর তাঁর শিষ্যদের ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব দিয়ে বাংলা ও আসামের বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে তরফপুর পরগণায় ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব অর্পিত হয় সাইয়েদ নাসিরুদ্দীনের নেতৃত্বে এগারোজন শিষ্যের উপর। এ দলে ছিলেন সাইয়েদ আহমদ। তাঁর মাথার চুল লম্বা ছিল বলে তাঁকে 'গেছু-দারাজ' বলা হতো।[১২১]

সাইয়েদ আহমদ কল্লা শহীদ ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে অমুসলিমদের পক্ষ থেকে বহু বাঁধার সম্মুখীন হন, এমন কি এক পর্যায়ে তাঁকে বিরুদ্ধবাদীদের সাথে যুদ্ধ করতে হয়। তরফের হিন্দু সামন্ত রাজা আচক নারায়ণের সাথে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে মুসলিম পক্ষে সাইয়েদ নাসিরুদ্দীন নেতৃত্ব দেন। যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয়ী হলেও সাইয়েদ আহমদ শহীদ হন। তাঁর এক ভক্ত তাঁর কর্তিত মস্তকের সন্ধান পান এবং তিনি এ স্থান থেকে পনের-ষোল মাইল দুরবর্তী খড়মপুরে এনে তা সমাধিস্থ করেন। খড়মপুর গ্রামের অধিবাসীদেরকে তিনি ইসলামে দীক্ষিত করেন বলে জনশ্রুতিতে জানা যায়।

শরীফ শাহ

কলকাতার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত ক্যানিং শহরের সন্নিকটে ঘুটিয়ার শরীফে শরীফ শাহ দরবেশের মাযার অবস্থিত। এ অঞ্চলে প্রচলিত জনশ্রুতি থেকে জানা যায় যে, সুন্দরবন এলাকায় ইসলাম প্রচারে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর আগমনের সময়কাল সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য জানা না গেলেও সাইয়েদ আব্বাস আলী মাক্কীর সময়ের বা তাঁর পরপরই তিনি এখানে আগমন করেছিলেন বলে জানা যায়। এ অঞ্চলে ইসলাম যেভাবে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে তাতে মনে হয় বিভিন্ন সময় এ এলাকায় বিভিন্ন ইসলাম প্রচারক ও মুজাহিদের আগমন হয়েছিল। কিন্তু প্রচলিত কিংবদন্তি থেকে তাঁদের প্রকৃত ধর্ম-বিশ্বাস এ সব ইসলাম প্রচারক ও মুজাহিদের চেহারাও বিকৃত করে দিয়েছে বলে মনে হয়। যার ফলে দীনের এ শ্রেষ্ঠ মুজাহিদগণের আস্তানা ও মাযার বর্তমানে শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। বর্তমানে পশ্চিম বাংলার ঘুটিয়ার শরীফ এ তালিকায় শীর্ষে স্থান লাভ করেছে। প্রতি বছর এখানে যে উরস অনুষ্ঠিত হয় তাতে পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন এলাকার লোক দূর-দূরান্ত থেকে আগমন করে। এ থেকে অন্ততপক্ষে শরীফ শাহের ব্যাপক ইসলাম প্রচারের স্বীকৃতি পাওয়া যায়।[১২২]

সাইয়েদ নাসিরুদ্দীন শাহ নেকমর্দান

বরেন্দ্র অঞ্চলে যে সব ইসলাম প্রচারক এসেছিলেন তাঁদের অধিকাংশই দিনাজপুর জেলায় নিজেদের কর্মশক্তি নিয়োগ করেন। তাই দিনাজপুর জেলায় বহু আলেম ও দরবেশের আস্তানা ও মাযার দেখা যায়। এ আলিম ও দরবেশদের সাথে জড়িত বহু কিংবদন্তি ও অঞ্চলে প্রচলিত রয়েছে। এ সব কিংবদন্তি থেকে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা মোটেই সহজসাধ্য ব্যাপার নয়।

ইসলাম প্রচারকদের মধ্যে সাইয়েদ নেকমর্দ সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও পরিচিত নাম। তাঁর আসল নাম সাইয়েদ নাসিরুদ্দীন শাহ নেকমর্দন, তবে জনগণের মধ্যে তিনি নেকমর্দ নামে পরিচিত। সম্ভবত অত্যধিক সৎ-সভাব ও চরিত্র মাধুর্যের জন্য তিনি এ নামে পরিচিত হয়েছেন।[১২৩] তাঁকে এ অঞ্চলের সবচেয়ে প্রাচীন ইসলাম প্রচারক মনে করা হয়। দিনাজপুর জেলার নেকমর্দান গ্রামে তাঁর মাযার অবস্থিত। পরবর্তীকালে তাঁর নামাসুরে এ গ্রামের নামকরণ করা হয়েছে বলে মনে করা হয়।

সাইয়েদ নেকমর্দান সম্পর্কে প্রচলিত কিংবদন্তি থেকে জানা যায়, দিনাজপুর জেলায় এ অঞ্চলে তৎকালে নাথ-পন্থীদের প্রাধান্য ছিল এবং এখানে নাথ-পন্থীদের গুরু গোরক্ষনাথের একটি মন্দির ছিল। ভীমরাজ ও পৃথ্বীরাজ নামক দুই জমিদার ভ্রাতা ছিলেন এ ধর্মের পৃষ্টপোষক। সাইয়েদ নেকমর্দ তাঁর সঙ্গী-সহচরদের নিয়ে এ অঞ্চলে

১২১. ড. আবদুল করীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১
১২২. ড. এনামুল হক, *পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম* (কলকাতা: আশরাফিয়া লাইব্রেরী, ১৯৭৫ খ্রী.), পৃ. ৫৪
১২৩. আল ইদ্রিসী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করলে এ জমিদার ভ্রাতৃদ্বয় তাঁদের উপর নানাবিধ উৎপীড়ন শুরু করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাইয়েদ নেকমর্দ ও তাঁর সহচরদের সাথে সংঘর্ষে জমিদারদ্বয়ের পতন ঘটে। ফলে এ এলাকায় ইসলাম প্রচারের পথ সুগম হয়।

সাইয়েদ নেকমর্দানের মাযারটি বহুদিন অনাদৃত ছিল। পরে বাদশাহ আওরঙ্গজেব তিন শত বিঘা পরিমাণ জমি মাযার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দান করেন। বহু প্রাচীনকাল থেকে দিনাজপুরে সাইয়েদ নেকমর্দানের যে বিপুল প্রভাব পরিলক্ষিত হয়ে আসছে তাতে মনে হয় তাঁর এ অঞ্চলে আগমন ত্রয়োদশ শতকের শেষ বা চতুর্দশ শতকের প্রথম ভাগেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

শাহ মালেক ইয়ামানী

ঢাকার ইডেন বিল্ডিং-এর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে হযরত শাহ মালেক ইয়ামানীর মাযার অবস্থিত। প্রচলিত জনশ্রুতি থেকে যতটুকু জানা যায় তা হচ্ছে এ যে, হযরত শাহ মালেক ইয়ামানী হযরত শাহ জালাল মুজাররাদের সাথে প্রথম সিলেটে আসেন। অতঃপর সিলেট বিজয়ের পর হযরত শাহ জালাল তাঁর সাগরিদগণকে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্য প্রেরণ করেন। এ সময় ঢাকা অঞ্চলে হযরত শাহা মালেক ইয়ামানী ইসলাম প্রচারে প্রেরিত হন। ঢাকা শহরের চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকায় তিনি ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার করেছিলেন বলে জানা যায়।

তাঁর মাযারের পাশে হযরত শাহ বলখীর মাযার অবস্থিহ। শোনা যায়, তিনি ছিলেন হযরত মালেক ইয়ামানীর শাগরিদ এবং ইসলাম প্রচারে হযরত শাহ মালেককে সহায়তা দান করার জন্য তিনি ঢাকায় আগমন করেন।[১২৪]

সাইয়েদ হাফেজ মাওলানা আহমদ তান্নুরী

নোয়াখালী জেলার ইসলাম প্রচারকদের মধ্যে সাইয়েদ হাফেজ মাওলানা তান্নুরী তারাককোলী ওরফে সাইয়েদ মীরান শাহ সর্বাধিক প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। তিনি এ অঞ্চলে প্রথম যুগের ইসলাম প্রচারকদের অন্যতম। এ জেলায় কাঞ্চনপুর গ্রামে তাঁর মাযার অবস্থিত। তিনি বড় পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র.)-এর পৌত্র ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল মাওলানা আজাল্ল (র.)। হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংসের পর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র.)-এর অনেক আত্মীয়-স্বজন ও বংশধর ইরান, আফগানিস্থান ও হিন্দুস্তান উপ-মহাদেশে চলে আসেন। মাওলানা সাইয়েদ আজাল্ল (র.) নানা স্থান ঘুরে অবশেষে দিল্লীতে আগমন করেন এবং সেখানেই সাইয়েদ আহমদের জন্ম হয়। তিনি পিতার কাছে সকল 'ইল্‌ম শিক্ষা লাভ করার পর অন্যান্য ওস্তাদ ও পীরের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রকার বিদ্যা অর্জন ও আধ্যাত্মিক দীক্ষা লাভ করেন। অবশেষে পিতার বাগদাদ প্রত্যাবর্তনের পর তিনি বারজন শাগরিদসহ পান্ডুয়ায় আগমন করেন। পরবর্তী পর্যায়ে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে নোয়াখালী জেলার সেনবাগে পৌঁছেন। এ জেলার বিভিন্ন এলাকায় তিনি ও তাঁর দলবল ইসলাম প্রচারে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। তিনি সিলেটের হযরত শাহ জালালের সমসাময়িক বলে কথিত।

রাস্‌তি শাহ

কুমিল্লা জিলার ইসলাম প্রচারকদের মধ্যে হযরত রাস্‌তি শাহ বিশেষ প্রসিদ্ধ। মেহার কালিবাড়ী স্টেশনের পূর্বদিকে শ্রীপুর গ্রামে তাঁর মাযার অবস্থিত। তিনি হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র.)-এর বংশধর বলে পরিচিত। দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ তোগলকের শাসনামলে (১৩৫১-১৩৮৮ খৃ.) তিনি বাংলায় আগমন করেন বলে জানা যায়। হযরত সাইয়েদ আহমদ তান্নুরী যখন নোয়াখালী জেলার কাঞ্চনপুরে আগমন করেন তখন তিনিও তাঁর সঙ্গে কুমিল্লার এ অঞ্চলে আগমন করেন বলে জানা যায়। কুমিল্লা ও নোয়াখলী জেলার বহু অমুসলিম তাঁর প্রচেষ্টায় ইসলামে দীক্ষিত হয়। সুলতান ফিরোজ শাহ তাঁকে লাখেরাজ ভূ-সম্পত্তি দান করেন।

শাহ মুহাম্মদ বাগদাদী

১২৪. গোলাম আহমদ মোর্তাজা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩

কুমিল্লার শাহতলী রেল স্টেশনের নিকটবর্তী শাহতলী খন্দকার বাড়ীতে হযরত শাহ মুহাম্মদ বাগদাদীর মাযার অবস্থিত। তিনি বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন। সুলতান ফিরোজ শাহ তোগলকের কাছ থেকে শাহতলী মৌজাটি নিষ্কর সম্পত্তি হিসেবে লাভ করার পর তিনি সেখানে আস্তানা স্থাপন করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় এ এলাকায় ইসলামের অভাবিতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়। তিনি হযরত রাসতি শাহের সমসাময়িক ছিলেন।

সাইয়েদুল আরেফীন

বর্তমান পটুয়াখালী জেলার অন্তর্গত বাউফল থানার কালিশুড়ি গ্রামে সাইয়েদুল আরেফীনের মাযার অবস্থিত। দিগ্বিজয়ী তৈমুর লংগের আমলে (১৩৬১-১৪০৫ খৃ.) তিনি বাংলায় আগমন করেন। কিংবদন্তি থেকে জানা যায়, তৈমুর লংগের নির্দেশেই ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি মধ্য এশিয়া থেকে এ সুদূর বাংলায় আগমন করেন। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, খৃস্টীয় চতুর্দশ শতকের শেষের দিকে তিনি এ দেশে আগমন করেন।

জনশ্রুতি থেকে আরো জানা যায় যে, বাংলায় ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগমন করে হযরত সাইয়েদুল আরেফীন প্রথমে সমগ্র এলাকা পরিভ্রমণ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যেখানে ইসলামের আলো এখনও প্রবেশ করার সুযোগ পায়নি, সে এলাকায় তিনি আস্তানা স্থাপন করবেন। কিন্তু তিনি দেখেন বাংলার সর্বত্র ইসলামের প্রসার ঘটেছে। তবে অসংখ্য নদী পরিবেষ্টিত বাকেরগঞ্জ জেলা ভ্রমণকালে তিনি এমন বহু স্থান দেখেন, যেখানে একজনও মুসলমান নেই। এমনি একটি স্থান ছিল কালিশুড়ি। এখানেই তিনি নিজের আস্তানা স্থাপন করেন। এ এলাকার মুসলমানরা তাই হযরত সাইয়েদুল আরেফীনকে বরিশাল ও পটুয়াখালী এলাকার সর্বপ্রথম ইসলাম প্রচারকদের অন্যতম গণ্য করেন।[১২৫]

শাহ লঙ্গর

ঢাকা জেলার রূপগঞ্জ থানার অন্তর্গত মুয়াজ্জমপুর গ্রামে শাহ লঙ্গরের মাযার অবস্থিত। তাঁর মাযার মসজিদটি গৌড়ের সুলতান শামসুদ্দীন আহমদ শাহের রাজত্বকালে (১৪৩১-১৪৪২ খৃ.) নির্মিত হয়। অবশ্য সর্বত্রই এ সমস্ত ইসলাম প্রচারক ও দরবেশগণের মৃত্যুর পর বা বহু বছর পর তাদের আস্তানায় বা মাযারে মসজিদ নির্মিত হতে দেখা গেছে। এ প্রেক্ষিতে বিচার করলে হযরত শাহ লঙ্গরকে চতুর্দশ শতকের শেষের দিকের বা তারও বহু পূর্বের কোনো ইসলাম প্রচারক বলা যেতে পারে।

হযরত শাহ লঙ্গরের প্রকৃত নাম জানা যায় না। লঙ্গর শব্দটি মূলত কোনো নাম হতে পারে না। সম্ভবত এটি লঙ্গরখানা শব্দের অংশ বিশেষ। এ থেকে অন্ততপক্ষে এতটুকু অনুমান করা যায় যে, হযরত শাহ লঙ্গর নিজের আস্তানার সঙ্গে কোনো বড় আকারের লঙ্গরখানা কায়েম করেছিলেন, যেখান থেকে তিনি গরীব, দুঃখী ও অভাবী নও মুসলিমদের আহার যোগাতেন। এ লঙ্গরখানা অত্যধিক প্রসিদ্ধ ও সাফল্যলাভ করেছিল। যার ফলে পরবর্তীকালে তাঁর আসল নাম ও পরিচয় এর অন্তরালে চাপা পড়ে গিয়েছিল। তাঁর এ লঙ্গরখানাই তাঁর ইসলাম প্রচারের ব্যাপকতা প্রমাণ করে। আ.ন.ম. বজলুর রশীদ তাঁর 'পাকিস্তানে সূফী সাধক' গ্রন্থে শাহ লঙ্গরকে বাগদাদের কোনো শাহজাদা বলে উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, সংসার ত্যাগী শাহজাদা দেশ-বিদেশ পরিভ্রমণের পর ঢাকার মুয়াজ্জমপুরে এসে আস্তানা গাড়েন।[১২৬]

শাহ মুহসিন আউলিয়া

চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানার ঝিয়ারী গ্রামে তাঁর মাযার ছিল। নদী-ভাঙ্গনের মুখে পড়ায় সেখান থেকে তা পরবর্তীকালে পার্শ্ববর্তী বটতলা গ্রামে স্থানান্তরিত হয়েছে। তাঁর কবরের পার্শ্বে রক্ষিত প্রস্তর খন্ডে উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, তিনি হিজরী ৮০০ সনে অর্থাৎ ১৩৯৭ খৃস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

প্রচলিত জনশ্রুতি থেকে জানা যায় যে, তিনি চট্টগ্রাম বিজয়ে অংশগ্রহণকারী পীর বদরুদ্দীন আল্লামার সহযোগী ছিলেন। দিল্লীর নিকটবর্তী পানিপথ থেকে বদরুদ্দীন আল্লামা, কাত্তাল পীর ও শাহ মুহসিন আউলিয়া একই সঙ্গে

---

১২৫. জুলফিকার আলী কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮
১২৬. আ. ন. ম. বজলুর রহমান, *পাকিস্তানের সূফী সাধক* (কলকাতা: আশরাফিয়া লাইব্রেরী, ১৯৮৮ খ্রী.), পৃ. ১৯৫

ঢাকায় আগমন করেন এবং এখান থেকে অগ্রসর হয়ে তাঁরা কদল খান গাজীর নেতৃত্বে মুবারক শাহী বাহিনীর সাথে চট্টগ্রাম বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন।[১২৭]

১২৭. ড. আবদুল করীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০

৪র্থ পরিচ্ছেদ
ইসলাম প্রচারের তৃতীয় পর্যায়

ইসলাম প্রচারের এ পর্যায়টি পঞ্চদশ শতকের শুরু থেকে সপ্তদশ শতকের শেষ অবধি প্রায় তিনশত বছর ধরে চলতে থাকে। ইতিমধ্যে মুসলিম রাজশক্তি বাংলায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। চতুর্দশ শতকের শেষ অবধি বাংলার বিপুল সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করে। এদিকে বিদেশাগত মুসলমানদের সংখ্যাও কম ছিল না। এ দুয়ের সংমিশ্রণে একটি শক্তিশালী মুসলিম জনগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। কজেই তৃতীয় পর্যায়ে ইসলাম প্রচারকদের পথ ছিল তুলনামূলকভাবে সুগম। কিন্তু তবুও তাঁদেরকে বহুস্থানে অমুসলিম শক্তির প্রচন্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এ পর্যায়ে যাঁদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য বা তাঁরা হলেন :

১. শায়খ যয়নুদ্দীন বাগদাদী ও চিহিল গাজী,
২. শায়খ বদরুল ইসলাম শহীদ,
৩. খান জাহান আলী,
৪. খালাস খান,
৫. শাহ শরীফ জিন্দানী,
৬. শাহ মান্নাহ,
৭. মুবারক গাজী,
৮. শাহ আফজাল মাহমুদ ও গাজী মুহাম্মদ বাহাদুর,
৯. শাহ মুয়াজ্জম দানিশ মন্দ,
১০. শাহ আলী বাগদাদী,
১১. শাহ আদম কাশ্মীরী ও শাহ জামাল,
১২. শাহ চাঁদ আউলিয়া,
১৩. খাজা চিশতী বেহেশ্তী,
১৪. শাহপীর,
১৫. সাইয়েদ আবদুল খালেক বুখারী,
১৬. মাওলানা শাহ আবদুর রহীম শহীদ।

শায়খ যয়নুদ্দীন বাগদাদী ও চিহিল গাজী

পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেও তখনও দেশের কোনো কোনো স্থানে হিন্দু সামন্ত জমিদারদের প্রভাব অপরিবর্তিত ছিল। মুসলিম আলিম ও সূফীগণ ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে বিভিন্ন স্থানে এ সব সামন্ত ও জমিদারদের চক্ষুশূল হন এবং অনেক ক্ষেত্রে এদের বিরুদ্ধে তাঁরা সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হন। দিনাজপুরের উত্তরাংশে চিহিল গাজীর ইসলাম প্রচার প্রচেষ্টা এরই একটি অধ্যায়। দিনাজপুর জেলায় এ চিহিল গাজীর মাযার আছে। 'চিহিল গাজী' অর্থ চল্লিশ জন জিহাদকারী। বিদেশ থেকে যেসব ইসলাম প্রচারক উত্তর বঙ্গে ইসলাম প্রচার করতে আসেন এক সময় তাঁদের মধ্য থেকে চল্লিশ জন আলিম ও দরবেশ দিনাজপুরের উত্তরাংশে স্থায়ীভাবে বসবাস করার চেষ্টা করেন। স্থানীয় হিন্দু জমিদারগণ তাঁদের ইসলাম প্রচারকে সুনজরে দেখতে পারেননি। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই হিন্দু জমিদারদের সাথে তাঁদেরকে সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়। এ সংঘর্ষে তাঁরা জয়ী হন। তাঁদের দলের নেতা ছিলেন হযরত শায়খ যয়নুদ্দীন বাগদাদী। অন্যান্য দরবেশের নাম এখনও অজ্ঞাত। এ চল্লিশ জন ইসলাম প্রচারককে একই স্থানে পরপর কবরস্থ করা হয় বলে মনে করা হয়। এ জন্য সাধারণ মানুষের ধারণা হচ্ছে, চিহিল গাজী একজন দরবেশের নাম। দিনাজপুরে তাঁদের সমাধি থেকে ওয়েস্টমেক্ট সাহেব সুলতান রুকনুদ্দীন বরবক শাহের একখানি শিলালিপি আবিষ্কার করেছিলেন। ১৪৬০ খৃস্টাব্দে উৎকীর্ণ এ শিলালিপিটি থেকে জানা যায় যে, পনের শতকের মাঝামাঝি সময়ে চল্লিশজন গাজী এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন।[১২৮]

১২৮. আবদুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

এছাড়াও দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে আরো যাঁরা ইসলাম প্রচার করেন তাঁদের মধ্যে গোরা সাইয়েদ সাহেব, পীর মানিক জাহান, হযরত বালা শহীদ, গোরা শহীদ সাহেব, মাওলানা আফতাবুদ্দীন কুতুব, শায়খ সিরাজুদ্দীন আউলিয়া, হুসাইন মুরিয়া বাগদাদী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে তাঁদের জীবন কাহিনী ও ইসলাম প্রচার সম্পর্কিত বিবরণ জানা যায়নি।

শায়খ বদরুল ইসলাম শহীদ

শায়খ বদরুল ইসলাম শহীদ গৌড়ের একজন সর্বজনমান্য আলিম ছিলেন। বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে তিনি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন। যার ফলে রাজা গণেশ তাঁর প্রতি রুষ্ট হন ও তাঁর উপর নির্যাতন চালাতে থাকেন। রিয়াযুস সালাতিন গ্রন্থে তাঁর উপর রাজা গণেশের নির্যাতন সম্পর্কিত নিম্নোক্ত ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। একদিন শায়খ মুঈনুদ্দীন আব্বাসের পিতা শায়খ বদরুল ইসলাম রাজা গণেশকে সালাম না করেই তাঁর সামনে বসে ছিলেন। রাজা গণেশ রুষ্ট হয়ে তাঁকে সালাম না করার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে শায়খ বললেন, "আলেমদের পক্ষে পৌত্তলিকদেরকে সালাম করা শোভনীয় নয়–বিশেষ করে তোমার মতো নিষ্ঠুর ও রক্তপিপাসু বিধর্মীর, যে মুসলমানদের রক্তপাত করছে।" শায়খ বদরুল ইসলামের এ নির্ভীক জবাবে রাজা গণেশ ক্রোধে অগ্নিশর্মা হলেন। কিন্তু তার করার কিছুই ছিল না। একদিন রাজা একটি নিচু ও সংকীর্ণ দ্বার বিশিষ্ট কক্ষে বসে শায়খকে ডাকলেন। শায়খ সেখানে পৌঁছে রাজার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে প্রথমে পা ঘরের মধ্যে রেখে পরে মস্তক নত না করেই কক্ষে প্রবেশ করলেন। রাজা গণেশ ক্রোধান্ধ হয়ে শায়খ বদরুল ইসলামকে তাঁর ভাইদের সাথে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করাবার নির্দেশ দিলেন। তৎক্ষণাৎ শায়খকে হত্যা করা হলো এবং অন্য আলেমদেরকে নৌকাযোগে নদীতে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে দেয়া হলো। হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানীও জৈনপুরের সুলতান ইবরাহীম শর্কীর কাছে লিখিত পত্রে এ শহীদ আলেমদের কথা উল্লেখ করেছিলেন।[১২৯]

খান জাহান আলী

যশোহর ও খুলনা অঞ্চলে ইসলাম প্রচার, ইসলামের ভাবধারার প্রচলন ও ইসলামী সমাজ-বিধি প্রবর্তনে হযরত উলুগ্ খান-ই-জাহান আলীর নাম সর্বাগ্রে স্মরণযোগ্য। এ দুই জেলার ব্যাপক প্রচলিত জনশ্রুতি এবং বাগেরহাটে প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে অনুমিত হয় যে, তিনি সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের একজন সেনাপতি ছিলেন এবং তিনিই এ এলাকায় মুসলিম শাসনের গোড়া পত্তন করেন। তিনি নিজে ইসলাম প্রচার করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিভিন্ন শিষ্য-শাগরিদকের বিভিন্ন স্থানে ইসলাম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। তাঁর সংগঠন ক্ষমতা, জনসেবা ও অকৃত্রিম চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ-বিমোহিত হয়ে এতদঞ্চলের অমুসলিম সম্প্রদায়গুলো দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে।

খুলনা জেলার বাগেরহাটে তাঁর সমাধি অবস্থিত। সমাধিগাত্রে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে বলা হয়েছে ঃ "আল্লাহ্‌র এক নগণ্য দাস, বিশ্ব প্রভুর অনুগ্র প্রত্যাশী, রাসূলে কারীম (স.)-এর বংশধরধের অনুরক্ত, সৎপথগামী আলেমগণের বন্ধু, বিধর্মী মুশরিকদের শত্রু, ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্যকারী উলুগ্ খান-ই-জাহান (তাঁর প্রতি আল্লাহ্‌র করুণা ও ক্ষমা বর্ষিত হোক) হিজরী ৮৬৩ সালের ২৬ জিলহজ্জ বুধবার রাত্রে এ নশ্বর দুনিয়া থেকে জান্নাতগামী হন এবং উক্ত মাসের ২৭ তারিখ বৃহস্পিতিবার তিনি সমাহিত হন।" শিলালিপিতে উল্লিখিত তারিখ থেকে জানা যায় যে, তিনি ১৪৫৮ খৃস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। তখন ছিল গৌড়ের সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের (১৪৩৭-১৪৫৯ খৃ.) আমল। এ আমলেই হযরত খান জাহান আলী দক্ষিণ বঙ্গ জয় করেন এবং সমগ্র এলাকার শাসনভার লাভ করেন। পয়গ্রাম কসবাতে তাঁর রাজধানী ছিল। কাজেই তিনি যে তদানিন্তন বাংলার সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের একজন শ্রেষ্ঠ সেনাপতি ছিলেন এতে সন্দেহ নেই। তবে তাঁর ধর্মপ্রাণতা, সততা, জনসেবা ও চরিত্র-মাধুর্য এ অঞ্চলের জনগণের ওপর এত বেশি প্রভাব বিস্তার করে যে, তারা তাঁকে আল্লাহ্‌র একজন যথার্থ অনুগত বান্দা এবং সূফী ও দরবেশ মনে করতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এলাকার জনগনের সামনে তিনি নিজেকে একজন যথার্থ মুসলমান হিসেবে তুলে ধরেন এবং বহুসংখ্যক মসজিদ নির্মাণ ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। জনগণ তাঁর দ্বারা এত বেশি প্রভাবিত হয়েছিল যে, তাঁর অনুকরণে তারাও বিভিন্ন স্থানে স্বতঃস্ফুর্তভাবে এ ধরনের জনসেবামূলক কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল।

---

১২৯. গোলাম হোসাই সলীম, *রিয়াযুস সালাতীন* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪ খ্রী.), পৃ. ৭৫-৭৬

খান জাহান আলী প্রথমে যশোহরের অতি প্রাচীন নগরী বারোবাজারে আগমণ করেন। এখানে তিনি বহু জনহিতকর কাজ করেন এবং ইসলামী ইবাদতের সুষ্ঠু অনুষ্ঠানের জন্য গড়ে তোলেন একটি সুরম্য মসজিদ। এ মসজিদটি এখনও বর্তমান আছে।[১৩০] এ ধরনের মসজিদ বারোবাজার থেকে বাগেরহাটের পথে তিনি বেশ কয়োটি নির্মাণ করেছিলেন বলে জানা যায়। বারোবাজার মূলত উত্তর বঙ্গের পৌন্ড্রবর্ধনের ন্যায় নিম্ন বর্ণের বৌদ্ধ ও হিন্দু সভ্যতার পীঠস্থান ছিল। হযরত খান জাহান আলী যখন এখানে অবস্থান করেছিলেন তখন তাঁর প্রচেষ্টা ও প্রচার মহাত্ম্যে বহু বৌদ্ধ ও হিন্দুর মনে ইসলামের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তারা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। মুসলমানদের নামানুসারে এখানে গড়ে ওঠে কয়েকটি গ্রাম। মুরাদগড়, সাদিকপুর, হাসিলবাগ, এনায়েতপুর ও রহমতপুর প্রভৃতি গ্রাম তার পরিচয় বহন করছে।[১৩১] বারোবাজার থেকে তিনি যশোহরের কয়েকটি স্থানে ইসলাম প্রচারের জন্য নিজের শাগরিদদের প্রেরণ করেন। এঁদের মধ্যে বাহরাম শাহ অন্যতম। তাঁর অন্য শাগরিদদের মধ্যে বুড়া খাঁ, ফতেহ খাঁ, মুহাম্মদ তাহির ওরফে পীর আলী, মীর খাঁ, চাঁদ খাঁ, মেহের উদ্দীন, বখতিয়ার খাঁ, পীর জয়ন্তী ও আলম খাঁর নাম জানা যায়। এঁদের মধ্যে বুড়া খাঁ ও ফতেহ খাঁ খানপুর ও বিদ্যানন্দকাঠি অঞ্চলে বহু অমুসলিমকে ইসলামে দীক্ষিত করেন। আমাদি গ্রামে তাঁরা একটি গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ নির্মাণ করেন। এ মসজিদটি আজও বিদ্যমান আছে।

তাঁর অন্যতম প্রধান শাগরিদ পীর আলী পূর্বে হিন্দু ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর নাম হয় মোহাম্মদ তাহির। তিনি বহু ব্রাহ্মণ-কায়স্থকে ইসলামে দীক্ষিত করেন বলে জানা যায়। তিনি যেসব ব্রাহ্মণকে ইসলামে দীক্ষিত করেন তারা এখনও এতদঞ্চলে পীরালী ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হয়ে আসছে।[১৩২] মাগুরার পীর-জয়ন্তীও পূর্বে হিন্দু ছিলেন। তিনি বহু সংখ্যক হিন্দুকে ইসলামে দীক্ষিত করেছিলেন বলে জানা যায়।

মূলত যশোহর ও খুলনার সমগ্র এলাকা ছিল খান জাহান আলীর কর্মস্থল। এ দুই জেলায় তিনি ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার করেন। বাগেরহাট শহরটি তাঁরই নির্মিত এবং তিনি এর নামকরণ করেন খলীফতাবাদ। বাংলার সুলতানদের মধ্যে একমাত্র নাসীরুদ্দীন মাহমুদ শাহ-ই খলীফা উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। ঢাকায় প্রাপ্ত ৮৬৩ হিজরীতে (১৪৫৭ খৃ.) একটি শিলালিপিতে এবং নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের কয়েকটি মুদ্রাতে তাঁকে খলীফা উপাধিতে ভূষিত দেখা যায়। সম্ভবত সুলতানের এ উপাধির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থে তিনি নব প্রতিষ্ঠিত শহরের খলীফতাবাদ নামকরণ করেন। বাগেরহাটের সুরম্য ষাট-গম্বুজ মসজিদ তাঁর একটি মহান কীর্তি। বস্তুত বাংলার এ দক্ষিণাংশে ব্যাপক ইসলাম প্রচারের কৃতিত্বের সিংহভাগই যে হযরত খান জাহান আলীর প্রাপ্য তাতে সন্দেহ নেই।[১৩৩]

খালাস খান

কপোতাক্ষ নদের পূর্ব তীরে সুন্দরবনের বেদকাশী নামক স্থানটিকে খালাস খান নিজের ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র রূপে বেছে নিয়েছিলেন। তখন যশোহর জেলা ও সুন্দরবনের এ অঞ্চলে ইসলামের দাওয়াত এসে পৌঁছেনি। তিনিই এ অঞ্চলে প্রথম ইসলাম প্রচারক। তাঁর আগে বা সমসময়ে যশোহর জেলার অন্যান্য অঞ্চলে বড় খান গাজী ও খান জাহান আলীর আবির্ভাব হয়েছিল। তুর্কী সুলতানদের রাজত্বকালে তিনি এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে ব্রতী ছিলেন বলে জানা যায়। তবে তাঁর আগমনকালের সঠিক তারিখ নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। বেদকাশী গ্রামে খালাস খাঁ দীঘির পাড়ে একটি প্রাচীন কালীমঞ্চের কাছে খালাস খাঁর মাযার অবস্থিত। দীঘি খনন করা থেকে অনুমান করা যায় যে, তিনিও খান জাহান আলীর ন্যায় জনহিতকর কাজের মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের অভিযান চালিয়েছিলেন। কোনো রাজশক্তির সহায়তা ছাড়াই পৌত্তলিকতার অবসান করে এ অঞ্চলকে তৌহিদের আলোকে উদ্ভাসিত করার জন্য তাঁকে যে বিপুল সংগ্রাম ও সাধনা করতে হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।[১৩৪]

শাহ শরীফ জিন্দানী

১৩০. হোসেন উদ্দীন হোসেন, *যশোরাদ্য দেশ*, পৃ. ৭৫, উদ্ধৃত: আবদুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১
১৩১. হোসেন উদ্দীন হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫
১৩২. চৌধুরী শামসুর রহমান, *পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামের আলো* (বশিরহাট: আল্লাহওয়ালা লাইব্রেরী, ১৯৭১ খ্রী.), পৃ. ৯৬
১৩৩. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০ খ্রী.), পৃ. ১৬৫
১৩৪. চৌধুরী শামসুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩

উত্তর বঙ্গে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে শাহ শরীফ জিন্দানী এক বিশিষ্ট অবদান রেখে গেছেন। পাবনা জেলার তাড়াশ থানার নওগাঁ গ্রামে তাঁর মাযার অবস্থিত। তিনি কোন্ সময় কিভাবে এখানে এসেছিলেন তার সঠিক বিবরণী পাওয়া যায় না। তবে যতদূর অনুমান করা যায়, তিনি উত্তর ভারত থেকে আগত সূফী-দরবেশদের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং স্বাধীন সুলতানদের আমলে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগমন করেছিলেন।[১৩৫]

শাহ মান্নাহ

ঢাকার সোনারগাঁও এলাকায় পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ ও মেঘনা নদীর সঙ্গম-স্থলের নিকটবর্তী মগড়াপাড়া গ্রামে হযরত শাহ মান্নাহ্‌র মাযার অবস্থিত। তাঁর মাযার সংলগ্ন একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, জালালুদ্দীন ফতেহ শাহের রাজত্বকালে (১৪৮৪ খৃ.) সুলতানের পরিচ্ছদ রক্ষক মুয়াজ্জমাবাদ বা মাহমুদাবাদের উজির ও সর্‌লস্কর (সেনাবাহিনী প্রধান) এবং সিলেট থানার সর্‌লস্কর কর্তৃক মাযার প্রঙ্গণে অবস্থিত মসজিদটি নির্মীত হয়। এ থেকেই অনুমান করা যায় যে, ১৪৮৪ খৃস্টব্দের পূর্বে হযরত শাহ মান্নাহ ইন্তিকাল করেছিলেন। তিনি পূর্ব বঙ্গের সোনাগাঁও এলাকায় আগত ইসলাম প্রচারকদের অন্যতম ছিলেন। ইসলামের সত্য ও ন্যায়ের বাণী নিয়ে তিনি এ এলাকায় এসেছিলেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিজের পবিত্র দায়িত্ব সম্পাদন করে এ দেশের মাটিতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

মুবারক গাজী

সুন্দরবন অঞ্চলের বিশাল কিংবদন্তির নায়ক মুবারক গাজীর প্রভাব এলাকার সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। মুজাহিদ দরবেশ হিসাবে তিনি সর্বত্র পরিচিত। তাঁর সম্পর্কিত প্রচলিত কিংবদন্তির বেড়াজাল থেকে তাঁর আসল পরিচয়টুকু উদ্ধার করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। কথিত আছে, বাঘের উপদ্রব থেকে সুন্দরবন এলাকার জনগণকে তিনি রক্ষা করেন। এর ফলে স্থানীয় জনসাধারণ তাঁর প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট ও অনুরক্ত হয়ে পড়ে এবং এভাবে তিনি তাদের মধ্যে ইসলামের বাণী প্রচারের পথ সুগম করেন। তাঁর হাতে অসংখ্য লোক ইসলাম গ্রহণ করে। বর্তমান পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্গত চব্বিশ পরগণা জেলার বাঁশড়া নামক স্থানে তাঁর মাযার অবস্থিত।[১৩৬]

শাহ আফজাল মাহমুদ ও গাজী মুহাম্মদ বাহাদুর

বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব থেকে পাবনা জেলায় ইসলামের দাওয়াত প্রবেশ করেছিল। তারপর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ইসলাম প্রচারক এ জেলার বিভিন্ন স্থানে ইসলামের সত্য ও ন্যায়ের বাণী প্রচার করে গিয়েছেন। হযরত মাখদুম শাহ আফজাল মাহমুদ এ সব ইসলাম প্রচারকদের অন্যতম। সুলতানী শাসনামলে তিনি এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। স্থানীয় কিংবদন্তি থেকে জানা যায় যে, তনি এতদঞ্চলের প্রতাপশালী হিন্দু জমিদার রাঘব রায়ের পুত্রকে ইসলামে দীক্ষিত করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর জমিদার পুত্র শায়খ রুকনুদ্দীন নামে পরিচিত হয়েছিলেন। সিরাজগঞ্জের উত্তরে অবস্থিত গুণেরগতি গ্রামের রুকনী সাহেবরা তাঁরই বংশধর বলে পরিচিত। সিরাজগঞ্জ শহরে হযরত শাহ আফজাল মাহমুদের মাযার অবস্থিত।

পনের শতকের মাঝামাঝি সময়ে এ অঞ্চলে আর একজন ইসলাম প্রচারকের আবির্ভাব হয়েছিল। তিনি ছিলেন গাজী শায়খ মুহাম্মদ বাহাদুর। সিরাজগঞ্জের পশ্চিম দিকে প্রায় তিন মাইল দূরবর্তী চান্দপাল গ্রামের পূর্ব সংলগ্ন দীঘিটি তিনি খনন করেছিলেন বলে যানা যায়। বর্তমানে দীঘিটি মজে গেছে এবং ‘গাজী বাহাদুরের দহ’ নামে পরিচিত হয়ে আসছে। কিংবদন্তি থেকে জানা যায় যে, গাজী বাহাদুর কাবুল থেকে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এ অঞ্চলে আগমন করেন। স্থানীয় বহু হিন্দু রাজা বা জমিদার তাঁর ইসলাম প্রচারের পথে বাঁধা সৃষ্টি করেন। তিনি উক্ত হিন্দু রাজা জমিদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। গাজী বাহাদুর তাঁদেরকে যুদ্ধে পরাজিত করে ইসলামে দীক্ষিত করেন। গাজী বাহাদুর প্রথমে চান্দপাল গ্রামে বাস করতে থাকেন। অতঃপর প্রচারের সুবিধার

১৩৫. গোলাম মোর্তাজা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮
১৩৬. ড. আবদুল করীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩

জন্য সিরাজগঞ্জের নিকটবর্তী ফুলবাড়ী গ্রামে আবাস স্থাপন করেন। সিরাজগঞ্জ মহকুমার ফুলবাড়ী, বাগডুমুর, নন্দিনা প্রভৃতি গ্রামের শায়খ সাহেবগণ গাজী শায়খ মুহাম্মদ বাহাদুরের বংশধর বলে পরিচিত।[১৩৭]

শাহ মুয়াজ্জম দানিশ মন্দ

গৌড়ের সুলতান নুসরাত শাহের আমলে (১৫১৯-১৫৩২ খৃ.) হযরত শাহ মুয়াজ্জম দানিশ মন্দ বাগদাদ থেকে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে আগম করেন। তিনি বাগদাদের খলীফা হারুনুর রশীদের বংশধর ছিলেন। তিনি বিভিন্ন ইসলামী শাস্ত্রে সুপন্ডিত হবার সাথে সাথে আধ্যাত্ম জ্ঞানেও উচ্চ আসনের অধিকারী ছিলেন। রাজশাহী জেলায় তিনি নিজের ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র স্থাপন করেন। এ জেলায় বাঘা নামক গ্রামে এসে তিনি বসবাস শুরু করেন। তাঁর গুণে ও চরিত্র মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হয়ে নিকটবর্তী মাখদুমপুর নামক স্থানের প্রভাবশালী জমিদার আল্লাহ্ বখ্শ বরখুরদার লশকরী নিজের কন্যাকে তাঁর সাথে বিবাহ দেন। এরপর থেকে তিনি স্থায়ীভাবে বাঘায় বসবাস করতে থাকেন। তাঁর প্রচেষ্টায় এ অঞ্চলে ইসলাম ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। তিনি একটি মাদ্রাসা ও একটি খানকাহ্ স্থাপন করে এ অঞ্চলের মুসলমানদের জ্ঞান সাধনার পথ প্রশস্ত করে গেছেন। সুলতান নুসরাত শাহের আমলে নির্মীত বাঘার প্রাচীন মনজিদটি এখনও তাঁর ইসলাম প্রচারের সাক্ষ্য বহন করছে। তাঁর পুত্র মাওলানা হামিদ দানিশ মন্দও একজন উঁচু দরের আলেম ছিলেন। তিনিও সারা জীবন ইসলাম প্রচারের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। বস্তুত রাজশাহী জেলায় ইসলাম প্রচারে এ পরিবারের দান অপরিসীম। বাঘায় হযরত দানিশ মন্দের সমাধি অবস্থিত।[১৩৮]

শাহ আলী বাগদাদী

ঢাকা জেলায় আগত ইসলাম প্রচারকদের মধ্যে হযরত শাহ আলী বাগদাদী অন্যতম। ঢাকা মহানগরীর কেন্দ্র থেকে দশ মাইল উত্তরে মীরপুর শহরতলিতে তাঁর মাযার অবস্থিত। তাঁর নাম থেকে বুঝা যায় যে, তিনি বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাগদাদ থেকে একশত জন দরবেশসহ দিল্লীতে আসেন। দিল্লী থেকে এসে প্রথমে ফরিদপুরে আস্তানা গাড়েন। অতঃপর সেখান থেকে ঢাকায় চলে আসেন এবং নিজের সঙ্গী-সাথীসহ ঢাকায় বিভিন্ন এলাকায় ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। তাঁর মাযারে প্রাপ্ত একখানি কিতাব থেকে জানা গেছে যে, তিনি ৮৯৫ হিজরী সনে (১৪৮৯ খৃ.) বাংলাদেশে আগমন করেন।[১৩৯] তিনি দীর্ঘদিন এদেশে ইসলাম প্রচারের কাজে রত থাকেন। অতঃপর ৯২৩ হজরীতে (১৫১৭ খৃ.) মীরপুরে ইন্তিকাল করেন। মি. এ্যালেন ১৫৭৭ খৃস্টাব্দকে তাঁর মুত্যুকাল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[১৪০] অন্যদিকে ড. এনামুল হক ১৪৮০ খৃস্টাব্দের পূর্বে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল বলে দাবি করেন।[১৪১] ড. এনামুল হক সাহেবের দাবির ভিত্তি হচ্ছে, মাযার সংলগ্ন মসজিদের শিলালিপি। মাযার সংলগ্ন মসজিদের একটি আরবী শিলালিপিতে বলা হয়েছে যে, ৮৮৫ হিজরীতে (১৪৮০ খ.) মসজিদটি নির্মীত হয়। কাজেই হযরত শাহ আলী বাগদাদী ১৪৮০ খৃস্টাব্দের পূর্বে পরলোকগমন করেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর মাযার সংলগ্ন মসজিদটি নির্মীত হয়। হযরত শাহ আলী বাগদাদী ১৪৮০ খৃস্টাব্দে নির্মীত এ মসজিদটিতে নিজের ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। কাজেই মৃত্যুর পর তাঁর মাযার সংলগ্ন নতুন মসজিদ নির্মাণের প্রয়োজন হয়নি।

শাহ আদম কাশ্মীরী ও শাহ জামাল

টাঙ্গাইলের আটিয়া গ্রামে হযরত শাহ আদম কাশ্মীরীর মাযার অবস্থিত। তিনি দিল্লীর বিখ্যাত সূফী শায়খ সলীম চিশতীর শাগরিদ ছিলেন। বাদশাহ আকবরের রাজত্বকালে তিনি মোগল সেনাপতি সাঈদ খান পন্নীর সাথে বাংলাদেশে আগমন করেন। চল্লিশজন শাগরিদ ও সহচরসহ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে টাঙ্গাইলের আটিয়া ও শেরপুরে কেন্দ্র স্থাপন করেন। সাধারণের মধ্যে তিনি হযরত বাবা নামে প্রসিদ্ধ। হযরত বাবা টাঙ্গাইলের আটিয়া

১৩৭. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯
১৩৮. চৌধুরী শামসুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬
১৩৯. *East Pakistan District Gazetteers,* Dhaka, 1969, P. 98, উদ্ধৃত: আবদুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩
১৪০. *East Bengal District Gazetteers,* Dhaka, 1912, P. 65, উদ্ধৃত: প্রাগুক্ত।
১৪১. ড. এনামুল হক, প্রগুক্ত, পৃ. ২৩৩

ও শেরপুর অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। বাবা শাহ আদম কাশ্মীরীর ভাগিনা জামাল মামার খোঁজে বহু স্থান ভ্রমণ শেষে টাঙ্গাইলে এসে তাঁর সাক্ষাৎ পান। কিন্তু মামার সাহচর্যে থেকে তিনিও দেশে ফেরার পরিবর্তে হযরত শাহ আদম কাশ্মীরীর সাথে এতদঞ্চলে ইসলাম প্রচারের কাজে ব্যাপৃত হন। কাগমারীতে টাঙ্গাইল এলাসিন রাস্তার সঙ্গম-স্থলে অবস্থিত মাযারটি শাহ জামালের মাযার বলে পরিচিত।

জামালপুর শহরের পশ্চিম দিকে শাহ জামাল নামক আর একজন দরবেশের মাযার দেখা যায়। তিনি বাদশাহ আকবরের রাজত্বকালে ইয়ামান দেশ থেকে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এ এলাকায় আগমন করেন। তিনি জামালপুর শহরে কেন্দ্র স্থাপন করে ইবাদত-বন্দেগী ও ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর নামেই জামালপুর শহরের নামকরণ হয়। বাবা আদম কাশ্মীরীর ভাগিনা শাহ জামাল ও ইয়ামানের শাহ জামাল একই ব্যক্তি কিনা তা বলার মতো কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

শাহ চাঁদ আউলিয়া

পটিয়া থানার এক মাইলের মধ্যে শ্রীমতী নদীর তীরে শাহ চাঁদ অউলিয়ার মাযার অবস্থিত। পটিয়া থানার মুসলমান-হিন্দু নির্বিশেষে সবাই তাঁর প্রতি সমান ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে থাকে। কথিত আছে, তিনি চির কুমার ছিলেন এবং দিল্লীতে আত্মগোপন করে বাস করতেন। দিল্লীর জনৈক শাহজাদী মনের মতো স্বামীর সন্ধানে ব্যর্থ হয়ে তাঁর কাছে ভাগ্য গণনা করার জন্য যান। তিনি শাহজাদীকে জানিয়ে দেন যে, তাঁর স্বামীভাগ্য নেই। এতে শাহজাদী ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে বিয়ে করার জন্য চাপ দিতে থাকেন। শাহজাদীর ভয়ে তিনি দিল্লী ত্যাগ করে বাংলার সর্বপূর্ব প্রান্তে চলে আসেন। এ এলাকার বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করার পর তিনি চট্টগ্রামের পটিয়ায় স্থায়ীভাবে আস্তান গাড়েন। ইতিপূর্বে তিনি যেসব স্থানে অবস্থান করেছিলেন সে স্থানগুলো তাঁর নামে পরিচিত হয়। যেমন মেঘনা পারের চাঁদপুর বন্দর, সীতাকুন্ডের চাঁদপুর, চট্টগ্রাম শহরের নিকটবর্তী চাঁদগাঁও এবং পটিয়ায় চাঁদখালী। এ সব স্থানের নামকরণ থেকে শাহ চাঁদ আউলিয়ার জনপ্রিয়তা অনুমান করা যায়। তিনি যেখানে অবস্থান করতেন সেখানে ইসলাম প্রচরের জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতেন।

কিছুদিন পর দিল্লীর শাহজাদীও তাঁর অনুসন্ধানে লোকজনসহ পটিয়ায় এসে উপস্থিত হন। কিন্তু ঘটনাক্রমে শাহজাদীর আগমনের কিছুদিন পরেই শাহ চাঁদ আউলিয়ার মৃত্যু হয়। শাহজাদী তাঁর ভাগ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে চাঁদ আউলিয়ার মাযারের খাদেমরূপে জীবন-যাপন করতে থাকেন।[১৪২]

খাজা চিশতী বেহেশ্‌তী

ঢাকা সুপ্রীম কোর্টের পূর্ব পার্শ্বে হযরত খাজা শরফুদ্দীন ওরফে খাজা চিশ্‌তী বেহেশ্‌তীর মাযার অবস্থিত। বাদশাহ আকবরের রাজত্বকালে (১৫৫৬-১৬০৫ খৃ) তিনি ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে ঢাকায় আগমন করেন। এতদঞ্চলে তিনি দীর্ঘদিন ধরে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। অনেকে তাঁকে নওয়াব আলাউদ্দীন ইসলাম খান চিশ্‌তীর উত্তর পুরুষ বলে মনে করেন। হিজরী ৯৯৮ সনে (১৫৮৯ খৃ.) তিনি ইন্তিকাল করেন বলে জানা যায়।

শাহপীর

চট্টগ্রাম থানার সাতকানিয়ায় এ দরবেশের মাযার আবস্থিত। তাঁর আসল নাম মুহাম্মদ ইউসুফ এবং তিনি দিল্লীর কোনো যুবরাজ ছিলেন। যৌবনকাল শেষে পার্থিব মোহমুক্ত হয়ে তিনি ধর্মীয় জীবনের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। এ সময় বিভিন্ন স্থান সফর করতে করতে প্রায় তিনশত বছর পূর্বে তিনি সাতকানিয়ায় এসে আস্তানা গাড়েন। এখানে দীর্ঘদিন ধরে তিনি ইসলাম প্রচার কার্যে রত থাকেন।

ড. এনামুল হক এ প্রসঙ্গে উত্তর ভারতের অন্তর্গত মীরাটের বিখ্যাত সূফী শাহপীর ও সাতকানিয়ার শাহপীরকে অভিন্ন মনে করেছেন।[১৪৩] মীরাটের এ সূফীর সমাধিতে মোগল সম্রাজ্ঞী নূরজাহান একটি মাযার তৈরী করে

১৪২. ড. আবদুল করীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১
১৪৩. ড. এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬

দিয়েছিলেন। মীরাটের এ সূফী ১৬৩২ খৃস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। সাতকানিয়ার মাযারটি শাহপীরের একটি স্মারক মাযার এবং তিনি সতের শতকের প্রথম দিকে চট্টগ্রামের সাতকানিয়া এলাকায় ইসলাম প্রচার করেন।

সাইয়েদ আবদুল খালেক বুখারী

টাঙ্গাইলের অন্তর্গত ঘাটাইল থানার পারসী গ্রামে সাইয়েদ আবদুল খালেক বুখারীর মাযার দীর্ঘ অযত্নের ফলে বর্তমানে অনেকটা ধ্বংসোন্মুখ হয়েছে। মুগল শাসন আমলে সাইয়েদ আবদুল খালেক বুখারী ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এ এলাকায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। বুখারার ইমাম আলী রেজা প্রমুখ ছিলেন তাঁর পূর্ব পুরুষ। সাইয়েদ আবদুল খালেক বুখারী ঘাটাইল এলাকায় ইসলাম প্রচার এবং মুসলমানদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে সংস্কার ও কলুষমুক্ত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যান বলে জানা যায়।[১৪৪]

মাওলানা শাহ আবদুর রহীম শহীদ

মাওলানা শাহ আবদুর রহীম শহীদ ১৬৬৩ খৃস্টাব্দে কাশ্মীরে জন্মগ্রহণ করেন। বিভিন্ন ইসলামী শাস্ত্রে পান্ডিত্য অর্জন করার পর সতের শতকের শেষের দিকে তিনি বাংলাদেশে আসেন। প্রথমে তিনি মুর্শিদাবাদে আগমন করেন, সেখানে কিছুদিন অবস্থানের পর ঢাকায় চলে আসেন এবং এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। তিনি চিরকুমার ছিলেন। কেবলমাত্র শাহ নজমুদ্দীন নামক এক ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন তাঁর সঙ্গী। বিশ বছর অবধি একাধারে ইবাদতে মশগুল থাকার পর তিনি হজ্জ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করেন এবং সেখান থেকে ফিরে এসে এতদঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও সমাজ সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। ঢাকার লক্ষীবাজার মহল্লায় তাঁর খানকাহ্ অবস্থিত। ১১৫৮ হিজরীর ৭ শাবান (১৭৪৫ খৃ.) একজন পাগল তাঁর দেহে সাতটি তরবারির আঘাত করে। ফলে এক মাস তিনদিন পর রমযানের ৯ তারিখে তিনি ইন্তিকাল করেন। লক্ষীবাজার মহল্লার মিয়া সাহেবের ময়দানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়। বর্তমানে এখানেই তাঁর মাযার অবস্থিত।

এ ছাড়াও ঢাকার ও দেশের বিভিন্ন এলাকায় অসংখ্য ইসলাম প্রচারকের আগমন হয়েছে। তাঁদের অক্লান্ত চেষ্টা ও নিরলস সাধনার ফলে বাংলাদেশে ইসলাম শক্তিশালী ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আঠারো শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত আগমনকারী এ সব ইসলাম প্রচারকের মাত্র কয়েকজনের কাহিনী বিবৃত করা হলো। আঠারো শতকের প্রথমার্ধের পর থেকে নিয়ে অদ্যাবধি ইসলাম প্রচারের কাজ অব্যাহত রয়েছে।[১৪৫]

---

১৪৪. ড. এনামুল হক, *বঙ্গে সূফী প্রভাব* (ঢাকা: আফতাবিয়া খানকাহ শরীফ, ১৪২০ হিঃ); পৃ. ১৩৯
১৪৫. আবদুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০

তৃতীয় অধ্যায়
ঐতিহাসিক ফুরফুরা শরীফ

১ম পরিচ্ছেদ
পরিচয় ও মুসলিম বিজয়ের পূর্বে ফুরফুরা

পরিচয়

'ফুরফুরা' ছোট্ট একটি নাম। এ নামের পেছনে লুকিয়ে আছে প্রায় সোয়া সাতশত বছরের এক বিশাল ইতিহাস।[১৪৬] পূর্বে এ অঞ্চলে অমুসলিম বসতি ছিলো। মুসলিমাগণের আগমনের পর তাঁদের অব্যাহত প্রচেষ্টায় ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে অমুসলিম জনগণ, বিশেষত নিম্নবর্ণের নির্যাতিত হিন্দুরা দলে দলে ইসলমের সাম্য ও শান্তির ছায়াতলে আশ্রয় নিতে থাকে। ধীরে ধীরে গড়ে ওঠতে থাকে এক সমৃদ্ধ মুসলিম জনপদ।

বিভিন্ন দেশ থেকে দীনের স্বার্থে হিজরত করে ফুরফুরায় এসে যে সকল মুসলিম সর্বপ্রথম বসতি স্থাপন করেন তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বুজুর্গ ও ওলিআল্লাহ্ ছিলেন। নবী করীম (স.) ও তাঁর প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর বংশধরগণও ছিলেন। তাঁরা স্থায়ীভাবে ফুরফুরায় বসবাস করতে থাকেন এবং দীনের প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। সে থেকে শুরু।

পরবর্তীতে ঐসব বুজুর্গের বংশধরেরা, বিশেষত হজরত আবুবকর (রা.)-এর উত্তরসূরীরা দীন ইসলামের খিদমতে বহুমুখী কর্মসূচী নিয়ে শুধু ফুরফুরাতেই বসে থাকেননি। ফুরফুরার গন্ডি পেরিয়ে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছেন। এ দীর্ঘ সোয়া সাতশত বছরে ফুরফুরায় জন্মগ্রহণ করেন অগনিত ওলামা-মাশায়েখ ও আউলিয়ায়ে কিরাম। এঁদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেন। পীর আউলিয়ার পদস্পর্শে ধন্য পূণ্যভূমি ফুরফুরা ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে আজও দেখা যায় শত শত বুজুর্গের কবর ও এর ধ্বংসাবশেষ।

এ ফুরফুরাতেই উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সিদ্দিকী বংশে জন্মগ্রহণ করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলিম ও পীর আমীরুস্ শরীয়াত মুজাদ্দিদে যামান হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিক (র.)। তাঁর সময়কালকে ফুরফুরার স্বর্ণযুগ বলা যায়। তাঁর সময়ে ফুরফুরা বিশ্বব্যাপী হেদায়েতী কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। এ অঞ্চলে নতুন নতুন মাদ্রাসা, মসজিদ ও অন্যান্য দীনি প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। রাস্তাঘাট ও অবকাঠামোর উন্নয়ন ঘটে। দাতব্য হাসপাতাল ও পোস্ট অফিস প্রতিষ্ঠা হয়। অসংখ্য ওয়ায ও ইসালে সাওয়াব মাহফিল প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়। শিক্ষিতের হার ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। পথ হারা মানুষ পথের দিশা পায়। পুরো অঞ্চলে ইসলামী ভাবধারা ও কৃষ্টি কালচারের ব্যাপক প্রচলন ও চর্চা শুরু হয়।[১৪৭]

মুজাদ্দিদে যামান আবু বকর সিদ্দিক (র.)-এর হিদায়েতী তৎপরতা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়লে কোটি কোটি মানুষ হিদায়েত হয়। হাজার হাজার মস্‌জিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ্, ইয়াতীমখানা, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা হয়। তাঁর প্রায় ষাট হাজার খলীফার মাধ্যমে ফুরফুরার হক হেদায়েত পূর্বে চীন থেকে নিয়ে পশ্চিমে আফ্রিকার গহিন অরণ্য পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর ইন্তিকালের পর তাঁর পুত্রগণ, বিশেষত তাঁর স্থলাভিষিক্ত বড় ছেলে হযরত আব্দুল হাই সিদ্দিকী (র), তারপর তাঁর বড় ছেলে মুজাদ্দিদে জামান (র.)-এর পৌত্র হযরত আবুল আনসার মোঃ অব্দুল কাহ্‌হার সিদ্দিকী (র) এবং তাঁর বড় ছেলে ও স্থলাভিষিক্ত হযরত আবু বকর আব্দুল হাই মিশকাত সিদ্দিকী সাহেবের মাধ্যমে ফুরফুরার হক হিদায়েতী কার্যক্রম আরও অনেক দূর এগিয়ে গেছে এবং এখনও এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত গতিতে চলছে।[১৪৮]

---

১৪৬. আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান, *ফুরফুরার ইতিহাস* (ঢাকা: ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, ২০০৫ খ্রী.), পৃ. ৪৯
১৪৭. মুফতী আবূ জাফর সিদ্দিকী, *ফুরফুরা শরীফের ইতিহাস* (ঢাকা: সাগর্দী লাইব্রেরী, ১৩৪৩ বাং.), পৃ. ১৯
১৪৮. মুফতী আবু জাফর সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

অবস্থান

ভারতের পশ্চিম বঙ্গের হুগলী জেলা আয়তনে খুব বড় না হলেও বহু স্বনামধন্য বিদগ্ধ সুধীজনের জন্মভূমি ও কর্মময় ময়দান। ঐতিহ্যমন্ডিত হুগলী জেলার জাঙ্গীপাড়া থানার অন্তর্গত ফুরফুরা একটি অতি প্রাচীন নাম। জেলার মহকুমা শহর শ্রীরামপুর থেকে একুশ কিলোমিটার দূরে এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী মহানগরী কলকাতা হতে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে ফুরফুরা অবস্থিত।[১৪৯]

যাতায়াত ব্যবস্থা

যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নয়নের ফলে ফুরফুরার যাতায়াত এখন অত্যন্ত সহজ হয়ে গেছে। কলকাতা থেকে ফুরফুরা পর্যন্ত বাস সার্ভিস আছে। ট্যাক্সি ক্যাব রিজার্ভ করেও যাওয়া যায়।

বাংলাদেশ থেকে যেতে হলে ঢাকা থেকে সরাসরি কলকাতা পর্যন্ত বাস সার্ভিস আছে। ঢাকা হতে কলকাতা পর্যন্ত শ্যামলি, সোহাগ, গ্রীনলাইন সহ বিভিন্ন পরিবহনের এসি ননএসি বাস রাতদিন চলাচল করে। বর্তমানে ঢাকা থেকে সরাসরি কলকাতা পর্যন্ত ট্রেন চলাচল করছে।

কলকাতা থেকে শিয়াখালা হয়ে ফুরফুরা যেতে হয়। কলকাতা মনুমেন্টের নিকটস্থ বাস টার্মিনাল হতে অনেক বাস শিয়াখালা হয়ে বিভিন্ন রুটে চলাচল করে। শিয়াখালা হতে ফুরফুরার দূরত্ব তিন মাইল। এ পথটুকু বাস, ট্যাকার, অটোরিক্সা বা রিক্সায় করে ফুরফুরা যেতে হয়।

সময় ও খরচ কমাতে চাইলে বেনাপোল নেমে বর্ডার পার হয়ে কলকাতা না গিয়ে বনগা হয়ে বারাসাত থেকে ৮১ নং বাসে বেরাকপুরের ধূপিঘাটে নামতে হয়। তারপর নদী পার হয়ে ওপারে শ্রীরামপুর থেকে ৩১ নং বাসসহ অন্য যেকোনো বাসে ফুরফুরা যাওয়া যায়। প্লেনে দমদম এয়ারপোর্টে নেমে সারাসরি টেক্সিতে অথবা কলকাতা হয়ে বাসে ফুরফুরা যেতে হয়।

মুসলিম বিজয়ের পূর্বে

হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে ফুরফুরা এবং এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল মুসলিম শাসনাধীনে আসে। মুসলিম বিজয়ের পূর্বে এ অঞ্চল 'বালিয়া-বাসন্তী' নামে অভিহিত হত এবং একজন হিন্দু ভূস্বামী বা বাগ্‌দী রাজার অধীন ছিল। যদিও তখন বঙ্গদেশের শাসনকর্তা মুসলিম ছিলেন, তথাপি তিনি সম্পূর্ণরূপে সমস্ত বঙ্গদেশকে করায়ত্ত করতে পারেননি।

কথিত আছে যে স্থানে ভূস্বামীর বাস ছিল তা 'বাগ্‌দী রাজার গড়' নামে অভিহিত হত। বর্তমানে উক্ত স্থানটি 'চার-শহীদের গড় নামে খ্যাত। উক্ত ভূস্বামীর নাম ইতিহাস পুস্তকে পাওয়া যায় না। তবে তার বাড়ির সম্মুখে 'চন্দ্রপুকুর' নামে একটি পুকুর ছিল, তা থেকে অনুমান হয় রাজার নাম চন্দ্রনাথ কিংবা চন্দ্রমোহন ছিল।[১৫০] পার্শ্ববর্তী স্থানের নাম গোবিন্দপুর থাকায় অনেকের ধারণা রাজার নাম গোবিন্দচন্দ্র। সেকালে বালিয়া-বাসন্তীর প্রায় সকলেই হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তখন সেখানে কোন মুসলিমের বসতি ছিল কিনা তা সুস্পষ্টভাবে জানা যায় না। দু'এক ঘর মুসলিম থাকার কথা কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন, যদিও এ তথ্য নিশ্চিত নয়।

বালিয়া-বাসন্তী বিজয়ের শত বছর পূর্ব থেকে বঙ্গের বিভিন্ন নগর মুসলিম সুলতান কতৃক বিজিত হয়। একাধিক রাজ্য জয় করে বঙ্গে মুসলিম সালতানাত কায়েম করলেও সম্পূর্ণ বঙ্গের ওপর তাদের কর্তৃত্ব ছিল না। ফলে, বিভিন্ন রাজ্যে কতিপয় অমুসলিম নরপতির আমলে সংখ্যালঘুদের ওপর অমানুষিক যুল্‌ম ও অবিচার চলতে

---

১৪৯. আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

১৫০. মাওলানা সুলতান আহম্মদ, *ফুরফুরা শরীফের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস* (চাঁদপুর: মজুমদার লাইব্রেরী, ২০০৭ খ্রী.), পৃ. ১৪

থাকে। সে সব অত্যাচারের নির্মম কাহিনী সুলতানদের কর্ণগোচর হতে থাকে। ফলে সুলতান কর্তৃক মনোনীত সেনাপতিগণ বিভিন্ন রাজ্য আক্রমণ করে মুসলিম সালতানাত কায়েম করেন।[১৫১]
পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার জাঙ্গীপাড়া থানার 'বালিয়া' পরগনার 'বালিয়া-বাসন্তি' তখন অমুসলিম রাজা অর্থাৎ হিন্দু ভূস্বামী বাগ্দী রাজার অধীন ছিল। উক্ত পরগনায় মুষ্টিমেয় মুসলিম ব্যতীত অধিকাংশ গরীব, অশিক্ষিত ও নিম্নশ্রেণীর অমুসলিম অধিবাসীদের বসবাস ছিল। বালিয়া বাসন্তির ভূস্বামী সংকীর্ণমনা ও অত্যাচারী ছিলেন।[১৫২] আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটায় দস্যু-তস্করদের দৌরাত্ম্যে নৈরাজ্যের কালো ছায়া রাজ্যের জন-মানসে সর্বত্র বিরাজ করতে থাকে। রাজার অপশাসনে প্রজারা দুর্বিসহ অনিশ্চিত জীবন যাপন করতে থাকে। কর আদায়ের অজুহাতে যুল্ম, বিচার-আচারের নামে অবিচার-অনাচার, স্বজন-পোষণ, জাতিভেদ, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য ও অসহিষ্ণু মনোভাবের নির্মম কাহিনী সুলতানের কর্ণগোচর হয়।

হুগলী জেলার পাভুয়া পরগনার 'পাভুরাজার' অনুরূপ অত্যাচারের রোমাঞ্চকর কাহিনী সুলতান অবগত হন। হযরত শফিউদ্দীন শহীদ ওরফে শাহ্ সূফী সুলতান (র.) তখন পাভুরায় বসবাস করতেন। তারপর সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী জা'ফর খান গাজীর অধীনে বিরাট একদল সৈন্য বাংলা অভিযানে প্রেরণ করেন। ঐ দলে হজরত শাহ্ সূফী সুলতান ও হযরত সৈয়দ হোসেন বুখারী (র.) প্রমূখ উচ্চশ্রেণীর বুযুর্গ ব্যক্তিগণও প্রেরিত হন। হযরত শাহ্ সূফী সুলতান ছিলেন হযরত শরফুদ্দীন বু-আলী কলন্দরের স্নেহভাজন খলীফা এবং সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী হজরত বু- আলী কলন্দরের খুবই ভক্ত ছিলেন।

হজরত শাহ্ সূফী সুলতানের পরামর্শক্রমে উক্ত প্রেরিত সৈন্যদল দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে হযরত শফিউদ্দীন ওরফে শাহ্ সূফী সুলতানের নেতৃত্বে জা'ফর খান গাজীসহ 'পাভুয়া ' অভিযান করেন। এ অভিযানে পাভুরাজার সঙ্গে যুদ্ধে হযরত শাহ্ সূফী সুলতান শহীদ (৬৯৫হিজরী) হন। এবং পাভুয়া বিজিত হয়। তার তিন বছর পর (৬৯৮ হিজরী মোতাবেক ১২৯৮ খ্রীস্টাব্দে) জা'ফর খান গাজী সংগ্রামে জয় করেন।[১৫৩]

হজরত শাহ্ সূফী সুলতান (র.)-এর আদেশে হযরত সৈয়দ হোসেন বুখারী (র.)-এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী 'বালিয়া বাসন্তি' অভিমূখে গমনপূর্বক রাজবাড়ির সন্নিকটে শিবির সন্নিবেশ করেন। রাজা মুসলমানদের আগমন বার্তা পেয়ে বহু সৈন্যসহ সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হন। সারাদিন তুমুল সংগ্রামের পর সন্ধ্যা সমাগমে যুদ্ধ স্থগিত রাখা হয়। প্রথম দিনের যুদ্ধে রাজার বহু সৈন্য হতাহত হয়। পরদিন পুনঃযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় রাজার সৈন্যসংখ্যা মুসলিম সৈন্য সংখ্যার দ্বিগুণ দেখে মুসলিম সেনাপতি চিন্তান্বিত হন। ঐ দিনের ভীষণ যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে হযরত শাহ্ সোলায়মান (র.) সহ অন্যান্য বহু বুযুর্গ সৈন্য শহীদ হন।[১৫৪] এ ঘটনায় সেনানায়ক হযরত সৈয়দ হোসেন বুখারী (র.) চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে দরবারে এলাহিতে অশ্রুসিক্ত হয়ে জিহাদে ফতেহ (যুদ্ধে জয়লাভ) হওয়ার জন্য ফরিয়াদ করতে থাকেন। এমন সময় তিনি তন্দ্রাভিভূত (ধ্যানমগ্ন) অবস্থায় জানতে পারেন, কে যেন বলছেন– "ঐ রাজার বাড়িতে 'জিয়ত কুন্ড' নামে একটি পুকুর আছে, তথায় 'দুষ্ট জিন' প্রভৃতি বাস করে। আহত সৈন্যদের তাতে নিক্ষেপ করলে, উক্ত দুষ্ট জিনরা তার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে অসীম বলশালী করে তোলে। এ নিমিত্তে তার সৈন্য হ্রাস পাচ্ছে না । যদি কোনো উপায়ে তাতে একখন্ড 'গরুর গোস্ত' নিক্ষেপ করা যায়, তাহলে উক্ত 'দুষ্ট জিন' প্রভৃতি পলায়ন করবে; কাজেই, ওদের সমস্ত শক্তি বিনষ্ট হয়ে যাবে। "[১৫৫]

উক্ত নিগূঢ় রহস্য জানতে পেরে তিনি মহান আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের দরবারে শোক্র গোজারী করতে লাগলেন এবং কী উপায়ে উক্ত কাজ সমাধা করা সম্ভব হয় সে বিষয়ে চিন্তা করতে থাকেন। এমন সময় তিনি খবর পেলেন যে, "উক্ত রাজা মেহমানদের অত্যন্ত সমাদর করেন এবং আহারাদি না করিয়ে কোনরূপেই তাঁকে বিদায় দেন না।"[১৫৬]

---

১৫১. আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

১৫২. মোঃ মোবারক আলী রহমানী, *ফুরফুরা শরীফের ইতিবৃত্ত* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৪ খ্রী.), পৃ. ০৯

১৫৩ . স্যার যদুনাথ সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

১৫৪ . হযরত শাহ্ সোলায়মান শহীদ (র.)- এর মাযার ফুরফুরা শরীফের গঞ্জে শোহাদার পূর্ব পার্শ্বে বিরাট 'গাবগাছ' মূলে বিদ্যমান। তালতলা হাটের দক্ষিণ-পূর্ব কোনে বিরাট গোরস্থানে শহীদানের মাযার আছে। উক্ত গোরস্থান থেকে পূর্বদিকে অনতিদূরে উল্লিখিত শহীদানের মাযার বিরাজ করছে। উক্ত স্থানটি গঞ্জে শোহাদা নামে খ্যাত। উদ্ধৃত: মোঃ মোবারক আলী রহমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

১৫৫. ড.এনামুল হক, The muslim Sufism in Bengal, উদ্ধৃত: মোঃ মোবারক আলী রহমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

১৫৬. মোঃ মোবারক আলী রহমানী, *ফুরফুরা শরীফের ইতিবৃত্ত* (ঢাকা: ইসকলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১৩ খ্রী.), পৃ. ১০

তিনি এক টুকরো গরুর গোশ্‌ত লুকিয়ে নিয়ে সাধু-দরবেশদের ন্যায় ছদ্মবেশ ধারণ করে রাজবাড়ির অনতিদূরে বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হয়ে ধ্যান করতে থাকেন। রাজা সাধুবেশী দরবেশের উপস্থিতি সংবাদ অবগত হয়ে তাঁকে আমন্ত্রণ করে সমাদরে আহারাদি করিয়ে স্বসম্মানে বিদায় করার জন্য রাজকর্মচারীদের প্রতি আদেশ দেন। রাজার নির্দেশে কর্মচারীরা নানাবিধ উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য নিয়ে তাঁকে গ্রহণ করার জন্য সাধ্য-সাধনা করতে থাকেন। কিন্তু ছদ্মবেশী সাধু-দরবেশ তৎপ্রতি কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করলেন না। রাজকর্মচারীরা বিফল মনোরথ্ হয়ে রাজাকে সবিশেষ জ্ঞাত করেন। তৎশ্রবণে রাজা স্বয়ং উপস্থিত হয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তাঁকে রাজবাড়িতে গমনপূর্বক আহারাদি গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেন। এ সুবর্ণ সুযোগে ছদ্মবেশী সৈয়দ হোসেন বুখারী (র.) রাজাকে বললেন, "আমি দীর্ঘদিন যাবৎ গোসল করিনি, গোসল না করে আহারাদি গ্রহণ করতে চাই না; অদ্য 'জিয়ত কুন্ডে' গোসল করতে পারলে ধন্য হবো।"[১৫৭] রাজা তাঁর দীপ্তময় চেহারা ও আচার-আচরণে মুগ্ধ হয়ে অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে রাজবাড়িতে নিয়ে গেলেন এবং তাঁকে 'জিয়ত কুন্ড' পুষ্করিণীটি দেখিয়ে দিয়ে গোসল করার অনুরোধ করেন।

রাজা 'অন্দর-মহলে' সম্মানিত রাজ অতিথি আপ্যায়নে ও রাজকর্মচারীরা স্ব স্ব কাজে ব্যস্ত; এ সুযোগে হযরত সৈয়দ হোসেন বুখারী (র.) গোসল করার বাহানায় লুক্কায়িত গরুর গোশ্‌ত 'জিয়ত কুন্ডে' নিক্ষেপ করেন। গোশ্‌ত খন্ড 'জিয়ত কুন্ডে' নিক্ষিপ্ত হওয়া মাত্রই ভয়াবহ বিকট শব্দ হতে থাকে, ফলে রাজবাড়ির সমস্ত মানুষ-জিন সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পতিত হয়। ইত্যবসরে তিনি ঐ স্থান থেকে প্রস্থান করতঃ শিবিরে প্রত্যাবর্তন করেন। উল্লিখিত ভয়ঙ্কর শব্দ আর কিছুই নয়; 'জিয়ত কুন্ডে' যে সমস্ত দুষ্ট জিন প্রভৃতি ছিল , ঐরূপ বিকট শব্দ করে দুষ্ট জিনেরা ঐ স্থান থেকে পালিয়ে যায়।

পরদিন সকালে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হলে, পরিণামে উভয়পক্ষের বহু সৈন্য হতাহত হয়। বাগ্‌দী রাজা (চন্দ্রনাথ/চন্দ্রমোহন/গোবিন্দচন্দ্র) আহত সৈন্যগণকে পূর্বের ন্যায় 'জিয়ত কুন্ডে' নিক্ষেপ করেন; কিন্তু অদ্য একজন সৈন্যও ক্ষমতাসম্পন্ন হলো না, বরং পানিমগ্ন হয়ে সত্বর প্রাণত্যাগ করলো। রাজা চিন্তা-ভাবনায় নিরুপায় হয়ে অবশেষে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর রাজার শরণাপন্ন হওয়ায়ার উদ্দেশ্যে অবশিষ্ট সৈন্যসহ পলায়ন করেন।[১৫৮]

চার-সহোদরের পশ্চাদধাবন ও শাহাদাত

মুসলিম সেনাপতির আদেশে চার-সহোদর যথা ঃ ১. হযরত শাহ্ সৈয়দ খায়রুর রহমান ২. হযরত শাহ্ সৈয়দ তাবিবর রহমান ৩. হযরত শাহ্ সৈয়দ আবিদুর রহমান ৪. হযরত শাহ্ সৈয়দ ফয়জুর রহমান (রহমাতুল্লাহি 'আলাইহিম)।[১৫৯] পলায়নরত রাজার সৈন্যদের পশ্চাদধাবন করেন। মুসলিম সেনাবাহিনীতে সম্ভবত অশ্বারোহী সৈন্য অতি অল্পই ছিলেন।[১৬০] অশ্বারোহী চারজন রাতের শেষ প্রহরে 'কাগমারী মাঠে'[১৬১] শত্রুসেনার সম্মুখীন হন। নিশা অবসানের পূর্বে তখনও অন্যান্য মুসলিম সৈন্যগণ উপস্থিত হতে না পারায় প্রাতঃকালে পলায়নমান রাজা সৈন্যদের সাথে উক্ত চারজনের তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। রাজার বহু সৈন্যের মুকাবিলায় চারজন অসীম বিক্রমে বহু সময় যুদ্ধ করে অনেক শত্রুসেনা হত করেন। অবশেষে তাঁরা শাহাদাত বরণ করেন, 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন'। রাজা বিষ্ণুপুরে পলায়ন করেন।[১৬২]

চার শহীদের আস্তানা

---

১৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
১৫৮ .আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫
১৫৯ . কোন কোন বুযুর্গ তাঁদের নাম নিরূপণে বলেন– ১. হযরত শাহ্ সৈয়দ মোহাম্মদ শাহ্ ২. হযরত শাহ্ সৈয়দ মোহাম্মদ শরীফ ৩. হযরত শাহ্ সৈয়দ মোহাম্মদ ফরিদ ৪. হযরত শাহ্ সৈয়দ মোহাম্মদ খারওয়া (রাহমাতুল্লাহি 'আলাইহিম)। উদ্ধৃত: মোঃ মোবারক আলী রহমানী, প্রাগুক্ত, পৃ.১২
১৬০ . আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮
১৬১ . বর্তমানে কাগমারী মাঠের কোন নাম-নিশানা পাওয়া যায় না। উক্ত চার শহীদের সুশিক্ষিত ঘোড়া তাঁদের লাশ মুবারক বহন করে নিয়ে আসে, মস্তক তথায় বিচ্ছিন্নভাবে থেকে যায়। লাশ মুবারক ফুরফুরা শরীফে দাফন করা হয়। পরবর্তীকালে বাঁদপুর গ্রামে উক্ত ঘোড়াগুলো দাফন করা হয়। উদ্ধৃত: মোঃ মোবারক আলী রহমানী, প্রাগুক্ত, পৃ.১২
১৬২ . প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

মুসলিম সেনাপতি উক্ত হৃদয়বিদারক শোক সংবাদে অত্যন্ত মর্মাহত হন। তাঁদের মস্তকহীন দেহ বালিয়া-বাসন্তিতে (ফুরফুরা শরীফে) আনয়ন করে শাহী মর্যাদা সহকারে দাফন করেন এবং তদুপরি এক 'স্মৃতি সৌধ' নির্মাণ করেন। অদ্যাবধি উক্ত সৌধ-শিখর স্বগর্বে অমর শহীদের অক্ষয় কীর্তি ঘোষণা করছে। উক্ত স্থান এখন 'চার-শহীদের আস্তানা' নামে প্রসিদ্ধ। এখানে প্রতি মাসের ফাল্গুন মাসের দ্বীতিয় শনিবার ঈসালে সওয়াব হয় এবং অসংখ্য ধর্মপ্রাণ মানুষ যিয়ারত করে নিজেকে ধন্য মনে করেন। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত শহীদানের মস্তক মুবারক দেহচ্যুত হয়েছিল বিধায় তাঁদের মস্তক মুবারক উক্ত 'কাগমারি–মাঠেই' দাফন করা হয়। বর্তমানে কাগমারি মাঠের কোন নাম-নিশানা পাওয়া যায় না। উক্ত চার শহীদের সুশিক্ষিত ঘোড়া তাঁদের লাশ মোবারক বহন করে নিয়ে আসে। মস্তক তথায় বিচ্ছিন্নভাবে থেকে যায়। পরবর্তীকালে বাঁদপুর গ্রামে উক্ত ঘোড়াগুলো দাফন করা হয়। অন্যান্য শহীদের লাশ ফুরফুরা শরীফের দক্ষিণ প্রান্তে একস্থানে দাফন করা হয়। অনেক কাশ্‌ফসম্পন্ন মানুষের ধারণা, তালতলা হাটের পাশের গোরস্থানে কোন কোন বীর মুজাহিদের কবর আছে।[১৬৩]

উক্ত হযরতগণের শাহাদাতের রক্তের বিনিময়ে 'বালিয়া-বাসন্তি' পরগনায় শান্তির বিজয় নিশান উড্ডীন হয়। সে সময় হতে উক্ত বালিয়া-বাসন্তীর নাম 'হযরতে ফুরফুরা শরীফ' রাখা হয়।[১৬৪]

ফুরফুরা নামকরণ

বহু শহীদের রক্তের বিনিময়ে বালিয়া-বাসন্তি পরগনায় ইসলামের সাম্য ও শান্তির বিজয় নিশান উড্ডীন হয়। সে সময় হতে উক্ত বালিয়া-বাসন্তির নাম 'হযরতে ফুরফুরা' রাখা হয়। জনাব হযরত মাওলানা শামসুল ওলামা গোলাম সালমানী (র.) বলেন ঃ 'ফুরফুরা' শব্দটি 'পুরফরা' হতে সমুৎপন্ন হয়েছে। 'পুর' অর্থ পূর্ণ আর 'ফরা' শব্দের অর্থ আনন্দ। এ অঞ্চল মুসলিমগণ দখল করে পূর্ণ আনন্দ লাভ করেছিলেন বিধায়, এরূপ নামকরণ করা হয়েছে।

কেহ কহ বলেন- 'ফুরফুরা' শব্দটি আরবী 'ফাররে ফারাহ' শব্দের অপভ্রংশ। আরবী ভাষায় 'ফাররে' শব্দের অর্থ জাকজমক আর 'ফারাহ' শব্দের অর্থ আনন্দ। মুসলিমগণ অতি জাকজমক ও আনন্দের সাথে এ অঞ্চল দখল করেছিলেন। এজন্যই এ স্থানের নাম ফুরফুরা রাখা হয়েছে।

আবার অনেকের মতে, 'ফুরফুরা' এ শব্দটি 'ফরফরা' শব্দের রূপান্তর। কেননা 'ফরফরা' অর্থ দ্রুত। যেহেতু মুসলিমগণ অতি দ্রুত এ অঞ্চল দখল করেছিলেন বিধায়, এ স্থানের নাম ফুরফুরা রাখা হয়েছে।
উক্ত ঘটনাত্রয়ের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারলাম যে, ফুরফুরা শব্দের রহস্য ও বিশিষ্টতা মুসলমানদেরই বিজয় গৌরব বহন করছে।[১৬৫]

'বালিয়া-বাসন্তি' বিজয় সংবাদ দিল্লীর বাদশাহ অবগত হয়ে অতিশয় আনন্দিত এবং শহীদানের মৃত্যু সংবাদে যুগপৎ দুঃখিত হলেন। কেননা তাঁরা সুলতানের বিশ্বস্ত কর্মচারী ও প্রিয়পাত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন । তারপর বাদশাহ বঙ্গদেশের নবাব (সুলতান) বাহাদুরের নিকট এ মর্মে আদেশ দেন যে, "যে সকল মুসলমান 'বালিয়া বাসন্তি' জয় করে হযরতে ফুরফুরার বসতি স্থাপন করেছেন, তাঁদেরকে জায়গীর প্রদান করুন।" বাদশাহের উক্ত আদেশে বাংলার নবাব (সুলতান) মুসলমানদেরকে 'জায়গীর' নিষ্কর জমি এবং যৎকিঞ্চিৎ করবিশিষ্ট বহু জমি প্রদান করেন। উক্ত নিষ্কর জমি 'আয়মা' এবং তার মালিকগণ 'আয়মাদার' নামে অভিহিত। অদ্যাবধি 'আয়মা' সম্পত্তি আয়মাদারগণ বংশ পরম্পরায় ভোগদখল করে আসছেন।

বর্তমানে ফুরফুরা, বেলপাড়া, রামপাড়া, আকুনি, বাঁদপুর, সাদপুর, কুতুবপুর, সীতাপুর, গাজীপুর, সুফিজঙ্গল, মোল্লাসিমলা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি বহু স্থানে আয়মাদারগণ বসবাস করছেন। ঐতিহাসিক ফুরফুরার অতীতের স্মৃতি মন্থন করলে আমরা জানতে পারি, ফুরফুরা ও এর পার্শ্ববর্তী ঐতিহ্যবাহী 'আয়মাদারগণ' এ দেশের অধিবাসী

---

১৬৩ . আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬
১৬৪ . অন্যান্য শহীদের 'লাশ মুবারক' ফুলফুরা শরীফের দক্ষিণ প্রান্তে একস্থাসে দাফন করা হয়; উক্ত স্থানকে 'গঞ্জে শোহাদা' বলা হয়। অনেক কাশ্‌ফ শক্তিসম্পন্ন মানুষের ধারণা তালতলা হাটের পার্শ্বের গোরস্থানে কোন কোন বীর মুজাহিদের কবর অছে। উদ্ধৃত: মোঃ মোবারক আলী রহমানী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯
১৬৫ . মুফতী আবু জাফর সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৮

ছিলেন না। তাঁরা বিদেশ থেকে এসেছিলেন। তাঁদের বংশের ধারা (Family Tradtion) বঙ্গের অধুনা মুসলিম থেকে স্বতন্ত্র।

ফুরফুরার আয়মাদারগণের জীবনযাত্রা অন্যান্য গ্রামবাসীদের সাথে একাত্ম হয়ে মিশে গেলেও তাঁদের আচার-আচরণ, পরিবেশ-রুচি, ভাষা-ভাবধারায় স্বতন্ত্র ইঙ্গিত বহন করে। তাঁদের মেহমানদারীর খেয়াল এখনও পূর্বের ন্যায় বিদ্যমান। সাধ্যানুযায়ী চেষ্টার ত্রুটি বা কৃপণতার লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় না। পর্দা-পুশিদার তন্বি এখনও প্রশংসনীয়। পাক-প্রণালী সম্পূর্ণ নিজস্ব ধারায়। আমীর-গরীব নির্বিশেষে আয়মাদারদের সে 'পেট-কাটা' দহজিল (বৈঠকখানা) এখনও অতীত দিনের সম্ভ্রান্ত বংশীয় ভাবধারার নমুনা বহন করছে। শিক্ষা-দিক্ষা, ইশা'আতে ইসলাম (ইসলাম প্রচার), পীর-মুরীদি, মাদ্রাসা-মক্তব, খানকা, জনকল্যাণকর সংস্থা স্থাপন প্রভৃতি খেদমতী চিন্তাধারা পূর্বের ন্যায় অদ্যাবধি বিদ্যমান।

স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জীবিত আয়মাদারগণ আল্লাহ্‌ভীরু গুণীজন ছিলেন। নিষ্কর সম্পত্তি ভোগদখল করার সুবাদে স্বাচ্ছন্দময় জীবনে সুশিক্ষার সুবন্দোবস্ত তখন থেকেই প্রচলিত। এমনকি অভিজ্ঞ আলিমগণ নিজেদের তত্ত্বাবধানে স্ব স্ব গৃহে দেশ-বিদেশের শিক্ষার্থীদের আরবী, ফার্সী ও উর্দু প্রভৃতি ভাষায় তা'লীম দিতেন। অদ্যাবধি ঐ সব শিক্ষাগারের স্মৃতি বিদ্যমান।[১৬৬]

---

১৬৬ . আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান, ফুরফুরার ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

২য় পরিচ্ছেদ
বালিয়া-বাসন্তী বিজয়ের সময়কাল

সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলা। জেলাটি আয়তনে খুব বড় না হলেও বহু স্বনামধন্য বিদগ্ধ সুধীজনের জন্মভূমি ও কর্মময় ময়দান। ঐতিহ্যমন্ডিত হুগলী জেলার জাঙ্গীপাড়া থানার অন্তর্গত বালিয়া পরগনার অধীন 'বালিয়া-বাসন্তী' প্রাচীন স্থান।

৭৯৬ হিজরীতে যখন 'সুলতান গিয়াসউদ্দীন' ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী স্থানসমূহ হস্তগত করার অভিলাশ করেন, তখন বাঙ্গালার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামীদিগকে দমন করার নিমিত্তে সৈন্য প্রেরণ করেন, এতদসহ উচ্চশ্রেণীর ওলি-আল্লাহ্‌গণও প্রেরিত হয়েছিলেন। তন্মধ্যে হযরত শাহ্ সূফী সুলতান (র.) কে একদল পরাক্রমশালী সৈন্য সমভিব্যাবহারে বঙ্গদেশাভিমুখে প্রেরণ করেন। তিনি বিশ্রাম করার নিমিত্তে একস্থানে উপবেশনপূর্বক হুগলী জেলার অন্তর্গত 'পাড়ুয়া' ও 'বালিয়া-বাসন্তী' আক্রমণ করার নিমিত্তে পরামর্শান্তে সৈন্যদলকে দু'ভাগে বিভক্ত করেন। স্বয়ং একদল সৈন্যসহ 'পাড়ুয়া' অভিমুখে যাত্রা করেন এবং অন্য দলকে (এই দলে হযরত মনসুর বাগদাদী (র.) ছিলেন) সেনাপতি হযরত শাহ হোসেন বুখারী (র.)-এর সমভিব্যাহারে 'বালিয়া-বাসন্তী' অভিমুখে প্রেরণ করেন।[১৬৭]

ফেনী মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা ওবায়দুল হক সাহেব কৃত "বাংলাদেশের পীর-আউলিয়াগণ" পুস্তকে সন-তারিখ ও বাদশাহদের নামোল্লেখ না থাকলেও হযরত সৈয়দ হোসেন বুখারী (র.) যে হযরত শাহ্ সূফী সুলতান (র.)-এর মনোনীত সেনানায়ক ছিলেন, তার উল্লেখ পাওয়া যায়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা থেকে প্রকাশিত অবু ফাতেমা মোহাম্মদ ইসহাক সাহেব 'হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (র.)' পুস্তকে ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের (ইসলাম প্রসঙ্গ থেকে) উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন- 'হযরত মাওলানা মনসুর বাগদাদী (র.) (যাকে ফুরফুরা বিজয়ী সেনানায়ক হযরত সৈয়দ হোসেন বুখারী (র.)-এর সাথী বলে উল্লেখ আছে) ৭৪১ হিজরীতে ভারত সম্রাট আলাউদ্দীন খিলজীর রাজত্বকালে বাগদাদ থেকে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের হুগলীর মোল্লাপাড়া গ্রামে আসেন। হযরত মাওলানা মনসুর বাগদাদী (র.)-এর ওয়ালেদ হযরত জিয়াউদ্দীন জাহেদ, হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়ার সমসাময়িক ছিলেন।

অন্যান্য আরও পুস্তকে ফুরফুরা বিজয়ী হযরত সৈয়দ হোসেন বুখারী (র.) হযরত শাহ সুফী সুলতান (র.)-এর মনোনীত সেনানায়ক এবং হযরত মাওলানা মনসুর বাগদাদী (র.)-কে উক্ত বিজয়ী দলভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন।[১৬৮]

৭৯৬ হিজরী সনে সুলতান গিয়াসউদ্দীন প্রেরিত সৈন্যদল কর্তৃক ফুরফুরা বিজয়ী বলে আলোচনা করলে এ তথ্য অসত্য প্রমাণিত হবে। কেননা ৭৯৬ হিজরী সন দিল্লীতে সুলতান গিয়াসউদ্দীনের রাজত্বকাল ছিল না। তখন দিল্লীর সুলতান ছিলেন আলাউদ্দীন সিকদার শাহ্ (১৩৯৩-১৩৯৪ খৃ.) এবং তখন বাংলার সুলতান ছিলেন গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ্ (১৩৮৯-১৪০৯ খৃ.)। পক্ষান্তরে ৭৪১ হিজরী সনে ভারত সম্রাট আলাউদ্দীন খিলজীর রাজত্বকাল ছিল না। সুলতান আলাউদ্দীনের রাজত্বকাল ৬৯৫ হিজরী মুতাবিক ১২৯৬ খৃস্টাব্দ। দিল্লী ও বাংলাদেশে সুলতান আলাউদ্দীন ও সুলতান গিয়াসউদ্দীন নামে একাধিক ব্যক্তি রাজত্ব করেছেন। তাঁদের সময় ও কালের যথেষ্ট ব্যবধান ছিল।

ঐতিহাসিকদের বিপুল তথ্যের প্রতি হয়তো অনেক লিখকের গভীর দৃষ্টি পড়েনি, ফলে সামনে পাওয়া নাম অনুযায়ী সন-তারিখ উল্লেখ করেছেন; কিংবা ইংরেজী (খৃস্টাব্দ) সাল 'সূর্যবর্ষ' এবং হিজরী সাল 'চন্দ্রবর্ষ' উল্লেখ

---

১৬৭. মোহাম্মদ রুহুল আমীন, *ফুরফুরা শরীফের পীর মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (র.)-এর বিস্তারিত জীবনী* (ঢাকা: ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, ১৩৯৬ বাং.), পৃ. ৪৯

১৬৮ . আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

করেছেন। চন্দ্রবর্ষ ও সূর্যবর্ষের মধ্যে প্রায় দশদিন কম-বেশি ব্যবধান হয়ে থাকে। হয়তো সেদিকে অনেকে খেয়াল করার অবকাশ পননি।

আবার অনেকে মালদহের 'গৌড়-পান্ডুয়া এবং 'ছোট-পান্ডুয়া' কে এক ধরে নিয়েছেন। কিংবা হযরত শাহজালাল মুজাররদ ইয়ামানী, হযরত শাহজালালউদ্দীন তাবরিজী, হযরত শাহজালালউদ্দীন জাঁহানিয়া জাঁহাগাশ্ত নামক তিনজন 'জালাল' কে এক ধরে নিয়েছেন। অথচ প্রত্যেক শাহজালালের আগমনকাল ভিন্ন ভিন্ন। ফলে ইতিহাসের বিকৃতরূপ নিয়ে বিষয়টি জটিল হয়ে পড়েছে।

বিভিন্ন জীবনী ইতিহাস পুস্তকে আমরা দেখতে পাই, হযরত শাহজালাল মুজাররদ ইয়ামানী (র.)-এর সিলেট আগমনকাল সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন সন তালিকা উল্লেখ আছে। আব্দুল মালেক চৌধুরীকৃত 'হযরত শাহজালাল' পুস্তকে, মৌলভী আব্দুল গফুর নচ্ছাখ তাঁর জীবনী পুস্তকে, এম.ওবায়দুল হক কৃত 'বাংলাদেশে পীর-আউলিয়াগণ' পুস্তকে, মাওলানা মোয়েজদ্দীন হমিদী সাহেব 'পাক-ভারতের আউলিয়া' পুস্তকে, নাছিরউদ্দীন হায়দার কৃত 'সুহাইল-ই-ইয়ামন' পুস্তকে, ডক্টর এনামুল হক প্রণীত 'বঙ্গে সুফি প্রভাব' পুস্তকে, সার যদুনাথ সরকার কৃত 'History of Bengal' পুস্তকে, ডক্টর আব্দুল গফুর সিদ্দিকী কৃত 'পীর গোরাচাঁদ' ও শামসুল আলম কৃত 'হযরত শায়খ জালাল' (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা) পুস্তকে ভিন্ন ভিন্ন সন উল্লেখ থাকলেও অধিকাংশ নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক সুলতান আলাউদ্দীন খিলজীর রাজত্বকালে সিলেট বিজয় ঘটেছিল বলে উল্লেখ করেছেন।

আর স্বতঃসিদ্ধ মত এ যে, হযরত শাহ্ সূফী সুলতান (র.) কর্তৃক পান্ডুয়া বিজয়কালেই 'ফুরফুরা' (বালিয়া-বাসন্তী) বিজয় হয়। প্রকাশ থকে যে, সিলেট বিজয়ী হযরত শাহজালাল মুজাররদ ইয়ামানী (র.)-এর দলে ৩৬১ জন অলি-আল্লাহ্ ছিলেন। উক্ত দলে হযরত সৈয়দ আব্বাস আলী ওরফে পীর গোরাচাঁদ (হাড়োয়া, বাসিরহাট মহকুমা, চব্বিশ পরগনা) (র.) শামিল ছিলেন। সৈয়দ আব্বাস আলী (র.)-এর নেতৃত্বে বাইশজন আউলিয়ার একটি দল দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে প্রেরিত হন। উক্ত বাইশ আউলিয়ার দল চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসাত মহকুমার অন্তর্গত 'রায়কোলা' (পূর্বে দেবদাসপুর, পরে রায়কহিলা) শাহী মস্‌জিদে অবস্থান করেন, সেখানথেকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েন। বাইশ আউলিয়ার দলে শাহ্ সূফী সুলতান (র.) ছিলেন।[১৬৯]

দিল্লীর বাদশাহ আলাউদ্দীন খিলজীর রাজত্বকালে হযরত শাহজালাল (র.)-এর সময় সিলেট বিজয়, হযরত শফিউদ্দীন গাজী ওরফে শাহ্ সূফী সুলতান (র.) কর্তৃক পান্ডুয়া বিজয় এবং তাঁরই নির্বাচিত সেনানায়ক হযরত সৈয়দ হোসেন বুখারী (র.) ফুরফুরা বিজয় সূত্র নির্ণয় করা ন্যায়সঙ্গত।

বাংলা একাডেমী, ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'তাবাকাত-ই-আকবরী' পুস্তকের ২৬৯ পৃষ্ঠায় সুলতান আলাউদ্দীনের রাজত্বকাল ৬৯৫ হিজরী থেকে ৭১৫ কিংবা ৭১৬ হিজরী (১২৯৬-১৩১৬ খৃ.) সন উল্লেখ করা হয়েছে। সার যদুনাথ সরকার তাঁর History of Bengal V0l-II পুস্তকে এবং ড. এনামুল হক সাহেব কৃত Muslim Sufism in Bengal পুস্তকে সুলতান আলাউদ্দীন খিলজীর রাজত্বকালে সিলেট বিজয় হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন।[১৭০] এমনকি ড.হক সাহেব ও ড.আব্দুল গফুর সিদ্দিকী ছোট পান্ডুয়ার হযরত শফিউদ্দীন শহীদ ওরফে শাহ সূফী সুলতান (র.) কে সুলতান আলাউদ্দীনের ভাগ্নে বলে উল্লেখ করেছেন। হযরত শাহ সূফী সুলতান (র.) শেখ শরফুদ্দীন বু-আলী কলন্দরের খলীফা ছিলেন। তাঁর দোয়া নিয়ে বিজয় অভিযানে রওয়ানা হন। জাফর খান গাজীও তাঁর সাথী ছিলেন।

তাজকিরাতুল আউলিয়া (৫ম খন্ডে) পুস্তকে বর্ণিত আছে সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী হযরত শেখ শরফুদ্দীন বু-আলী কলন্দর (র.)-এর খুবই ভক্ত ছিলেন এবং আমীর খসরু মারফত তাঁর দরবারে তোহ্‌ফা পাঠাতেন। হযরত বু-আলী কলন্দর (র.) সুলতানুল মাশায়েখ হযরত নিজামউদ্দীন আউলিয়া (র.)-এর অন্যতম প্রধান খলীফা ছিলেন। হযরত বু-আলী কলন্দর (র.)-এর জন্ম ৬০৫ হিজরী এবং মৃত্যু ৭২৪ হিজরী।[১৭১]

১৬৯ . তারিক মুহাম্মদ মুত্তাকী বিল্লাহ, *এই সেই ফুরফুরা শরীফ* (হুগলী: হেদায়াতুল মুসলিমীন লাইব্রেরী, ১৯৮৫ খ্রী.), পৃ. ৬০
১৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫
১৭১ . আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

সুলতান আলাউদ্দীন খিলজীর রাজত্বকালে সুলতানুল মাশায়েখ হজরত নিজামউদ্দীন আউলিয়া (র.) জীবিত ছিলেন। আমীর খসরু তাঁর খলীফা ছিলেন। আমীর খসরু তাঁর দরবারে সুলতানের 'তোহ্‌ফা' নিয়ে যেতেন। তাঁর জন্ম ৬৩৬ হিজরী, মৃত্যু ৭২৪ হিজরী। সিলেট বিজয়ের পূর্বে হযরত শাহজালাল (র.) দিল্লীতে অবস্থানকালে সুলতানুল মাশায়েখ নিজামউদ্দীন আউলিয়া (র.)-এর সাথে তাঁর খুবই হৃদ্যতা ছিল।

বিস্তারিত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, হযরত নিজামউদ্দীন আউলিয়া(র.), হযরত শায়খ শরফুদ্দীন বু-আলী কলন্দর (র.), হযরত শাহজালাল মুজাররদ ইয়ামানী (র.), হযরত শফিউদ্দীন শহীদ ওরফে শাহ্ সূফী সুলতান (র.), জাফর খান গাজী (র.), হযরত জিয়াউদ্দীন জাহেদ খোরাসানী (র.), হযরত শাহ্ কড়ক (র.), কাজী রুকনউদ্দীন (র.) প্রমুখ এবং সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী, আমীর খসরু প্রমুখ সমসাময়িক ছিলেন। প্রায় সকলের মৃত্যুকাল হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগের মধ্যে।

প্রকাশ থাকে যে, হযরত শাহ্ সূফী সুলতান শহীদ (র.) ও সৈয়দ হোসেন বুখারী (র.) একই সময়ে উভয় অভিযান পরিচালনা করেন। হযরত শাহ্ সূফী সুলতান (র.) পাণ্ডুয়া বিজয়ের যুদ্ধে শহীদ হন হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে (৬৯৫ হিজরী)। সঙ্গত কারণে আমরা ঐ সময়কেই ফুরফুরা বিজয়ের সাল হিসেবে ধরে নিতে পারি। ঐ সময় দিল্লীর বাদশাহ ছিলেন সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী (হিজরী ৬৯৫-৭১৬) ও বাংলার সুলতান ছিলেন রুকনউদ্দীন কায়কাউস (৬৯০-৭০১ হিজরী)।

৬৯৫ হিজরীতে শাহ্ সূফী সুলতান শহীদ ও জাফর খান গাজী পাণ্ডুয়া বিজয় করেন। ৬৯৮ হিজরীতে জাফর খান গাজী হুগলী জেলার সপ্তগাঁয়ের (সাতগা) মতুক রাজাকে পরাজিত করে 'সপ্তগ্রাম' জয় করেন। ৬৯৮ হিজরীর শিলালিপাতে এ তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। খুব সম্ভব এ সময়ের মধ্যে (৬৯৫-৬৯৮ হিজরী) হযরত সৈয়দ হোসেন বুখারী (র.) 'বালিয়া-বাসন্তী' জয় করেন।[১৭২]

ফুরফুরা বিজয়ী সেনাপতি হযরত সৈয়দ হোসেন বুখরী (র.) প্রথমদিকে সৈন্যসহ 'সূফী-জঙ্গলে' অবস্থান করতেন। ফুরফুরা বিজয়ের পর উক্ত স্থানে বহু 'আবিদ' ও 'সূফী' সৈন্য বসবাস করেছিলেন। সেজন্য উক্ত স্থান 'সূফী-জঙ্গল' নামে অভিহিত। ফুরফুরা থেকে উক্ত স্থান প্রায় পনেরো কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। পরে তিনি ফুরফুরার পশ্চিম প্রান্তে বেলপাড়া মহল্লায় বসবাস করতে থাকেন এবং সেখানেই তাঁর ইন্তিকাল হয়। ওখানে আজও তাঁর কবর প্রাচীর পরিবেষ্ঠিত অবস্থায় আছে। তিনি সৈয়দ বংশীয় ছিলেন। তাঁর প্রথম জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত তেমন কিছু জানা যায় না। আজও বেলপাড়ায় তাঁর বংশধরগণ বসবাস করছেন। তাঁর সতেরো তম নিম্ন পুরুষ মাওলানা সৈয়দ মনসুর হোসেন সাহেবের বসতবাড়ি কবরের সন্নিকটেই। প্রতি বছর ফাল্গুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে শনিবার তাঁর ইসালে সওয়াব অনুষ্ঠিত হয়।

বাদশাহী ফরমান

'বালিয়া–বাসন্তি' বিজয় সংবাদ দিল্লীর বাদশাহ্ অবগত হয়ে অতিশয় আনন্দিত এবং শহীদানের মৃত্যু সংবাদে যুগপৎ দুঃখিত হলেন; কেননা তাঁরা সুলতানের বিশ্বস্ত কর্মচারী ও প্রিয়পাত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তারপর বাদশাহ্ বঙ্গদেশের নবাব (সুলতান) বাহাদুরের নিকট এইমর্মে অদেশ দেন যে, "যে সকল মুসলমান 'বালিয়া–বাসন্তি' জয় করে 'হযরতে ফুরফুরা শরীফে' বসতি স্থাপন করেছেন, তাঁদেরকে জায়গীর প্রদান করুন।"[১৭৩] বাদশাহের উক্ত আদেশে বাংলার নবাব (সুলতান) মুসলিমদিগকে 'জায়গীর' নিষ্কর জমি এবং যৎকিঞ্চিৎ করবিশিষ্ট বহু জমি প্রদান করেন। উক্ত নিষ্কর জমি 'আয়মা' এবং তার মালিকগণ 'আয়মাদার' নামে অভিহিত। অদ্যাবধি 'আয়মা' সম্পত্তি আয়মাদারগণ বংশ পরম্পরায় ভোগদখল করে আসছেন। বর্তমানে 'হযরতে ফুরফুরা শরীফ', বেলপাড়া, রামপাড়া, আকুনি, বাঁদপুর, সাদপুর, কুতুবপুর, সীতাপুর, গাজীপুর, সূফীজঙ্গল, মোল্লাসিমলা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি বহু স্থানে আয়মাদারগণ বসবাস করছেন।[১৭৪]

---

১৭২ . মুবারক আলী রহমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১
১৭৩ . প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩
১৭৪ . 'বাদশাহী সনদ' 'আল্লামা মুফতী আবু জা'ফর সিদ্দিকী মেজলা হুজুর পীর কেবলার নিকট সংরক্ষিত আছে। উদ্ধৃত: প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

হযরত সৈয়দ হোসেন বোখারী গাজী (রহ.)

বালিয়া–বাসন্তি বিজয়ী সেনাপতি হযরত সৈয়দ হোসেন বোখারী গাজী (র.) এর প্রথম জীবনের বিস্তারিত পরিচয় জানা যায় না্। তবে তিনি অত্যন্ত 'আলা দরজার বুযুর্গ, ওলী ও বীর মুজাহিদ ছিলেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাঁর বংশ পরিচয় থেকে জানা যায়, তিনি সৈয়দ বংশীয় শে'রে খোদা হযরত 'আলী (রা.)- এর বংশধর ছিলেন।

তাঁর বংশলতা

মনসুর হোসেন বিন এসতেমদাদ হোসেন বিন খোররাম হোসেন বিন মোসওয়ার হোসেন বিন গোলাম রসূল বিন দেয়ানতুল্লাহ বিন আতাউল্লাহ বিন আবদুন্ নবী বিন মুহাম্মদ সালেহ বিন জাহাঙ্গীর বিন হামজা বিন আহমাদ বিন হোসায়েন বিন মুহাম্মদ বিন মাহমুদ বিন চাঁদ বিন হোসেন বুখারী গাজী[১৭৫] বিন জিয়াউদ্দীন ইউসূফ বিন আবু ইউসূফ জিয়াউদ্দীন ওরফে মুরাদ বিন পীর মুহাম্মদ বিন গোলাম আহমদ বিন গোলাম মুহাম্মদ বিন সৈয়দ সিরাজুদ্দীন বিন সামসুদ্দীন রিজা'য়ী বিন 'আলী রেজা বিন মূসা কাজেম বিন জ'ফর সাদেক বিন বাকের বিন জয়নুল 'আবেদীন বিন সৈয়দ ইমাম হোসাইন বিন শে'রে খোদা 'আলী (রা.)।[১৭৬]

হযরত সৈয়দ হোসেন বোখারী গাজী (র.) প্রথমদিকে সৈন্যসহ 'সূফী–জঙ্গলে' অবস্থান করতেন। বিজয়ের পর উক্ত স্থানে বহু 'আবিদ' ও 'সূফী' সৈন্য বসবাস করেছিলেন; সে জন্য উক্ত স্থান 'সূফী জঙ্গল' নামে অভিহিত। ফুরফুরা শরীফ থেকে উক্ত স্থান প্রায় পনেরো কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

তারপর সেনানায়ক হযরত সৈয়দ হোসেন বোখারী গাজী (র.) ফুরফুরা শরীফের পশ্চিম প্রান্তে 'বেলপাড়া' মহল্লায় বসবাস এখতিয়ার করেন এবং সেখানেই তাঁর ইন্তেকাল হয়। উক্ত স্থানে আজও তাঁর কবর প্রাচীরবেষ্টিত অবস্থায় আছে। তথায় তাঁর বংশধরগণ বসবাস করছেন। তাঁর ১৭তম নিম্নপুরুষ মাওলানা সৈয়দ মনসুর হোসেনের বসতবাড়ি কবরের সন্নিকটেই। প্রতি বছর ফাল্গুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহের শনিবার সৈয়দ হোসেন বোখারী গাজী (র.)-এর ঈসালে সওয়াব বেলপাড়ায় অনুষ্ঠিত হয়।[১৭৭]

ফুরফুরার প্রথম মস্‌জিদ

ফুরফুরার দক্ষিণ প্রান্তে মোল্লাপাড়ায় অবস্থিত মাটির মস্‌জিদটিই ফুরফুরার আদি মস্‌জিদ। কথিত আছে, অমুসলিম রাজার সময়ে বালিয়া-বাসন্তিতে মাত্র ২/১ ঘর মুসলিমের বসত ছিল। তাদের মধ্যে একজন আল্লাহওয়ালা নিষ্ঠাবান ব্যক্তির একটি 'হুজরাখানা' ছিল। সে হুজরা স্থানেই পরবর্তীতে মস্‌জিদ নির্মাণ করা হয়। ফুরফুরায় মুসলিম বসতি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আদি মস্‌জিদ তৈরির কথা বিবেচনা করে অনেকেই ধারণা করেন উক্ত মস্‌জিদের বয়স প্রায় সাত শত বছর। এটি 'আদি মেটে মসজিদ' নামেই জনসাধারণের কাছে পরিচিত।[১৭৮]

আয়মাদার পরিচয়

ইতিপূর্বে বাদশাহ্‌র আদেশে বাংলার সুলতান কর্তৃক জায়গীর প্রদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বাদশাহ্‌গণ তখন কয়েকটি কারণে জায়গীর প্রদান করতেন। প্রধান দু'টি কারণ ঃ-

---

১৭৫. উক্ত কুরসীনামা হযরত মনসূর হোসেনের সৌজন্যে প্রাপ্ত। উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

১৭৬. হজরত সৈয়দ হোসেন বোখারী গাজী (র.)-এর সতেরোতম নিম্ন পুরুষ হযরত মাওলানা আলহাজ্জ শাহ্ সূফী সৈয়দ মনসূর হোসেন বেলপাড়ায় তাঁর মাজার শরীফ সন্নিকট বসবাস করছেন। মা'রেফতের খনি হযরত 'আলী (রা.)– বংশে 'ইলমে বাতেনীর ধারা (মা শাআল্লাহ) অদ্যাবধি বিদ্যমান। এশায়াতে ইসলামে আত্মনিয়োগকারী সৈয়দ মনসূর হোসেন সাহেব বর্তমানে ৯ ছেলে ও কন্যার জনক। এ বংশে কয়েকজবন 'আলেম, হাফেজ ও কাশ্‌ফশক্তিসম্পন্ন (নারী-পুরুষ) বুযুর্গ ব্যক্তি বিদ্যমান। উক্ত কুরসীনামা হযরত সৈয়দ মনসূর হোসেনের সৌজন্যে প্রাপ্ত। উদ্ধৃতঃ তারিক মুহাম্মদ মুত্তাকী বিল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

১৭৭ . মোঃ মোবারক আলী রহমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

১৭৮ . আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

১. তৎকালীন সুলতানের বিশ্বস্ত অমাত্যবর্গের মধ্যে অধিকাংশ যাঁরা সম্মানীয় (অনারারী) পদে ব্রতী ছিলেন, তাঁদের প্রত্যেককে বাদশাহ্ কিছু না কিছু জায়গীরের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁরা সর্বদা বাদশাহ্র হুকুমবরদারী করতেন; যে সব আমীর-ওমারাগণ জায়গীর সম্পত্তি ভোগদখল করতেন, তাঁদের যায়েদাদ অনুযায়ী প্রয়োজন মুহূর্তে সৈন্য ও অন্যান্য সর্ববিধ সাহায্য বাদশাহ্কে করতে হতো। বেতনভোগী কর্মচারী ব্যতীত অন্যরা ছোট-বড় জায়গীর ভোগ করতেন।

২. বিদ্যোৎসাহী ও জ্ঞানী-গুণীদের যথাযোগ্য স্বীকৃতিস্বরূপ বাদশাহ্ উপযুক্ত জায়গীরের ব্যবস্থা করতেন। তাঁদের প্রতি ফরমাননামা বা সনদে কিছু কিছু শর্ত উল্লেখ থাকত। সাধারণত ইশা'আতে ইসলাম, পীর-মুরীদি, দীনি খেদমতে সময় দেয়া, বাদশাহী মসজিদ হেফাজত, দীনি মাদ্রাসা-মক্তব প্রভৃতির মাধ্যমে তালেবুল 'ইলমগণের শিক্ষা দেয়া খানকাহ, লঙ্গরখানা বা মুসাফিরখানার আঞ্জাম দেয়া প্রভৃতি শর্তের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৭৯]

মুসলমান সুলতানদের মধ্যে অধিকাংশ সুলতানদের কেবল রাজ্য জয় করা উদ্দেশ্য ছিলো না, বরং দীনের প্রচার ও প্রসার এবং অন্যায়-অনাচার, যুল্‌ম-অত্যাচারের প্রতিকার বা অবসান ঘটানোই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো। তাঁরা রাজশক্তি ও আত্মিক শক্তির মিলিত প্রয়াসে জনসাধারণের প্রভুত কল্যাণ কামনা ও দীন ইসলামের উন্নতি বিধানে রত ছিলেন। সে সময়ে বাদশাহ্দের দরবারে বুযুর্গ দরবেশগণের উচ্চ মর্যাদার স্থান নির্ধারিত ছিলো। বিরাট ও মহৎ কাজে তাঁদের পরামর্শ ও দু'আ কামনা করতেন। এমনকি কঠিন ও জটিল বিষয়ে তাঁদের প্রত্যক্ষ সাহায্য চাইতেন ও গ্রহণ করতেন।

ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই, পার্থিব জগতের ভোগবিলাস ত্যাগ করে যেসব পীর-বুযুর্গ-দরবেশ দীনের পথে সদাসর্বদা নিয়োজিত; নিরুপায় হয়ে বাদশাহ্রা যে সব বুযুর্গদের শরণাপন্ন হয়েছেন, নিছক দীন ও জনকল্যাণে সে সব বুযুর্গ তাঁদের সাহায্য করেছেন, সহানুভূতিও দেখিয়েছেন এমনকি যুদ্ধের ময়দানে সেনানীর বেশে অস্ত্রধারণ করে জয়লাভও করেছেন, কিন্তু রাজ্যভোগ ও পদের মোহ তাঁদেরকে কখনই আকৃষ্ট করতে পারে নি। অন্যের হাতে, এমনকি, পূর্বতন পরাজিত-নিহত রাজার যোগ্যতম সন্তানকে বা উত্তরাধিকারীকে রাজ্যভার প্রদান করে দীন-হীন বেশে সাধক জীবনের পবিত্র আঙ্গিনায় ফিরে গিয়েছেন খুশি মনে।

যেখানে পীর-বুযুর্গরা অনোন্যপায় হয়ে রাজদন্ড হাতে নিয়েছেন, তথায় তাঁরা আল্লাহ্র ফজলে বিচার-বুদ্ধি-বিচক্ষণতার সাঙ্গে রাজ্যশাসন, প্রজাপালনের অনন্য নযির স্থাপন করেছেন। যাঁরা রাজদরবারে উচ্চপদ ত্যাগ করে সাধনার যিন্দেগী বেছে নিয়েছেন, তাঁদের ত্যাগের স্বীকৃতি স্বরূপ বাদশাহ্ 'লাখেরাজ' (লা-খারাজ) সম্পত্তি প্রদান করে সম্মানিত করেছেন।[১৮০]

ঐতিহাসিক ফুরফুরা শরীফের অতীতের স্মৃতি মন্থন করলে আমরা জানতে পারি, ফুরফুরা শরীফ ও ফুরফুরার পার্শ্ববর্তী ঐতিহ্যবাহী 'আয়মাদারগণ' এ দেশের অধিবাসী ছিলেন না। তাঁরা বিদেশ থেকে এসেছিলেন। তাঁদের বংশের ধারা (Family Tradition) বঙ্গের অধুনা মুসলিম থেকে স্বতন্ত্র।

লাখনৌর নবাবজাদা দিল্লীর রেলওয়ে প্লাটফরমে দীর্ঘদিন কাটিয়েছেন, তবুও তাঁর Family Tradition অক্ষুন্ন ছিলো। এক নজরে বোঝা যেত, তিনি কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। দিল্লীর শেষ স্বাধীন সুলতান বাহাদুর শাহের শেষ বংশধর কলকাতায় ধুঁকে ধুঁকে শেষ হয়ে গেলো। তবুও তাঁদের আচার-আচরণে সহজে ধরা পড়তো যে, তাঁরা রাজবংশীয় সন্তান। টালীগঞ্জের নবাবজাদাগণ (টিপু সুলতানের বংশধর) এখনও কলকাতায় রয়েছেন, তাঁদের আচার-আচরণ, ঘরবাড়ি, পরিবেশ-রুচি, স্থাপত্য, শিল্পকলা অনন্য।

হুগলীর ফুরফুরা শরীফের আয়মাদারণের[১৮১] জীবনযাত্রা অন্যান্য গ্রামবাসীদের সাথে একাত্ম হয়ে মিশে গেলেও তাঁদের আচার-আচরণ, পরিবেশ-রুচি, ভাষা-ভাবধারায় স্বতন্ত্র ইঙ্গিত বহন করে। তাঁদের মেহমানদারীর খেয়াল এখনও পূর্বের ন্যায় বিদ্যমান। সাধ্যানুযায়ী চেষ্টার ত্রুটি বা কৃপণতার লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় না। পর্দা-

১৭৯. হুগলী, মেদিনীপুর জেলার কয়েকটি পুরনো বাদশাহী সনদে অনুরূপ শর্তের উল্লেখ আছে। উদ্ধৃত: প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

১৮০. মাওলানা সুলতান আহম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

১৮১ . 'আয়মাদার' ; আয়মা-নিষ্কর, দার-গ্রহনকারী। যারা নিষ্কর সম্পদ (লাখেরাজ) ভোগ করেন, তাদের আয়মাদার বলা হয়। উদ্ধৃত: মোঃ মোবারক আলী রহমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

পুশিদার তন্বি এখনও প্রশংসনীয়। পাক-প্রণালী সম্পূর্ণ নিজস্ব ধারায়। আমীর-গরীব নির্বিশেষে আয়মাদারদের সে 'পেট-কাটা' 'দহজিল' (বৈঠকখানা) অতীত দিনের সম্ভ্রান্ত বংশীয় ভাবধারার নমুনা বহন করছে। শিক্ষা-দিক্ষা, ইশা'আতে ইসলাম,পীর-মুরীদি, মাদ্রাসা-মক্তব, খানকাহ, জনকল্যাণকর সংস্থা স্থাপন প্রভৃতি খিদমতী চিন্তাধারা পূর্বের ন্যায় অদ্যাবধি বিদ্যমান।[১৮২]

স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জীবিত আয়মাদারগণ আল্লাহ্ভীরু গুণীজন ছিলেন। নিষ্কর সম্পত্তি ভোগদখল করার সুবাদে স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনে সুশিক্ষার সুবন্দোবস্ত তখন থেকেই প্রচলিত। এমনকি অভিজ্ঞ আলিমগণ নিজেদের তত্ত্বাবধানে স্ব স্ব গৃহে দেশ-বিদেশের শিক্ষার্থীদের আরবী, ফার্সী ও উর্দু প্রভৃতি ভাষায় তা'লীম দিতেন। অদ্যাবধি ঐসব শিক্ষাগারের স্মৃতি ভগ্নাবস্থায় বিদ্যমান। পরে কতিপয় বুযুর্গ আলিমের জীবনী আলোচনাকালে এ বিষয়ে আরো কিছু তথ্য সন্নিবেশিত করা হবে। অতীতের ভগ্ন-স্মৃতির উপর উনবিংশ শতাব্দিতে তিলে তিলে তিলোত্তমায় রূপায়িত হিরোন্ময় স্মৃতিসৌধ মুজাদ্দিদে জামান সুপ্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন।

---

১৮২ . প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

৩য় পরিচ্ছেদ

প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (র.)-এর বংশধরগণ যেভাবে ফুরফুরায় এলেন

আরবের বুকে নবী করীম (স.)-এর ডাকে সাঁড়া দিয়ে সমাজের গণ্যমান্য কেউ যখন আল্লাহ্‌র সত্য ধর্ম ইসলাম গ্রহণে এগিয়ে আসেনি, তখন উচ্চ বংশীয় এবং সর্বোত্র সম্মানিত সায়্যিদিনা হযরত অবু বকর (রা.) সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করে বিজয়ের সূচনা করলেন। সে থেকে ইসলামের জন্য তাঁর খিদমত ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। তিনি ইসলামের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারকারী, নবী (স.)-এর শ্বশুর ও হিজরতের সাথী ও ইসলামের প্রথম খলীফা। বিশ্বনবী (স.) তাঁর ইমামতিতে সালাত আদায় করেছেন। নবীজীর আহবানে তিনি তাঁর সমস্ত সম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় বিলিয়ে দিয়েছেন। নবীজী তাঁকে 'সিদ্দীক' উপাধীতে ভূষিত করেন। তামাম উম্মতের নেক আমল যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর আমলনামা যদি অন্য পাল্লায় রাখা হয় তবে সম্ভবত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর আমলনামাই ভারী হয়ে যাবে।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) নবীজী সাল্লাল্লাহু (স.)-এর সাথে বিভিন্ন জিহাদে শরীক হয়েছেন, অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছেন। যাকাত অস্বীকারকারী ও ভন্ড নবীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন। জিহাদ, দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে দূর-দূরান্তে বিভিন্ন দেশে বাহিনী পাঠিয়েছেন, অভিযান চালিয়েছেন। সিদ্দীকে আকবর (রা.)-এর এ কাজের ধারা অনুসরণ করে তাঁর বংশধরেরা ইসলামের স্বার্থে হিজরত করে আরব ছেড়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছেন এবং সকল বাতিল পথ ও মতের বিরুদ্ধে যুগে যুগে জিহাদ করেছেন।

হিজরতের এ ধারাবাহিকতায় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর ২৩ তম নিম্ন পুরুষ হযরত খাজা মুহাম্মদ রুস্তম (র.) তৎকালীন মধ্য এশিয়ার খোরাসানে বসবাস করছিলেন। চেঙ্গিস খানের দৌরাত্বের সময় তিনি হিজরত করে ভারতে চলে আসেন। তিনি 'চারবাগ-জালালাবাদে' এসে বসবাস শুরু করেন। এখানেই তিনি ইন্তিকাল করেন।

আকবর নামায় আছে- আকবর শাহ খাজা রুস্তম খোরাসানীর 'কবর' যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে মুর্শিদাবাদ জেলার 'মহলন্দ' মৌজায় এসেছিলেন, এতে বুঝা যায় তাঁর 'কবর' মুর্শিদাবাদে আছে। কিন্তু পূর্বোক্ত কথাই বিশ্বাসযোগ্য। কেননা তাঁর মাযার পুনঃ সংস্কার ও অন্যান্য ব্যয় নির্বাহে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি পূর্বতন বাদশাহ্‌গণের সময় হতে অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে।

হযরত রুস্তম খোরাসানী (র.)-এর পুত্র হযরত মাওলানা জিয়াউদ্দীন জাহেদ সিদ্দিকী (র.)। তিনি ইশা'আতে ইসলামের জন্য এলাহাবাদ জেলার 'ক্রীড়া-মাণিকপুরে' কিছুকাল অবস্থান করেন। তিনি একজন উচ্চশ্রেণীর ওলী আল্লাহ্ ছিলেন। তারীখে- মসিরে কুৎবীতে উল্লিখিত আছে- হযরত মখদুম জিয়াউদ্দীন জাহেদ, হযরত শাহ্ কড়ক, কাজী রুকনউদ্দীন ও সুলতানুল মাশায়েখ হযরত নিজামউদ্দীন আউলিয়া দেহলবী (র.) একই সময়ের লোক ছিলেন।

উক্ত তারীখে আছে যে, যখন হযরত শাহ্ 'কড়ক' ইন্তিকাল করেন, তখন মাওলানা জিয়াউদ্দীন জাহেদ (র.) তাঁর লাশ মুবারকের নিকট গিয়ে বলেছিলেন- 'আস্‌সালামু 'আলাইকুম ইয়া কুতুবু-ল্লাহ্'। তৎক্ষণাৎ শাহ্ কড়ক (র.)-এর লাশ মুবারক থেকে উত্তর আসে-'ওয়া 'আলাইকুমুস্ সালাম ইয়া হাবীবুল্লাহ্।'

হযরত জিয়াউদ্দীন জাহেদ সিদ্দিকী (র.)-এর দ্বিতীয় পুত্র হযরত মাওলানা মনসুর বাগদাদী (র.)। তিনি বাগদাদে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছিলেন বলে 'বাগদাদী' নামে খ্যাত। তিনি কোন্ সময় বঙ্গে আগমন করেন তা সঠিকভাবে জানা যায় না। জীবনী ইতিহাসে তাঁর বংশধরদের পীর-মুরিদী ও ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে মুর্শিদাবাদ জেলায় আগমনের কথা জানা যায়। কয়েকটি জীবনী পুস্তকে জানা যায় যে, তিনি সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবন (১২৬৬-১২৮৭ খৃস্টাব্দে, ৬৬৪-৬৮৫ হিজরী)-এর সময় ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে হুগলী জিলার 'কৃষ্ণনগর-মোল্লাপাড়া' গ্রামে আগমন করেন।

হযরত সৈয়দ হোসেন বুখারী (র.), হযরত শফিউদ্দীন ওরফে শাহ্ সূফী সুলতান শহীদ (র.), হযরত মাওলানা মনসুর বাগদাদী (র.) প্রমুখ বুজুর্গের মধ্যে যোগাযোগ ছিল। হযরত শাহ্ সূফী সুলতান শহীদ (র.) হুগলী জেলার পাণ্ডুয়ায় (ছোট পাণ্ডুয়া) বসবাস করতেন এবং মাওলানা মনসুর বাগদাদী (র.)ও একই জেলার মোল্লাপাড়ায় বসবাস করতেন। স্বভাবিক কারণে উভয়ে সম্মিলিত হয়ে ফুরফুরা ও পাণ্ডুয়া বিজয়ে শামিল হয়েছিলেন।[১৮৩]

পূর্বসূরীদের অনুকরণে হযরত মনসুর বাগদাদী (র.) সতীর্থ মুজাহিদদের সাথে নিয়ে সৈয়দ হোসেন বুখারী (র.)-এর সেনাপতিত্বে অমুসলিম রাজার বিরুদ্ধে জিহাদ করে ফুরফুরায় ইসলামের বিজয় নিশান উড্ডীন করেছিলেন। এরপর তিনি এ অঞ্চলেই স্থায়ীভাবে থেকে যান ও ইশা'আতে ইসলামের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এখানেই তাঁর ইন্তিকাল হয়। তাঁর কবর হুগলী জেলার জাঙ্গীপাড়া থানার অন্তর্গত কৃষ্ণনগর মোল্লাপাড়ার 'কুলেকাশ-কন্দকপুরে' বিদ্যমান। তাঁর সঠিক মৃত্যু সন জানা যায় না।[১৮৪]

হযরত মনসুর বাগদাদী (র.)-এর পর তাঁর বংশধরেরা যুগ যুগ ধরে এ অঞ্চলে বসবাস করে ইশা'আতে ইসলামের কাজ করে যাচ্ছেন। হযরত মনসুর বাগদাদী (র.)-এর ৯ম অধঃস্তন পুরুষ হলেন হযরত মোস্তফা মাদানী (র.) [যিনি মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র.)-এর পুত্র হযরত মাসুম রব্বানী (র.)-এর বিশিষ্ট খলীফা ছিলেন] এবং ১৫তম অধঃস্তন পুরুষ হলেন মুজাদ্দিদে যামান হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (র.)।[১৮৫]

মুজাদ্দিদে যামান পীর আবু বকর সিদ্দিকী (র.)-এর বংশধারা

আবু বকর সিদ্দীক বিন আবদুল মুক্তাদির বিন মু'তাসিম বিল্লাহ বিন গোলাম সামদানী বিন মুহাম্মদ মুনাক্কা বিন অজিহুদ্দীন মুজতাবা বিন কুতুবুল আকতাব হাজী মোস্তফা মাদানী বিন মুহাম্মদ খিজির বিন দাউদ বিন ইসমাইল বাগদাদী বিন শাহ্ কলিমুদ্দীন ওরফে কালু মিয়া বিন মুহাম্মদ বিন আশরাফ বিন মাখদুম শাহ্ গিয়াসুদ্দীন বাগদাদী বিন মাওলানা মনসুর বাগদাদী বিন জিয়াউদ্দীন জাহেদ বিন রুস্তম খোরাসানী বিন নূর মোহাম্মদ বিন খাজা নাছীর উদ্দীন বিন শাহ্ জাহান বিন খাজা মোহাম্মদ দীন বিন শাহ্ জাহেদ বিন শাহ্ 'আরেফ বিল্লাহ বিন শাহ্ আছগার বিন শেখ আমজাদ বিন শেখ আহমদ বিন খাজা আবদুর রহীম বিন খাজা আবদুর রহমান বিন আবুল কাছেম বিন মোহাম্মদ বিন আমীরুল মু'মিনীন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) নবী করীম (স.)-এর প্রথম খলীফা।[১৮৬]

---

১৮৩. ইয়াকুব ও খুরশিদ আনোয়ার, *বেহেশতের ফুলবাগিচা* (কলকাতা: মদিনা বুক ডিপো, ১৩৯৫ বাং.), পৃ. ৫১
১৮৪. আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪
১৮৫. প্রাগুক্ত।
১৮৬. হাফেজুল হাদীছ আল্লামা রূহুল আমীন (রহ.), *ফুরফুরা শরীফের পীর* (ঢাকা: ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, ১৯৯৫ খ্রী.), পৃ. ০৯

৪র্থ পরিচ্ছেদ

ফুরফুরা বিজয়ী মনসুর বাগদাদী (র.) থেকে মুজাদ্দিদে যামান আবু বকর সিদ্দিকী (র.)

হযরত মাওলানা মনসুর বাগদাদী (র.)-এর পুত্র হযরত মাওলানা গিয়াসউদ্দীন (র.), তাঁর পুত্র হযরত মাওলানা আশরাফ (র.), তাঁর পুত্র হযরত মাওলানা মুহাম্মদ (র.), তাঁর পুত্র শাহ্ কালু ওরফে কলিমুদ্দীন (র.), তাঁর পুত্র মাওলানা ইসমাইল বাগদাদী (র.) এবং তাঁর পুত্র হযরত মাওলানা দাউদ (র.)। হযরত মাওলানা দাউদ (র.)-এর পাঁচ পুত্র।

- প্রথম পুত্র, হযরত মুহাম্মদ সুলতান (র.)।
- দ্বিতীয় পুত্র, হযরত শাহ্ ইব্রাহীম। তাঁর বংশে হযরত মাওলানা বদরে ইসহাক (র.), গোলাম মোস্তফা ওরফে কাল খোন্দকার, হাফিজ শোয়েব সহ বহু বুজুর্গ জন্মগ্রহণ করেন।
- তৃতীয় পুত্র, হযরত মাওলানা কাজী মুহাম্মদ হোসাইন (র.)। তাঁর বংশে হযরত আবদুল্লাহ আবদাল (র.) জন্মগ্রহণ করেন।
- চতুর্থ পুত্র, হযরত মাওলানা খিজির (র.)। তাঁর আট পুত্রের মধ্যে চতুর্থজন হলেন হযরত মাওলানা মোস্তফা মাদানী (র.)।
- পঞ্চম পুত্র, হযরত শাহ্ পিয়ার (র.)। তাঁর বংশে আকুনী নিবাসী খোন্দকার সাবরুল্লাহ (র.) সহ বহু বুজুর্গ জন্মগ্রহণ করেন।

হযরত মাওলানা মোস্তফা মাদানী (র.) 'আলেমে হক্কানী বাহারুল 'উলুম ও উচ্চ শ্রেণীর বুযুর্গ ওলি-আল্লাহ্ ছিলেন। তিনি ফুরফুরার মিয়া সাহেব মহল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হযরত মাওলানা খিজির (র.) ইন্তিকাল করায় চাচাত ভাই হযরত মাওলানা আবদুল্লাহ আবদাল (র.)-সহ বিদ্যা শিক্ষার্থে দিল্লী অভিমুখে রওয়ানা হন। তখন তাঁর বয়স প্রায় সতেরো বছর ছিল। যমুনা নদী কুলে উপস্থিত হলে তথায় হযরত খিজির (আ.)-এর সাথে তাঁদের যিয়ারত নসীব হয়।

ঘটনাক্রমে সে সময় হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী সারহিন্দ (র.)-এর পুত্র হযরত মাওলানা মাসুম রব্বানী (র.) দিল্লীর জামে মসজিদে অবস্থান করছিলেন। তথায় দিল্লীর বাদশাহ মহিউদ্দীন অওরঙ্গজেব আলমগীর তার কাছে মুরীদ হওয়ার জন্য উপস্থিত হন। হযরত মাসুম রব্বানী (র.) বাদশাহ্কে বলেন- "এখন মুরীদ করতে পারবো না, অপেক্ষা করুন। বাংলাদেশ থেকে দুটি 'শের' আসছে।"[১৮৭]

উপস্থিত লোকেরা যুগপৎ বিস্মিত হলেন। তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগলেন- বাংলা থেকে সামান্য দু'জন লোকের আগমনের জন্য তিনি বাদশাহ্কে মুরীদ করলেন না। উদ্বিগ্নভাবে তারা পথের দিকে তাকাতে থাকেন। একটু পরেই হযরত মোস্তফা মাদানী (র.) এবং হযরত আবদুল্লাহ (র.) অবসন্ন দেহে তথায় উপস্থিত হলেন।

হযরত মাসুম রব্বানী (র.) উভয়কে বিশেষ সমাদর করে জিজ্ঞেস করলেন- 'উপস্থিতির করণ কি?' তাঁরা আদবের সাথে বিনীত নিবেদন করলেন- "আমরা 'ইল্ম শিক্ষার্থে এবং হুজুরের নিকট মুরীদ হওয়ার অভিলাসে উপস্থিত হয়েছি।"[১৮৮]

---

১৮৭. সৈয়দ বাহাউদ্দীন আলী ও শেখ মহিউদ্দীন, *ফুরফুরার পীর হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (র.)* (মুর্শিদাবাদ: হোছাইনিয়া কুতুবখানা, ১৯৯০ খ্রী.), পৃ. ২৭
১৮৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

হযরত মাসুম রব্বানী (র.) তখন হযরত মাওলানা অবদুল্লাহ আবদাল (র.) কে একটি কুতুবখানা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'ঐ কিতাবগুলো পাঠ করো।' আদেশ পেয়ে আবদুল্লাহ (র.) অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে কিতাবগুলো পাঠ করে 'ইল্‌ম হাসিল করলেন। হযরত মাসুম রব্বানী (র.) তখন তাঁকে 'আবদাল' খেতাবে ভূষিত করে বললেন- "বাবা ! তোমার দৌলত আর এখানে নেই। বরং ফুলওয়ারী শরীফে যেতে হবে।"[১৮৯] অনন্তর তাঁকে একখানা পত্রসহ ফুলওয়ারী শরীফের হযরতের কাছে প্রেরণ করেন।

হযরত মাসুম রব্বানী (র.) হযরত মোস্তফা মাদানী (র.) ও দিল্লীর বাদশাহ আওরঙ্গজেবকে একই সাথে বায়'আত করেছিলেন। বাদশাহ্‌কে তিনি নসিহত করেন- 'বাবা তুমি সুচারুরূপে রাজ্য সংক্রান্ত কাজকর্ম পরিচালনা করতে থাকো।' অতঃপর তিনি হযরত মাওলানা মোস্তফা মাদানী (র.) কে সঙ্গে নিয়ে মক্কা শরীফ অভিমুখে যাত্রা করেন। যাত্রাসময়ে মক্কা ও মদীনা শরীফের যাবতীয় কার্যাদি সুসম্পন্ন করে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর তিনি হযরত মোস্তফা মাদানী (র.) কে 'জাহেরী-বাতেনী' 'ইল্‌ম সম্পূর্ণরূপে তা'লীম দিয়ে 'মাদানী' খেতাবে ভূষিত করেন এবং বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থানের 'কুতুব' করে বিদায় দেন।[১৯০]

হযরত মাওলানা মাদানী (র.) স্বদেশে ফিরে জানতে পারলেন যে, চার শহীদের আস্তানায় প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় কাওয়ালী ও বাদ্যাদির মজলিশ হয়। তৎশ্রবণে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। পরদিন উক্ত স্থানে যথাসময়ে সমবেত জনমন্ডলী কাওয়ালী-বাদ্য আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রটি বিদীর্ণ হয়ে গেলো। তারপর আরও দু'টি বাদ্যযন্ত্র আনা হলো, কিন্তু তাও বিদীর্ণ হয়ে গেলো। অগত্যা তারা স্ব স্ব গৃহে ফিরে গেলো। সে রাতে আস্তানার খাদেমকে স্বপ্নে কে যেন বলছেন– "রে নির্বোধ! তোরা কি জানিসনে, কাওয়ালী ও বাদ্যাদি বাজানো হারাম ? বাদ্যযন্ত্র বিদীর্ণ হয়েছে- তা হাজী মাওলানা মোস্তফা মাদানী সাহেবের কারামত। উনি গতকাল্য এখানে তাশরীফ এনেছেন।" পরের দিন খাদেম সাহেব তাদের কাছে উক্ত স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণনা করায় তথায় চিরতরে কাওয়ালী-বাদ্য বন্ধ হয়ে যায়।[১৯১]

তাঁর পীর ভাই দিল্লীর বাদশাহ আলমগীর (র.) তাঁকে সমস্ত বঙ্গাদেশ প্রদান করতে চেয়েছিলেন– তিনি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। তিনি সৈন্যদের ও অন্যান্যদের হিদায়েতের নিমিত্তে মেদেনীপুর 'কেল্লায়' (প্রয়জনানুসারে) অবস্থান করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় বাদশাহ তা মঞ্জুর করেন। তিনি উক্ত কিল্লায় অবস্থানপূর্বক সমস্ত কার্য সম্পন্ন করতেন। তাঁর হুজরা শরীফ উক্ত কিল্লার মধ্যেই ছিল। এমনকি কিল্লায় তাঁর মাজার ও গৃহাদি বিদ্যমান। প্রাকাশ থাকে যে, তাঁর নামানুসারে উক্ত স্থানের নাম 'মাদানীপুর' রাখা হয়। কালক্রমে তা পরিবর্তিত হয়ে বর্তমানে 'মেদেনীপুর' হয়েছে।

কথিত আছে, বাদশাহ আলমগীর তাঁর পীর ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের জন্য একবার ফুরফুরায় এসেছিলেন। পীর হযরত মাসুম রব্বানী (র.) তাঁর কাছে দু'খানা পত্র লিখেছেন, যা তাঁর মাকতুবাত (মাকতুবাতে মাসুম রব্বানী) শরীফের মধ্যে ৫২/৬২ মাকতুবাতে সন্নিবেশিত হয়েছে। উক্ত পত্রদ্বয়ের মাধ্যমে হযরত মাওলানা মোস্তফা মাদানীর উচ্চ দরজার পরিচয় পাওয়া যায়। হযরত মাওলানা আব্দুল মাবুদ মেদেনীপুরী (র.) স্বীয় কিতাব 'সওয়ানেহে ওমরী গাওসে সামদানী পীরে ফুরফুরা' পুস্তকের ৯–১৭ পৃষ্ঠায় হযরত মাসুম রব্বানী (র.)-এর উক্ত পত্রের হুবহু প্রতিলিপি (সারহিন্দ শরীফ থেকে সংগৃহীত) সন্নিবেশিত করেছেন। এ দুষ্প্রাপ্য কিতাবটি ফুরফুরা মাদ্রাসা লাইব্রেরীতে মওজুদ আছে। সম্প্রতি 'মাকতুবাতে মাসুমিয়া' নামে মাসুম রব্বানী (র.)-এর চিঠিগুলোর বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। 'রওজা কাইউমিয়া' কিতাবে হযরত মোস্তফা মাদানী (র.) কে হযরত মাসুম রব্বানী (র.)-এর খলীফা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত মাওলানা মোস্তফা মাদানী (র.) কর্তৃক নির্মিত মিয়া সাহেব মহল্লায় অবস্থিত মাদানী মস্‌জিদ অদ্যাবধি ফুরফুরায় সগৌরবে বিরাজ করছে। ফুরফুরায় মিয়া সাহেব মহল্লায় মসজিদের সন্নিকটে তাঁর পূর্ব বসতবাড়ির ভগ্নাবশেষ অদ্যাবধি বিদ্যমান।[১৯২]

---

১৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩
১৯০. আল্লামা সাইফুদ্দিন সিদ্দিকী, হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (র.)-এর জীবনী (হুগলী: হোদায়াতুল মুসলিমীন লাইব্রেরী, ১৯৯৩ খ্রী.), পৃ. ৫৭
১৯১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯
১৯২. পীরজাদা মাওলানা বাকীবিল্লাহ সিদ্দিকী, *শাহ সূফী পীর মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিকী (র.)-এর অসিয়ত এবং নসিহত* (ফুরফুরা: মুজাদ্দেদীয়া লাইব্রেরী, ১৩৯৯ বাং.), পৃ. ২৯

হযরত মাদানী (র.)-এর দুই সাহেবজাদা। প্রথম সাহেবজাদার নাম হযরত মাওলানা অজিহুদ্দীন মোজতাবা (বড় হযরতজী) এবং দ্বিতীয় সাহেবজাদার নাম হযরত নূরুদ্দীন মুকতাদা (ছোট হযরতজী)।

হযরত মাওলানা অজিহুদ্দীন মোজতাবা সিদ্দিকী (র.) একজন অতি উচ্চশ্রেণীর হাক্কানী 'আলেম ও বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর কবর ফুরফুরার মিয়া সাহেব মহল্লায় বিদ্যমান। [তাঁর (হযরতজীর) তিন সহধর্মিনী ছিলেন। প্রথমা বিবির বংশধর মোসাম্মাত নাজিরা সিদ্দীকা খাতুন মুজাদ্দিদে জামান আবু বকর সিদ্দিকী (র.)-এর স্ত্রী। তাঁর মাতা রাবেয়া খাতুন মেদেনীপুরের ঘোড়ামারার বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত শাহ্ আলী (র.)-এর বংশধর। এ বংশ থেকে বঙ্গে চিশতিয়া তরিকার শাখা সহরাওয়ার্দী তরীকা এসেছে। এদের পরবর্তী বংশধর ড. হাসান সোহরাওয়ার্দী, শহীদ সহরাওয়ার্দী। পীর বড় আম্মাজানের খালাতো ভাই ছিলেন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ কলকাতার মেয়র আব্দুল্লাহ সহরাওয়ার্দী।]

হযরত অজিহুদ্দীন মোজতবা (র.)-এর চার পুত্র। প্রথম পুত্র হযরত মুনাক্কা। দ্বিতীয় পুত্র নিঃসন্তান। তৃতীয় পুত্র হযরত গোলাম নকশাবন্দ (র.)-এর বিবি ময়ীমার গর্ভে হযরত ফজিরউদ্দীন ওরফে মামুমিয়া জন্মগ্রহণ করেন, তিনিও নিঃসন্তান। চতুর্থ পুত্রও নিঃসন্তান।

হযরত মাওলানা মুনাক্কা (র.) অত্যন্ত উচু দরজার ওলি ছিলেন। কথিত আছে– দু'ব্যক্তি একটি গাছ নিয়ে বিবাদ করে তাঁর কাছে বিচারপ্রার্থী হলে তিনি মিমাংসা করে দেন। কিন্তু একজনের বিচার পছন্দ না হওয়ায় রেগে গাছের নিকট চলে যায়। গিয়ে দেখে গাছটি শুকিয়ে যাচ্ছে। এ ঘটনায় সকলে আশ্চর্য হয়ে যায়। ফুরফুরার মিয়া সাহেব মহল্লায় মোনাক্কা (র.)-এর কবর আজও বিদ্যমান।[১৯৩]

মোনাক্কা (র.)-এর ছয় পুত্র। নাজিমুদ্দীন, বাসিরুদ্দীন, এলহামুদ্দীন, একরামুদ্দীন, গোলাম সামদানী ও মেলিহুদ্দীন। পঞ্চম পুত্র হযরত মাওলানা গোলাম সামদানী সিদ্দিকী (র.) একজন উচ্চস্তরের শরীয়তপন্থী ফকীহ 'আলেম এবং ওলিয়ে কামিল ছিলেন। ফুরফুরাতেই তাঁর জন্ম। তিনি অধিকাংশ সময় অরণ্যে অবস্থান করে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাতে মশগুল থাকতেন। প্রবাদ আছে যে– বহুলোক স্বচোখে দেখেছেন বাঘের সাথে দেখা হলে বাঘ তাঁকে সালাম করে চলে যেত; অক্রমণ করতে সাহস পেত না। তিনি প্রায় একশ বছর হায়াত পেয়েছিলেন। তাঁর কবর ফুরফুরার মিয়া সাহেব মহল্লার গোরস্থানে বিদ্যমান।[১৯৪]

হযরত মাওলানা গোলাম সামদানী (র.)-এর ছয় পুত্র– হযরত মোহাম্মদ নজমদ্দীন, হযরত মাওলানা মোহাম্মদ মু'তাসিম বিল্লাহ, আব্দুল খালেক, মৌলভী আবদুস সামাদ, মাওলানা আবদুল আজিম ও আবদুল বাসেত। দ্বিতীয় পুত্র হযরত মু'তাসিম বিল্লাহ (র.)-এর আবার দুই পুত্র। প্রথম পুত্র মুহাম্মদ মোশাররফ ও দ্বিতীয় পুত্র হযরত হাজী আবদুল মুক্তাদীর সিদ্দিকী (র.)।

হযরত মৌলভী হাজী আবদুল মুক্তাদীর সিদ্দিকী (র.) অত্যন্ত পরহেজগার মুত্তাকী ও আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। কলকাতা দমদমা মাকামে সূফী ফতেহ আলী ওয়সী (র.) ও মাওলানা রাশেদ (র.) সহ অবস্থানকালে তিনি হযরত খিজির (আ.)-এর যিয়ারত লাভ করেন।

হযরত খিজির (আ.) তাঁকে বলেন– "তুমি ইমামত করবে।"[১৯৫] তৎশ্রবণে তিনি বলেন– আমি আল্লাহু অকবার বলতেই অচৈতন্য হয়ে যাই, এ হেতু ইমামত করতে পারি না। কোনো গতিকে নিজের নামাজ পড়ে থাকি। তখন তিনি তাঁর শরীরে হাত বুলিয়ে বলেন, আর তোমার এ অবস্থা হবে না ইনশাআল্লাহ্।

তিনি আরও বলেন– তোমার ওয়ালেদা একটা কুরবানী মান্নত করেছিলেন, তা আদায় করা হয়নি। তিনি যেন তা আদায় করে নেন। হাজী আবদুল মুক্তাদীর বললেন– আমার মামাত ভগ্নির উপর জ্বিনের আছর আছে। তিনি মৃত্তিকার ওপর বৃদ্ধা আংগুল চেপে ধরে বললেন– সে জ্বিন দফা করে দিলাম। সে থেকে জ্বিন দফা হয়ে

১৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫
১৯৪. মোহাম্মদ রুহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২
১৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭

গিয়েছিল। তিনি আরও বলেন– আমি গায়েব জানার দাবি করছি না। আমি যা দেখছি, তাই বলছি। ইনি হযরত খিজির (আ.)।

হযরত হাজী মুক্তাদীর (র.)-এর বিশ্ববরেণ্য খ্যাতিসম্পন্ন সন্তান, 'ফুরফুরার পীর' নামে বিশ্বখ্যাত মুজাদ্দিদে যামান আমীরুশ-শরীয়ত হযরত মাওলানা আবদুল্লাহিল মা'রুফ আবু বকর সিদ্দিকী (র.)। মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর যখন মাত্র ৯ মাস বয়স, তখন তাঁর পিতা একমাত্র পুত্র ও স্ত্রী মোসাম্মাৎ মহাব্বাতুন্নিসা খাতুনকে রেখে আনুমানিক ১২৬৩ কিংবা ১২৬৪ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।[১৯৬]

মুজাদ্দিদে যামান হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী, ১৮৪৬ ইং সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সন্তান-সন্ততি ঃ-

১.হযরত মাওলানা আবদুল হাই সিদ্দিকী (বড় হুজুর)।
তাঁর চার পুত্র, এক কন্যাঃ-
১ম পুত্র ঃ মাওলানা আবুল আনসার মুহাম্মদ আবদুল কাহ্‌হার সিদ্দিকী, ১৯৪২ সালে জন্মগ্রহণ করেন।
২য় পুত্র ঃ হযরত মাওলানা আবূ ইবরাহীম মুহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ সিদ্দিকী, ১৯৪৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন।
৩য় পুত্র ঃ হযরত মাওলানা আবূ তাহের মুহাম্মদ মতিউল্লাহ সিদ্দিকী, ১৯৫২ সালে জন্মগ্রহণ করেন।
৪র্থ পুত্র ঃ হযরত মাওলানা আবূ বকর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ সিদ্দিকী, ১৯৫৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন।
৫ম কন্যা ঃ একমাত্র কন্যা উম্মে যয়নাব মুসাম্মাৎ মোমতাজ বেগম, ১৯৪৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন।[১৯৭]

২.হযরত মাওলানা আবূ জাফর মুহাম্মদ অজিহুদ্দীন সিদ্দিকী (মেজ হুজুর), জন্ম ১৯০৫ ইং। তাঁর তিন পুত্রঃ-
১ম পুত্র ঃ হযরত মাওলানা সাইফুদ্দীন সিদ্দিকী, জন্ম ১৩৩৯ বাং।
২য় পুত্র ঃ হযরত মাওলানা কুতুবউদ্দীন সিদ্দিকী, জন্ম ১৯৫৭ ইং।
৩য় পুত্র ঃ মাওলানা নূরুদ্দীন সিদ্দিকী, জন্ম ১৯৭৫ ইং।[১৯৮]

৩.হযরত মাওলানা আবদুল কাদের সিদ্দিকী (সেজ হুজুর), জন্ম ১৩১৭ বাং। তাঁর একমাত্র সাহেবজাদা মাওলানা আবুল ফারাহ সিদ্দিকী

৪.মাওলানা নাজমুস্ সায়াদাত সিদ্দিকী (ন'হুজুর), জন্ম ১৯১৩ ইং। তাঁর তিন পুত্র ঃ-
১ম পুত্র ঃ মাওলানা মুহাম্মদ বাকীবিল্লাহ সিদ্দিকী, জন্ম ১৩৪১ বাং।
২য় পুত্র ঃ মাওলানা মুহাম্মদ হুজ্জাতুল্লাহ সিদ্দিকী, জন্ম ১৩৪৬ বাং।
৩য় পুত্র ঃ হাফিজ মাওলানা মুহাম্মদ সিবগাতুল্লাহ সিদ্দিকী, জন্ম ১৯৫০ ইং।[১৯৯]

৫.মাওলানা আবুল বাসার মুহাম্মদ জুলফিকার আলী সিদ্দিকী (কনিষ্ঠ সাহেবজাদা), জন্ম ১৯২০ ইং। তাঁর দুই পুত্র ঃ-
১ম পুত্র ঃ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কালিমুল্লাহ সিদ্দিকী।
২য় পুত্র ঃ হযরত মাওলানা আবদুল্লাহিল মারূফ সিদ্দিকী।[২০০]

---

১৯৬. আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮
১৯৭. মোঃ মোবারক আলী রহমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫
১৯৮. আতাউর রহমান কালামী, *স্মরণীয় জীবন কথা* (কলকাতা: ন্যাশনাল লাইব্রেরী, ১৯৯৭ খ্রী.); পৃ. ৭৪
১৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯
২০০. মোঃ মোবারক আলী রহমানী, প্রাগুক্ত, ১৮৬

চতুর্থ অধ্যায়
মুজাদ্দিদে যামান হযরত মাওলানা আবূ বকর সিদ্দিকী (র.)

১ম পরিচ্ছেদ
পরিচয়, শিক্ষা ও কর্ম জীবন

হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীর ক্ষণজন্মা রেনেসাঁ বা যুগ-সংস্কারক মুজাদ্দিদে যামান, আমীরুশ-শরীয়ত, কুতুবুল ‘আলম, কাইয়ুমে যামান, শায়খুল মিল্লাত ওয়াদ্‌দীন, শামসুল ‘আরিফীন হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী পীর আবূ বকর সিদ্দিকী ফুরফুরাবী ছিলেন মুসলিম জাহানের প্রথম খলীফা অমীরুল মু’মিনীন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর বংশধর। এ জন্য তিনি সিদ্দিকী উপাধিতে বিভূষিত হয়ে থাকেন। তাঁর পিতৃদত্ত নাম ‘আবূ বকর’ এবং হযরত নবী করীম (স.) স্বপ্নযোগে তাঁর নাম ‘আবদুল্লাহ্’ রাখেন।[২০১]

তাঁর মহামান্য ওয়ালেদ হাজী মাওলানা মাখদূম আবদুল মুক্তাদির (র.) একজন কারামত বিশিষ্ট ‘ওলি’ ছিলেন এবং তাঁর মহিয়সী ওয়ালেদা মোসাম্মাৎ মুহাব্বাতুন্নিসা খাতুন অত্যন্ত ধৈর্যশীলা, পুণ্যবতী, বিদুষী, আবিদা-জাহিদা রমণী ছিলেন।

তাঁর বংশধারা

১. তাঁর নাম আবূ বকর,
২. তাঁর ওয়ালেদ হাজী মাওলানা মাখদূম আবদুল মুক্তাদির,
৩. তাঁর ওয়ালেদ মাখদূম মু’তাসিম বিল্লাহ্,
৪. তাঁর ওয়ালেদ মাখদূম মাওলানা গোলাম সামদানী,
৫. তাঁর ওয়ালেদ মাখদূম মোনাক্কা,
৬. তাঁর ওয়ালেদ মাখদূম অজিহুদ্দীন মুজতাবা,
৭. তাঁর ওয়ালেদ মাখদূম মোস্তফা মাদানী,
৮. তাঁর ওয়ালেদ মাখদূম মোহাম্মদ খিজির,
৯. তাঁর ওয়ালেদ মাখদূম দাউদ,
১০. তাঁর ওয়ালেদ মাখদূম ইসমাইল বাগদাদী,
১১. তাঁর ওয়ালেদ মাখদূম শাহ কালু মিয়া,
১২. তাঁর ওয়ালেদ মাখদূম আশরাফ,
১৩. তাঁর ওয়ালেদ মাখদূম গিয়াস উদ্দীন বাগদাদী,
১৪. তাঁর ওয়ালেদ মাখদূম মোহাম্মদ,
১৫. তাঁর ওয়ালেদ মাখদূম মনসুর বাগদাদী,
১৬. তাঁর ওয়ালেদ মাখদূম জিয়াউদ্দিন জাহেদ,
১৭. তাঁর ওয়ালেদ মাখদূম মোহাম্মদ রুস্তম খোরাসানী,
১৮. তাঁর ওয়ালেদ মাখদূম নূর মোহাম্মদ,
১৯. তাঁর ওয়ালেদ মাখদূম খাজা নাছীর উদ্দিন,
২০. তাঁর ওয়ালেদ মাখদূম শাহ জাহান,
২১. তাঁর ওয়ালেদ খাজা মোহাম্মদ দীন,
২২. তাঁর ওয়ালেদ মাখদূম শাহ জাহেদ,
২৩. তাঁর ওয়ালেদ মাখদূম শাহ আরেফ বিল্লাহ,
২৪. তাঁর ওয়ালেদ মাখদূম শাহ আছগার,
২৫. তাঁর ওয়ালেদ মাখদূম শেখ আমজাদ,
২৬. তাঁর ওয়ালেদ মাখদূম শেখ আহমাদ,

২০১. আবদুল হাকিম, খান বাহাদুর সম্পা, *বিস্তারিত ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৭৬ খ্রী.), খন্ড- ৪র্থ, পৃ. ২৮০

২৭. তাঁর ওয়ালেদ মাখদূম খাজা আবদুর রহীম,
২৮. তাঁর ওয়ালেদ মাখদূম খাজা আবদুর রহমান,
২৯. তাঁর ওয়ালেদ মাখদূম আবুল কাছেম,
৩০. তাঁর ওয়ালেদ মাখদূম মোহাম্মদ (র.),
৩১. তাঁর ওয়ালেদ নবী করীম (স.)-এর প্রথম খলীফা আমীরুল মু'মিনীন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)।[২০২]

জন্ম

মাওলানা আবূ বকর সিদ্দিকী (র.) ১২৬৩ হিজরী, ১৮৪৬ ইংরেজী এবং ১২৫২ মতান্তরে ১২৫৩ সালে পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার জাঙ্গীপাড়া থানার অধীন ফুরফুরা শরীফে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবন

হযরত মাওলানা আবূ বকর সিদ্দিকীর বয়স যখন নয় মাস, তখন তাঁর পিতা 'আবদুল মুক্তাদির ইন্তিকাল করেন। তাঁর মাতা মুহাব্বাতুন নিসা'র অগ্রহে ও যত্নে তিনি প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। তৎকালীন রাষ্ট্রভাষা ইংরেজী পড়া ত্যাগ করে তিনি আরবী, ফার্সী প্রভৃতি দীনি 'ইল্ম শিক্ষার জন্য প্রথমে সীতাপুর মাদ্রাসা ও পরে হুগলী মুহসিনিয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করেন। শেষোক্ত মাদ্রাসা হতে তিনি কৃতিত্বের সাথে জামা'আতে 'উলা (ফাজিল) পাস করেন। অতঃপর তিনি কলকাতা সিন্দুরিয়া পট্টির মস্‌জিদে হাফিজ জামালুদ্দীন-এর নিকট তাফসীর, হাদীস ও ফিক্‌হ অধ্যয়ন করেন। হাফিজ জামালুদ্দীন সাহেব সৈয়দ আহমদ ব্রেলবী (র.)-এর খাস খলীফা ও প্রধান মুজাহিদ ছিলেন।

তারপর তিনি কলকাতা নাখোদা মস্‌জিদে মাওলানা বিলায়াত (র.)-এর নিকট মানতিক, হিকমাহ্ (গ্রীক বিজ্ঞান) ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ২৩/২৪ বৎসর বয়সে তিনি ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। অতঃপর তিনি মদীনা শরীফ গমন করেন। তথায় হাদীস অধ্যয়ন করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর রওজা মুবারকের বিশিষ্ট খাদিম বিখ্যাত 'আলেম শায়খুদ্দালাইল সৈয়দ মাওলানা আমীন রেদওয়ান-এর নিকট হতে ৪০টি হাদীস গ্রন্থের সনদ লাভ করেন। তৎপর তিনি দেশে ফিরে বহু দুর্লভ কিতাব সংগ্রহ করে ধারাবাহিকভাবে ব্যক্তিগত উদ্দোগে ১৮ বছর অধ্যয়ন ও গবেষণা করে খ্যাতি অর্জন করেন।[২০৩]

রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর রওজা শরীফের খাদিম কর্তৃক সনদ প্রাপ্ত কিতাবসমূহের তালিকা নিম্নরূপ

১. সহীহ বুখারী,
২. সহীহ মুসলিম,
৩. সুনানে আবি দাউদ,
৪. সুনানে তিরমিজি,
৫. সুনানে নাসায়ী,
৬. সুনানে ইবনে মাজা,
৭. মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক,
৮. মুসনাদে ইমাম আবূ হানীফা,
৯. মুসনাদে ইমাম শাফিয়ী,
১০. মুসনাদে ইমাম আহমাদ,
১১. মুসনাদে দায়মী,
১২. মুসনাদে অবি দাউদ তায়লিসী,
১৩. মুসনাদে আব্দ বিন হুমায়েদ,
১৪. মুসনাদে হারেস বিন ওসামা,
১৫. মুসনাদে বাজ্জাজ,

---

২০২. হাফেজুল হাদীছ আল্লামা রূহুল আমীন (রহ.), *ফুরফুরা শরীফের পীর* (ঢাকা: ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, ১৯৯৫ খ্রী.), পৃ. ০৯
২০৩. এম, ওবায়দুল হক, *বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ* (ফেনী: মুজাদ্দিদে আলফেসানী লাইব্রেরী, ১৯৬৯ খ্রী.), পৃ. ৩৬

১৬. মুসনাদে আবি ইয়ালি মুসেলি,
১৭. সহীহ ইবনে হিব্বান,
১৮. সহীহ ইবনে খোজায়মা,
১৯. মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক,
২০. মিশকাতুল-আনওয়ার লিশ্-শায়খিল আকবর,
২১. সুনানে আবি মুসলিমিল-কাশি,
২২. মুসনাদে সাঈদ ইবনে মানসূর,
২৩. মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা,
২৪. সুনানে বায়হাকিয়ে কুবরা,
২৫. তারিখে ইবনে 'আছকার,
২৬. তারিখে ইয়াহইয়া ইবনে মঈন,
২৭. শেফায়ে কাজী আয়াজ,
২৮. শরহুস্-সুন্নাহ্ লিল্ বাগাবী,
২৯. আয্‌জুহদু ওয়াদ্দাক্বায়েক্ব লি ইবনে মুবারক,
৩০. নাওয়াদিরুল উসূল লিল্ হাকীমিত্ তিরমিজি,
৩১. কিতাবুদ্ দু'আ লিত্ তিবরানী,
৩২. আকছালুল 'ইলমি ওয়াল 'আমাল,
৩৩. মুস্তাখরিজে ইসমাঈল 'আলা সহীহিল বুখারী,
৩৪. মস্তািদরিক লিল হাকেম,
৩৫. আল ফারাজো বা'দাশ্ শিদ্দাহ লি ইবনে আবিদ্দুনইয়া,
৩৬. মুস্তাখরিজে আবি 'উয়ানা 'আলা সহীহিল মুসলিম,
৩৭. হুলইয়া লি আবি মুঈন,
৩৮. জিয়াদুল মুসালসালাত লি জালালুদ্দীন সুয়ূতী,
৩৯. আয্‌জুররিয়াতুত্ ত্বাহেরাহ,
৪০. আ'মালুল ইয়াওমি ওয়াল্ লাইলি লি আবিস্‌সুন্নী।[২০৪]

পাঠ্যাবস্থাতেই ইবাদাত-বন্দেগীর প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল। রাত জেগে তিনি যিক্‌র করতেন। শরীয়তের হুকুম-আহকাম সাধ্যমত পালন করতে তিনি অতিশয় যত্নবান ছিলেন। এভাবে যখন তিনি নিরলস সাধনায় রত ছিলেন, তখন কলকাতার বিখ্যাত ওলী শাহ্ সূফী ফতেহ আলী (র.)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। আবূ বকর সিদ্দিকী (র.) তাঁর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন এবং নিষ্ঠার সাথে 'ইল্‌ম-ই-মা'রিফাহ শিক্ষা করেন। তিনি সূফী ফতেহ আলী (র.)-এর একজন প্রধান খলীফাও ছিলেন। ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। বিভিন্ন ফিক্‌হী মাস'আলার সঠিক উত্তর জিজ্ঞেস করা মাত্রই তিনি কিতাব না দেখে বলে দিতেন।[২০৫]

তীক্ষ্ণ মেধা, ধীশক্তি ও 'ইল্‌মে লাদুন্নির অধিকারী আবূ বকর সিদ্দিকী (র.) যাহিরী ও বাতিনী 'ইল্‌মে অগাধ পান্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি একদিন স্বপ্নযোগে দেখেন যে, "হযরত নবী করীম (স.) অগ্রগমন করছেন এবং তাঁর পশ্চাতে পশ্চাতে তিনি চলতে চলতে নানাবিধ মাস'আলা-মাসায়েল জিজ্ঞাসা করছেন।" এ হেতু আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীন তাঁকে 'ফিক্‌হের খনি' বানিয়েছিলেন। আল্লাহ্‌র ফজলে বড় বড় 'আলিমগণ যে কোনো মাস'আলা জিজ্ঞেস করার সাথে সাথে তিনি মুদাল্লাল মা'কূল জওয়াব দিয়ে দিতেন।

পীর সাহেব যখন হুগলী মাদ্রাসার বোর্ডিং-এ অবস্থান করতেন, পাঠ্যাবস্থাতে অধিকাংশ রাতে চার তরীকার নিসবত (ফয়েজ) আপনা আপনি তাঁর অন্তরে নিক্ষিপ্ত হয়ে নিজের দিকে আকর্ষণ করতো। যখন যে তরীকার নিসবত তাঁর অন্তরে নিক্ষিপ্ত হতো, তখন তিনি অধির হয়ে সে তরীকার যিক্‌র করতেন। তিনি বলতেন– "অনেক সময় আমি রাতে বোর্ডিং হতে বাহিরে এসে যিক্‌র করতে করতে গলি-কুচা ভ্রমণ করতাম। সে সময় একটি নূর আমার আপাদমস্তক বেষ্টন করতো এবং তার মধ্যে আমার অত্মবিস্মৃতি ঘটতো, আনেক সময় আমার

২০৪. আবু ফাতেমা মোহাম্মদ ইসহাক, *ফুরফুরা পীর হযরত আবু বকর সিদ্দিকী* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০ খ্রী.), পৃ. ১০-১১
২০৫. আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ.১০১

‘জযবা’ হতো।”[২০৬] মুজাদ্দিদে যামান রাতে অনেক বুযুর্গের কবর যিয়ারত করে বেড়াতেন। অনেক সময় ময়দানে জলি যিক্‌র করে কাটিয়ে দিতেন। তিনি ফুরফুরা শরীফের পশ্চিম দিকস্থ ‘ধনপোতা’ নামক স্থানে অনেক সময় রাতে বসে জলি যিক্‌র করতেন। তাঁর সে যিক্‌র করা স্থানে লোকেরা এখন ঈদগাহ্ বানিয়েছেন।

মুজাদ্দিদে যামান হযরত পীর সাহেব শে'রে খোদা হযরত ‘আলী (রা.), হযরত ফাতেমা (রা.), হযরত নবী করীম (স.) ও হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর নিকট বাতিনী বায়'আত লাভ করেন।[২০৭]

কর্মময় জীবন

পীর-মুরীদী, তাসবীহ্-তাহলীল নিয়েই কেবল পীরদের সীমাবদ্ধ পরিধি, এ ধারণা যে কত ভ্রান্ত, তা তিনি তাঁর কর্মময় জীবনে বাস্তবরূপ দিয়ে দেখিয়ে গেছেন। খানকানশীন, হুজরানশীন পীরদের ন্যায় রীতিনীতি ও আচার-আচরণ তিনি কখনই বরদাস্ত করতেন না। অনেক পীরের দরবারে দারোয়ান ‘খাড়া’ থাকতো, পরদা লটকানো থাকতো, বিশেষ কায়দায় সালাম ও বিনা সালামী (নাজরানা-উপঢৌকন) এবং বিনা অনুমতিতে কেউ প্রবেশ করতে সক্ষম হতো না, তিনি সে সবের মূলোচ্ছেদ করেন।

একাধারে লক্ষ লক্ষ সালিকীনদের তা'লীম দিয়েছেন। শত শত দীনি প্রতিষ্ঠান, মস্‌জিদ, খানকাহ সহ জনকল্যাণকর বহু সংস্থা তিনি গড়েছেন। ফলে সমাজ জীবনে নব জাগরণের তুফান বয়ে গেছে। রাজনীতির ময়দানে অনাচার, অত্যাচার, যুল্‌মের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হয়েছেন।

দীন ও মিল্লাতের খিদমতে অধিকতর কল্যাণ কামনায় তিনি ‘আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীন’ নামে সংস্থা গঠন করে তাকরীরি ও তাহরীরি খিদমত করেছেন।
এমনকি ১২/১৩জন বেতনভুক্ত স্থায়ী ‘আলিম প্রচারক দিয়ে সভা-সমিতির আঞ্জাম দিয়েছেন। অনারারী প্রচারকের সংখ্যা ছিল বেশুমার। ফলে সমাজ জীবন থেকে হাজার অনাচার, অত্যাচার, কলহ-বিবাদ, মামলা-মুকাদ্দমা, দূরাচার কুসংস্কার হয়েছিল বিদূরিত। ‘বায়তুল মাল ফান্ড’ কায়েম করে গরীব-ইয়াতীমদের প্রতি সহানুভূতি, যুবকদের সংগঠিত করে যুব সমিতি গঠন প্রভৃতি অসংখ্য জনহিতকর কর্মসূচি তিনি বাস্তবায়িত করেছিলেন। দীন ও সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে তিনি ‘জমিয়তে ওলামা বাংলা আসাম’ গঠন করেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর দান অনস্বীকার্য। তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ছিল অত্যন্ত প্রখর ও সুদূরপ্রসারী। মাওলানা মুহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী, মিষ্টার গান্ধী, সি. আর. দাস প্রমুখ নেতারা যখন খিলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশবাসীকে আইন অমান্য , সরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা ইত্যাদি বর্জন সম্বন্ধে কোনো কোনো পত্রিকার মাধ্যমে পরামর্শ দিতেছিলেন, সে সময় পীর সাহেব (র.) ‘হানাফী’ পত্রিকা মারফত জমিয়তে ‘উলামার মত প্রচার করে বলেন– “রাজ আইন মান্য করতে হবে। জাতীয় স্কুল, কলেজ, মক্তব, মাদ্রাসা স্থাপন না করা পর্যন্ত স্কুল, কলেজ, মক্তব, মাদ্রাসা বয়কট করা অনুচিত হবে।”[২০৮]

যে সময় মিষ্টার গান্ধী, মাওলানা মুহাম্মদ আলী, মাওলানা আজাদ সুবহানী, ডাক্তার কিচলু, মাওলানা শওকত আলী প্রমুখ কলকাতার টিকাটুলি মস্‌জিদে পীর সাহেবের দরবারে পরামর্শের জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন, সে সময় তিনি বলেছিলেন– “আমি কুর'আন ও হাদীসের পক্ষপাতী ও গভর্মেন্টের শরীয়ত বিরুধী নহে এরূপ আইনের পক্ষপাতী।” অতঃপর তিনি মাওলানা মুহাম্মদ আলীকে একান্তে ডেকে বলেন– “আপনি স্মরণ রাখবেন, প্রত্যেক ব্যাপারে প্রথমে দীন, পরে দেশ। দীন ছেড়ে দিয়ে দেশ উদ্ধার আমাদের অভিপ্রায় নয়।” মাওলানা মুহাম্মদ আলী জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পীর সাহেবের নসিহত অনুসারে কাজ করে গিয়েছেন।

রাজনৈতিক মুকাবিলার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচনে মনোনীত প্রার্থীকে সমর্থন করার কথা প্রচার করেন। ফলে স্বমতের অনেক সদস্য নির্বাচিত হয়ে আসতে সমর্থ হয়। বাঙ্গালী হজ্জযাত্রীদের কষ্ট-দুর্দশা ও অসুবিধা লাঘবের

---

২০৬. এম. ওবায়দুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩
২০৭. মোঃ মোবারক আলী রহমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১
২০৮. আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

জন্য আন্দোলন করে প্রভূত কল্যাণ করেন। এমনকি সে সময় কলকাতা থেকে হাজিদের জাহাজ ছাড়ার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছিল।

সারদা আইনের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন গড়ে তুলে মনুমেন্টের পাদদেশে বিরাট প্রতিবাদ সভার ঘোষণা করেন– "মহারাণী ভিক্টোরিয়া কারো ধর্মে হস্তক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে গিয়েছেন। এ সারদা বিলে তা ভঙ্গ করা হয়েছে। এক্ষণে আমাদের ওপর দু'টি কর্তব্য অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে। হয় সমর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া, না হয় হিযরত করা। কুর'আন শরীফ আমার সম্মুখে, হাদীস শরীফ ডান পাশে, ব্রিটিশ আইন বাম পাশে। যদি ব্রিটিশ আইন আমাদের কুর'আন ও হাদীসের বিপরীত না হয়, তবে আমরা তা সমর্থন করতে বাধ্য। আর তার বিপরীত হলে, রাজদ্রোহিতা হলেও আমি তার প্রতিবাদ করতে বাধ্য।"[২০৯]

১২৪০ সালে বঙ্গীয় ওয়াকফ বিল পাশ হয়। পীর সাহেব ওয়াক্ফ বিলের (কিয়দাংশ) প্রতিবাদ এবং গ্রামোফোনের রেকর্ডে কুর'আন শরীফ ও মিলাদ শরীফ পাঠের কঠোর সমালোচনা ও প্রতিবাদ করেন। 'মাসিক সুন্নত অল-জামায়াত' পত্রিকায় আল্লামা রুহুল আমীন (র.)-কে হিন্দুস্তানের মুফতীদের ফাতওয়া সংগ্রহ করে প্রকাশ করার আদেশ দেন।

বাংলা আসামের মানুষ তাদের প্রাণের ব্যাথা, মনের কথা, অভাব-অভিযোগ অকপটে বিনা দ্বিধায় তাঁর খিদমতে পেশ করার ভরসা পেতেন। আর তিনি প্রত্যেকের বিষয়ে গভীরভাবে পর্যালোচনা ও সঠিক মূল্যায়ন করে অকাতরে উপযুক্ত বিধি ব্যবস্থা করে দিতেন। তিনি ছিলেন সকলের আপনজন মুরুব্বী।

ধর্মদ্রোহী, ফাসাদী, বিদ'আতীরা তাঁর নামে সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকতো। তাঁর নাম শুনার সাথে সাথে জিনগ্রস্থ রুগীর জিন পলিয়ে যেতো, এমনকি শেষ জীবনের বেশ কয়েক বছর (ইন্তিকাল পর্যন্ত) এতদ্বাঞ্চলে জিন-ভূতের কোনো উৎপাত ছিলো না। তাঁর অসংখ্য জিন মুরিদ ছিলো।

আল্লামা রুহুল আমীন (র.) বলেন– "১২১৬ সালে হযরত পীর সাহেব উত্তরপাড়ার সভায় গমন করেন। অমুসলিমরা শ্রেনীবদ্ধভাবে সহস্র কণ্ঠে 'বন্দোমাতরম' শব্দে তাঁকে অভিনন্দন করায় তিনি 'চুপরাও' শব্দে এমন ধমক দেন যে সমস্ত সভা নিস্তব্ধ হয়ে যায়। এরূপ ভয়াবহ গম্ভীর আওয়াজ হযরত 'উমর ফারুক (রা.)-এর কণ্ঠে ছিল। পীর সাহেবের কণ্ঠে তারই প্রতিধ্বনি হয়েছিলো।"[২১০]

কলকাতা জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের অধিবেশনে দেওবন্দের মাওলানা আজিজুর রহমান, মাওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানী, মাওলানা হোসেন আহমদ মাদানী, মুফতী মাওলানা কিফায়েতুল্লাহ (র.) প্রমুখ বিখ্যাত আলিমদের সমাবেশে মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও তাঁর সমর্থকরা ব্যাংকের সুদ হালাল হওয়ার প্রস্তাব আনার চেষ্টা করেছিলেন। হযরত পীর সাহেব তীব্র প্রতিবাদ করে বলেন– "বড় শুকরটি যদি হারাম হয়, তবে কি ছোট শুকরটি হারাম হবে না ? লোকেরা একটু ছিদ্র পেলে বড় বড় কাজ করে বসবে।" তৎশ্রবণে বড় বড় আলিমরা তাঁর সূক্ষ্মজ্ঞানের প্রশংসা করেন। ফলে প্রস্তাবটি বাতিল হয়। এভাবে তিনি অনেক সংস্কারমূলক কাজ করে গিয়েছেন।

দেশে যখন 'বন্দেমাতরম' গানে হিন্দু-মুসলিম 'এক দেহ-এক প্রাণ' হুজুগে মাতওয়ারা সে সময় পীর সাহেব ফাতওয়া প্রদান করেন, "বন্দেমাতরম শব্দের কোনো অর্থ থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু এর কয়েক প্রকার কাফিরী মর্ম আছে। তাই তা বলা মুসলিমগণের পক্ষে কিছুতেই জায়েয হবে না।"[২১১]

১৩৪০ সালের শাবণ মাসে ৫ নম্বর ধর্মতলা করিন্থেন থিয়েটার হলে কতিপয় লোক একদল অর্থলোভী নামধারী আলিমদের বশীভূত করে ওয়ায ও মিলাদের ব্যবস্থা বিজ্ঞাপণে প্রকাশিত হলে পীর সাহেব মি. গজনবী সাহেবকে দিয়ে পুলিশ কমিশনারের হস্তক্ষেপের ব্যবস্থা করেন, ফলে ঐ সভা বন্ধ হয়ে যায়।

---

২০৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮
২১০. ফকীহ মুহাদ্দিস আল্লমা রুহুল আমীন (র.), *হযরত পীর সাহেবের বিস্তারিত জীবনী* (বসিরহাট: মুজাদ্দেদীয়া লাইব্রেরী, ১৯৮৮ খ্রী.), পৃ. ৯৭
২১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

পীর সাহেবের প্রতিবাদে কুকুর দৌড় বিল পাস হতে পারেনি। গ্রামোফোনে কুর'আন ও আযানের প্রতিবাদ, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে মুসলিম মেয়েদের নাচ-গানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, হাততালির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, মস্‌জিদের সামনে বাদ্যের প্রতিবাদ, অমুসলিম পদ্ধতিতে মুসলিম-অমুসলিমদের মিলনের নামে 'রাখি বন্ধনের' প্রতিবাদ তিনি উচ্চ নিনাদে ঘোষণা করেন। তিনি 'আইন অমান্য' (যে আইন কুর'আন-হাদীসের খেলাফ নয়) করার বিরুধিতা করতেন, বরং উক্ত পরিস্থিতিতে জীবন বিপন্ন হবে, ফলে আত্মহত্যার পাপে পতিত হবে। বন্ধ-হরতাল তিনি সমর্থন করতেন না।

আজ থেকে প্রায় শত বছর পূর্বে বঙ্গ-আসামের সমাজ জীবন কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিলো। শির্‌ক-কুফ্‌র, বেশরা বিদ'আতী কাজ নির্বিচারে হত। দেশের সর্বত্র নানরকম মেলা বা বাজার বসতো। তথায় নানা কায়দায় অসমাজিক গর্হিত কার্যকলাপ চলতো। মদ-জুয়া-নারী কারবারে মেলাগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা হতো।

সমাজে মোল্লা-মৌলভী, মুনসীর প্রচন্ড অভাব ছিলো। ফলে অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত মোল্লা-মুনসীরা ফলাও করে কারবার চালাতো। একই মোল্লা-মুন্‌সী একদিনে একাধিক জায়গায় নামাজ পড়াতেন। মহল্লায় 'ছুরি-পড়া' দিয়ে যেতো মুরগী জবেহ করার জন্য। রূহ-শাফায়াতের নামে নানাবিধ শরীয়ত বিরুধী কাজ করতো।

মুজাদ্দিদে যামান (র.) বঙ্গ-আসামের সমাজ জীবনে মহাবিপ্লব আনেন। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে দিক-দিগন্তে ধর্মের অমীয় বাণীর নিখুঁত ব্যাখ্যা প্রচার করে ন্যায়-অন্যায়ের স্বরূপ ও সুফল-কুফল সমাজে বোঝাতে থাকেন এবং বহু স্থানে দীনী মক্তব-মাদ্রাসা কায়েম করেন। মাদ্রাসাভিত্তিক বার্ষিক ইসালে সওয়াব প্রতিষ্ঠা করে 'বাজার মেলার' মূল উৎপাটন করেন।

পেঁচো-পাঁচী, বন-বিবি, ওলা বিবি প্রমুখের নামে 'থান ও দরগা' স্থাপন করে হাজত- মান্নত তথা দরগা পুজা করা হতো। 'গইলে গান' মনসার ডালা, 'ছট্টি' সাদ খাওয়া প্রভৃতি অনৈসলামিক কার্যকলাপ মুসলিম সমাজে বেশ প্রচলিত ছিলো। মুজাদ্দিদে যামান (র.) তাকরিরী ও তাহরিরীভাবে উক্ত বিদ'আতী-বে-শরার আমূল সংস্কার করেন।[২১২]

বঙ্গ-আসামে লা-মাযহাবী-মুহাম্মদী, মাযহাব বিদ্বেষী মৌলভীরা হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমামে 'আজম নু'মান বিন সাবিত আবূ হানীফা কুফী (র.)-এর প্রতি 'তোহমতের-স্বর' এনে হানাফী মাযহাবকে ঝাঝরা করছিলো। শিয়া, খারিজী, কাদিয়ানী, মাইজভান্ডারী, সুরেশ্বরী, নেড়ার ফকিরদের দৌরাত্ম বিদ্যমান ছিলো। মুজাদ্দিদে যামান (র.) এবং তাঁর অন্যতম প্রধান খলীফা রুহুল আমীন (র.) বঙ্গ-আসামের বিভিন্ন স্থানে বাহাস মুকাবিলা করে তাদের অসারতা প্রমাণ করেন এবং তাদের লিখিত পত্র-পত্রিকা ও পুস্তিকায় প্রকাশিত ভ্রান্ত মতবাদের অসারতা অপনোদনকল্পে অকাট্য প্রমাণে প্রমাণিত শতাধিক প্রামান্য পুস্তক এবং পত্র-পত্রিকায় দান্দান-শেকন জবাব দিয়ে দর্পচুর্ণ করেন। তা ছাড়া 'আল্লামা আবূ জাফর সিদ্দিকী (র.), মাওলানা আহমদ আলী এনায়েতপুরী (র.), সম্পাদক মাসিক শরীয়তে ইসলাম, এম. এল.এ. হযরত মাওলানা নেছারউদ্দীন আহমদ (শর্ষিণা-বরিশাল) (র.), হযরত পীর হাতেম আলী (র.), মাওলানা মোয়েজ উদ্দীন হামিদী (র.), মুজাদ্দিদে মিল্লাত মাওলানা বজলুর রহমান দরগাহপুরী (র.) প্রমুখ বিখ্যাত খলীফাগণ অসংখ্য কিতাব লিখে শরীয়তের সঠিক চিন্তাধারা ও রূপরেখা সমাজে পরিবেশন করেন।

প্রকাশ থাকে যে, সে সময় মুজাদ্দিদে যামান (র.) ও তাঁর অনুসারী হক্কানী 'আলিমগণ ব্যতীত তেমন কোনো ব্যক্তিই ছিলেন না উল্লিখিত শির্‌ক, বিদ'আত, বেশরা, কুসংস্কার প্রতিকার ও প্রতিবাদ করার। আল্লাহ্‌র শোক্‌র, মূলত ফুরফুরার একক প্রচেষ্টায় সমাজ সংস্কারের উত্তাল তরঙ্গমালায় অনাচার-কুআচার, বাতিল-বেশরা প্রভৃতি কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায়।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মুজাদ্দিদে যামান (র.) ব্যাপক কর্মসূচি রূপায়ণে জীবন সংগ্রামে রত ছিলেন। তাঁর অর্ধশতাব্দীর বৈপ্লবিক জীবনে মাযহাব বিদ্বেষীদের আক্রমণ থেকে হানাফী মাযহাবকে সুদৃঢ় করেছেন এবং শিয়া, কাদিয়ানী, নেড়ার ফকির প্রভৃতি বাতিল মতাবলম্বীদের স্বরূপ উদঘাটন করে দিয়েছিলেন।[২১৩]

---

২১২. মোঃ হালিম আরামবাগী, *আমীরুস শরীয়ত ফুরফুরার পীর সাহেব* (ঢাকা: আবদুল্লাহ প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স, ১৯৮৫ খ্রী.), পৃ. ১৪
২১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

সংবাদপত্র পরিচালনায় তাঁর বিরাট ভূমিকা ছিলো। মিহির ও সুধাকর, মুসলিম হিতৈষী, ইসলাম দর্শন, হানাফী, সুন্নত ওয়াল জামায়াত, ইসলাম প্রচারক, হেদায়েত, সুলতান, মোহাম্মদী, নবনূর, মুসলিম, শরীয়তে ইসলাম প্রভৃতি সাপ্তাহিক, অর্ধ সাপ্তাহিক, মাসিক ও দৈনিক পত্রিকার সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক ছিলো। এমন কি আজাদ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মাওলানা আকরাম খাঁ সাহেবের 'মোহাম্মদী' পত্রিকা তাঁর কাছে ঋণী, সে সম্বন্ধে আকরাম খাঁ 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন।[২১৪]

তিনি একজন কামিল পীর ছিলেন। বঙ্গদেশের প্রতি এলাকায় এবং বাইরেও তাঁর অনেক মুরীদ রয়েছেন। তাঁর মতে শরীয়ত ব্যতীত মা'রেফাত হয় না। ইবাদাত-বন্দেগীতে, কাজে-কর্মে, চাল-চলনে, আচার-অনুষ্ঠানে, রীতি-নীতিতে, মোটকথা সকল ব্যাপারে যিনি শরীয়তের অনুবর্তী হন তিনিই পীর হতে পারেন। তিনি বলতেন, কেবল পীরের বংশেই যে পীরের জন্ম হবে এমন কথা কিতাবে নেই। যে বংশেই হউক না কেনো, যিনি শরীয়ত ও মা'রেফাত ইত্যাদিতে কামিল হবেন, তিনিই পীর হতে পারবেন।[২১৫]

তিনি ছিলেন একজন সুবক্তা। বাংলা-আসামের শহরে ও গ্রামে তিনি বহু ধর্মসভায় ওয়ায-নছীহত করেছেন, বিদ'আতপন্থী ও বে-শর'আ পীর-ফকিরদের বিরুদ্ধে তিনি মৌখিক প্রচার ও লিখনীর মাধ্যমে বিরামহীন সংগ্রাম করেছেন। তৎকালে 'আলিমগণ সাধারণত বাংলা শিখতেন না এবং বাংলা ভাষায় কিছু লিখতে আগ্রহী ছিলেন না। সহজ সরল বাংলা ভাষায় সাধারণের বোধগম্য করে শরীয়তের বিধি-বিধান তথা ইসলামী বিষয়াদির ওপর বই-পুস্তক রচনা করতে তিনি তাঁর 'আলিম ও ইংরেজী শিক্ষিত মুরীদদেরকে উৎসাহিত করেন। ফলে রুহুল আমীন, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, আবদুল হাকীম (বিখ্যাত তাফসীর কারক), ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ আরও অনেকে এ কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর অনুমোদনক্রমে অথবা তাঁর নির্দেশে লিখিত এ ধরনের কিতাব-পুস্তকের সংখ্যা হাজারের অধিক হবে। মাওলানা রুহুল আমীন একাই প্রায় ১৩৫ খানা পুস্তকের রচয়িতা। তাঁর নির্দেশে লিখিত বা অনুমোদন প্রাপ্ত কয়েকখানা বইয়ের নাম উল্লেখ করা যায়। যেমন ঃ 'আকায়েদে ইসলাম, তাসাউফ, ছিরাজুস সালেকীন, পীর-মুরীদ তত্ত্ব, বাতিল দলের মতামত, নছীহতে সিদ্দিকীয়া, ফাতওয়ায়ে সিদ্দিকীয়া, তা'লীমে তরীকত, এরশাদে সিদ্দিকীয়া ইত্যাদি। তরীকত দর্পন বা তাসাউফ তত্ত্ব বইটি আবূ বকর সিদ্দিকী (র.)-এর মুখ নিঃসৃত বাণীর সংগ্রহ।[২১৬] তিনি নিজেও একজন সুলেখক ছিলেন। পত্র-পত্রিকায় তাঁর বহু বিবৃতি, কিছু প্রবন্ধ ও লিখিত ভাষণ প্রকাশিত হয়েছে।[২১৭] তাঁর রচিত তারীখুল ইসলাম (বাংলা),কাওলুল হাক্ক (উর্দু) এবং অছিয়তনামা (বাংলা) প্রকাশিত হয়েছে।[২১৮] তিনি 'আদিল্লাতুল মুহাম্মাদিয়া' নামে আরবিতে একটি কিতাবও রচনা করেন। তবে তা প্রকাশিত হয়নি।[২১৯]

মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেন। মাদ্রাসার পাঠ্য তালিকা সংস্কারের জন্য তিনি দাবি জানান। যুগোপযোগী শিক্ষা গ্রহণ করতে তিনি মুসলমানদেরকে উপদেশ দেন, বিশেষত ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের প্রতি তিনি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বালক-বালিকাদেরকে ইবতেদায়ী তা'লীম (প্রাথমিক শিক্ষা) ইসলামী তরীকা অনুযায়ী ও ইসলামী পরিবেশে দেয়ার জন্যে তিনি জোর তাকীদ করেন। তাঁর মতে নারী শিক্ষাও জরুরী, তবে পর্দার সাথে। তাদের জন্যে বিশেষতঃ উচ্চশ্রেণীর বেলায় পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে তিনি উপদেশ দেন।[২২০] তাঁর চেষ্টায় বঙ্গ দেশের নানা স্থানে প্রায় ৮০০ মাদ্রাসা ও ১১০০ মস্‌জিদ স্থাপিত হয়েছিল। তাঁর নিজ গ্রামে তিনি একটি 'ওল্ড স্কীম' ও একটি 'নিউ স্কীম' মাদ্রাসা এবং একটি ভালো গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৯২৮ সালে কলকাতা 'আলিয়া মাদ্রাসার প্রথম গভর্নিং বডি গঠিত হয়। তিনি তার সদস্য ছিলেন।[২২১]

---

২১৪. আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান, প্রগুক্ত, পৃ. ৯৯
২১৫. রুহুল আমীন, *মুজাদ্দিদে জামান (র.)-এর জীবনী* (ঢাকা: ইসলামিয়া কুতুবখানা, ১৩৪০ বাং.), পৃ. ২৪৭
২১৬. দিওয়ান মুহাম্মদ ইব্রাহীম তর্কবাগীশ, *হাক্বীকতে ইনসানিয়াত* (চট্টগ্রাম: ছিরাতুল মুস্তাকীম লাইব্রেরী, ১৯৯৯ খ্রী.), পৃ. ৯৭
২১৭. *শরিয়তে ইসলাম*, বর্ষ- ৩য়, সংখ্যা-১০ম, পৃ. ০২
২১৮. এম. ওবায়দুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১
২১৯. রমজান আলী, *ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেব (র.)-এর মত ও পথ* (পাবনা: আলামীন লাইব্রেরী, ১৯৭৭ খ্রী.), পৃ. ৪৬
২২০. *শরিয়তে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৪
২২১. মাওলানা আবদুস সাত্তার, *তারিখ ই-মাদ্রাসা ই-আলিয়া* (ঢাকা: ইসলামিয়া লাইব্রেরী, ১৯৭৫ খ্রী.), পৃ. ৮৫

সমাজ সংস্কারক হিসেবে আবু বকর সিদ্দিকীর অবদান রয়েছে। তিনি মুসলিম সমাজ হতে শির্ক, বিদ'আত ও অনৈসলমী কার্যক্রম দূর করতে সাধ্যমত চেষ্টা করেন। তাঁর পরামর্শ ও পৃষ্ঠপেষকতায় ১৩১৭/১৯১১ সনে 'আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীন' নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়।[২২২] এর উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে ছিল মুসলিমদেরকে হিদায়াত করার জন্যে ওয়ায নছীহত-এর ব্যবস্থা করা, খৃষ্টান মিশনারীদের কার্যকলাপের প্রতিবিধান করা ও অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করা। এ আঞ্জুমানের প্রচেষ্টায় বেশ কিছু অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এ আঞ্জুমানের সভাপতি ছিলেন।[২২৩]

জমিয়ত-ই-ওলামা-ই-হিন্দ ১৯১৯ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। তার একটি শাখা জমিয়ত-ই-ওলামা-ই বাংলা ও আসাম। মাওলানা আবূ বকর সিদ্দিকী শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন এবং আযাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এর এক অধিবিশনে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেছিলেন, "শরীয়ত, তরীকত, হাকীকত ও মা'রেফাতে পূর্ণরূপে 'আমল করে দেশ ও কওমের খিদমতের জন্যে 'আলিমদেরকে রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতিতে যোগ দেয়া আবশ্যক। রাজনীতির ক্ষেত্র হতে 'আলিমদেরকে সরে পরার জন্যে আজ মুসলিম সমাজে নানাবিধ অন্যায় ও বে-শর'আ কাজ হচ্ছে।"[২২৪]

কলকাতায় ১৯২৬ সালে জমিয়ত-ই-ওলামা-ই-হিন্দের বার্ষিক সভায় অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে প্রস্তাব গৃহীত হলে তিনি তার বিরুধিতা করেন। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "আইন অমান্য আন্দোলনের ফলে শান্তি-শৃংখলা বিনষ্ট ও মহা ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। স্বরাজ স্বাধীনতা সকলের কাম্য, তা লাভ করার জন্য পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করা অবশ্য প্রয়োজন, নতুবা তার ফল হবে ভয়ংকর। ভারতের মুসলিমরা এ বিষয়ে বহু পশ্চাতে পড়ে আছে। তারা সামাজিক সংগঠন ও শিক্ষায় নিতান্ত পশ্চাৎপদ; সুতরাং তাদেরকে শিক্ষা, সংগঠন প্রভৃতি বিষয়ে উন্নত করতে হবে, নতুবা মহাসর্বনাশ অনিবার্য। আইন অমান্য আন্দোলন হতে সম্পুর্ণ পৃথক থাকা বিশেষ প্রয়োজন।"[২২৫] ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের প্রাদেশিক নির্বাচনে তিনি তাঁর মুরীদান, মুত্তাকিদীন ও সাধারণ মুসলিমদেরকে মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ড কর্তৃক মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে ভোট দিতে অনুরোধ করেছিলেন।[২২৬]

জমিয়তের সভাপতি হিসেবে তিনি সৌদী আরবের সুলতান অবদুল আজীজ ইবনে সৌদকে শরীয়ত বিরোধী কার্যাদি রোধ সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করে ১৩৫১ হিজরীতে পত্র লিখেন। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং আরো চেষ্টা করা হবে বলে বাদশাহ তাঁর পত্রের জবাব দিয়েছিলেন।[২২৭]

তৎকালীন সমাজে সংবাদপত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তিনি এ কথাটি ভালোভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বেশ কিছু পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আর্থিক সংকটে পতিত হয়েছে, এমন অনেক পত্রিকাকে তিনি নিজ তহবিল হতে অথবা চাঁদা সংগ্রহ করে সাহায্য করেছেন।[২২৮] তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় যে সকল পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলোর কয়েকটি নাম উল্লেখ করা হলো ঃ

১. মিহির ও সুধাকর (সাপ্তাহিক), সম্পাদক, শেখ আবদুর রহিম, ১ম প্রকাশ, ১৮৯৫
২. নবনূর (মাসিক), সম্পাদক, সৈয়দ এমদাদ আলী, ১ম প্রকাশ, ১৯০৩
৩. মোহাম্মদী (সাপ্তাহিক), সম্পাদক, মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, প্রথম প্রকাশ, ১৯০৮
৪. সুলতান (সাপ্তাহিক), পরবর্তীকালে দৈনিক, সম্পাদক, প্রথমে রেয়াজুদ্দিন আহমদ ও পরে মোহাম্মদ মুনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, ১ম প্রকাশ, ১৯০২

৫. মুসলিম হিতৈষী (সাপ্তাহিক), সম্পাদক, শেখ আবদুর রহিম, প্রথম প্রকাশ, ১৯১১

---

২২২. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্রিকা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯ খ্রী.), পৃ.২৫
২২৩. আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০
২২৪. *শরিয়তে ইসলাম*, বর্ষ-১০ম, সংখ্যা-৮ম, ভাদ্র ১৩৪২, পৃ. ১৩
২২৫. শরিয়তে ইসলাম, বর্ষ-৫ম, সংখ্যা-৩য়, আষাঢ় ১৩৪২, পৃ. ৪৩
২২৬. ছুন্নত-অল-জামাত পত্রিকা, বর্ষ- ৪র্থ, সংখ্যা-১ম বৈশাখ ১৩৪০, পৃ. ৫৬
২২৭. দিওয়ান মুহাম্মদ ইব্রাহীম তর্কবাগীশ,প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫-১১৭
২২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

৬. ইসলাম দর্শন (মাসিক), আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীনের মুখপত্র, সম্পাদক, মোহাম্মদ আবদুল হাকিম ও নূর মোহাম্মদ, ১ম প্রকাশ, ১৯২০

৭.হানাফী (সাপ্তাহিক), সম্পাদক মোহাম্মদ রুহুল আমীন, ১ম প্রকাশ, ১৯২৬

৮. শরীয়তে ইসলাম (মাসিক), সম্পাদক, আহমদ আলী এনায়েতপুরী, ১ম প্রকাশ, ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দ।[২২৯]

তাঁর খলীফাদের সংখ্যাও অনেক। তারা তাঁর অনুসরণে কাজ করে গিয়েছেন। ফলে তাঁর ইন্তিকালের পরও তাঁর আরদ্ধ কাজে ছেদ পড়েনি। তাঁর পাঁচ পুত্র। প্রথম পুত্র শাহ্ সূফী আবু নসর মুহাম্মদ আবদুল হাই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। পুত্ররা সকলেই 'ইল্‌ম ও শরীয়তের জ্ঞান সম্পন্ন এবং তাঁর খলীফা ছিলেন।

২২৯. আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

২য় পরিচ্ছেদ
বিভিন্ন দেশে হিদায়াতী কার্যক্রম

হযরত মাওলানা আবদুল্লাহ আল মা'রূফ আবু বকর সিদ্দিকী (র.) ফুরফুরার সিদ্দিকী বংশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। মুজাদ্দীদে যামান ও আমীরুস শরীয়ত হিসেবে সমগ্র বিশ্বে তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। সৌদী আরবের বাদশাহকেও তিনি হিদায়াতী পত্র লিখেছিলেন। যার উত্তর আজও সযত্নে রক্ষিত আছে। বাংলা-ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ওয়ায-নছীহত, হাজার হাজার মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ ও শিক্ষা বিস্তারেও তাঁর অবদান ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে।

মুজাদ্দিদে যামান (র.) তদানীন্তন আরবের বাদশাহ সুলতান ইবনে স'উদ সাহেবের কাছে যে পত্র লিখেছিলেন এবং তিনি তার যে উত্তর দিয়েছিলেন, নিম্নে তার হুবহু আরবী এবং অনুবাদ উদ্ধৃত করা হলো।[২৩০]

সউদী বাদশাহর প্রতি পত্র

من ابى بكر عبدالله بن مولانا الحاج عبدالمقتدر اميرالشريعة وشيخ صدر جمعية العلماء صوبه بنجالة
الى حضرة السلطان عبدالعزيز بن السعود جلالة الملك سلطان النجد ومالك الحجاز دام ملكه وبقائه -
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اما بعد فلا نزال ان الاثار القديمة وقباب المزارات المقدسة فى سلطنتكم الحجاز قد انهدمت ومحيت بامركم وان ذالك ليس ببعيد عن الحق من جهة واحدة اتباعا للحديث النبوى لكن عجبا لنا ان اكثر قطان ملككم وسكانه نراهم انهم قد يحلقون لحاهم ويقصرونها بخلاف السنة النبوى وسكان الارض جميعا لايزالون يرتكبون على هذا الامر الشنيح بالتدريج لما يرون منهم ويصدر عنهم من الافعال القبيحة فهذا يقول هذا العبد الضعيف من شيمتكم البهيمية وشنشنتكم المريقة ان تصد ماكان فى بلادكم وملككم من الافعال الشنيعة المبتدعة والاعمال الغير المشروعية هداية لهم وشفقة عليهم واصلاحا لحالاتهم– فاذا تفوز بفوز سعادة الدارين بفضل الله خالق الكونين ونحن ندعو الله تعالى جل برهانه لبقائكم وملككم -

অনুবাদ : আবু বকর আবদুল্লাহ ইবনে মাওলানা আলহাজ আবদুল মুক্তাদির আমীরুশ-শারীয়ত শায়খ সদরে জমিয়তে ওলামা বাঙ্গালা হতে নজদের সুলতান ও হিজাজের অধিপতি আবদুল আযীয ইবনে সউদের নিকট। তিনি দীর্ঘায়ু হোন। তাঁর রাজ্য চিরস্থায়ী হোক।

আস্‌সালামু 'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।
অতঃপর আমরা শুনে আসছি যে, প্রাচীন স্মৃতিগুলো ও পাক মস্‌জিদসমূহের চূড়াসকল আপনার আদেশে ধ্বংস এবং নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এটা এক হিসাবে নবী (স.)-এর হাদীস শরীফের অনুসরণে অসত্য নহে। কিন্তু আমাদের বড় আশ্চর্য বোধ হয় যে, আপনার দেশের অধিকাংশ অধিবাসী ও অবস্থানকারীকে আমরা দেখেছি যে তারা নবী (স.)-এর সুন্নতের বিপরীত দাড়ি মুন্ডন করে থাকে এবং ছাট-খাট করে থাকে। তাদের দ্বারা অসৎকাজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে দেখে দুনিয়ার সমস্ত অধিবাসী ক্রমশ এসব অসৎ কাজে লিপ্ত হচ্ছে। আপনার উজ্জ্বল চরিত্র ও অনাবিল স্বভাবের প্রতি ভরসা করে এ দীনহীন বান্দা আশা করে, আপনার শহরগুলোতে ও রাজ্যে যে বিদ'আত ও কুৎসিত কাজগুলো ও শরীয়তের বিপরীত আমলগুরো অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তাদের হিদায়েতের উদ্দেশ্যে, তাদের প্রতি দয়া প্রকাশের উদ্দেশ্যে এবং তাদের অবস্থার সংশোধন করার উদ্দেশে এসব না করতে তাদেরকে নিষেধ করুন।

২৩০. মুবারক আলী রহমানী, *ফুরফুরা শরীফের ইতিবৃত্ত* (কলকাতা: নাসারীয়া প্রকাশনী ট্রাস্ট, ১৯৮৪ খ্রী.), পৃ. ১২০-১২৩

ফলে আপনি উভয় জগতের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে উভয় জগতের সৌভাগ্য লাভে সমর্থ হবেন। আমরা মহিমান্বিত আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে আপনার ও আপনার রাজ্যের স্থায়িত্বের জন্য দু'আ করছি।[২৩১]

সউদী বাদশাহ্‌র উত্তর

من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل الى حضرة المكرم محمد ابى بكر عبدالله بن الحاج عبد المقتدر امير الشريعة وصدر جمعية العلماء فى بنجالة حفظه الله -

بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته– ثم وصلنا كتابتكم المورخة فى ١٦-٣-١٣٥١ وما ذكرتم به كان لدينا معلوما خصوصا ما اشرتم اليه من بعض الامور المخالفة للشرعية فلا يخفى الينااننانبذل جهدا فى تائيد كل امر يجيزه الشرع ويامره به ونمنع ما يخالف ذالك وهذا الذى ندين الله به ونحيا عليه ونموت عليه ان شاء الله ونسال الله ان يوفقنا واياكم وجميع المسلمين الى سلوك الهداية والرشاد ويجنب بجميع ضده ويمنحنا واياكم القصد والسداد بالاقوال والافعال لما فيه الخير وحسن العاقبة من امر الدنيا والدين اما الحالة عندنا نهى من كرم الله على ما يرام من الراحة والطمانينة نشكر الله على نعمه ونرجوه مزيدها هذا مالزم بيانه الله يحفظكم- حرر فى -

١١ ربيع الثانى والسلام-

অনুবাদ

আবদুল আযীয ইবনে আবদুর রহমান ফয়সল হতে হযরত মুহাম্মদ আবু বকর আবদুল্লাহ ইবনে হাজী আবদুল মুক্তাদির আমীরুশ শরীয়ত ও জমিয়াতুল 'ওলামা বাঙ্গালার সভাপতির নিকট–

আসসালামু 'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ।
অতঃপর আপনার ১৬/০৩/১৩৫১ হিজরী তারিখের লিখিত পত্র পেয়েছি। আপনি যে বিষয় উল্লেখ করেছেন, আমি তাহা জ্ঞাত আছি। বিশেষত আপনি যে শরীয়ত বিরুধী কতিপয় বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, প্রকাশ থাকে যে, নিশ্চয়ই আমি শরীয়ত যে কোনো বিষয় জায়েয রাখে এবং আদেশ করে তার সহায়তাকল্পে সাধ্য সাধনা করছি এবং তার বিপরীত বিষয় নিষেধ করছি। আল্লাহ্ তা'আলার যে দীন কবুল করেছি তা এই। তার ওপর আমার জীবন এবং আমার মরণ, ইনশাআল্লাহ্।

আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সওয়াল করি যে, তিনি যেনো আমাকে , আপনাদেরকে ও সমস্ত মুসলমানকে হিদায়েত ও সত্য পথে চলার শক্তি প্রদান করেন এবং এর বিপরীত পথ থেকে দূরে রাখেন। আর তিনি যেন আমাদেরকে এবং আমাদের কথা ও কাজে ন্যায়পরায়ণতা ও সততা প্রদান করেন। কেননা এতে দীন ও দুনিয়ার কাজে কল্যাণ ও শুভপরিণতি অছে। আমি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে আশানুরূপ শান্তিপূর্ণ অবস্থায় আছি। আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতগুলোর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং তার বৃদ্ধির আশা রাখি, এ আমার জওয়াব। আল্লাহ্ আপনাদিগকে নিরাপদে রাখুন।
১১ই রবিউস সানিতে লিখা।[২৩২]

১৩২০ বাংলা ভাদ্র মাসে নোয়াখালী জেলার লক্ষীপুর নিবাসী একজন আ'লিম আরব দেশে শিক্ষা শেষে সোজা ফুরফুরায় এসে হযরত পীর সাহেবের খিদমতে উপস্থিত হন ও তাঁর হাতে বায়'আত করত তা'লীম গ্রহণ করেন। উপস্থিত মাওলানা এনায়েত উল্লাহ (নোয়াখালী) সাহেব তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি দূর দেশ থেকে কষ্ট করে কেনো এখানে আসলেন ? উত্তরে তিনি বলেন, আরব দেশে হযরত পীর সাহেবের গুণ গরিমা ও প্রসংশা শুনে

২৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫
২৩২. মোঃ মুবারক আলী রহমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০-১০৩

তাঁর সাথে সাক্ষাতের আগ্রহে এসেছি। পুনরায় আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আরব দেশে পীর সাহেবের নাম কিরূপ প্রসিদ্ধ আছে ? তিনি বলেন, মক্কা শরীফে তাঁর নাম জানে না এমন লোক অতি বিরল। তাঁরা হুযুরের সাক্ষাতের জন্য লালায়িত আছেন। তথায় পীর সাহেবের বহু মুরীদ আছে।

পীর সাহেবের খলীফা সূফী সদরুদ্দীন (র.) বার্মার লোককে শরীয়ত ও তরীকতের নূরে উদ্ভাসিত করেছেন। সামারকান্দ, বোখারার 'আলিমগণ পীর সাহেব কর্তৃক শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে তৎসমস্ত স্থানে প্রচার করেছেন। মক্কা শরীফে শায়খুদ্দালায়েল মাওলানা অবদুল হক দেহলবীর খলীফা মাওলানা বদরুদ্দীন সাহেব হুজুরের নিকট থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে উক্ত তরীকা তথায় প্রচার করেছেন।[২৩৩]

তাকওয়া-পরহেজগারী ও আমল-আখলাক

হযরত মাওলানা সূফী আবদুল মাবুদ (র.) 'সওয়ানেহে ওমরী' পুস্তকে লিখেন যে– 'একদিন মুজাদ্দিদে যামান পীর সাহেব **১১** নং নিউ মার্কেটের মস্জিদের দোতলায় তাশরীফ রাখেন। আমি (সূফী আবদুল মাবুদ) তথায় ছিলাম। মুন্শি আবদুল বারি নামে জনৈক ব্যক্তি হুজুরের কাছে বায়'আত করে কাদিরীয়া তরীকা লাভের আগ্রহ প্রকাশ করলে হুজুর আমাকে উক্ত তরীকার দরূদ শরীফ লিখে দিতে আদেশ করেন। আমি সে মত তাঁর বিছানায় পাওয়া এক টুকরা কাগজে দরূদ শরীফ লিখে দেই।' মুন্শী সাহেব দরূদ শরীফ লিখা কাগজটি হুজুরকে দেখালে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'কাগজ কোথায় পেলে?' আমি বললাম, 'হুজুরের বিছানায় ছিলো।' তিনি বললেন, 'কাগজ কার জানো?' আমি বললাম, 'জী না।' হুজুর বললেন, 'অজানা দ্রব্য ব্যবহার করা কি জায়েয আছে?' তৎশ্রবণে আমি খুবই লজ্জিত হলাম। হুজুর বললেন, 'একটি ছেলে তাবিজ লিখার জন্য কাগজ এনেছিলো, সে নিচে আছে। যাও তার কাছে মাফ চেয়ে এসো।' আমি তৎক্ষণাৎ নিচে যেয়ে তার কাছে মাফ চালাম এবং দরকার পড়তে পারে চিন্তা করে তার দোয়াত-কলম ব্যবহার করার অনুমতি গ্রহণ করলাম। অতঃপর একটি ফাতওয়ায় হুযুরের দস্তখতের দরকার পড়ায় উক্ত দোয়াত-কলম হাযির করলে, তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'এ কার দোয়াত-কলম? তার থেকে ইজাযত নিয়েছ কি?' আমি বললাম, 'হুজুরের কথা উল্লেখ করিনি, তবে আমার জন্য অনুমতি নিয়েছি।' হুজুর বললেন– "তোমার জন্য তা জায়িয কিন্তু আমার জন্য নয়।"[২৩৪]

উক্ত সূফী সাহেব আরো বলেন, 'একদিন হুজুর আমাকে বলেন, 'দেখো তো বাবা এ আয়াত কোন সূরায়?' আমি সূরা বের করার জন্য যেই কুর'আন শরীফ হাতে নিয়েছি অমনি হুজুর জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ কুর'আন শরীফ কার? আর যাই হোক ইজাযত লওয়া হয়েছে কি?' আমরা শুনে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলাম। পুনরায় তিনি বলেন– "এসব খেয়াল রাখা আবশ্যক, তা না হলে কখনই তরক্কি করতে পারবে না।"[২৩৫]

নদীয়া কপুরহাটের মাওলানা ফজলুর রহমান সাহেব বর্ণনা করেন : মুজাদ্দিদে যামান (র.) গোয়ালন্দে তাশরীফ আনলে সেখানে রেলওয়ে কোম্পানীর পাথুরিয়া কয়লা দ্বারা তাঁর খানা পাকানো হ'লো। একথা জানতে পেরে তিনি বললেন–"রেলওয়ে কোম্পানী তো অন্য লোকের খানা পাক করার জন্যে কয়লা ব্যবহার করার অনুমতি দেয়নি। সুতরাং এ কয়লা দিয়ে পাক করা খানা খাওয়া আমার জন্যে জয়িয়েয হবে না।" পরে বাজার হ'তে কাঠ কিনে এনে তাঁর জন্যে আবার খানা পাকানো হলো।

চট্টগ্রামের মৌলভী আবদুল মজিদ সাহেবের দাওয়াতে মুজাদ্দিদে যামান(র.) একবার চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন। সেখানে একদিন ফজরের ওয়াক্তে মাদ্রাসার ছত্ররা বোর্ডিং হতে পানি গরম করে অযুর জন্যে হুজুরের কাছে উপস্থিত করলো। হুজুর জিজ্ঞেস করলেন– 'এ পানি কোত্থেকে গরম করা হয়েছে?' ছাত্ররা উত্তরে বললো, 'বোর্ডিং-এ গরম করা হয়েছে।' হুজুর তখন বললেন, 'যিনি বোর্ডিং-এ কাঠ দান করেছেন, তিনি নিশ্চয়ই আমার এ অযুর পানি গরম করার জন্যে দেননি।' এ কথা বলেই তিনি নিজের পকেট থেকে কাঠের মূল্য আদায় করে দিলেন।[২৩৬]

---

২৩৩. আবদুল্লাহ মারূফ আরিফ আল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪
২৩৪. সূফী আবদুল মাবুদ, *সওয়ানেহে ওমরী* (হুগলী: হোদায়াতুল মুসলিমীন লাইব্রেরী, ১৯৬৫ খ্রী.), পৃ. ৫২
২৩৫. অবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫
২৩৬. সূফী আবদুল মাবুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

জয়পুর হাটের মাওলানা ফজলুর রহমান সাহেব বর্ণনা করেন: একদিনের ঘটনা। আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীনের অফিসে মুজাদ্দিদে যামান (র.) তাশরীফ আনলেন। বিশেষ প্রয়োজনে হুজুরের কাছ থেকে এক ব্যক্তি একটি দস্তখত নিল। দস্তখত করেই হুজুর জিজ্ঞেস করলেন, 'এ দোয়াত-কলম কোথাকার?' আমি বললাম, 'এটি আঞ্জুমান অফিসের দোয়াত-কলম।' হুজুর বললেন, 'এ দোয়াত-কলম অফিসের কাজের জন্যে, আমার দস্তখত করার জন্য নয়।' অতঃপর হুজুর এর মূল্য বাবদ দু'আনা পয়সা দিয়ে দিলেন।

মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর এক মুরীদ একটি নালাতে কয়েকটি মাছ দেখতে পেয়ে মাছগুলো দিয়ে বদনাটি পূর্ণ করে তাঁর কাছে নিয়ে আসলো। হুজুর জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি এ মাছগুলো কোত্থেকে আনলে?' সে ব্যক্তি বললো, 'একটি নালা দিয়ে মাছগুলো যাচ্ছিল, সেগুলো আমি ধরে এনেছি।' হুজুর ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'উক্ত নালা এবং যে পুকুর হতে মাছগুলো বের হয়েছে, সেগুলো কার অধিকারভুক্ত তা তুমি জান কি?' সে ব্যক্তি বললো, 'না।' হুজুর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কয় বছর হলো তুমি আমার কাছে মুরীদ হয়েছো?' লোকটি বললো, 'নয় বছর।' হুজুর পুনরায় তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ নয় বছরে কিছু শিক্ষা পেয়েছ কি?' সে ব্যক্তি বললো, 'কল্‌বের ছবক মশ্‌ক করছি; কিন্তু ফায়েজ বুঝতে পারছি না।' হুজুর পরিশেষে তাকে বললেন–"অন্তর শুদ্ধির পরিপন্থী এরূপ অযোগ্য রীতি-নীতিতে কি ফায়েজ জারি হতে পারে? যাও মাছগুলো স্বস্থানে রেখে এসো। যদি কোনটি মরে গিয়ে থাকে, তবে মালিকের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে এসো। যদি সে মাফ না করে তবে মূল্য দিয়ে দেবে।"[২৩৭]

দীনি শিক্ষার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের পরিচয় মাত্র একটি ঘটনা থেকেই অনুমান করা যায়। তদীয় খলীফা মাওলানা আবদুল মাবুদ মেদেনীপুরী একদিন শিয়াখলা যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, 'হুজুরের রুমে প্রচন্ড মশা, অথচ মশারী নেই। তাই হুজুরের জন্য একটি মশারী কিনে আনতে চাই।' মুজাদ্দিদে যামান জিজ্ঞাসা করেন, "মশারী কত নেবে গা?" তিনি বলেন, হুজুর ৩/৪ টাকায় হবে।' হুজুর ইরশাদ করেন– "ঐ টাকা মাদ্রাসার তালেবে 'ইল্‌মদের জন্য মাদ্রাসার ফান্ডে জমা দাও। আবু বকরকে মশায় খাক, এর অসিলা যেন নাজাতের কারণ হয়।"[২৩৮]

হযরত মাওলানা পীরজাদা বাকীবিল্লাহ সিদ্দিকী সাহেব বলেন ঃ একদিন আমার দাদাজী আমাকে (তাঁর মাখানো ভাত খাওয়ানোর সময়) বলেন, 'তুমি কার পোতা বলে পরিচয় দেবে?' আমি বললাম, 'অমি ফুরফুরার পীর সাহেবের পোতা।' দাদাজী বললেন– "না, তা বলবে না। আমি যখন হুগলী মাদ্রাসায় পড়তাম, তখন প্রয়োজনের তাকীদে বেশ কিছু দিন রান্নার কাজে রাঁধুনিকে সাহায্য করতে হতো, এমনকি নিজ হাতে বাটনা বাটতে হয়েছিল, কাজেই 'রাধুনির পোতা' বলে আত্মপরিচয় দিবে।"[২৩৯] একদিকে নিজের হাস্তিকে নিস্ত করলেন, অন্যদিকে বিদ্যাশিক্ষার্থীদের তিনি উত্তম সবক দিলেন।

'আল্লামা রুহুল আমীন লিখেন ঃ খুলনা জিলার সাতক্ষীরার একটি মেথরের মেয়ে মুসলিম হয়ে দশ পারা কুর'আনের হাফিয হয়। তথাকার নামজাদা তছিরুদ্দীন সরদার তাকে নিকাহ করেন। ফলে লোকেরা তাকে সমাজচ্যুত করে, জন-মজুরী সব বয়কট করে। আমি ও যশোহর-বাঁকড়ার মরহুম মাওলানা সানাউল্লাহ সাহেব তথায় উপস্থিত হয়ে সমাজকে বোঝাতে থাকি, কিন্তু তারা আমাদের কথা অমান্য করে বয়কট বহাল রাখে। বেচারা তছিরদ্দীন সাহেব কয়েক বছরের মধ্যে একেবারে অভাবগ্রস্থ হয়ে পড়ে। শেষে নওমুসলিম স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ফুরফুরায় হযরত পীর মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর বাড়িতে উপস্থিত হন। তাঁর নিদারুন দুঃখের কাহিনী শুনে পীর সাহেব বলেন, 'সাতক্ষীরার লোকেরা এতবড় জাহিল হয়ে আছে, তা আমি জানতাম না।'[২৪০]

অতঃপর তিনি উক্ত স্ত্রীলোকটিকে বাড়ির মধ্যে যাওয়ার আদেশ করেন। হযরত মুজাদ্দিদে যামান পীর সাহেব বাড়ির মধ্যে যেয়ে বড় পীর আম্মাকে বলেন– "দু খানা বাসনে ভাত-তরকারী দিয়ে একখানা সে সাতক্ষীরার মেয়েকে, অপর বাসনটি বাহিরে তছিরুদ্দীন সরদারকে দেওয়া হোক।" তিনি পীর আম্মাকে আরও বলেন– "যদি

---

২৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬
২৩৮. প্রাগুক্ত
২৩৯. পীরজাদা মাওলানা বাকীবিল্লাহ সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮
২৪০. মোহাম্মদ রুহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

আপনার দাদা হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর শাফা'আত চান, তবে ঐ মেয়েটির ঝুঁটা ভাত-তরকারী আহার করুন। আর আমি বাহিরে তছিরুদ্দীনের ঝুঁটা খাব। আল্লাহ্ যদি আবু বকরের আর কোনো বন্দেগী কবুল না করেন, তবে আশা করি এ 'আমলের জন্য বেহেশতে দাখিল হতে পারবো এবং নবী (স.)-এর শাফা'আত হতে বঞ্চিত হবো না।" পীর আম্মা তাঁর হুকুম তামিল করেন। সাতক্ষীরাবাসীরা হযরত মুজাদ্দিদে যামানের হৃদয়বিদারক কথা শুনে অনুতপ্ত হয়ে তাকে সমাজে গ্রহণ করে। তিনি এমন কত অসংখ্য পতিত ব্যক্তিকে সমাজভুক্ত করে দিয়েছেন, তার ইয়ত্তা করা যায় না।[২৪১]

'আল্লামা বজলুর রহমান দরগাহপুরী বলেন-নদীয়ায় কোনো এক জলসায় লোকে লোকারণ্য, আমার পীর ও মুর্শিদ মুজাদ্দিদে যামান (র.) ওয়ায করছেন, নীরবে নিস্তব্দে সবাই শুনছেন। হঠাৎ দূরে দেখা গেল কতগুলো লোক দোকানে জটলা করছে। হুজুর বলেন-বাবা! ওখানে কিসের জটলা? কে একজন বললো, হুজুর ওখানে বিড়ির দোকান। তিনি গর্জে উঠলেন– "আবু বকরের জলসায় বিড়ির দোকান! মাকরুহ তাহরিমী হচ্ছে।" তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই একদল লোক যেয়ে বিড়িওয়ালাকে মারধর করে দোকান নষ্ট করে ফেলে।[২৪২]

অতঃপর সুলতানুল ওয়ায়েযীন 'আল্লামা রুহুল আমীন 'ইন্নাকা লা'আলা খুলুকীন 'আযীম' আয়াতে কারীমা তিলাওয়াত করে নবী (স.)-এর আদর্শ ও উন্নতমনা চরিত্রের নিপুণ ব্যাখ্যা তাঁর স্বভাবসিদ্ধভাবে করতে থাকেন। তাঁর চোখে পানি, শ্রোতারাও কেঁদে কেঁদে জারে জার। হঠাৎ লোকজনের ব্যস্ততার আওয়াজে তিনি চোখ খুলে দেখেন, মুজাদ্দিদে যামান (র.) মিম্বরে পুনরায় তাশরীফ এনেছেন। 'আল্লামা ওয়াজ বন্ধ করে দিলেন, সমস্ত মজলিস নিস্তব্ধ। মুজাদ্দিদে যামান (র.) বলেন ঃ বাবারা! আমার কথায় বিড়িওয়ালা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তিনি কোথায় ? বিড়িওয়ালা ভয়ে পায়খানা ঘরে লুকিয়ে আছে। তাঁর আদেশে উক্ত বিড়িওয়ালাকে খুঁজে খিদমতে আনা হলো। অতি সাধারণ মানুষ ভয়ে থর থর করে কাঁপছে। হাজার হাজার হৃদযন্ত্র দ্রুত ওঠানামা করছে। হুজুর বিড়িওয়ালার হাত ধরে বলেন– "আপনার কত টাকার মাল ক্ষতি হয়েছে?" সে ব্যক্তি কিছু বলা তো দূরের কথা, কেবল কাঁদছে। তিনি তাকে দশটি টাকা হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন– "বাবা! আবু বকরের কথায় আপনার ক্ষতি হয়েছে, লোকেরা লাঞ্ছিত করেছে। বাবা! আবু বকরকে ক্ষমা করে দিন।" হাজার হাজার শ্রোতা হুজুরের হুসনে আখলাক দেখে হাহাকার করে কেঁদে জারে জার হচ্ছে। হুজুর বললেন– "ক্ষতিপূরণের এ টাকা গ্যহণ করুন। বাবা! বিড়ির কারবার না করা ভালো।"[২৪৩]

বাদুড়িয়া (২৪ পরগনা জেলা) থানার রাজবেড়িয়া গ্রামের বড় বুযুর্গ মুন্শী হামিজদ্দীন (র.) বর্ণনা করেছেন। ইটিন্ডা গ্রামের জনাব দিদার বকস্ নামে একজন ধনাঢ্য দীনদার নিঃসন্তান ব্যক্তি ছিলেন। সন্তানের কামনায় তিনি তিন বিবাহ করেন এবং নানারকম চিকিৎসার ক্রটি করেননি। নিঃসন্তান দিদার বক্স মিয়া অবশেষে মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর কাছে তদবীর করার ইচ্ছা করেন। নির্ধারিত দিনে, নিকটস্থ গ্রামে জলসার দাওয়াতের সুযোগে হজুরকে রাযী করিয়ে সকালে নিয়ে আসেন। তদবীরের কাজ চলতে থাকে। দিদার বক্স মিয়া নানারকম সুখাদ্য তৈরি করে যোহরের নামাজ অন্তে দস্তরখানে হুজুরের খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু আশ্চর্য! তৈরি খাদ্যসামগ্রী হুজুরের সামনে নিয়ে দেখা যায়, তরকারী, মাছ, গোশ্ত সব কাঁচা। হুজুর বলেন– "বাবা! আবু বকরকে কি কাঁচা খাওয়াবে?" লজ্জিত হয়ে উক্ত সামগ্রী ফিরিয়ে নিয়ে দ্রুত রান্নার ব্যবস্থা করে আনা হল। এবারও দেখা গেল, পূর্বের ন্যায় কাঁচা। তৃতীয়বার তার বড় বিবি নিজের তত্ত্বাবধানে সংক্ষেপে রান্না করা সামগ্রী বাদ আসর হুজুরের খিদমতে আনা হয়, এবার সবকিছু স্বাভাবিক থাকায় হুজুর খাদ্য গ্রহণ করলেন।

সাথীরা (খাদেমরা) হুজুরকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করেন, হুজুর! যদি দিদার বক্স মিয়ার মাল হারাম হয়, তবে তো তারই মাল তিনবার রান্না হল। দু'বার কাঁচা, একবার পাকা হওয়ার হেতু কী ? জবাবে হুজুর বললেন– "বাবা! আবু বকরকে আল্লাহ্ পাক 'দাইয়ুসের' হাতের রান্না খাওয়াবেন না।" স্থানীয় মুন্শীরা বলেন ঃ হুজুর! তার তিন বিবি, প্রত্যেকে নামাজী দীনদার ও পর্দানশীন। হুজুর বললেন– "বাবা! তার বিবিরা দাইয়ুস (বেপর্দাবিহারিণী) নয়, কিন্তু ওনার (দিদার বকসের) বাড়িতে যে ঝি মেয়েটি সংসার ও রান্নার কাজে সহায়তা

২৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮
২৪২. বজলুর রহমান দরগাহপুরী, *ইমামুল মুসলিমীন হযরত পীর সাহেবের জীবন চরিত* (হুগলী: হেদোয়াতুল মুসলিমীন লাইব্রেরী, ১৯৮২ খ্রী.), পৃ. ৪৮
২৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

করে , সে 'দাইয়ুস'। শেষবারের রান্নায় বড় বিবি ঝি মেয়েটির সহায়তা নেয়নি। তাই আল্লাহ্পাক আবু বকরকে দু'টো খাওয়ালেন।[২৪৪]

মুজাহিদে মিল্লাত 'আল্লামা বজলুর রহমান দরগাহপুরী (র.) বলেছেন ঃ এক সময় মুজাদ্দিদে যামান (র.) বাদুরিয়া বাজারে জলসায় আসেন। তাঁর বিশ্রামের সময় কে যেন হুজুরের কানে পৌঁছে দিয়েছে, 'হুজুর! যার বাড়িতে খাবেন সে সুদখোর। হুজুর দাওয়াতকারী বাড়িওয়ালাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন। অনুসন্ধানে জানা যায়, বাড়িওয়ালা এবং তার পিতা ও দাদা সুদখোর নন। শুনেছেন দাদার পিতা সুদ খেত। মুজাদ্দিদে যামান (র.) বলেন– "আপনার ('আলিমরা) খান। আবু বকর (তিনি নিজের নাম ধরে বলতেন) খাবে না; যেহেতু সন্দেহ আছে বলে।" বর্ণনাকারী বলেন– পোলাও কোরমা আমরা খেলাম আর হুজুর গরীব বুড়ির বাড়ির আলু-ভর্তা-ভাত (খোরাকী দিয়ে) খেলেন।[২৪৫]

মুজাহিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী জুলফিকার আলী সিদ্দিকী (র.) বলেছেন ঃ জীবনের অন্তিমকালে রোযার সময় হুজুরের শরীর অত্যন্ত দুর্বল, এমনকি ওঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতা নেই। ডাক্তার ও সকলে হুজুরকে রোযা না থাকর পরামর্শ দিলেন। কিন্তু জীবনে আর রোযা করার সময় পাবেন কিনা, সে নিশ্চয়তা যখন নেই, তখন রোযা রাখার সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন। হুজুরের অবস্থা দেখে, আমরা শঙ্কিত। কিন্তু হুজুর ঠিকই রোযা আদায় করেছেন এবং নামাজের ওয়াক্তে ঠিকই নামাজ পড়েছেন। কলকাতা ওয়াসেল মোল্লা ম্যানশনে একবার হুজুরের লাকুয়া হয়। আমি ও আম্মাজী (সেজ হুজুর জননী) তাঁকে ধরে শুইয়ে দেই। হুজুর কখনও সম্বিতহারা হচ্ছেন, সম্বিত হলেই নামাজের ওয়াক্তের খোঁজ নিচ্ছেন, যথাসময়ে ঐ অবস্থায় নামাজ আদায় করছেন। এক সময় এমন পর্যায় হ'ল যে, কিবলা ঠিক চেনা এবং দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার তাকতহারা, কিন্তু তিনি বললেন (ইশারায়)– 'আমাকে নামাজে দাঁড় করিয়ে দাও।' সে অবস্থায় নামাজ সমাধা করলেন। জীবনে নামাজ তাঁর কাযা হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না।

২৪৪. মোহাম্মদ রুহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮
২৪৫. প্রগুক্ত,পৃ. ৫৭

৩য় পরিচ্ছেদ

মুজাদ্দিদে যামানের ওছীয়তনামা (জনসাধারণের উদ্দেশ্যে)

মুজাদ্দিদে যামান হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (র.) জনসাধারণের উদ্দেশ্যে যে ওছীয়তনামা লিখে ছাপিয়ে রেখে গিয়েছিলেন, তা সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো আহমদ আলী এনায়েতপুরী কর্তৃক সম্পাদিত 'শরীয়তে ইসলাম' পত্রিকায়, বাংলা ১৩৩৭ সালের ৪র্থ বর্ষ ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১২শ এবং ৫ম বর্ষ ১ম, ২য়, ৪র্থ, ৫ম, ৭ম, ১০ম ও ১২শ সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে। মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর মতাদর্শ সম্পর্কে জানার জন্য তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর ইন্তিকালের আট বছর পূর্বে সরাসরি তাঁর তত্ত্বাবধানে প্রণীত ও প্রকাশিত এ 'ওছীয়তনামা'-কে সবচাইতে প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য বলে মনে করা হয়। ওছীয়তনামাগুলো নিম্নরূপ ঃ

ওছীয়তনামা-০১

আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীন হযরত আদম (আ.)-এর আওলাদ মানুষকে আশরাফুল-মাখলুকাত করে পয়দা করেছেন। 'আকল, বুদ্ধি-বিবেক প্রভৃতি এনায়েত করে তাঁদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের প্রত্যেক প্রকার খায়রিয়াতের জন্য দীন ইসলামকে নির্দিষ্ট করে এরশাদ করেছেন :

ان الدين عند الله الاسلام -

"অর্থাৎ নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহ্র নিকট একমাত্র দীন।"[২৪৬]

হযরত আদম ছফীউল্লাহ্ (আ.) হতে প্রত্যেক পয়গম্বর-নবী দীন ইসলামের পাবন্দ থেকে তা জারি করে গিয়েছেন। সাইয়েদুল আম্বিয়া রহমাতুল্লিল 'আলামীন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুযতাবা (স.)-কে শেষ নবী এবং তাঁর নিকট শেষ কিতাব কুর'আন মাজীদ, ফুরকান হামীদ নাযিল করে দীন ইসলামকে পূর্ণ করে দিয়েছেন। এর পূর্বে ইসলাম পূর্ণ নাযিল হয়নি। তাঁর পর আর কোনো নবী বা পয়গম্বর আসবে না কিংবা কোনো কিতাব নাযিল হবে না। হযরত মুহাম্মদ (স.) শেষ নবী এবং কালামে এলাহী কুর'আন মাজীদ শেষ কিতাব। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন :

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا-

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাংগ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম।"[২৪৭]

এ আয়াতে ইসলামের পূর্ণ হওয়া, কুর'আন শরীফের পরে আর কোনো ওহী নাযিল না হওয়ার এবং প্রত্যেক মানুষের জন্য দীন ইসলামেকে মনোনীত করার স্পষ্ট সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

محمد رسول الله-

"অর্থাৎ মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল।"[২৪৮]

আল্লাহ্ আরও বলেন :

ماكان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيئ عليما-

"অর্থাৎ মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহ্র রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত।"[২৪৯]

---

২৪৬. আল কুর'আন, ০৩: ১৯
২৪৭. আল কুর'আন, ০৫: ০৩
২৪৮. আল কুর'আন, ৪৯: ২৯
২৪৯. আল কুর'আন, ৩৩: ৪০

হযরত নবী করীম (স.)-কে আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত মাখলুকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব এনায়েত করেছেন, তাঁর ফজিলত অন্যের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাবেদার। কুর'আন শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى انما الهكم اله واحد-

"অর্থাৎ বলো, আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ একমাত্র ইলাহ্।"[২৫০]

যাতে কেউ হযরত নবী করীম (স.)-কে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কোনো প্রকার শরীক না করে, এ জন্যই মহান আল্লাহ্ উক্ত আয়াত নাযিল করিয়াছেন। আল্লাহ্ কারো মেছেল নন, তিনি বে-মেছেল-অতুলনীয়। আল্লাহ্ বলেন :

ليس كمثله شيئ -

"অর্থাৎ কোনো কিছুই তাঁর মত নয়।"[২৫১]

আল্লাহ্‌র বান্দা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (স.)-কে কেউ সীমা অতিক্রম করে তা'রীফ না করে, এ জন্য হাদীস শরীফে নবী করীম (স.) ইরশাদ করেছেন :

لا تطرونى كما اطرى عيسى قولوا عبدالله ورسوله -

"অর্থাৎ তোমরা আমাকে এরূপ তা'রীফ করো না যেরূপ (গোমরাহ্ দল) ঈসা (আ.)-কে তা'রীফ করেছে (অর্থাৎ তাঁকে খোদার বেটা প্রভৃতি বানিয়েছে); তোমরা (আমাকে) বলো, আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল।"[২৫২]

শেষ নবী হযরত রাসূলুল্লাহ্ (স.)-কে সম্বোধন করে আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আনুল কারীমে ইরশাদ করেছেন :

يا ايها النبى انا ارسلنك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا -

"অর্থাৎ হে নবী! আমি তো তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহবানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।"[২৫৩]

আল্লাহ্‌র ওয়াহদানিয়্যাত (একত্ববাদ) রাসূলের রিসালাতের শাহাদাত, যথা–

لا اله الا الله محمد رسول الله -

"অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই, মোহাম্মদ (স.) আল্লাহ্‌র রাসূল।"

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله -

"অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ্ নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (স.) তাঁর বান্দা ও রাসূল।"

পেয়ারা হাবীবে আকরাম মুহাম্মদ (স.) আল্লাহ্ তা'আলার কালাম অনুসারে মানুষদিগকে শাহাদাত প্রভৃতি শুনিয়ে আল্লাহ্‌র দিকে আহবান করেছিলেন। এ দাওয়াতে ইসলামের মূল বস্তু কুর'আন শরীফ। যার সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

كتاب انزلنه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد -

"অর্থাৎ এটি একটি কিতাব, যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানবজাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে বের করে আনতে পারো অন্ধকার হতে আলোকে, তাঁর পথে যিনি পরাক্রমশালী।"[২৫৪]

আল্লাহ্‌র কালাম কুর'আন শরীফে কুফ্‌রী, গুনাহ, অজ্ঞতা, অধঃপতন প্রভৃতি প্রত্যেক প্রকার যুল্‌মাত হতে মানুষদিগকে ঈমান, নেকী, 'ইল্‌ম, তরক্কী প্রভৃতির নূরের দিকে আনার পূর্ণ ব্যবস্থা মৌজুদ রয়েছে। হযরত নবী করীম (স.) মানুষের দু-জাহানের খায়রিয়াতের জন্য সমস্ত জিন্দেগানী যেরূপ অসাধারণ চেষ্টা করে আল্লাহ্‌র

২৫০. আল কুর'আন, ১৮: ১১০
২৫১. অল কুর'আন, ৪২: ১১
২৫২. উদ্ধৃত: আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান, *ফুরফুরার ইতিহাস*, পৃ. ১১১
২৫৩. আল কুর'আন, ৩৩: ৪৫
২৫৪. আল কুর'আন, ১৪: ০১

কিতাব জারী করেছেন; হক্ক জাহির করার জন্য তিনি যেরূপভাবে গায়ের ইসলামের নিকট হতে যুল্ম-নির্যাতন সহ্য করেছিলেন, তা বলে শেষ করা যায় না। এত কষ্ট, এত অত্যাচার সমস্তই তিনি নীরবে বরদাশ্ত করে আল্লাহ্‌র দরবারে তাদের হিদায়াতের দু'আ করতেন। কাফিরদিগের যুল্মে হযরত নবী করীম (স.) নেহায়েত বে-কারার হয়ে পড়ার পর সাহাবায়ে কিরাম (রা.) বলেছিলেন–'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কাফিরদিগের জন্য লা'নত ও বদ্-দু'আ করুন।' এতদুত্তরে হযরত (স.) বলেছিলেন :

انی لم ابعث لعنا وانما بعثت رحمة -

"অর্থাৎ আমি লা'নত ও বদ্-দু'আ করার জন্য প্রেরিত হইনি, বরং আমি রহমত স্বরূপ প্রেরিত হয়েছি।"[২৫৫]
অপর এক হাদীসে নবী করীম (স.) ইরশাদ করেছেন :

ضرب قومه فادموه وهو يمسح الدم ويقول اللهم اغفر لقومى فانهم لايعلمون -

"অর্থাৎ তাঁর কওম তাঁকে প্রহার করে রক্তাক্ত করেছিলো, তিনি সে খুন্ মুছতেন আর বলতেন, হে আল্লাহ্! আমার কওমকে মাফ করুন, তারা বুঝতে পারেনি।"[২৫৬]

রাহমাতুল্লিল 'আলামীন হযরত নবী করীম (স.) এরূপ বহু যুল্ম-নির্যাতন সহ্য করে আল্লাহ্‌র কালাম লোকদেরকে শুনাতেন এবং আল্লাহ্‌র পথে সকলকে দাওয়াত করতেন। মাখলুকের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার খাছ এনায়েত নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এবং কিতাবুম্মুবীন কুর'আন মাজীদের আহকাম মতো 'আমল করাই মানুষের সর্ব প্রকার বিপদ-আপদ, দুঃখ-মুছিবত এবং অধঃপতন হতে নাজাত পাবার একমাত্র সরল পথ। আল্লাহ্ বলেন :

وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله -

"অর্থাৎ এবং এ পথই আমার সরল পথ। সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ করবে এবং বিভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন করে দিবে।"[২৫৭]

মহান আল্লাহ্ অন্যত্র এরশাদ করেছেন :

ما اتكم الرسول فخذوه وما نهكم عنه فانتهوا -

"অর্থাৎ রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাকো।"[২৫৮]

হযরত নবী করীম (স.) 'হুজ্জাতুল বিদা' জীবনের শেষ হজ্জে যেয়ে বলেছিলেন, আমার মনে হচ্ছে, এ আমার শেষ হজ্জ। আয়েন্দা বৎসর বোধ হয় আর তোমাদের সাথে হজ্জ করতে আসতে পারবো না। এ কথা শুনে সাহাবাগণ বে-কারার হয়ে আরজ করেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যখন আপনি আমাদেরকে ছেড়ে চলে যাবেন, তখন আমরা কার হুকুম অনুযায়ী আমল করবো, গোমরাহি হতে কে আমাদেরকে রক্ষা করবেন ? হযরত (স.) ইরশাদ করেছিলেন :

تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله -

"অর্থাৎ আমি তোমাদের মধ্যে দুটো নির্দেশিকা রেখে গেলাম। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এ দুটোকে শক্ত করে ধরে রাখবে, কখনও বিভ্রান্ত হবে না; আল্লাহ্‌র কিতাব (কুর'আন) ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ্।"[২৫৯]

কুর'আন ও হাদীসের যাবতীয় আহকাম অনুসারে আমল করে মুসলিমগণ প্রত্যেক প্রকার গোমরাহি ও তনজ্জলি হতে নাজাত পেয়েছিলেন। যে সময় হযরত নবী করীম (স.) কুর'আন-হাদীসের এশা'আত করেছেন, সে সময় আরব ও সমস্ত দুনিয়া শির্ক-কুফ্র, অত্যাচার-যুল্ম, খুন-ডাকাতি, বে-পর্দা, সুদ, ঘুষ, জুয়া, নেশা-পান, কলহ ফাসাদ প্রভৃতি অন্যায় কাজে ভরপুর ছিলো। কুর'আন ও হাদীসের পূর্ণ আমল তাদেরকে গায়রুল্লাহ্‌র

২৫৫. *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং- ৬৫০৭
২৫৬. *সহীহ আল বুখারী*, হদীস নং- ৩৪৭৭
২৫৭. আল কুর'আন, ০৬: ১৫৩
২৫৮. আল কুর'আন, ৫৯: ০৭
২৫৯. ইমাম মালিক ইব্ন আনাস, *মুয়াত্তা* (আরবী) (কায়রো: আল-মাকতাবাতুর রশীদিয়্যাহ,১৯৫১ খ্রী.), পৃ. ৬৮

এমদাদ, শির্ক-কুফ্রী হতে নাজাত দিয়েছিলো, এক আল্লাহ্র ইবাদাত বন্দেগী এবং কেবলমাত্র তাঁরই তা'য়ীদ ও মদদ তলবকারী বানিয়েছিলো। মুসলিমগণ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও নিকট মাথা নুয়াতে পারে না, এ তা'লীম দিয়ে তাদেরকে গায়রুল্লাহ্র নিকট মাথা নীচু করা হতে রেহাই দিয়েছিলো। বে-পর্দা হতে তাদেরকে বাঁচিয়ে ছিলো। সুদ, জুয়া প্রভৃতি হারাম রুজী হতে উদ্ধার করে হালাল ব্যবসা-বানিজ্য শিখিয়ে অগাধ মাল-দৌলতের মালিক করে দিয়েছিলো।

মোট কথা, কুর'আন-হাদীস তাদেরকে দু-জাহানের সর্ব প্রকার অবনতি ও গোমরাহি হতে বাঁচিয়ে প্রত্যেক প্রকার তরক্কী ও হেদায়াতের দিকে নিয়ে গিয়েছিলো। যে কুর'আন-হাদীস মুসলিমকে যথার্থ ইনছানিয়াত তরক্কী এনায়েত করেছিলো, ঠিক সে কুর'আন-হাদীস আজও মৌজুদ রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও কায়েম থাকবে। কাদারে-মুৎলাক, লা-যাওল আল্লাহ্ তা'আলার পাক কালাম কুর'আন শরীফের 'কুওয়াতে 'আমেলা' (কার্যকরী শক্তি) হামেশার জন্য কায়েম রয়েছে এবং থাকবে। কুর'আন-হাদীস নষ্ট হয় নি, কিংবা তা পচে যায় নি-নষ্ট হয়েছে ও পচে গিয়েছে বর্তমান যামানার মুসলিমগণের 'আমল। সে জন্যই তাদের ঘোর অধঃপতন ও গোমরাহি উপস্থিত হয়েছে। যা ধরে তাদের তরক্কী হয়েছিলো, তা ছেড়ে দেয়ায় আজ তাদের অধঃপতন হচ্ছে।

আল্লাহ্র কালাম কুর'আন শরীফ এবং রাসূলের হাদীস শরীফ অনুসারে আমল করে আল্লাহ্র মখলুকে আল্লাহ্র বান্দা তরক্কী হাছিল করতে পারবে না যারা বলে, আল্লাহ্ ও রাসূলের ওপর তাদের ঈমান কায়েম আছে বলে মনে হয় না। আহ্কামে-ইলাহী ও সুন্নতে নববী দু-জাহানের একমাত্র উন্নতির পথ। ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, আহ্কামে ইলাহী ও সুন্নতে নববী অনুসারে প্রত্যেক আমল করে সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন প্রভৃতি বুযুর্গানে দীন সর্ব দিক দিয়ে কিরূপ তরক্কী হাছিল করেছিলেন এবং তাঁদের খোশনাম দুনিয়ায় চির-জিন্দা রয়েছে। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আহ্কাম পরিত্যাগ করে বর্তমান যামানার মুসলিমগণ অধঃপতন ও বদ্নামিতে গ্রেফতার হয়েছে। কুর'আন শরীফে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন :

افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذالك منكم الا خزى فى الحيوة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون -

"অর্থাৎ তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস করো এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান করো ? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে হীনতা এবং কিয়ামতের দিন তারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে। তারা যা করে আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অনবহিত নন।"[২৬০]

বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিম আল্লাহ্র কিতাবের পুরাপুরি 'আমল পরিত্যাগ করেছেন। কুর'আন শরীফের যে কথা তাদের মনমতো হয়, তারা তাই মান্য করেন। আবার কেউ কেউ শরা-শরীয়তকে একেবারেই বাদ দেয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। এ সমস্ত কারণের জন্যই মুসলিমগণের দীন দুনিয়ার ঘোর অবনতি এবং দুর্দশা হচ্ছে। প্রত্যেক প্রকার তনজ্জলি ও খারাবি হতে প্রকৃত রেহাই পাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে কুর'আন-হাদীসের পুরোপুরি 'আমল অর্থাৎ ইসলামী শরা-শরীয়তের পূর্ণ তাবেদারী করা। আল্লাহ্ বলেন :

يا ايها الذين امنوا ادخلوا فى السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين -

"অর্থাৎ হে মুমিনগণ! তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ করো[২৬১] এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"[২৬২]

দু-জাহানের প্রকৃত তরক্কী হাসিল করতে হলে পুরোপুরি মুসলিম হতে হবে অর্থাৎ কুর'আন-হাদীস এবং তদনুযায়ী কিতাব অর্থাৎ ফিক্হ, 'আকায়িদ প্রভৃতি শরীয়ত-সঙ্গত কিতাব মুতাবিক সমস্ত 'আমল করতে হবে। এ সমস্তের খিলাফ যা কিছু তৎসমুদয় হতে তওবা করে খাঁটি মুসলিম হতে হবে।[২৬৩]

---

২৬০. আল কুর'আন, ০২: ৮৫
২৬১. ইয়াহুদীদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা ইয়াহুদী ধর্মের কোন কোন কাজ পূর্ববৎ করতে ইচ্ছা করেছিলেন। তখন নির্দেশ দেয়া হয়, প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য আল্লাহ্ ও রাসূলের আদেশ-নিষেধগুলি পুরাপুরিভাবে পালন করা। অন্য মত বা পথের অনুসরণ করা কোন অবস্থাতেই তার পক্ষে সমীচীন নয়। উদ্ধৃত: আল কুরআনুল করীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১
২৬২. আল কুর'আন, ০২: ২০৮
২৬৩. আহমদ আলী এনায়েতপুরী, শরিয়তে ইসলাম, বর্ষ-৪র্থ, সংখ্যা-৭ম, ১৩৩৭ বাং, পৃ. ১৬২-১৬৬

ওছীয়তনামা-০২

আল্লাহ্ জাল্লাশা'নুহু এরশাদ করেছেন :

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم - فان تنازعتم في شيئ فردوه الى الله و الرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذالك خير واحسن تأويلا -

"অর্থাৎ হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস করো তবে তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহ্‌র, আনুগত্য করো রাসূলের এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে[২৬৪] ক্ষমতার অধিকারী; কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপন কর আল্লাহ্ ও রাসূলের নিকট। এটাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর"[২৬৫]

আল্লাহ্‌র আনুগত্য করো অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কুর'আন মাজীদ ও ফুরকান হামীদের আহ্কাম অনুসারে যাবতীয় আমল করো; কুর'আন শরীফের খিলাফ যা তা আমল করিও না।
রাসূলের আনুগত্য করো অর্থাৎ হযরত নবী করীম (স.)-এর সুন্নতের তাবেদারী করো; হাদীসের খিলাফ আমল করিও না।

নবী করীম (স.) আল্লাহ্‌র হুকুমের খিলাফ কোনো হুকুম করতেন না। তাঁর সমস্ত হুকুম আল্লাহ্‌র হুকুমের মুতাবেক। কাজেই রাসূলের তাবেদারী করলে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র হুকুমের তাবেদারী করা হয়। মহান আল্লাহ্ বলেন :

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم -

"অর্থাৎ বলো, তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভালবাস তবে আমাকে[২৬৬] অনুসরণ করো, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[২৬৭]

রাসূলের সুন্নতের মুতাবেক হওয়া মুসলিমদের জন্য একান্ত আবশ্যক। হযরত নবী করীম (স.) উম্মতের জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা ও হুকুম করেছেন, তার প্রত্যেকটিই দর্শন, বিজ্ঞান এবং পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর হুকুম পরিত্যাগ করে তার খিলাফ 'আমল করলে প্রকৃত তরক্কী ও নাজাত হাসিল হতেই পারে না।

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের হুকুম অনুসারে যারা হুকুম করেন, তাদের সে হুকুমের তাবেদারী করতে হবে। মাযহাবের ইমাম, তরীকতের পীর, 'আলিম প্রভৃতি বুযুর্গানেদীন এবং মুসলিম বাদশাহ্ কুর'আন মুতাবিক যে হুকুম করেন, তার তাবেদারী করা শরীয়তের হুকুম। মাযহাবের ইমামগণ কুর'আন-হাদীস হতে মাস'আলা বের করেছেন, সুতরাং তদানুযায়ী 'আমল করতে হবে। ফিক্‌হের কিতাবে কুর'আন-হাদীস হতে মাস'আলা সমূহ ইস্তেম্বাত (বের) করা হয়েছে, কাজেই তার 'আমল করতে হবে। আমরা হানাফী মাযহাব অবলম্বি, অতএব আমাদিগকে হানাফী ফিক্‌হের মাস'আলা মুতাবিক 'আমল করতে হবে। কুর'আন-হাদীসের খিলাফ কোনো মাস'আলা হলে তা 'আমল করা যেতে পারে না-তাা অবশ্য পরিত্যাগ করতে হবে। এটা হযরত ইমাম আবু হানীফা (র.) সাহেবের ক্বওল।

শরীয়ত, তরীকত, হাকীকত, মা'রেফাত পরস্পর পৃথক নয়; শরীয়ত মূল এবং তরীকত, হাকীকত, মা'রেফাত তার অন্তর্ভূক্ত। যে তরীকত, হাকীকত, মা'রেফাতের সাথে শরীয়তের অর্থাৎ কুর'আন-হাদীস, ইজমা-কিয়াসের মিল নেই-তা ইসলামের খিলাফ; এবং কোনো মুসলিম তার ওপর 'আমল করতে পারে না। তরীকতের পীরগণের যে সমস্ত ক্বওল কুর'আন-হাদীস মুতাবেক, তৎসমূহের 'আমল করতে হবে। যদি কোনো পীরের ক্বওল শরীয়তের খিলাফ হয়, অর্থাৎ সে ক্বওলের বিরুদ্ধে শরীয়ত সাক্ষ্য দেয়, তবে তার ওপর 'আমল করা জায়েয নহে।

---

২৬৪. এ আয়াতে মু'মিনগনকে সম্বোধন করা হয়েছে, সুতরাং এ স্থলে 'তোমাদের মধ্যে' অর্থ মু'মিনদের মধ্যে, কাফির এবং মুশরিকদের মধ্যে নয়। উদ্ধৃত: আল কুরআনুল করীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০
২৬৫. আল কুর'আন, ০৪: ৫৯
২৬৬. অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (স.)-কে। উদ্ধৃত: আল কুরআনুল করীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০
২৬৭. আল কুর'আন, ০৩: ৩১

لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق -

"অর্থাৎ স্রষ্টার অবাধ্যতা করে কোন সৃষ্টির আনুগত্য নেই।"[২৬৮] এ হাদীসে আল্লাহ্‌র হুকুমের খিলাফ কারও হুকুমের তাবেদারী করা না-জায়িয বলে হযরত নবী করীম (স.) হুকুম করেছেন। পীর কিংবা যে কেউ কুর'আন-হাদীসের খিলাফ কোনো কথা বললে বা কোনো রুছমের প্রচলন করলে, মুসলিমগণ তদনুযায়ী 'আমল করতে পারে না-উক্ত কথা বা রুছম না-জায়েয ও বাতিল। নবী করীম (স.) এরশাদ করেছেন :

من احدث فى امرنا هذا ما ليس فيه فهو رد -

"অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমাদের শরী'আতে নতুন কিছু প্রবর্তন করবে তা প্রত্যাখ্যাত তা গ্রহণযোগ্য হবে না।"[২৬৯]

পীরগণ নবী নন, তাঁরা নবীর উম্মত। নবীগণ আল্লাহ্ নন, তাঁরা আল্লাহ্‌র বান্দা ও মাখলুক। নবীকে আল্লাহ্ তা'আলার শরীক বা কোনো প্রকারে তাঁর অংশী করা ইসলামের খিলাফ। হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (স.)-কে আল্লাহ্ তা'আলার অংশী করা কিংবা 'আহাদ' ও 'আহমাদ' এক বলা কখনও জায়িয নয়, তা ইসলামের খিলাফ। আল্লাহ্ তা'আলা খালেক আর নবী করীম (স.) তাঁর মাখলুক; আল্লাহ্ তা'আলা মা'বুদ আর হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁর ইবাদতকারী; আল্লাহ্ তা'আলা হুকুমকারী আর হযরত মুহাম্মদ (স.) সে হুকুমের পূর্ণ আমলকারী।

আল্লাহ্‌কে আল্লাহ্, নবীকে নবী, ইমামকে ইমাম ও পীরকে পীর বলে বিশ্বাস করা ইসলামের নিয়ম। নবীকে আল্লাহ্ অথবা পীরকে নবী বলা ইসলামের খিলাফ। ইমাম, পীর ও 'আলিমগণ ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া অর্থাৎ নায়েবে নবী। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.), হযরত ওমর ফারুক (রা.), হযরত ওসমান গণি (রা.), হযরত আলী (রা.) হচ্ছেন হযরত নবী করীম (স.)-এর উম্মত ও সাহাবা। তাঁরাও কেউ নবী নন।

আউলিয়াগণকে বেলায়েতের দর্জায়, সাহাবাগণকে সাহাবার দর্জায়, নবীগণকে নবীর দর্জায় এবং আল্লাহ্ তা'আলাকে উলুহিয়াতের দর্জায় রাখতে হবে। হযরত নবী করীম (স.) এরশাদ করেছেন :

لا نبي بعدى -

"অর্থাৎ আমার পরে কোন নবী হবে না।"[২৭০]
নাবীজি আরও বলেন :

سيكون فى امتى كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبي الله وانا خاتم النبيين -

"অর্থাৎ আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশজন মিথ্যাবাদী লোক নিজেকে আল্লাহ্‌র নবী বলে দাবী করবে, কিন্তু আমি নবীদিগের শেষ।"[২৭১]

নবী পাক (স.)-এর পর যদি কেউ মুস্তাকাল (স্বাধীন) কিংবা মা-তাহ্‌ত (অধীনস্থ) অথবা যে কোন প্রকারের নবী হবার দাবী করে, তবে তা ঘোর মিথ্যা ও ইসলামের খিলাফ। হযরত নবী করীম (স.) হতে রিসালাত ও নবুওয়্যাত খতম হয়ে গিয়েছে। হাদীস শরীফ অনুযায়ী স্পষ্টই জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর পর ত্রিশজন নিজেকে নবী বলে দাবী করবে এবং তারা মিথ্যাবাদী। ইতিহাস হতে জানা যায়, এরূপ অনেক লোক ইতিপূর্বে গত হয়ে গিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হতে পারে। মুসলিমগণ এ সমস্ত মিথ্যাবাদী হতে হুশিয়ার থাকবেন। ইসলামের দলীলানুসারে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর পর আর কোন নবী হবে না এবং কুর'আন শরীফের পর আর কোনো ওহী নাযিল হবে না।

ইবাদত-বন্দেগী একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই মাখসূস (নির্দিষ্ট)। আল্লাহ্ ব্যতীত কারও ইবাদাত করা, কাউকে সিজদাহ্ করা জায়িয নয়। শরীয়ত সঙ্গত বুযুর্গ লোকদের (পীর মোর্শেদ, বাপ-মা, ওস্তাদ, 'আলিম প্রভৃতি) কদমবুছি করা জায়িয, কিন্তু তা যদি মাথা নীচু করে রুকু অথবা সিজদাহ্‌র হালাতে করতে হয়, তা হলে জায়েয

২৬৮. আল-মুসনাদ, হাদীস নং- ২০৬৫৩
২৬৯. *সহীহ আল বুখারী*, হদীস নং- ২৫০১
২৭০. *জামে' আত-তিরমিযী*, হাদীস নং- ২২১৯
২৭১. প্রাগুক্ত

হবে না। পয়গম্বর, পীর কিংবা কারও কবরে সিজদাহ, কবর মুছা জায়িয নয়। এক মুসলিমের পক্ষে অন্য মুসলিমের কবর যিয়ারত এবং ছওয়াব রেছানী করা জায়িয।

‘আওরাত-মরদ সকলকে ‘ইল্ম শিখার জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (স.) কুর’আন-হাদীসে ইরশাদ করেছেন। ‘আলিমদের তা’রীফ এবং দু-জাহানে তাঁদের ইয্যত ও তরক্কীর সম্বন্ধে আল্লাহ্-রাসূল বহুবার বলেছেন। ‘আলিমদের নেহায়েত তাকলীফ সহ ইশা’আতের ফলে ইসলাম কায়িম রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। মুসলিমগণ ‘ইল্মে দীনের অভাবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে চিনতে, আহকামে শরীয়ত বুঝতে এবং তদানুযায়ী ‘আমল করতে পারছে না। দীন-ইসলামকে বুঝবার জন্য ‘ইল্মে দীনের দরকার, দু-জাহানের তরক্কীর জন্য ‘ইল্মে দীন নেহায়েত জরুরী। ‘ইল্মে দীন এবং তার ‘আমল ছেড়ে মুসলিমগণ সর্বদিকদিয়ে অবনতির দিকে ছুটছে। হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি ইসলাম জিন্দা রাখার জন্য ‘ইল্মে দীন শিখার সময় ইন্তিকাল করেন, তাঁর ও নবীগণের মধ্যে বেহেশ্ত মাত্র একটি বিষয়ের প্রভেদ থাকবে। অর্থাৎ নবুওয়্যাতের দরজা হাছিল করতে পারবে না, তা ব্যতীত আল্লাহ্তা’আলা তাঁকে অন্যান্য ইয্যতসমূহ বখশিশ করবেন।[২৭২]

যথার্থ তরক্কী ও প্রকৃত ইনছানিয়াত ইসলামের মধ্যেই আছে। সুতরাং ইসলামকে জিন্দা রাখতে পারলে ঐ সমস্তকেও নিশ্চয়ই জিন্দা রাখতে পারা যায়। ইসলাম জিন্দা রাখার জন্য কুর’আন-হাদীস, তাফসীর-ফিক্হ, উসূল, ‘আকায়িদ প্রভৃতির ‘ইল্ম নেহায়েত জরুরী। এগুলো ব্যতীত ইসলামকে পুরাপুরিরূপে বুঝতে কিংবা তা জিন্দা রাখতে পারা সঙ্কটময়। উপরোক্ত বিষয়ের ‘ইল্ম তাহছীল করতে হলে আরবী শিক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। সেজন্য মুসলিম মাত্রকেই দীনের ‘ইল্ম-আরবি শিক্ষা করা অবশ্য প্রয়োজন। ইংরেজী, বাংলা, উর্দু, ফারসী প্রভৃতি ভাষার দ্বারাও ইসলামের খিদমত হয় এবং তা জিন্দা রাখতে পারা যায়, কিন্তু এর মূলে আরবী শিক্ষার নেহায়েত জরুরত রয়েছে। কেননা আরবী না হলে ইসলামকে ‘কামা হাক্কুহু’ (যথাযথরূপে) বুঝতে পারা যাবে না। আরবী না শিখলে ইসলামের আহ্কাম-আরকান অন্য ভাষায় তর্জমা করা সম্ভব হবে না। দুনিয়াবী জরুরতের জন্যেও দেশীয় ভাষা বাংলা, রাজ্যভাষা ইংরেজী খুব আবশ্যক।[২৭৩]

আরবী ব্যতীত অন্য ভাষা শিক্ষা করা ইসলামের নিকট না-জায়িয নয়। হযরত নবী করীম (স.)-এর যামানায় ইবরানী ভাষা শিখার জন্য তিনি তাঁর সাহাবাগণকে হুকুম করেছিলেন। এতদ্বতীত আরও বহু দলীলে জানা যায় যে, আরবি ব্যতীত অন্য ভাষা শিক্ষা করা শরীয়তের খিলাফ নয়। বর্তমানে যে নিউ স্কীম ও ওল্ড স্কীম অনুসারে মক্তব-মাদ্রাসার নিয়ম হয়েছে, মুসলিমগণকে এর যে কোনো এক স্কীম অনুসারে ‘ইল্ম তাহছীল করা অবশ্য প্রয়োজন। নিউ স্কীমে আরবী ও ইংরেজী শিখার ব্যবস্থা আছে। একদল লোক নিউ স্কীম এবং অপর একদল ওল্ড স্কীম অনুসারে তা’লীম পেলে মুসলিমের দু-জাহানের তরক্কীর পথ পরিষ্কার হবে। নিউ স্কীম অনুসারে উচ্চ শিক্ষা করলে ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং, মেকানিক্যাল প্রভৃতি হিকমাত শিক্ষা এবং সরকারী, বে-সরকারী চাকুরী পাওয়ার উপায়, সঙ্গে দীন সম্বন্ধে প্রয়েজনীয় ‘ইল্ম হাছিল হবে। ওল্ড স্কীম অনুসারে উচ্চ শিক্ষা করলে কুর’আন-হাদীস, তাফসীর, ফিক্হ, উসূল প্রভৃতি বিষয়ে ভালোরূপে অবগত হওয়া এবং এতেও চাকুরী পাওয়া যাবে। ওল্ড স্কীম নিউ স্কীম উভয়ই মুসলিমের জন্য জরুরী।

মুসলিমগণের ছেলে-মেয়েকে প্রথম হতেই পড়ার জন্য মক্তব-মাদ্রাসায় দেয়া একান্ত উচিৎ। মক্তব-মাদ্রাসা ছেড়ে স্কুল-পাঠশালায় দেয়া উচিৎ নয়। দুনিয়ার প্রত্যেক জাতি তাদের ‘ইবতেদায়ী তা’লীম’ (প্রাথমিক শিক্ষা) নিজের কওমের দ্বারা শেষ করে। কেননা প্রথমে যে তা’লীম পাওয়া যায় তা এতো মজবুত হয় যে, সহসা তা দূরীভূত হয় না। ইবতেদায়ী তা’লীম নিজের দ্বারা শেষ হলে কওমী তরীকাদি শিখতে পারে এবং তা কওমী তরক্কীর জন্য খুব উপকারে আসে। ইবতেদায়ী তা’লীম মুসলিমদের নিকট মক্তব-মাদ্রাসায় না হওয়ার জন্য বাংলার মুসলিমগণ তাদের কথা-বার্তা, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং চালচলনে গায়ের ইসলামের অনুকরণ করতে মজবুত হয়েছে। বাংলার স্কুল-পাঠশালায় যে সমস্ত প্রাথমিক শক্ষা দেয়া হয়, তাতে মুসলিমদের সন্তানগণ ইসলামী আকীদা, আলফাজ (শব্দ), আদব-কায়দা ও কওমী চাল-চলন প্রভৃতি কিছুই শিখতে পারে না। বরং তাতে তারা গায়ের ইসলামী তরীকার দিকে চালিত হয়ে দীন-দুনিয়ার খারাবী করতে থাকে।[২৭৪]

---

২৭২. ফজলুর রহমান মুন্সী, *সীরাতে আজীম* (ফেনী: আহসানিয়া লাইব্রেরী, ১৯৮৫ খ্রী.), পৃ. ৯৫
২৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭
২৭৪. মাওলানা বাকীবিল্লাহ সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

মুসলিমদের মেয়েদিগকে পর্দার সাথে আসা-যাওয়া করার ও মেয়ে ওস্তাদের দ্বারা পর্দার সাথে মাদ্রাসা-মক্তবে পড়ার ব্যবস্থা করে তাদিগকে শিক্ষিতা করতে হবে। যাতে মুসলিমদের ছেলে-মেয়ে ইসলামী তরীকার সাথে 'ইল্‌ম তাহছীল করতে পারে, তার জন্য নিউ স্কীম ও ওল্ড স্কীমের ব্যবস্থা হয়েছে। গায়র ইসলাম তরীকায় মুসলিমদের কোনো তরক্কী নেই। মুসলিমগণের প্রকৃত তরক্কী ইসলামের মধ্যেই।[২৭৫]

ওছীয়তনামা-০৩

আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীন পবিত্র কুর'আনে ইরশাদ করেছেন :

انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون -

"অর্থাৎ মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং তোমরা ভ্রাতৃগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন করো আর আল্লাহ্‌কে ভয় করো; যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।"[২৭৬]

যাতে মুসলিমদের মধ্যে ঝগড়া-ফাসাদ না হয়, পরস্পর মিল মুহাব্বত কায়েম থাকে, তার জন্য আল্লাহ্‌তা'আলা এ হুকুম করেছেন। আপোসের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ, দলাদলি এবং হিংসা-বিদ্বেষ কওমি অবনতির বিশেষ কারণ। তাই আল্লাহ্‌তা'আলা বলেন, মুসলিমগণ পরস্পরের ভাই, তোমরা ভাইদের মধ্যে মিমাংসা করো। আল্লাহ্ আরও বলেন :

واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين -

"অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুগত্য করবে ও নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না; করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। তোমরা ধৈর্য ধারণ করো; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"[২৭৭]

আপোসের মধ্যে ঝগড়া-ফাসাদের জন্য আমাদের কওম কমজোর এবং 'ইয্‌যত-হুরমত' (মান-সম্ভ্রম) বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যাতে ঝগড়া-ফাসাদ না হয় এবং ইত্তেফাকের সাথে তরক্কী হাছিল করতে পারা যায়, তার জন্য মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন :

فان تنازعتم فى شيئ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذالك خير واحسن تاويلا -

"অর্থাৎ কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপন করো আল্লাহ্ ও রাসূলের নিকট। এটাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।"[২৭৮]

অর্থাৎ আল্লাহ্ রাসূলের হুকুম মতো তার ফয়ছালা (মীমাংসা) করে নাও। বর্তমানে মুসলিমগণ আল্লাহ্ তা'লার হুকুম ভুলে আপোসের মধ্যে ঝগড়া-ফাসাদ ও দলাদলি করে তনজ্জলির দিকে চলছে, তাই তারা কমজোর হয়ে পড়েছে এবং তাদের ইয্‌যত ও হুরমত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এ সমস্ত অবনতি হতে নাজাত পাবার একমাত্র পথ হচ্ছে আল্লাহ্ ও রাসূলের হুকুম অনুসারে সমস্ত ঝগড়া-ফাসাদ মিমাংসা করে আপোসের মধ্যে ছোল্‌হ করা। প্রত্যেক মুসলিমকে বিশেষ খেয়াল করা চাই, যাতে আপোসের মধ্যে কোনো প্রকার ঝগড়া-ফাসাদ, দলাদলি, দ্বেষ-হিংসা পয়দা না হয়। যদি কোনোরূপে তা হয়ে থাকে, তবে তা শরীয়ত অনুসারে ফায়সালা করে নিতে এবং আহ্‌কামে এলাহীকে একসঙ্গে মজবুত করে ধরতে হবে, তবেই দু-জাহানের তরক্কী ও নাজাত পাওয়া যাবে। মহান আল্লাহ্ বলেন :

واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم

بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذالك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون -

২৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২
২৭৬. আল কুর'আন, ৪৯: ১০
২৭৭. আল কুর'আন, ০৮: ৪৬
২৭৮. আল কুর'আন, ০৪: ৫৯

"অর্থাৎ তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র রজ্জু[২৭৯] দৃঢ়ভাবে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ করো, তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা তো অগ্নিকুন্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ্‌ তা থেকে তোমাদের রক্ষা করেছেন। এরূপে আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা সৎপথ পেতে পারো।"[২৮০]
হযরত নবী করীম (স.) ইরশাদ করেন :

من سلك على طريقى فهو الى -

"অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার তরীকা অনুযায়ী চলে, সে আমার আওলাদ (আওলাদুল কল্‌ব অর্থাৎ হৃদয়ের সন্তান)"[২৮১]

যে মুসলিম হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ (স.)-এর সুন্নতের খিলাফ কাজ করে না, তিনিই রাসূলুল্লাহ্‌র হৃদয়ের সন্তান। যে জাতি বা যে কোনো লোক মুসলিম হয়ে রাসূলের সুন্নতের পা'বন্দ হলেই তাঁহাকে রাসূলের কালবী আওলাদ বলতে হবে। সে ব্যক্তি প্রত্যেক মুসলিমের ভাই এবং তাঁকে মুসলিমগণের সমাজ, জামায়াতে পুরাপুরিভাবে প্রবেশ করাতে হবে। তাঁর সাথে পূর্ণ ছোলহ করতে হবে। মহান আল্লাহ্‌ বলেন :

يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقكم ان الله عليم خبير -

"অর্থাৎ হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকট সে ব্যক্তি অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ সকল কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।"[২৮২]

যার মধ্যে 'খওফে খোদা' (আল্লাহ্‌র ভয়) নেই, রাসূলুল্লাহ্‌ (স.)-এর সুন্নতের অনুসারী নয়, সে যতো বড়ই ইজ্জতের দাবীদার হউক না কেনো, আল্লাহ্‌ ও রাসূলের হুকুম অনুসারে সে ইয্যতের পাত্র নয়। ইজ্জত হচ্ছে বুযুর্গী, খোদাভীরু ও সুন্নতের পাবন্দদিগের জন্যই মাখছুছ (নির্দিষ্ট)। যিনি আল্লাহ্‌ ও রাসূলের হুকুম মতো কাজ করবেন, তিনিই সম্মানী; আর যিনি করবেন না, তিনি ইসলামের নিকট সম্মানী নন।

যে মুসলিম শরীয়ত অনুসারে উপযুক্ত তিনিই মুসলিমদের ইমাম, পীর এবং নেতা হওয়ার যোগ্য। পীর, ইমাম কিংবা নেতা হওয়ার জন্য শরীয়তের পা'বন্দি হওয়া নেহায়েৎ জরুরী। পীরের ছেলে পীর অথবা ইমামের পুত্র ইমাম হবে এরূপ নিয়ম ইসলামের খিলাফ। যদি কেউ পীর অথবা ইমামের পুত্র হয়ে শরীয়ত অনুসারে উপযুক্ত না হন, তবে তিনি পীর অথবা ইমাম হতে পারেন না। আর যদি কেউ পীর অথবা ইমামের পুত্র না হয়েও মুত্তাকী 'আমিল অর্থাৎ শরীয়ত অনুসারে উপযুক্ত হন, তবে তিনিই পীর অথবা ইমাম হওয়ার যোগ্য।

অনুপযুক্ত ইমাম ও পীরদিগের শরীয়তের খিলাফ কাজের জন্য মুসলিমগণের বহু ক্ষতি হচ্ছে। খিলাফে-শর'আ ইমাম, খেলাফে-শর'আ 'আলিম, খিলাফে-শর'আ ওয়ায়িয-বক্তা এবং খিলাফে-শর'আ লিখকদের শরীয়তের খিলাফ কাজের জন্য মুসলিম সমাজ ছারেখারে যেতে বসেছে।

যাহারা শরীয়তের খিলাফ কাজ করেন, অর্থাৎ আল্লাহ্‌-রাসূলের হুকুমের ওপর পুরোপুরি 'আমল করেন না, তাদিগকে পীর, ইমাম, ওয়ায়েজ, বক্তা, নেতা কিংবা লিখক হতে দেয়া কোন মুসলিমের পক্ষে আদৌ ছহী নয়। যদি শরীয়তের পূর্ণ আমলকারী হয়ে আল্লাহ্‌-রাসূলের হুকুম অনুসারে উপযুক্ত হন, তবে তারা এ সমস্ত ইয্যতের যোগ্য হবেন-নতুবা নহে।

২৭৭. এর প্রাথমিক অর্থ রজ্জু। এ স্থলে আল্লাহ্‌র রজ্জু অর্থে কুর'আন ও ইসলাম। উদ্ধৃত: আল-করআনুল করীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫
২৮০. আল কুর'আন, ০৩: ১০৩
২৮১. উদ্ধৃত: আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১
২৮২. আল কুর'আন, ৪৯: ১৩

শরীয়তের খিলাফ পীর, ইমাম ও 'আলিমের ইত্তেবা' (অনুসরণ) করে কিংবা কুর'আন, হাদীস, তাফসীর, 'আকায়েদ, ফিক্হ প্রভৃতি 'না-ওয়াকেফ' (অজ্ঞ) খেলাফে-শর'আ ওয়ায়িযের ওয়ায, বক্তার বক্তৃতা এবং লিখকের লিখা অনুসারে 'আমল করে দীন, ঈমান নষ্ট না করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্যে নেহায়েত আবশ্যক।[২৮৩]

ওছীয়তনামা-০৪

আল্লাহ্তা'আলা পবিত্র কুর'আনে ইরশাদ করেছেন :

فلا تطع المكذبين -

"অর্থাৎ সুতরাং মিথ্যাচারীদের অনুসরণ করো না।"[২৮৪]

যারা মিথ্যাবাদী, না-হক পথের পথিক এবং যারা না-হক বিষয়ে পরামর্শ দেয়, তাদের তা'বেদারী করতে অর্থাৎ তাদের কথামত চলতে আল্লাহ্তা'আলা প্রত্যেক মুসলিমকে নিষেধ করেছেন। কেননা এরা মানুষকে প্রকাশ্য নুকছানের দিকে নিয়ে যায় এবং যার ফলে তাদের দু-জাহানের সর্বনাশ হয়। মিথ্যাবাদীর ওপর আল্লাহ্র লা'নত। কুর'আন শরীফে তাদের ভয়ঙ্কর আযাবের কথা স্পষ্টই উল্লেখ আছে। এদের ছোহবত (সংসর্গ) হতে মুসলিমদের দূরে থাকা নেহায়েত জরুরী; অন্যথায় তাদের খপ্পড়ে পড়ে দুনিয়া-আখিরাতের মহা সর্বনাশ করা হবে।

আজকাল ওয়ায়িয-বক্তা ও 'আলিমদের মধ্যে বহু মিথ্যাবাদী বের হয়েছে। তারা মুসলিমদেরকে গোমরাহ্ করে শয়তানের দল পুষ্ট ও জাহান্নামী করতে খুব চেষ্টা করছে। এরা কুর'আন-হাদীসের খোঁজ-খবর রাখে না, অথচ নিজেদেরকে পীর, মৌলবী, মাওলানা প্রভৃতি নামে পরিচয় দিয়ে সাধারণকে গোমরাহীর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। শরা-শরয়িত, নামাজ-রোজা ইত্যাদির সাথে এদের কোনো সম্পর্ক নেই। হালাল-হারাম, পাক-নাপাক বিষয়ে এরা সম্পূর্ণ না-ওয়াকিফ।

মোট কথা, ইসলামের আহ্কাম ও আরকান সম্বন্ধে কোনো কিছু না জেনে লোকদেরকে মিথ্যা ও ভুল মাস'আলা বলে গোমরাহ্ করে। এ শ্রেণীর বক্তারা সভায় গিয়ে মৌলবী মাওলানা সেজে ইসলামী শরীয়তের নামে অনবরত খিলাফে-শর'আ মত প্রচার করে। কুর'আন ও হাদীসের মিথ্যা অর্থ বলে জাহান্নামের পথ খোলাসা করে। গানবাদ্য জায়িয, সুদ-হালাল, পর্দা পরিহার ইত্যাদি খিলাফে-শর'আ মত প্রচার করে লোকদেরকে গোমরাহ্ করে। অথচ এরা কুর'আন শরীফটি পর্যন্ত ছহীহ্ করে পড়তে পারে না- আরবী 'ইলমের মোটেও ধার ধারে না।

একদল কংগ্রেসী লোক আছে, ইনারা নিজেদেরকে মৌলবী-মাওলানা বলে পরিচয় দিয়ে মুসলিমদিগকে মহা ধোকায় ফেলতেছে। আসলে তারা আদৌ কিছু জানে না; কিন্তু কুর'আন-হাদীসের নামে মিথ্যাকথা প্রচার করে নিজেদের দীন-ঈমান বরবাদ এবং তাদের তা'বেদারদিগের জন্য জাহান্নামের পথ পরিষ্কার করে। এরা নিজেদের স্বার্থ সাধনের জন্য আল্লাহ্-রাসূলের মুখালেফতী করতে একটুকুও পিছপা হয় না, মিথ্যা বলতে এদের মোটেও ভয় হয় না। সাধারণকে ধোকায় ফেলে নিজের মতলব হাছিল করা এদের প্রধান ব্যবসা। যাতে নিরীহ মুসলিমদের দু-জাহানের তনজ্জলি হয়, এরা সে চেষ্টাই করে থাকে।

এরূপ এক শেণীর লিখক বের হয়েছে, তারা কুর'আন-হাদীস, ইল্মে শরীয়ত প্রভৃতি ভালোরূপে অবগত না হয়ে নিজের মনমতো ফাতওয়া প্রদান করে মুসলিমদের সর্বনাশ করতেছে। না-জায়িযকে জায়িয; হারামকে হালাল করার জন্য ইনারা প্রাণপন চেষ্টা করতেছে।

হযরত নবী করীম (স.) এ সমস্ত লোকদিগকে মিথ্যাবাদী দাজ্জাল বলে অভিহিত করে মুসলিমদেরকে তাদের আক্রমণ হতে সাবধান থাকতে বলেছেন। মুসলিমগণ খুব হুঁশিয়ার থাকবেন যেনো মিথ্যাবাদীদের দল কাউকে মিথ্যার দিকে পরিচালিত করে দু-জাহানের ক্ষতি করতে না পারে।[২৮৫]

---

২৮৩. শরিয়তে ইসলাম, বর্ষ-৪র্থ, সংখ্যা-৯ম, পৃ. ১৯৩-১৯৫
২৮৪. আল কুর'আন, ৬৮: ০৮

ওছীয়তনামা-০৫

আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীন ইরশাদ করেন :

واجتنبوا قول الزور -

"অর্থাৎ আর তোমরা দূরে থেকো মিথ্যা কথন হতে।"[২৮৬]

মুসলিমদেরকে প্রত্যেক প্রকার মিথ্যা হতে পরহেজ থাকবার জন্য মহান আল্লাহ্ এ আয়াতে হুকুম করেছেন। আল্লাহ্র মনোনীত দীন ইসলাম কোনো প্রকার মিথ্যাকে পছন্দ করে না। সমস্ত মিথ্যাই না-জায়িয এবং কঠিন বিষয়। মিথ্যুকের ওপর আল্লাহ্তা'আলার লা'নত; রোজ-কিয়ামতে মিথ্যাবাদীগণ কঠিন আযাবে গ্রেফতার হবে; মিথ্যাবদীর তা'বেদারী করা গুনাহের কাজ; কুর'আন শরীফে এ হুকুম পরিষ্কার ভাবে দেয়া আছে।

আল্লাহ্র হুকুম না মেনে যারা মিথ্যা কথা ও মিথ্যা বিষয় দ্বারা তরক্কী লাভ করতে চায়, তারা নেহায়েত গোমরাহ্। কেননা মিথ্যা বষয় তনজ্জলির পথ দেখিয়ে থাকে; এতে যথার্থ তরক্কী হতে পারে না। কতক লোকে বলে থাকে যে, দুনিয়ায় মিথ্যা ছাড়া কোন কাজ করা যায় না, অতএব দুনিয়াদারীর জন্য মিথ্যা চাই। এরূপ কথা যারা বলে, তারা ঈমানদার কিনা তা সন্দেহের বিষয়। কেননা তারা আল্লাহ্র কালামের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস করে নি; যদি তারা করতো, তবে কিছুতেই ঐরূপ কথা বলতে পারতো না। কেননা আল্লাহ্র কালামে আছে, হক যাহের হবে এবং না-হক বিনষ্ট হবে। যেমন আল্লাহ্ বলেন :

وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا -

"অর্থাৎ এবং বলো, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে; মিথ্যা তো বিলুপ্ত হবারই।"[২৮৭]

মুসলিমগণ! হুশিয়ার থাকবেন, কিছুতেই না-হকের দিকে যাবেন না এবং যারা না-হক পথে চলে তাদের তা'বেদারী করবেন না। বর্তমান সময়ে মিথ্যার খুব প্রচলন হয়েছে; হক পরিত্যাগ করে লোকেরা না-হকের দিকে চলছে; মিথ্যাকে তারা তাদের অবলম্বন স্থির করে নিয়েছে; তাই আজ তাদের এ ঘোর দুর্দশা ও দু-জাহানের তনজ্জলি আরম্ভ হয়েছে।

আজকাল প্রত্যেক বিষয়ের মধ্যে মিথ্যা ও ফেরেবের প্রচলন দেখা যায়। মিথ্যা সাক্ষী, মিথ্যা কথা, মিথ্যা পরামর্শ, মিথ্যা ব্যবসা ও মিথ্যা মুকাদ্দামা এবং না-হক বিচারে দেশ ভরে গিয়েছে। মিথ্যাবাদী নেতা, মিথ্যা লিখক, মিথ্যুক বক্তা এবং অসত্যপরায়ণ 'আলিম ও অযোগ্য পীরের না-হক কাজের জন্য সমাজের মহা ক্ষতি হচ্ছে।

সমস্ত মিথ্যা হতে তাওবা করতে এবং মিথ্যাবাদীর তা'বেদারী না করতে আল্লাহ্তা'আলা সকলকে হুকুম করেছেন। মুসলিমগণ, মহান আল্লাহ্র হুকুম অনুযায়ী আমল করবেন।[২৮৮]

ওছীয়তনামা-০৬

আল্লাহতা'আলার হুকুম অনুসারে আমল করলে দু-জাহানের সকল প্রকার তরক্কী লাভ করতে পারা যায়। যত প্রকার মিথ্যা আছে, তার প্রত্যেকটাকে পরিত্যাগ করে খাঁটিভাবে শরীয়ত অনুসারে 'আমল করবার জন্য মুসলিমদিগকে একান্ত চেষ্টা করতে হবে। হযরত নবী করীম (স.) ইরশাদ করেছেন– "আমার যামানা, তার পরের যামানা এবং তার পরের যামানা ভালো; তার পরে মিথ্যা ছড়িয়ো পড়বে।"[২৮৯]

---

২৮৫. শরিয়তে ইসলাম, বর্ষ-৪র্থ, সংখ্যা-১২শ, পৃ. ২৬৫-২৬৬
২৮৬. আল কুর'আন, ২২: ৩০
২৮৭. আল কুর'আন, ১৭: ৮১
২৮৮. শরিয়তে ইসলাম, বর্ষ-৫ম, সংখ্যা-১ম, পৃ. ১-২
২৮৯. আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

বর্তমান যামানায় চারদিকে মিথ্যা ছড়িয়ে পড়েছে। মিথ্যার তা'বেদারী করবার জন্য মুসলিমগণের তনজ্জলি হচ্ছে। দুনিয়ার এবং আখিরাতের কাজের মধ্যে নানা প্রকার মিথ্যা ঢুকে পড়েছে। মুসলিমদেরকে গোমরাহ্ করার জন্য জিন এবং মানুষ শয়তান নানা উপায়ে মিথ্যার প্রচলন করেছে। বহু মিথ্যা ও নকলকে আসলের নামে প্রচার করে সে তার নিজের কাজ হাসিল করছে অর্থাৎ সকলকে গোমরাহ্ করে জাহান্নামের দিকে টানতেছে। মুসলিমগণ! এগুলো হতে সাবধান থাকবেন। মিথ্যা পীর অর্থাৎ অযোগ্য মুরশীদগণের মিথ্যা প্রচারে সমাজের মহা সর্বনাশ হচ্ছে।

ইনারা শর'-আ শরীয়তের বিপরীত কাজ করে মানুষকে শয়তানের পথে চালাচ্ছে। যথার্থ পীরগণের যে কাজ ইনারা তা না করে তার খিলাফ কাজ করে এবং এ জন্য সমাজের বহু নুকছান হয়। কামিল অর্থাৎ যোগ্য পীরের নিকট মুরীদ (বায়'আত) হওয়া সুন্নাত এবং এটা নেক কাজ। কামিল পীরের কতগুলো শর্ত আছে। সে সমস্ত শর্ত যাঁর মধ্যে নেই তিনি কামিল পীর হতে পারেন না এবং তাঁর নিকট মুরীদ হওয়াও জায়িয নেই।

বর্তমান যামানায় পীরের জন্য ঐ সমস্ত শর্তের দিকে খেয়াল করা হয় না বলেই অযোগ্য পীরের হিসাব বেড়েই চলছে এবং এর ফলে পীর-পোরস্তি, কবর-পূজা, পীর-সিজ্দা, কাওয়ালী, জাহেলী, মিথ্যা এবং হারামের বিস্তার হতেই চলেছে। আল্লাহ্ ব্যতীত কাউকেই সিজ্দা করা জায়িয নয়। কুর'আন এবং হাদীসে আল্লাহ্ ভিন্ন অপর কিছুকে সিজ্দা করতে নিষেধ রয়েছে। পীর-পূজা, কবর- পূজা করলে ঈমান বরবাদ হয়ে যায়; কিন্তু না-কামিল পীরগণ এ সমস্ত খিলাফে-শর'আ বিষয়ে লোকদিগকে নিষেধ করে না, বরং তারা ঐ সমস্ত না-জায়িয কাজ করিয়ে থাকে বলে আজকাল পীর-পোরস্তি, পীর-সিজ্দা, কবর-পূজা প্রভৃতি গায়ের ইসলামী কাজ হচ্ছে এবং এ সকল কার্য্যকে জায়িয বলে প্রচার করে লোকেরা কাফির হচ্ছে।

পীর-মুরীদি পৌরহিত প্রথার মতো নয়। এটি জায়িয এবং প্রত্যেক প্রকার না-জায়েয তরীকা হতে বিমুক্ত। পীরের ছেলে পীর হবে এরূপ নিয়ম ইসলামে নেই, কিংবা সাধারণ লোকের ছেলে পীর হতে পারবে না এরূপ নিয়মও ইসলামে নেই। যদি কোনো কামিল পীরের ছেলে শরীয়ত অনুসারে উপযুক্ত না হন অর্থাৎ কামিল পীর হবার যে সমস্ত শর্ত আছে তৎসমুদয়ে শর্তবান না হন তবে তিনি পীর হবার যোগ্য নন। যদি কোনো সাধারণ লোকের ছেলে উপযুক্ত হন অর্থাৎ শর্তসমূহে শর্তবান হন তবে তিনি নিশ্চয়ই পীর হতে পারবেন। ইসলামের নিকট কাবিলিয়াতের কদর আছে, না-কাবিল সে কদরের যোগ্য নয়। আজকাল মুসলিমগণ কাবিলিয়াতের দিকে খেয়াল না করে মহা ভুলে পতিত হচ্ছেন এবং যাকে তাকে পীর বলে গোমরাহ্ হতে চলেছেন।[২৯০]

শরীয়ত অনুযায়ী কামিল পীর হবার জন্য তাকে দীনের 'ইল্ম অর্জন করা চাই। কুর'আন, হাদীস, তাফসীর, 'আকায়িদ, ফিক্হ, তাছাউফ প্রভৃতির 'ইল্ম অর্জন করা প্রয়োজন। বে-'ইল্ম অর্থাৎ জাহিল ব্যক্তি কখনও পীর হতে পারে না। জাহিল পীরের নিকট মুরীদ হয়ে মুসলিমগণ! দীন-দুনিয়ার মহা সর্বনাশ করবেন না। কামিল পীরের জন্য মুত্তাকী পরহেজগার এবং হকের পা-বন্দ হওয়া নেহায়েত জরুরী। যাঁরা মুত্তাকী পরহেজগার নন এবং না-হক পথে চলেন, তিনি উপযুক্ত পীর হবার যোগ্যই নন।

যাঁরা না-হক বিচার করে চলে না, হালাল-হারাম খেয়াল করে না অর্থাৎ আল্লাহ্-রাসূলের হুকুমের দিকে খেয়াল না করে নিজের সুবিধামত পথে চলেন, তারা উপযুক্ত পীর হবার যোগ্য নহেন। ইনারা না-হক পথে চলে এবং হারাম খেয়ে ও মিথ্যা তা'বেদারী করে নিজে জাহান্নামের দিকে যায় এবং নিজের মুরীদ-মু'তাকিদদিগকেও সে দিকে নিয়ে যায়।

কামিল পীরের জন্য না-জায়িয লোভ পরহেজ করা এবং আখিরাতের দিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখা একান্ত প্রয়োজন। যে সমস্ত পীর না-জায়িয লোভে গ্রেফতার থাকেন এবং আখিরাতের দিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখে না, তারা উপযুক্ত পীর হবার যোগ্য নন। পীর-মুরীদিকে যারা টাকা-পয়সা উপায়ের অথবা দুনিয়াবী ব্যবসা বলে খেয়াল রাখে অথবা মুরীদ বৃদ্ধি করে নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি মান-সম্ভ্রম বাড়াতে যাঁরা ইচ্ছে করে, তারা ব্যবসায়ী পীর। তাদের নিকট মুরীদ হওয়া মুসলিমগণের পক্ষে জায়িয নয়। বরং মুরীদ না হওয়া ইশা'আতে ইসলামের কাজ। এটাই আল্লাহ্র ওয়াস্তে করতে হবে। দুনিয়াবী গরজের জন্য পীর মুরীদি করা না-জায়িয। যদি

---

২৯০. কুরআন হাদীস রিসার্চ সেন্টার, *হাকীকতে খলীফাতুল্লাহ* (ঢাকা: মারকাজে ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, সন নেই), পৃ. ৫৮

কোন মুরীদ নেক-নিয়তে কোনো পীরকে হালাল মাল তোহ্ফা দেয় তা নেয়া জায়িয। এটি হযরত নবী (স.) হতে এ পর্যন্ত জায়িয রয়েছে। কিন্তু এটি পাইবার উদ্দেশ্যেই যদি কোন পীর লোকদিগকে মুরীদ করে, তবে তাঁর নিকট মুরীদ হওয়া জায়িয হবে না।

কামিল পীরের জন্য নেক কাজের নছিহত এবং বদ কাজ করতে নিষেধ করা অবশ্য প্রয়োজন। যে সমস্ত পীর নেক কাজ করতে উপদেশ এবং গুনাহের কাজ করতে নিষেধ করে না, তারা কামিল পীর হবার যোগ্য নহে। হক নছিহত করা এবং না-হক কাজ করতে নিষেধ করা পীরগনের জন্যে একান্ত আবশ্যক। যাঁরা এটি না করেন অর্থাৎ হক কাজে উৎসাহ এবং গুনাহের কাজ করতে নিষেধ না করে, তারা কামিল পীর নন। হক কথা বলবার মতো উপযুক্ত সৎ-সাহস এবং না-হকের প্রতিবাদ করবার মতো ক্ষমতা কামিল পীরের থাকা চাই। সমাজের মধ্যে যে কোন প্রকার না-হক প্রচলিত হলে, তার তারদীদ করে হক কাজের প্রচলন করা কামিল পীরের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। মুসলিমগণের কোনো প্রকার বিপদ-আপদের সময়ে তার যথাবিহিত প্রতিবিধান করা কামিল পীরের পক্ষে নেহায়েত জরুরী। কামিল পীরের পক্ষে উল্লিখিত শর্ত থাকা বিশেষ প্রয়োজন। এ ছাড়া তাঁকে কোনো কামিল পীরের নিকট থেকে খিলাফত পাওয়া আবশ্যক।[২৯১]

ওছীয়তনামা-০৭

আল্লাহ্তা'আলা কুর'আন শরীফে মিথ্যাবাদীদের তা'বেদারী না করবার জন্য হুকুম নাযিল করেছেন :

فلا تطع المكذبين -

"অর্থাৎ সুতরাং তুমি মিথ্যাচারীদের অনুসরণ করো না।"[২৯২]
সুতরাং প্রত্যেক মুসলিমের জন্য একান্ত আবশ্যক যে, তাঁরা যার নিকট মুরীদ হবেন এবং যার ইত্তেবা করবেন তাঁর সম্বন্ধে বিশেষরূপে অনুসন্ধান করেন। যদি তাঁর কাজ ও কথার মধ্যে শরীয়তের খিলাফ কিছু পাওয়া যায় এবং তিনি ঐ খিলাফে-শর'আ কাজ পরিত্যাগ না করেন, তবে তাঁর নিকট মুরীদ হওয়া অথবা ইত্তেবা করা জায়িয হবে না। বে-শর'আ বিদ'আতী এবং বে-'ইল্ম পীর নামধারী ব্যবসায়ী লোকের দাপটে আজ সমাজ ছারখার হয়ে যাচ্ছে।

মুসলিমগণ সাবধান! কামিল পীরের প্রত্যেক শর্তের সাথে মিল না পেলে কারও নিকট মুরীদ হয়ে দীন-ঈমান বরবাদ করবেন না। হাদীস শরীফে আছে, হযরত নবী করীম (স.) ইরশাদ করেছেন যে, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে বহু শয়তান মানুষের সুরত ধরে খিলাফে-শর'আ কাজের প্রচলন দ্বারা মানুষকে গোমরাহ্ করবে। আজকাল যেমন বহু না-কাবেল পীর নামে পরিচিত হয়ে মুসলিমদিগের দু-জাহানের সর্বনাশ করতেছে; তদ্রুপ একদল 'আলিম বের হয়েছে-তারা তাদের মতলব হাছিল করবার জন্য হারামকে হালাল, না-জায়িযকে জায়িয বলে, মুসলিমগণের নেহায়েত নুকছান করে যাচ্ছে। এ সমস্ত মিথ্যা 'আলিম তাদের নাম জাহির, দল-পুষ্ট, স্বার্থ-সাধন এবং ব্যবসা চালাবার জন্য খিলাফ-শর'আ বহু কাজ করে থাকেন। ফাতওয়া-ফারায়েজ প্রভৃতিতে ইনারা নিজের সুবিধা অনুযায়ী মাস'আলা বলে এবং পয়সা পেলে হারামকে হালাল বলে ফাতওয়া দিয়ে থাকে। নফসানিয়াত ও ব্যবসার জন্য ইনারা শরীয়তের সর্বনাশ করছে। ইনাদের কেউ কেউ পয়সা অথবা অন্য কিছু উপায়ের জন্য সুদ জায়িয বলতেছে। জীবনবীমা, ব্যাংক প্রভৃতি নানাবিধ সুদকে হালাল বানাবার জন্য ইনারা যথাসাধ্য চেষ্টা করেই চলেছে। হিন্দুস্তানকে "দারুল হারব" বলে কেউ কেউ সুদ নেয়া ও সুদ খাওয়া হালাল বলতেছে। কেউ কেউ স্থানে স্থানে ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে সেখান থেকে সুদ গ্রহণ করতেছে এবং বলতেছে, ব্যাংকের সুদ গ্রহণ না করলে সমাজ রক্ষা হবে না। মোটকথা, নানা উপায়ে ইনারা সুদ খাওয়াকে জায়িয ও হালাল করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। ইনাদের কাগজ-পত্র ও বক্তৃতা সাধারণত এ সমস্ত হারামকে হালাল বানাবার জন্য ইস্তে'মাল হয়।[২৯৩]

---

২৯১. *শরিয়তে ইসলাম*, বর্ষ- ৫ম, সংখ্যা- ২য়, পৃ. ২৫-২৭
২৯২. আল কুর'আন, ৬৮: ০৮
২৯৩. আবু ফাতেমা মোহাম্মদ ইসহাক, *ফুরফুরা শরীফের পীর হযরত মাওলানা শাহ সূফী আবু বকর সিদ্দিকী* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮ খ্রী.), পৃ. ২৮

ভাই মুসলিমগণ! আল্লাহ্‌তা'আলা পবিত্র কুর'আন শরীফে এবং হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ (স.) হাদীস শরীফে প্রত্যেক প্রকার সুদকে কাত্'য়ী হারাম বলে দিয়াছেন-তা কখনই হালাল নয়। কাত্'য়ী হারামকে হালাল জানলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায় এবং সে কাফির হয়ে যায়। যারা নানা প্রকার যুক্তি-তর্ক ও ছলনা হাজির করে সুদকে হালাল ও তা দ্বারা সমাজের তরক্কী হাছিল করতে চান, তারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের হুকুম ইনকার করে নিজেরা কাফির হচ্ছেন এবং অন্যকেও কাফির বানাতে চেষ্টা করতেছেন। সুদের দ্বারা মুসলিমগণের প্রকৃত তরক্কী লাভ হবে এরূপ কথা যারা বলে, তারা আল্লাহ্‌-রাসূল এবং কুর'আন-হাদীসের ওপর ঈমান আনতে পেরেছে কিনা সন্দেহ! কেননা আল্লাহ্‌-রাসূলের কালামে ঐ সমস্ত কথার কঠোর প্রতিবাদ এসেছে। আল্লাহ্‌তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

واحل الله البيع وحرم الربوا -

"অর্থাৎ আল্লাহ্‌ ব্যবসা (ক্রয়-বিক্রয়)-কে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।"[২৯৪]

অন্য স্থানে বলেছেন :

يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذرو ما بقى من الربوا ان كنتم مؤمنين - فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله -

"অর্থাৎ হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আর আগের যে সকল বকেয়া সুদ রয়েছে তা ছেড়ে দাও। যদি সত্যিকার ইমানদার হও। যদি এমনটি না করো, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা থাকলো।"[২৯৫]

আল্লাহ অন্যত্র ইরশাদ করেছেন :

يمحق الله الربوا ويربى الصدقات -

"অর্থাৎ আল্লাহ্‌ সুদকে মিটিয়ে দেন বা নিশ্চিহ্ন করেন, আর দান-সদকাকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করেন।"[২৯৬]

মহান আল্লাহ্‌ অন্যত্র বলেছেন :

الذين ياكلون الربوا لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس -

"অর্থাৎ সুদখোরেরা ঐ ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা (দুনিয়ার প্রতি) পাগল করে দিয়েছে।"[২৯৭]

আল্লাহ্‌ অন্যত্র ইরশাদ করেছেন :

يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربوا اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون - واتقوا النار التى اعدت للكافرين -

"অর্থাৎ হে ইমানদারগণ, চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না বরং আল্লাহ্‌কে ভয় করো, যাতে সফল হতে পারো। আর জাহান্নামের আগুনকে ভয় করো, যা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।"[২৯৮]

নবী করীম (স.) ইরশাদ করেছেন :

الربوا سبعون حوبا- ايسرها ان ينكح الرجل امه -

"অর্থাৎ সুদ হলো সত্তর প্রকার পাপের সমষ্টি। তম্মধ্যে সবচেয়ে সহজটি হলো আপন মায়ের সাথে ব্যাভিচার করা।"[২৯৯]

---

২৯৪. আল কুর'আন, ০২: ২৭৫
২৯৫. আল কুর'আন, ০২: ২৭৮-২৭৯
২৯৬. আল কুর'আন, ০২: ২৭৬
২৯৭. আল কুর'আন, ০২: ২৭৫
২৯৮. আল কুর'আন, ০৩: ১৩০-১৩১
২৯৯. সুনান ইবনে মাজা, হাদীস নং- ২২৭৪

নবী করীম (স.) অন্যত্র ইরশাদ করেন, "যে কেউ জেনে শুনে এক দিরহাম পরিমাণ সুদ খেয়েছে, সে ব্যক্তি ছত্রিশ বার জিনা করা অপেক্ষা বেশি গুনাহ করেছে।"[৩০০]

বিশ্বনবী অন্যত্র ইরশাদ করেন :

اجتنبوا السبع الموبقات- قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر واكل الربوا -

"অর্থাৎ তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় থেকে বিরত থাকবে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল সেগুলো কী? তিনি বললেন : ১) আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা, ২) যাদু করা, ৩) সুদ খাওয়া।"[৩০১]

নবী করীম (স.) আরো ইরশাদ করেন :

لعن النبى صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة واكل الربوا وموكله -

"অর্থাৎ নবী (স.) অভিসম্পাত করেছেন উল্কি অংকনকারিণী, উল্কি গ্রহণকারিণী, সুদ গ্রহীতা ও সুদ দাতাকে।"[৩০২]

বিশ্বনবী আরো ইরশাদ করেন :

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربوا وموكله وشاهده و كاتبه -

"অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (স.) সুদখোর, সুদদাতা, সুদের সাক্ষীদাতা এবং সুদের লিখককে লা'নত করেছেন।"[৩০৩]

এ ছাড়াও কুর'আন-হাদীসে সুদের খারাবী এবং তা না খাবার জন্য বহু বর্ণনা আছে। আল্লাহ্ ও রাসূলের হুকুম ইনকার করে যারা কাত্'য়ী হারাম সুদকে হালাল বলতে চায়, তারা যে কিরূপ মুসলিম তা ভাববার বিষয়। স্পষ্ট কথা, যাদের ঐরূপ 'আকীদা তাদের ঈমান নষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং তারা আল্লাহ্ ও রাসূলের মুখালিফ। মুসলিম! এ সমস্ত দল হতে হুশিয়ার থাকবে।

আল্লাহ্‌তা'আলা বলেছেন–"সুদের যা কিছু বাকী আছে, তাহা পরিত্যাগ করো এবং সুদের মাল আল্লাহ্‌তা'আলা ধ্বংস করবেন।" আর ইনারা বলতেছে যে, 'সুদের যা কিছু তাহা পরিত্যাগ করিও না, বরং তা গ্রহণ করো এবং সুদ দ্বারা পয়সা বৃদ্ধি ও সমাজের উন্নতি হবে।' এখন কার কথা মুসলিমদিগকে মানতে হবে ? আল্লাহ্‌তা'আলার অথবা এ সমস্ত লোকের ? আল্লাহ্‌র কথা বিশ্বাস করতে গেলে ইনাদের কথা অবিশ্বাস করতে হয়। যাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র ঈমান আছে, তারা কিছুতেই আল্লাহ্‌র কথা অবিশ্বাস করতে পারে না। বরং আল্লাহ্-রাসূলের কথার খিলাফ যার কথা হউক না কেনো, তাকে তারা নিশ্চয়ই অবিশ্বাস করে থাকেন। তাই বলি মুসলিমগণ, খুব হুশিয়ার থাকবেন। আলিমদিগের এ দল মুসলিমদিগকে আল্লাহ্-রাসূলের মুখালিফ বানাবার জন্য সুদ প্রভৃতি হারামকে হালাল বলে প্রচার করতেছে এবং যা আল্লাহ্‌তা'আলা ধ্বংস করবেন, তার দ্বারা সমাজের উন্নতি করতে চাইতেছে। ইনাদের অপেক্ষা ঝুট দাবী আর কার হতে পারে ?

মিথ্যাবাদী 'আলিমগণের আর এক দল আছে, যারা গান-বাদ্য জায়িয করবার চেষ্টা করতেছে। গান-বাদ্য জায়িয বলে ইনারা কাগজ-পত্র ও বক্তৃতায় প্রকাশ করতেছে। কুর'আন-হাদীসের উল্টা অর্থ এবং মানসূখ হাদীস ও মনগড়া দলীল এনে গান-বাজনা জায়িয বলতেছে। ইনাদের প্রতিবাদ করে প্রকৃত 'আলিমগণ শরীয়তের দলীল প্রকাশ এবং গান-বাদ্য হারাম ছাবিত করেছেন। কুর'আন ও সহীহ হাদীস হতে গান-বাদ্য হারাম সাব্যস্ত হয়েছে। আল্লাহ্‌তা'আলা গানকে শয়তানের আওয়াজ বলেছেন এবং যারা গান-বাদ্য করে অথবা শুনে তাদের জন্য কঠিন আযাবের সংবাদ রয়েছে।

অথচ এ সমস্ত লোক শয়তানী ওয়াছওয়াছায় পড়ে মতলব হাছিল করবার জন্য ওগুলোকে জায়িয বলে প্রকাশ করতেছে। মুসলিমগণ, এদের ফেরেব হতে হুঁশিয়ার থাকবেন।[৩০৪]

৩০০. আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯
৩০১. সহীহ আল বুখারী, হাদীস- ২৬১৫, সহীহ মুসলিম, হাদীস- ২৭২
৩০২. সহীহ আল বুখারী, হাদীস-৫০৩২
৩০৩. সুনান আবু দাউদ, হাদীস- ৩৩৩৫
৩০৪. শরিয়তে ইসলাম, বর্ষ-৫ম, সংখ্যা-৪র্থ,পৃ. ৭৩-৭৫

ওছীয়তনামা-০৮

আল্লাহ্ ও রাসূল (স.) কুর'আন-হাদীসে গান-বাদ্য হারাম বলেছেন। তাফসীর, ফিক্হ প্রভৃতি কিতাবেও গান-বাদ্যকে স্পষ্ট হারাম বলে লিখা আছে। শরীয়তের প্রত্যেক দলীলে গান-বাদ্য হারাম ছাবিত হয়েছে। যারা গান-বাদ্যকে হালাল জানে, তারা হারামকে হালাল জানবার জন্য কাফির হয়ে যাবে। শরীয়তে এর অকাট্য দলীল মৌজুদ আছে। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন– "সঙ্গীত জিনার মন্ত্র।" 'মদ্‌খল্‌লে আমীরে হজ্জ' কিতাবে আছে যে, যখন মানুষ গান-বাদ্য করে এবং অপর স্ত্রীলোকর দিকে বদ নযর করে, ইবলিশ শয়তান সে সময় তাকে গোমরাহ্ করতে বেশি সুযোগ পায়। ইমাম শাফেয়ী (র.) 'আদাবুল কাজা' নামক কিতাবে বলেছেন যে, গান গাওয়া না জায়িয এবং বাতিল কাজ।[৩০৫]

ইমাম মুহাম্মাদ (র.) তাঁর 'যিয়াদাৎ' কিতাবে গানকে হারাম বলেছেন। 'নেহায়া' কিতাবে আছে, কুর'আন শরীফের আয়াত অনুযায়ী গান গাওয়া, তাম্বুরা-দফ প্রভৃতি বাদ্য বাজান হারাম ও কঠিন গুনাহের কাজ। 'মোহিত', 'জামেউল ফতোয়া', 'ফাতওয়ায়ে বায়হাকি' প্রভৃতি কিতাবে আছে যে, গান-বাদ্য হারাম, ওগুলোকে হালাল জানলে কাফির হয়ে যাবে।[৩০৬]

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (স.) গান-বাদ্যের আওয়াজকে 'মাল'উন আওয়াজ' বলেছেন। হাদীসে আরও আছে যে, যে সময় মুসলিমদের মধ্যে বাদ্য এবং গায়িকা স্ত্রীলোক যাহির হবে, তখন তাদের তনজ্জলি হতে থাকবে। 'মুসনাদে আহমাদ'-এ রয়েছে যে, হযরত নবী করীম (স.) বলেছেন, আল্লাহ্‌তা'আলা আমাকে প্রতিমা, ক্রুশ এবং গান-বাজনা দূর করবার জন্য হুকুম করেছেন। মুসলিমগণ হুশিয়ার থাকবেন! আল্লাহ্-রাসূলের হুকুমের খিলাফ যে কেউ হুকুম করে তার হুকুম মেনে দীন ঈমান বরবাদ করবেন না।[৩০৭]

হযরত নবী করীম (স.), সাহাবা, তাবে'য়ী, তাবে তাবে'য়ী, ইমাম, মুজতাহিদ, পীর, ওলী প্রভৃতি সকলেই গান-বাদ্যকে আল্লাহ্‌তা'আলার হুকুম অনুসারে হারাম বলে ফাতওয়া দিয়েছেন। যে সমস্ত লোক গান-বাদ্যকে হালাল বলতেছে, তারা ইসলামের খিলাফ ফাতওয়া দিতেছে। যারা হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম বলে থাকে তারা ইসলামের দুশমন; তারা কুর'আন-হাদীসকে উল্টিয়ে দিতে চায়। ইনাদের ধোকা হতে সকলকে হুঁশিয়ার থাকতে হইবে।

এ সমস্ত খিলাফি-শর'আ 'আলিম, পীর, লিখক, সম্পাদক, ওয়ায়িয এবং বক্তাগণ ইসলামের মহা সর্বনাশ করতেছে। ইনারা শয়তানী ফেরেবে পড়ে নিজেরা গোমরাহ্ হয়েছে এবং সকলকে গোমরাহ্ করতেছে। ইনারা হালাল, হারাম, জায়িয-নাজায়িয, পাক-নাপাক এবং ইসলামী 'আকায়িদ সম্বন্ধে গাফিল হয়ে দুনিয়াবী লোভের জন্য মনগড়া ফাতওয়া দিতেছে এবং সকলকে জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

ভাই মুসলিমগণ! ইনাদের ফেরেব হতে খুব সাবধান থাকবেন। রাগ-রাগিনী সুর করে গজল কিংবা কুর'আন শরীফ পড়া না-জায়িয। কুর'আন শরীফের প্রত্যেক হরফের মাখরাজ এবং এ'রাবের উচ্চারণ ভালভাবে আদায় করে তিলাওয়াত করা জায়িয এবং ছওয়াবের কাজ। আর যদি তা রাগ-রাগিনীর সাথে পড়া হয় তবে না-জায়িয হবে। এটি নিছাবুল ইহতেছাব, তরীকায়ে মুহাম্মাদী, গুনিয়াতুত-তালেবীন প্রভৃতি বহু কিতাবে আছে।

একদল ওয়ায়িয-বক্তা অছেন, যারা মসনবী প্রভৃতির গজলগুলিকে রাগ-রাগিনীর সুর করে পড়ে থাকেন, এটি না-জায়িয কাজ। ইনারা রাগ-রাগিনীর সুরসহ ওয়ায করে লোকদিগকে সুরের মোহে মত্ত করতে এবং তা দ্বারা নিজেদের প্রসার ও দাওয়াত বৃদ্ধির জন্য বিশেষ চেষ্টা করে থাকে। এ সমস্ত খিলাফ-শর'আ ওয়াযে মুসলিমদের যোগ দেয়া উচিত নয়। এ থেকে সকলে পৃথক থাকবেন। যে ওয়াযে খিলাফি-শর'আ কিছু না হয়, কুর'আন-হাদীসের বিপরীত কার্য যেখানে না হয়, সে ওয়াযের স্থানে মুসলিমগণ অবশ্য অবশ্য যোগ দিবেন। এতে দু-জাহানের খায়রিয়াত এবং তরক্কী লাভ হবে। সব সময় মনে রাখবেন যে, কুর'আন-হাদীস দ্বারা ইসলাম প্রচার

---

৩০৫. আবদুল্লাহ মামুন আলিফ আল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০
৩০৬. প্রাগুক্ত
৩০৭. প্রাগুক্ত

হয়েছে, গান-বাদ্য দ্বারা হয় নি। ইসলামের প্রত্যেক প্রকারের তরক্কী কুর'আন-হাদীসের মধ্যেই আছে। কুর'আন-হাদীস নিয়েই তরক্কী, আর কুর'আন-হাদীস ছেড়ে দিয়েই অবনতি।

গান-বাদ্য দ্বারা ইসলামের তরক্কী হয়নি এবং হতেও পারে না। গান-বাদ্য দ্বারা ইসলামের সর্বনাশ হচ্ছে। তাই বলি, প্রত্যেক মুসলিম এগুলো হতে তফাত থাকবেন। যে ওয়ায়িয রাগ-রাগিনী সুরসহ গজল ও কুর'আন শরীফ পড়েন, তার ওয়াযে কেউ শরীক হবেন না। যে বক্তা গান করেন, তার বক্তৃতা কেউ শুনতে যাবেন না। যে লিখক গান-বাদ্য জায়িয বলে লিখেন, তার লিখার প্রতি কেউ বিশ্বাস করবেন না এবং তাকে কোন প্রকার সাহায্য করবেন না। কেননা এতে না-জায়েয কাজে সাহায্য করা হবে। অনেক খিলাফি-শর'আ পীর আছে, যারা রাগ-রাগিনী, সুরসহ গজল পাঠ এবং কাওয়ালী করে থাকে, তাদের মজলিশে যাওয়া, তাদের নিকট মুরীদ হওয়া না-জায়িয। গান-বাদ্য হারাম হওয়া সত্ত্বেও সেগুলোকে যারা জায়িয বলে কুর'আন-হাদীস উল্টেয়ে দিতে চান, তারা আরও বলে থাকেন যে, ঈদ ও বিবাহের দিন গান গাওয়া ও দফ্ বাজানো জায়িয। তাদের এ ফাতওয়া শরীয়তের খিলাফ; কেননা ঈদ কিংবা বিবাহের দিন দফ্ বাজানো ও গান গাওয়া জায়িয হবার ফাতওয়া ছহীহ্ নয়-তা বাতিল। বিভিন্ন কিতাবে এর যথেষ্ঠ দলীল বিদ্যমান।[৩০৮]

হযরত নবী করীম (স.) হাদীসে ইরশাদ করেছেন যে, দাজ্জাল ও মিথ্যাবাদীগণ এসে তোমাদের নিকট এমন সব কথা বলবে, যা তোমরা শুনোনি অর্থাৎ যা শরীয়তে নেই; সে সমস্ত লোক হতে তোমরা হুঁশিয়ার থেকো এবং সকলকে হুঁশিয়ার করো, যেনো তারা তোমাদের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি করতে এবং তোমাদেরকে গোমরাহ্ করতে না পারে।[৩০৯]

সুতরাং প্রত্যেক মুসলিম, হারামকে হালাল ও হালালকে হারামকারী মৌলভী, মাওলানা, পীর, বক্তা, ওয়ায়িয, সম্পাদক , লিখক ও নেতা হতে সাবধান থেকে দীন ঈমান বাঁচাবেন। তাদের ফেরেবে পড়ে গোমরাহ্ হবেন না।

ওছীয়তনামা-০৯

আল্লাহ্‌তা'আলা কুর'আন শরীফে গান-বাজনাকে শয়তানের গলার আওয়ায বলেছেন। শয়তান তার গলার আওয়ায দ্বারা লোকদিগকে বেশি গোমরাহ্ করতে পারে। দোজখের দিকে চালাবার জন্য গান-বাজনা শয়তানের বড় অবলম্বন। হাদীসে গান-বাদ্যকে যিনার মন্ত্র বলে কথিত হয়েছে। যে সমস্ত ওয়ায়িয-বক্তা গান গেয়ে ওয়ায করেন, তারা একপক্ষে শয়তানের গলার আওয়াযের সাহায্যে লোকদিগকে দোযখের দিকে ডেকে থাকেন। ইনাদের দ্বারা গোমরাহ্ কার্যে শয়তানের খুব সাহায্য হয়, আবার শয়তানের আওয়াযের সাহায্যে ইনাদেরও প্রসার জমিয়ে পয়সা উপায়ের সুবিধা হয়। আজকাল বহু 'আলিম ও পীরের অবস্থা এরূপ হয়েছে যে, তাঁরা পয়সা এবং সম্মান প্রতিপত্তির লোভে পড়ে হালাল-হারাম, জায়িয-নাজায়িয কিছুই বিচার করেন না। তাঁদের এ নাজায়েয লালচ এবং বে-শর'আ কাজের জন্য সমাজের মহাক্ষতি হচ্ছে। হযরত নবী করীম (স.)-এর হাদীসের দিকে খেয়াল করলে স্পষ্টই জানা যায় যে, এ সমস্ত খিলাফি-শর'আ পীর, মৌলভী, মাওলানা, লিখক, বক্তা, ওয়ায়িয এবং নেতা প্রভৃতির জন্যই মুসলিম সমাজ আজ এতো তনজ্জলির মধ্যে পতিত হয়েছে।[৩১০]

'আলিম, পীর, নেতা প্রভৃতির মধ্যে যদি শরীয়তের খিলাফ চালচলন এবং নাজায়িয তরীকা না থাকতো, তবে কখনই সমাজের এ দূরাবস্থা হতো না। এর জলন্ত প্রমাণ, আগেকার যামানার মুসলিমগণ এবং তাদের যশ-গৌরব। যারা ইমাম তাদের যদি তনজ্জলি হয়, তবে সাধারণের তরক্কী হওয়া মুশকিল।

আজকাল বহু ওয়ায়িয-বক্তা আল্লাহ্-রাসূলের কালাম ও মাস'আলা-মাসায়েল এবং শরীয়ত অনুযায়ী মুসলিমগণের তরক্কী সম্বন্ধে ওয়ায-বক্তৃতা পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র কতকগুলি বাজে গল্প, উপন্যাস এবং উর্দু, ফার্সী, বাংলা প্রভৃতি ভাষায় গান গেয়ে থাকেন।

---

৩০৮. হযরত আবদুল হাই সিদ্দিকী, খলিফাতুল্লাহ (ঢাকা: ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, সন নেই), পৃ. ২৭
৩০৯. আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৩২
৩১০. আল্লামা সাইফুদ্দীন সিদ্দিকী, ফুরফুরার পীর হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (র.) ৩য় সংস্করণ (ফুরফুরা: মুজাদ্দেদীয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৩ খ্রী.), পৃ. ৪৫

আল্লাহ্-রাসূলের কালাম কুর'আন-হাদীস, যা দ্বারা ইসলামের ইশা'আত (প্রসার) হয়েছে, তার সাথে ইনাদের সম্বন্ধ নেই, বরং শয়তানের গলার আওয়ায যা দ্বারা ইসলামের মহাক্ষতি হয়, তার সাথে ইনাদের খুব সম্বন্ধ। যারা কুর'আন-হাদীস পরিত্যাগ করে শয়তানের গলার আওয়াযের সাথে সম্বন্ধ করে, তাদের ওয়ায-বক্তৃতা শ্রবণ এবং তাদের উপদেশ মতো কাজ করা ঈমানদার মুসলিমের পক্ষে কিছুতেই উচিত নয়। যদি কোনো মুসলিম ঐরূপ লোকের মজলিসে গিয়েই পড়েন, তবে তাকে শয়তানের গলার আওয়াজ ছেড়ে কুর'আন-হাদীস, মাস'আলা-মাসায়েল প্রভৃতি শরীয়ত অনুসারে ওয়ায-বক্তৃতা করতে বলবেন; যদি তা না হয় তবে তথা হতে চলে আসবেন। খুব ইয়াদ রাখবেন যে, যে মজলিসে শয়তানের গলার আওয়াজ হয়, সে মজলিসে ঈমানদার মুসলিম, যারা আল্লাহ্র আযাবকে ভয় করেন, তারাও কখনও থাকতে পারেন না। কেউ কেউ বলে থাকেন যে, রূহের খুশির জন্য আমরা গজল প্রভৃতি গেয়ে ওয়ায করি, কেননা এতে 'ইতমিনানে রূহ' আনয়ন করে এবং আল্লাহ্র দিকে রুজু হয়। যারা এরূপ বলেন, তাদের 'আকীদা খুব ভালো। কেননা গান, রাগ-রাগিনীসহ মিষ্টি সুরে গজল প্রভৃতি দ্বারা রূহের ইতমিনান হয় না এবং তাতে নফসের খুশি হয় এবং এর দ্বারা আল্লাহ্র দিকে দিল রুজু হওয়া অপেক্ষা শয়তানের দিকে দিল রুজু হওয়াই সম্ভব এবং খুব সহজ। শয়তানের গলার আওয়াযে শয়তানের দিকেই রগবত করে, আল্লাহ্র দিকে নয়। আল্লাহ্-রাসূলের কালাম কুর'আন-হাদীস দ্বারা ঈমানদারের রূহের শান্তি হয় এবং তা দ্বারাই প্রকৃতভাবে আল্লাহ্র দিকে দিল রুজু হয়। রাগ-রাগিনীসহ গান, গজল প্রভৃতি দ্বারা নফছের খুশি হয় এবং নফছের খুশির জন্য লোকে এতে মজে যায়।[৩১১]

নফছের খুশির কারণে যিনা প্রভৃতি হারাম কাজ হয়ে থাকে। তাই নবী করীম (স.) বলেছেন যে, গান-বাজনা যিনার যন্ত্র। রাগ-রাগিনীপূর্ণ গজল গাওয়া ওয়ায-বক্তৃতায় অনেক সময় এমন সমস্ত ঘটনা ঘটেছে এবং শয়তানের গলার আওয়াযে মজে গিয়ে কত রকমের কান্ড কত স্থানে হয়েছে যে, তাহা শুনলে অবাক হতে হয়।

প্রত্যেক ওয়ায়িয-বক্তার জন্য আবশ্যক যে, তাঁরা যেন রাগ-রাগিনী, গান প্রভৃতি খিলাফে-শর'আ বিষয় পরিত্যাগ করে আল্লাহ্র ওয়াস্তে কুর'আন-হাদীস, মাস'আলা-মাসায়েল আলোচনা এবং শরীয়ত অনুসারে সমাজের প্রত্যেক প্রকার উন্নতি সম্বন্ধে ওয়ায-বক্তৃতা করেন। আর প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আবশ্যক যে, তারা খিলাফি-শর'আ কোনো ওয়ায ও বক্তৃতার মজলিশে উপস্থিত না হন এবং তদনুযায়ী আমল না করেন। সাবধান মুসলিমগণ, সে সমস্ত পীর, মৌলভী, মাওলানা, ওয়ায়িয, বক্তা, লিখক, সম্পাদক, নেতা ও মোড়ল যারা শরীয়তের খিলাফ কাজ করেন এবং যারা সমাজকে তনজ্জলি ও দোযখের দিকে আকৃষ্ট করেন তাদিগকে কোনও প্রকার সহায়তা করে আল্লাহ্-রাসূলের নাফরমানী করবেন না। সবসময় আল্লাহ্কে ভয় করুন।

বাদ্য ব্যতীত লাঠি-চালনা উত্তম কাজ। এতে দীন-দুনিয়ার বহু উপকার হয়ে থাকে। হযরত নবী (স.)-এর হাদীস ও ফিক্হ হতে ছাবিত আছে যে, তীরন্দাজী ও ঘোড়ায় চড়া শিক্ষা এবং স্ত্রীর সাথে আমোদ-আহলাদ করা জায়িয। এ মাস'আলা হতে লাঠি চালনা এবং আত্মরক্ষার সময়োপযোগী ব্যবস্থা অভ্যাস করা জায়িয এবং সওয়াবের কাজ। কিন্তু এর সাথে বাদ্য রাখা জায়িয নয়। লাঠি-চালনা, ঘোড়ায় চড়া, তীরন্দাজী, তলোয়ার ভাঁজা, বন্দুকের লক্ষ্য স্থির ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা করা বিশেষ আবশ্যক; এতে স্বাস্থ্য এবং আত্মরক্ষার উপায় হয়ে থাকে। মুসলিমগণ এ সমস্ত ভাল কাজ পরিত্যাগ করে স্বাস্থ্য ও আত্মরক্ষার পথ হারাতে বসেছেন; এতে তাদের খুব ক্ষতি হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে।

অতএব, আর বিলম্ব না করে গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় লাঠি-চালনা প্রভৃতি কছরতের জামায়াত গঠন করুন এবং মাসের মধ্যে কয়েক দিন নির্দিষ্ট করে তথায় সকলে সম্পূর্ণ নেক-নিয়তে উক্ত বিষয়সমূহ শিক্ষা করুন। এতে দু-জাহানের খায়রিয়াত হাছিল হবে। কিন্তু সাবধান, এতে বাজনা বাজাবেন না। জিহাদের সময় জরূরাতান রণ-বাদ্য বাজানো হয় বলে যদি কেউ লাঠি-চালনা প্রভৃতি কছরতে বাদ্য-বাজানো জায়িয বলেন, তবে তিনি খুব ভুল বলেছেন। কেননা এর ওপর কিয়াস করা কোনও মতে ছহীহ্ হবে না। বাদ্য না হলে লাঠি-চালনা, তলোয়ার ভাঁজা প্রভৃতি করা যায় না বলে যারা দাবী করেন, তাদেরও এ দাবী খুব ভূল। প্রতিবেশী হিন্দুগণ তাদের স্বাস্থ্য এবং অত্মরক্ষার জন্য বহু স্থানে লাঠি-চালনা প্রভৃতির আখড়া স্থির করে নিয়েছে, কিন্তু তারা বাদ্য ব্যতীত সমস্তই করতেছে। তাদের ধর্মে বাদ্য-বাজনা থাকা সত্ত্বেও তারা বিনা বাদ্যে এগুলো করতে পারছে, আর দীন-ইসলামে বাদ্য-বাজনা নাজায়িয হওয়া সত্ত্বেও মুসলিমগণ বাদ্য ব্যতীত তা কেনো পারবে না? লাঠি-

৩১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

চালনা প্রভৃতি কছরত যদি স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য করা হয়, তবে তাতেও বাদ্যের প্রয়োজন নেই; কেননা বাদ্য দ্বারা স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় না। তারপর যদি তা আত্মরক্ষার জন্য হয়, তবে তাতেও বাদ্যের দরকার নেই; কেননা বাদ্য দ্বারা আত্মরক্ষা করা কখনও সম্ভব নয়। লাঠি-চালনা প্রভৃতি যদি বাদ্য ব্যতীত না করা যায়, তবে হঠাৎ আত্মরক্ষার প্রয়োজন হলে কী করা যাবে? তখন কি দুশমন ঢোল প্রভৃতি বাদ্য যোগাড় করে আনার ফুরসত দিবে?

সাবধান মুসলিমগণ! কতকগুলি গান-বাদ্য লোভী লোকের নাজায়িয কথায় গুনাহ্গার হবেন না। লাঠি-চালনা প্রভৃতি শরীয়ত সঙ্গত কছরত সমূহের তারিখ মুহাররাম কিংবা কোনো ইবাদাতের দিন স্থির করবেন না, কেননা এতে ইবাদাতের ক্ষতি হয়। ঐ সমস্ত দিন ইবাদাতে মালি ও ইবাদাতে বদনীর জন্য নির্দিষ্ট রাখা হয়েছে। দীন-দুনিয়ার প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রাসূল (স.)-এর হুকুম মেনে চলবেন।

ওছীয়তনামা-১০

আল্লাহ্ ও রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর হুকুম পরিত্যাগ করে যে কোনো কাজ করা হবে, তার শেষ ফল কখনও ভাল হতে পারে না এবং তার দ্বারা মুসলিমদিগের তরক্কী হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। প্রত্যেক মুসলিমকে সব সময় আল্লাহ্-রাসূলের হুকুম-আহ্কামের দিকে খেয়াল রেখে অগ্রসর হওয়া বিশেষ আবশ্যক, নতুবা বে-শক তনজ্জলি হবে।

স্বাস্থ্য ও আত্মরক্ষার জন্য লাঠি-চালান প্রভৃতি কস্রত শিক্ষা করা খুব ভালো। কিন্তু এতে বাদ্য বাজানো প্রভৃতি বে-শর'আ কাজ করা জায়িয নয় এবং তা দ্বারা কখনও উপকার পাওয়া যেতে পারে না। লাঠি-চালনা শিক্ষা করবার সময় এরূপভাবে কাপড় পরতে হবে যাতে 'সতর' ঢাকা থাকে। সাধারণত: একটি টুপি, নিম-আস্তিন জামা এবং হাঁটুর নিম্নে অন্তত ৬/৭ আঙ্গুলি পরিমাণ লম্বা পায়জামা পরতে হবে। হাঁটুর নীচ পর্যন্ত কাপড় পরা ফরয। এতে নামায আদায় করা যাবে এবং লাঠি-চালনা প্রভৃতি কসরত করতেও সুবিধা হবে।

এটা খুবই সুখের বিষয় যে, আজকাল নানা স্থানে 'ফৌজে ইসলাম' জামায়াত গঠন করা হচ্ছে। এ সমস্ত জামায়াত গঠন করা নেহায়াত আবশ্যক। খিলাফে-শর'আ এবং বে-আইনী কার্যের সংস্রব না রেখে গ্রামে গ্রামে এরূপ জামায়াত গঠন করবার জন্য সকলে চেষ্টা করবেন। তাদেরও পোষাক এরূপ হওয়া আবশ্যক। যাতে সতর ঢাকা থাকে এবং নামাজ পড়তে বাঁধা না হয়, এরূপ পোষাক পরিধান করতে হবে।

অ-মুসলিমদের রীতি-নীতি অনুসারে আজকাল কতকগুলি লোক মুসলিম সমাজের মধ্যে বহু খিলাফি-শর'আ প্রচলন করতে চেষ্টা করতেছেন। এর দ্বারা যথার্থই মুসলিমগনের দু-জাহানের ক্ষতি করতেছেন। অ-মুসলিমদের সে সমস্ত কাজের অনুকরণ-যা করতে ইসলামী শরীয়তে নিষেধ রয়েছে, তাকে পরিত্যাগ করতে হবে। ইসলামী রীতি-নীতি 'তওর-তরীকা' ও লেবাছ ছুরতের মধ্যে এরূপ কোনো গলদ নেই যে, তার জন্য ইসলামী ছেড়ে গায়ের ইসলামী রীতি-নীতি 'তওর-তরীকা' লেবাছ ও ছুরতের মতো কাজ করতে হবে। অতএব মুসলিগণ হুঁশিয়ার হবেন, কারও ফেরেবে পড়ে ইসলামী নিয়ম-কানুন ছেড়ে দিয়ে খিলাফি-শর'আ কাজ করে উন্নতির নামে অবনতির দিকে যাবেন না।

হাদীসের কিতাব থেকে জানা যায় যে, উম্মতের মধ্যে এমন একদল লোক বের হবে যারা মানুষদিগকে দোযখের এবং তনজ্জলির দিকে ডাকবে। এ গোমরাহকারী দল শরা'আ-শরীয়তের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করবে। ইনারা কুর'আন পড়বে, কিন্তু তার প্রকৃত অর্থ বুঝতে অথবা তার আস্বাদ গ্রহণ করতে পারবে না। চিতা বাঘের ন্যায় এদের অন্তঃকরণ হিংস্র এবং ফের'আউনের কাজের ন্যায় এদের কাজ সমূহ হবে। ইনারা সম্মান, অর্থ, প্রতিপত্তি এবং জিদের খাতিরে মনগড়া ফাতওয়া দিবে। ঐ সমস্ত কথার দিকে খেয়াল করে বর্তমান যামানার কতকগুলি মৌলভী, পীর, লিখক, ওয়ায়িয-বক্তা এবং নেতার কার্যকলাপের দিকে লক্ষ্য করলে এর স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কেননা ইনারা নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করবার জন্য হারামকে হালাল, নাজায়িযকে জায়িয বলে ফাতওয়া দিতেছে। বে-পরওয়া খিলাফি-শর'আ কাজ করে যাচ্ছে। আল্লাহ্-রাসূলের খাওফ যেনো এদের অন্তরে একেবারে নেই।[৩১২]

---

৩১২. আবু ফাতেমা মোহাম্মদ ইসহাক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

নিজেদের প্রসার-প্রতিপত্তি, অর্থ সম্পত্তি প্রভৃতির লোভে এদের কেউ কেউ পীর-সিজ্‌দা, কবর-পূজা, গান-বাজনা,কাওয়ালী, মহররমের দরগা ও তাজিয়া পোরস্তি প্রভৃতি হারাম ও শির্‌কী কাজকে জায়িয বলে ফাতওয়া দিতেছে। সুদ, জীবজন্তুর ছবি, বে-পর্দা, যিনা প্রভৃতি স্পষ্ট হারামকে হালাল করবার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করতেছে। "বন্দেমাতরম" প্রভৃতি শির্‌কী মন্ত্রকে ইবাদাত এবং জাতির উন্নতির বিষয় বলতেছে। আবার কেউ কেউ আল্লাহ্‌র কুর'আন, রাসূলের হাদীস পরিত্যাগ করে নিজেদের মত অনুসারে নতুন ধর্ম তৈরী করতে চাচ্ছে কেউ কেউ নিজেকে পয়গম্বর ও নবী বলে প্রচার করতেছে। 'আলিম ও পীরগণের বিরুদ্ধে এদের একদল ওঠে পড়ে লেগেছে নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত প্রভৃতি ইসলামী কাজকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে এরা সমাজের উন্নতি চাইতেছে। এ সমস্ত গোমরাহ্ দলের অনেকে তাদের মনগড়া ফাতওয়ার দলীল পেশ করতে গিয়ে কুর'আন, হাদীস, ফিক্‌হ, উসূল প্রভৃতির উল্টো অর্থ , ফেরেবীপূর্ণ মতলব এবং মিথ্যা রেওয়ায়েত সমূহ প্রকাশ করতেছে।

ইসলামের নিকট যা যা হারাম এবং যে সকল বিষয়কে হযরত নবী করীম (স.) হতে আরম্ভ করে সাহাবা, মুজতাহিদ, মুহাদ্দিস, পীর, ওলি প্রভৃতি সকলেই হারাম বলে ঘোষণা করেছেন, যেমন– সুদ, ঘুষ, যিনা, গান-বাজনা, জীবজন্তুর মূর্তি, ছবি-পূজা, দরগাহ পূজা ইত্যাদি হারাম ও শির্‌কী কার্যকে জায়িয বলে সকলকে গোমরাহ্ করবার এবং ইবলিছ মাল'উন ও শয়তানের দলের নিকট খাতির পাবার জন্য এদের অনেকে প্রাণপন চেষ্টা করতেছে। ইবলিছের তায়ীদকারী (সাহায্যকারী) এ সমস্ত ফেরেববাজ লোকদের সম্বন্ধে হাদীস আছে যে, মিথ্যাবাদী ও দাজ্জালগণ এসে নতুন নতুন ফাতওয়া প্রকাশ করবে, ইহাদের ফেরেব হতে তোমরা সাবধান থাকো এবং সকলকে সাবধান করো যেন তারা তোমাদিগকে গোমরাহ্ করতে এবং তোমাদের মধ্যে ফিত্‌না সৃষ্টি করতে না পারে।[৩১৩]

অতএব মুসলিমগণ খুব হুঁশিয়ারীর সহিত দীন ঈমান বজায় রাখবেন। যেনো কোনো মৌলভী, পীর বা নেতা প্রভৃতি নামধারী গোমরাহ্ লোকের ফেরেবে পড়ে এবং তাদের প্রচারিত মিথ্যা ফাতওয়া শুনে আখিরাতে জাহান্নাম ও দুনিয়ায় তনজ্জলির পথ পরিষ্কার করবেন না। আল্লাহ্‌কে ভয় করুন এবং যারা আল্লাহ্-ভীরু (মুত্তাকী) 'আলিম, পীর, নেতা, সে সমস্ত লোকের ইত্তেবা করুন। মিথ্যাবাদী, ফেরেববাজ এবং যারা মুত্তাকী-পরহেজগার নয়, তাদের ইত্তেবা করে দু-জাহানের ক্ষতি করবেন না।

আজকাল একদল 'আলিম ও পীর নামধারী লোক বের হয়েছে, এরা কুর'আন, হাদীস, তাফসীর, ফিক্‌হ, উসূল, 'আকায়িদ ইত্যাদি বিষয়ে আদৌ ভালোরূপে অবগত নয়। দু'একখানা অন্য কিতাব হতে ওয়ায করবার কয়েকটি কথা শিখে নিয়ে গলাবাজির জোরে এবং রাগ-রাগিনী সুরে মুছনবী গেয়ে সাধারণের নিকট খুব নাম করে নেয় এবং নিজেদেরকে বড় মাওলানা, বড়পীর, বড়বক্তা বলে প্রচার করছে। ইনারা ওয়ায বক্তৃতা করতে গিয়ে নিজেদের বে-কুফী অথবা পয়সার লোভে যা' তা ফাতওয়া দেয়, হালাল-হারাম, শর'আ-শরীয়ত ইত্যাদি বিষয়ের দিকে আদৌ খেয়াল রাখে না।[৩১৪] এ দলের কেউ কেউ দু'পাঁচটা বাঁধা গদ বলতে শিখে নিজদিগকে মস্তবড় বক্তা ও নেতা বলে ঘোষণা করতেছে। নানাবিধ না-জায়িয ও হারাম কার্য এবং সমাজের যাতে সর্বনাশ হয় তার ব্যবস্থা করে কেবলমাত্র নিজেদের নাপাক স্বার্থ হাছিল করছে।

সাবধান মুসলিমগণ! এ সমস্ত ভংঙ্কর আখলাকের লোক হতে খুব হুঁশিয়ার থাকবেন। এদের সভা-সমিতিতে উপস্থিত হয়ে এবং এদের ঐ সমস্ত খিলাফি-শর'আ ওয়ায-নছিহত শুনে সমাজের সর্বনাশ করবেন না। যদি ঐ রূপ লোকের বক্তৃতার মজলিসে গিয়ে পড়েন, তবে তখনই তথা হতে চলে আসবেন। যারা যথার্থ 'আলিম, কামিল, পীর এবং শরীয়ত অনুযায়ী ওয়ায়িয-বক্তা, তাদের শর'আ-সঙ্গত ওয়ায-নছিহত শুনবেন এবং তদনুযায়ী 'আমল করে দু-জাহানের খায়রিয়াত হাছিল করবেন।[৩১৫]

ওছীয়তনামা-১১

---

৩১৩. মুজাদ্দিদে আলফ সানী, *মাকতুবাত শরীফ*, অনুবাদ: শাহ মোহাম্মদ মুতী আহমদ আফতাবী (ঢাকা: আফতাবিয়া খানকাহ শরীফ, ১৪০৬ বাং.); পৃ. ৩৯

৩১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

৩১৫. শরিয়তে ইসলাম, বর্ষ-৫ম, সংখ্যা-১০ম, পৃ. ৩২৭-৩২৯

আল্লাহ্‌তা'আলা কুর'আন শরীফে হুকুম করেছেন :

تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان -

"অর্থাৎ সৎকর্ম ও তাক্‌ওয়ায় তোমরা পরস্পর সহযোগিতা করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সহযোগিতা করবে না।"[৩১৬]

বদ্‌কারদের সাথে মিশতে এবং তাদের অসৎ কাজে সাহায্য করতে আল্লাহ্‌ ও রাসূল (স.) বহু স্থানে কঠোর নিষেধ করেছেন। যারা বদ্‌কারদের সাথে মুহাব্বাত রাখে কিংবা বদ্‌কাজের প্রতি রাজি থাকে, তারা বদ্‌কারদিগের দলভুক্ত হবে এবং তাদের সাথে হাশর হবে, এটা কুর'আন-হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। অতএব মুসলিমগণ খুব হুঁশিয়ার থাকবেন, যেন নিজেদের কথা, কাজ কিংবা কোন কিছু দ্বারা কোনো প্রকার গুনাহের কাজ এবং কোনো বদ্‌কারকে সাহায্য করা না হয়। শরীয়তের খিলাফ যাদের চাল-চলন এবং যারা খিলাফি-শর'আ কাজের প্রচারক, তাদের ফেরেব হতে সাবধান থেকে দীন-ঈমান বাঁচিয়ে রাখবেন।

আল্লাহ্‌তা'আলা বলেছেন :

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون -

"অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে এমন এক দল হোক যারা কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং সৎকর্মের নির্দেশ দিবে ও অসৎকর্মে নিষেধ করবে।"[৩১৭]

নেক কাজ করতে উপদেশ দেয়া এবং অন্যায় কাজ করতে নিষেধ করা আল্লাহ্‌-রাসূলের হুকুম। এটি সাধারণত দুই প্রকারে করা যেতে পারে; যথা লিখে ও মুখে বলে।

লিখে অর্থাৎ বই, কিতাব, কাগজ প্রভৃতির এবং মুখে বলে অর্থাৎ ওয়াজ-নছিহত, বক্তৃতা প্রভৃতির দ্বারা এটা করা যায়। কিন্তু এ প্রত্যেকটাতেই আল্লাহ্‌ ও রাসূলের হুকুম-আহ্‌কাম বজায় রাখতে হবে। আল্লাহ্‌-রাসূলের আদেশ-নিষেধ পরিত্যাগ করে যদি ঐ সমস্ত করা হয়, তবে তা গোমরাহীর পথ হবে এবং তা দ্বারা দোযখের পথে যাওয়া হবে মাত্র। আল্লাহ্‌ ও রাসূলের আদেশ-নিষেধ পরিত্যাগ করে যে বই, কিতাব, কাগজ প্রভৃতি লিখা হয়, তা দ্বারা হিদায়াতের কাজ আদৌ হয় না, বরং তা গোমরাহীমূলক। তদ্রূপ আল্লাহ্‌ ও রাসূলের অদেশ-নিষেধ পরিত্যাগ করে ওয়ায-নছিহত বক্তৃতা দ্বারা কোনো প্রকার তরক্কী হতে পারে না। বরং তা দ্বারা দুনিয়া-আখিরাতের ঘোর তনজ্জলি হয়ে থাকে। অতএব, প্রত্যেক লিখক ও বক্তাকে শরীয়তের সম্পূর্ণ পা-বন্দ হয়ে কলম চালাতে ও কথা বলতে হবে। আর প্রত্যেক মুসলিমকে সব সময়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক যে, যেনো তারা কোনও খিলাফি-শর'আ বই, কিতাব, কাগজ এবং খিলাফি-শর'আ ওয়াজ-বক্তৃতার প্রতি মহাব্বাত না রাখেন। কেননা এতে অন্যায় কাজের সাহায্য হবে এবং তা কঠিন গুনাহের কাজ।[৩১৮]

দুঃখের বিষয়, বর্তমান সময়ে একদল লিখক ও ওয়ায়িয-বক্তা বের হয়েছেন যাঁরা শরীয়তের খিলাফ বিষয়ের প্রচার করতে এবং সুন্নতের আদর্শ নষ্ট করতে প্রাণপন চেষ্টা করতেছেন। প্রত্যেক মুসলিমকে এ সমস্ত লোক হতে খুব হুঁশিয়ারীর সাথে থাকতে এবং এদের 'ওয়াছওয়াছা' ও ফেরেব হতে দীন-ঈমান রক্ষা করতে হবে। নতুবা দু-জাহানের ভয়ঙ্কর নুকছান (ক্ষতি) হবে। যাতে এ সমস্ত খিলাফে-শর'আ লোক, সম্পাদক, ওয়ায়িয, বক্তা, পীর ও নেতাগণ সমাজকে গোমরাহীর দিকে নিতে না পারে এবং যাতে তাদের বাতিল মত ও শরীয়তের বিপরীত ফাতওয়া সমাজে প্রচার হতে না পারে, তার জন্য প্রত্যেক মুসলিমকে বিশেষ চেষ্টা করা আবশ্যক।[৩১৯]

মুসলিম সমাজকে বরবাদ করবার জন্য ইবলিছ শয়তানের কু-পরামর্শে এমন বহু লোক বের হয়েছে, যারা কুর'আন, হাদীস, ফিক্‌হ, 'আকায়েদ প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করে ইসলাম ও মুসলিমদের গুরুতর ক্ষতি করছে। এ সমস্ত গোমরাহ্‌ লোকদের ফেরেব হতে যাতে সমাজ রক্ষা পায় তার চেষ্টা করা মুসলিম মাত্রই আবশ্যক। সমাজক্ষেত্রের এ সমস্ত আগাছা দূর হয়ে যাতে ক্ষেত্র পরিষ্কার হয় এবং মুসলিমগণের দীন-দুনিয়ার প্রকৃত তরক্কী হয়, তার জন্য 'ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া' আলিমদিগকে বিশেষ যত্ন করা এবং সর্বসাধারণ মুসলিমকে এ নেক

---

৩১৬. আল কুর'আন, ০৫: ০২

৩১৭. আল কুর'আন, ০৩: ১০৪

৩১৮. ইয়াকুব ও খুরশিদ আনোয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

৩১৯. প্রাগুক্ত

আঞ্জামে পূর্ণ তা'য়ীদ করা অবশ্য কর্তব্য। কোনো বই, কিতাব অথবা কাগজ কিংবা কোন ওয়ায-বক্তৃতা যদি এ নেক কাজের জন্য না হয়ে শরীয়তের বিপরীত অর্থাৎ ইবলিছ শয়তানের গোমরাহী কাজের সাহায্যের জন্য হয়, তবে তা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ এবং বরবাদ করে দেয়া আবশ্যক।

যাতে মুসলিমগণের দীন-দুনিয়ার যথার্থ তরক্কী হয় এবং খিলাফি-শর'আ কার্য হতে সকলে উদ্ধার পায় তার জন্য সমাজের সর্বত্র ইসলামী আঞ্জুমান গঠন করা নেহায়াত জরুরী। শরীয়ত সঙ্গত জামায়াত অর্থাৎ আঞ্জুমান গঠন করা ছওয়াবের কাজ এবং এর দ্বারা দু-জাহানের অশেষ উন্নতি লাভ হয়ে থাকে। প্রত্যেক পীর, ওয়ায়িয, বক্তা, 'আলিম, সম্পাদক, লিখক এবং নেতাদিগকে স্ব স্ব সাধ্যানুযায়ী মুসলিমগণের জামায়াত গঠন এবং শরীয়তের নির্দেশ অনুসারে আঞ্জুমানের কার্য পরিচালনা করবার চেষ্টা করা প্রয়োজন।

ভাই মুসলিমগণ! কোনো প্রকার অসৎ কাজে বিন্দুমাত্র সাহায্য করবেন না। প্রত্যেক প্রকার নেক কাজে যথাসাধ্য সাহায্য করবেন এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (স.)-এর হুকুম মেনে চলবেন।[৩২০]

'আল্লামা রুহুল আমীন (র.)-এর লিখিত জীবনীতে সংকলিত ৫৭ টি পয়েন্ট সম্বলিত একটি ঐতিহাসিক ওছীয়তনামা লিখা রয়েছে[৩২১] যা নিম্নরূপ ঃ-

আস্ সালামু 'আলাইকুম!
বাদ আমার অনুরোধ ও উপদেশ এ যে, আমার খলীফা ও কুল ইমানদার মুসলিম ভাইদের নিকট নিম্নলিখিত মনোভাব প্রকাশ করলাম। সকলে যাথাসাধ্য 'আমল করবেন। হায়াত কারও স্থায়ী নয়। "কুল্লু নাফছিন জা'ইকাতুল মাউত।"[৩২২]

আমি বৃদ্ধ অবস্থায় পরিণত হয়েছি, কোন্ সময় এ দুনিয়া ছেড়ে যেতে হয় তার নিশ্চয়তা নেই। আমার ভয় হয়, আমার খলীফা ও মুরীদগণ শরীয়ত অনুযায়ী আমার মতের কোনো বিরুদ্ধ মত 'আমল করে গোমরাহ্ হয়ে পড়ে নাকি। বিভিন্ন স্থানে দেখা যায় যে, শরীয়ত অনুযায়ী আমলকারী পীরের খলীফা ও মুরীদ, পীরের মতের বিরুদ্ধাচারণ করে এক এক জন এক এক দল তৈরী করে সাধারণ মুসলিম ভাইদেরকে গোমরাহ্ করছে। যা হোক আমার ওছীয়তনামাখানি 'আমল করলে আমি বিশেষ খুশি হবো। যেহেতু হাদীস 'আদ্দাললু 'আলাল খাইরি কাফা'ইলিহী' অর্থাৎ যিনি নেক কাজের পথ দেখিয়ে দেন, তিনি ঐ নেককারের সমান ছাওয়াব লাভ করবেন।[৩২৩] তাই অনুরোধ, আমি যেনো মৃত্যুর পরও কিছু নেকী পেতে পারি।

১. বর্তমান সময়ে ঈমান বাঁচিয়ে রাখা খুব সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়েছে। আশরাফুল মাখলুকাত খাতামুন্নাবিইয়ীন হযরত মুহাম্মদ (স.) শেষ নবী ও তাঁর পরে আর কোনো নবী বা রাসূল আসবেন না। এ কথার ওপর পূর্ণ ঈমান কায়েম রাখবেন।

কালিমায়ে তাইয়েবা :

لا اله الا الله محمد رسول الله -

"অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই, হযরত মুহাম্মাদ (স.) আল্লাহর রাসূল।"

কালিমায়ে শাহাদাত :

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله -

"অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তিনি অদ্বিতীয় তারঁ কোনো অংশীদার নেই, আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (স.) তাঁর বান্দা ও রাসূল।" এর ওপর ঈমান কায়িম রাখবেন এবং এর

৩২০. শরিয়তে ইসলাম, বর্ষ- ৫ম, সংখ্যা-১২শ, পৃ. ২৬৫-২৬৬
৩২১. আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০
৩২২. আল কুর'আন, ০৩: ১৮৫
৩২৩. আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২

বিপরীত কোনো কিছুর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করবেন না। যদি কেউ উক্ত কালিমাসমূহ পরিবর্তন করে, সে বেঈমান ও কাফির হয়ে যাবে।

২. জীবিত কি মৃত পীরের সূরত হাযির-নাযির জেনে ধ্যান করা হারাম, যারা করে তারা বে-ঈমান।

৩. পুত্র-কন্যাদেরকে দীনি 'ইল্‌ম শিক্ষা দিবেন, তৎ সাথে সাথে দুনিয়ার যাবতীয় বৈধ হুনুর-হিকমত (শিল্প) ও ভাষা- ইংরেজী, বাংলা ইত্যাদি শিক্ষা দিবেন এবং যাতে সর্বসাধারণ লোকেরা শিক্ষিত হতে পারে তজ্জন্য ইসলামিক কলেজ, ইসলামিয়া মাদ্রাসা, জুনিয়র ও সিনিয়র মাদ্রাসা, মক্তব ইত্যাদি ও মধ্যে মধ্যে দু'একটি হাদীস-তাফসীরের দাওরা খুলে হাদীস, তাফসীর পড়ার সুব্যবস্থা করে দিবেন।

৪. স্ত্রী, কন্যা, মা, ভগ্নীদিগকে পর্দায় রাখবেন। কন্যাদিগকে শিক্ষাদানকালেও পর্দায় রেখে মহিলা শিক্ষয়িত্রী বা মুহরেম ব্যক্তি দ্বারা শিক্ষা দিবেন। যারা স্ত্রী, কন্যা, মা ও ভগ্নীদিগকে বে-পর্দায় রাখবেন, তাঁরা দাইয়ুছ হয়ে জাহান্নামে যাবেন। পর্দা করা ফরযে 'আইন। এর প্রতি যারা ঘৃণা করবে, তারা বে-ঈমান। এ সমস্ত ঘৃণ্য ব্যক্তিদেরকে তোমরা উপেক্ষা করে চলবে।

৫. আমার মতে যাবতীয় চাকুরির উপযুক্ত বিদ্যা শিক্ষা করায় বাঁধা নেই। যে চাকুরি শরীয়ত অনুযায়ী জায়িয, তা করবে, কিন্তু হালাল উপার্জন ও সুন্নাহ্ মুতাবিক পোষাক ইত্যাদি ও রোজা-নামাজ-ঈমান ঠিক রেখে করবে।

৬. সুদ খাওয়া হারাম, কম হোক কি বেশি হোক, বিশেষ ওজর ব্যতিত সুদ দেয়াও হারাম। সুদ দেয়া ও সুদ খাওয়া একই প্রকার গুনাহ। সুদে টাকা এনে কারবার করতে নেই। সুদখোরের দাওয়াত খাওয়া, তার দান-খয়রাত গ্রহণ করা হারাম। যে সুদের মাল খাবে, তার কলব (অন্তর) অন্ধকার হয়ে যাবে।

সুদখোর তাওবা করলেও তার বাড়িতে বৎসরকাল খাওয়া-দাওয়া করতে নেই। যদি কোনো সুদখোর তাওবা করে সুদের সমস্ত মাল ফেরৎ দেয়, তবে তার বাড়িতে তৎক্ষণাত খাওয়া যেতে পারে। আর তাওবা করে সুদ ফেরৎ না দিলে তাকে বৎসরকাল পর্যন্ত দেখতে হবে, সে সুদ থেকে পরহেজ করে কি না। যদি সুদ আর না খায় ও তার মাল অর্ধেকের বেশি হালাল হয়ে থাকে, এক্ষেত্রে যদি দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, হালাল মাল দ্বারা খাওয়াবে, তবে তার দাওয়াতে খাওয়া জায়িয হবে, অন্যথায় নয়।

সুদখোরের পৌনে ষোল আনা হালাল মাল থাকলেও তওবা করে ইস্তেকামাত না করা পর্যন্ত তার বাড়িতে দাওয়াত খাওয়া জায়িয নহে, যেহেতু সেও ফাসিকে মু'লেন (প্রকাশ্য ফাসিক)। সুদখোরকে তাওবা করানো মাত্রই তার বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করলে, দান-সদ্‌কা গ্রহণ করলে, হিদায়াত হওয়া তো দূরের কথা, বরং সুদখোর আরও সুদখোর হবে। অতএব, যদি কেউ সুদ খায়, সুদখোরের দাওয়াতে খায় ও তার দান-সদ্‌কা গ্রহণ করে, সে যেনো আমার মুরীদ বা খলীফা বলে পরিচয় না দেয়। তার নিকট কেউ মুরীদও হবেন না।

৭. মেয়ের সাচকের (পণের) টাকা খাবেন না। যে ব্যক্তি খাবে ও তদ্দারা যিয়াফত করবে, তা হারাম। এ যিয়াফত যারা খাবে, তাদের হারাম খাওয়ার গুনাহ হবে। আমার খলীফাদের মধ্যে যদি কেউ সুদখোরের বাড়ি কিংবা মেয়ের পণের (সাচকের) টাকা দ্বারা যিয়াফতকারী ও গ্রহণকারীর বাড়িতে খাবে, তার নিকট কেহ মুরীদ হবেন না। এরূপ ব্যক্তি আমার খলীফা হউক অথবা অন্যান্য পীরের খলীফা হউক, তাদের নিকট মুরীদ হবেন না।

৮. ভাই, ভগ্নী ও অংশীদারগণের অংশ ফারায়েয অনুযায়ী বণ্টন করে দিবে। যদি তাদেরকে দেয়া অসম্ভব হয়, তবে এর মূল্য দিয়ে হোক বা যে কোনো প্রকারে হোক সন্তুষ্ট করে দাবী ছাড়িয়ে নিবে। নচেৎ আল্লাহ্‌র নিকট দায়ী থাকবে। টাকার হোক, কথার হোক, দাবীদারের নিকট মাফ চেয়ে নিবে। যদি দাবীদার মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়ে থাকে, তবে যাবতীয় পাওনা তার ওয়ারিশগণকে প্রদান করবে।

কথা ইত্যাদির মাফের জন্য নামাজ পড়ে সে মৃতের রূহের ওপর ছাওয়াব রেছানী করবে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাবে। প্রথম বিবাহ ও দ্বিতীয় বিবাহের পুত্র কন্যাদের অংশের মধ্যে ফারায়েয অপেক্ষা কম-বেশি করে দিলে মহান আল্লাহ্‌র নিকট দায়ী থাকবে।

৯. আমার খলীফা ও মুরীদদের মধ্যে যদি কেউ কুর'আন, হাদীস ও ফিক্‌হসমূহের বিপরীত অর্থাৎ শরীয়তের বিপরীত কোনো মত প্রাকাশ করে, তবে কেউ মানবেন না। যদি কেউ আমার খলীফা বা মুরীদ দাবী করে আমার ওছীয়তের বিপরীত চলে, তবে কেউ তাকে আমার মুরীদ বা খলীফা মনে করবেন না ও তার নিকট মুরীদ হবেন না।

১০. হিন্দুদের পূজা-পার্বনে, মেলা-তিহারে ও গান-বাজনার স্থানে সাহায্য করবেন না ও এতে যাবেন না। পূজায় পাঠা, কলা, ইক্ষু, দুধ ইত্যাদি বিক্রয় করবেন না। ভ্যাট দিবেন না, দিলে গুনাহে কবীরাহ্‌ হবে।

১১. কেউ প্রকাশ্য ফাসিকের দাওয়াত কবুল করবেন না এবং তাকেও দাওয়াত করে খাওয়াবেন না। যথা- বেনামাজী, কেননা প্রত্যহ বিত্‌রের নামজে পড়া হয় "নাতরুকু মাই ইয়াফজুরুকা" অর্থাৎ আমরা ফাসিক-ফাজিরের সাথে চলবো না।

১২. কেউ দাড়ি মুন্ডন করবেন না, এক মুষ্টির কম হয় এমন খাট করবেন না, লম্বা মোছ রাখবেন না। ফ্রান্স কাট, টেরি বা ঢাকাইয়া ছাট ছাটবেন না। কাছা দিয়ে কাপড় পরিধান করবেন না। কোট, প্যান্ট, ন্যাকটাই ইত্যাদি বিজাতীয় পোষাক ব্যবহার করবেন না। সুন্নাহ্‌ মুতাবেক পোষাক পরিধান করবেন ও খালি মাথায় চলবেন না। টুপি, পাগড়ী, লুঙ্গী, পায়জামা ও লম্বা পানজাবী ব্যবহার করবেন। আচকান চোগা ইত্যাদি মুবাহ ব্যবহার করাও জায়িয।

বড়ই পরিতাপের বিষয়, নাছারা, হিন্দু ও অন্যান্য গায়ের কাওম তাদের জাতীয় পোষাক-পরিচ্ছদ ত্যাগ করে না। আর আমাদের কাওমের কতক লোক বর্তমানে যাত্রার সংসাজতে লজ্জাবোধ করে না। কখনও দাড়ি মুন্ডন করে, হ্যাট পরে খালি মাথায় কাছা দিয়ে রাস্তায় বেড়ায়, কখনও টুপি মাথায় দিয়ে লুঙ্গি পরে থাকে। আমি দু'আ করি, আল্লাহ্‌ আমার মুসলিম ভাইদের ঈমান কায়িম রাখুন ও শরীয়তের খিলাফ পোষাক পরিধান করা থেকে রক্ষা করুন।

১৩. তাস, পাসা, ফুটবল, ব্যাটবল ইত্যাদি, ঘোড়াদৌড়, মহিষ ও গরুর লড়াই বা কোনো প্রাণীর লড়াই খেলার নিয়তে দিবে না। যদি কোথায়ও ঐরূপ লড়াই হয় তথায় যাবে না, এগুলো হারাম।

আত্মরক্ষার জন্য ঘোড়াদৌড়, লাঠিখেলা শিক্ষা, তলোয়ার ভাজা, তীরন্দাজী শিক্ষা মাসের মধ্যে ২/৩ দিন তা'লিমের জন্য করা জায়িয হবে, কিন্তু হাটুর নীচে পর্যন্ত পায়জামা পরবে, নামাজের ওয়াক্তে নামাজ পড়বে। ঐগুলো শিক্ষাকালে বাজি ও বাজনা না রেখে শিক্ষা করা জায়িয আছে, তবে দু'ঈদ, শবে-বরাত, মুহাররম ইত্যাদিতে যেনো না করে। করলে ইবাদাতের ক্ষতি হবে।

১৪. বিবাহে বারুদ পোড়ান, লাঠিখেলা, কলের গান, সুর দিয়ে পুথি পড়া ইত্যাদি কার্য করবে না। ফজুলভাবে অর্থ ব্যয় করবে না, এটা হারাম।

১৫. যথা শক্তি ব্যবসা-বাণিজ্য কৃষি-শিল্প ইত্যাদি অবলম্বন করে হালাল উপার্জন করবে। খয়রাত গ্রহণ করার ওপর নির্ভর করবে না। শক্তি থাকা সত্ত্বেও অন্যের নিকট খয়রাত চেয়ে নেয়া হারাম। 'আলিমের 'ইলম, পীরের পীরত্ব যেন খয়রাত পাওয়ার উদ্দেশ্যে না হয়। 'আলিম ও পীরগণ আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ওয়ায-নছিহত করবেন। কারো নিকট ইশারা বা ইঙ্গিত অথবা অন্যের সাহায্যে খয়রাত আদায় করবে না, এগুলোও হারাম। যদি কেউ ইচ্ছে করে দেয়, তবে তা গ্রহণ করা জায়িয।

১৬. 'আলিমগণের নিকট আমার বিনীত আরজ এই যে, আপনাদের মধ্যে যদি কোনো মাস'আলা নিয়ে ইখতেলাফ বা মতভেদ হয়, তবে একত্রে বসে কিতাবসমূহ নিয়ে মতভেদ মীমাংসা করে সর্বসাধারণের নিকট ছহীহ মতটি প্রকাশ করবেন। যাবত পর্যন্ত ঐরূপ 'আলিম সাহেবগণের মধ্যে একতা না হবে, তাবত পর্যন্ত 'আলিম সমাজে দলাদলি থাকলে অচিরে সমাজ বিনষ্ট হবার আশঙ্কা আছে।

১৭. যদি কোনো 'আলিমের মত কোনরূপ কিতাবের খিলাফ বিজ্ঞাপনে বা বাজে লোকের মুখে দেখতে ও শুনতে পান, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত নিজে তার লিখিত মত বলে কিংবা তার মৌখিক কথা বলে নিশ্চিতরূপে জানতে না পারেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তার ওপর কোনো প্রকার ইস্তেহার ও ফাতওয়া প্রকাশ করবেন না। অনেক স্থানে অনেকে বাজে লোকের কথায় বিশ্বাস করে বহু সংখ্যক ঈমানদার মুসলিমদের ঈমান বিনষ্ট করে মস্তবড় গুনাহগার হয়েছে ও হচ্ছে। 'আলিম ও পীর সাহেবগণ এ বিষয়ে সাবধান থাকবেন। মনে রাখবেন, শয়তান জীবিত আছে। সে পীরে পীরে 'আলিমে 'আলিমে বিবাদ ও দলাদলি লাগিয়ে দিয়ে ইসলামকে বিনষ্ট করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকে। আল্লাহ্ পানা দেন।

১৮. কেউ গান-বাজনা করবেন না ও শুনবেন না। আল্লাহ্-রাসূলের তা'রীফে কবিতা, গজল পড়তে পারেন। কিন্তু 'ইলমে 'আরুজির ওযনে পড়বেন, 'ইলমে মুছিকির ওযনে অর্থাৎ রাগ-রাগিনীর সাথে পড়া হারাম। 'ইলমে 'আরুজির সাথে পড়তে হলেও ৫টি শর্ত পালন করতে হবে। তম্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে-উক্ত মজলিসে মেয়েলোক না থাকা চাই।

১৯. বর্তমানে যে বাজে লোক মসনবী শরীফ 'ইলমে মুছিকির অর্থাৎ রাগ-রাগিনীর সাথে পড়ে থাকে, এটা জায়িয নেই, তথায় যাবেন না। যদি কেউ তথায় গিয়ে থাকেন, তবে উঠে আসবেন। মসনবী শরীফ 'ইলমে 'আরুজির সাথে অর্থাৎ বিনা রাগ-রাগিনীতে মিষ্টি স্বরে পড়তে বাঁধা নেই।

২০. মাথায় এরূপ লম্বা চুল রাখবে না যে তা মেয়েলেকের ন্যায় হয়। বাবরী সুন্নাহ্ মুতাবিক রাখতে পারে। বাজে নাদান ফকীরেরা যে লম্বা চুল রাখে, এটা হারাম। বাবরী রাখতে হলে স্কন্ধ পর্যন্ত চুল কেটে খাট করে রাখবে, যাতে মহাড়ার নিচে না পড়ে। মহাড়ার নিচে চুল লম্বা হলে স্ত্রীলোকের ন্যায় হয়। ওটা হারাম। ওর ওপর আল্লাহ্তা'আলার লা'নত পতিত হবে।

২১. সওয়াব রেছানি করে কেউ সওয়াল করে কিছু গ্রহণ করবেন না, এটা হারাম। যদি কেউ আল্লাহ্র ওয়াস্তে মৃতের খতম পড়ে, আর পড়ানেওয়ালা লিল্লাহ্ কিছু দেয়, এক্ষেত্রে নেয়া-দেয়া জায়েয। বর্তমান যামানায় কুর'আন শরীফ ও হাদীস শরীফ শিক্ষা দিয়ে, আজান দিয়ে ও ইমামতি করে, ঝাঁড়-ফুক দিয়ে মুজুরী নেয়া জায়িয।

২২. ওয়াজ-নছিহত আল্লাহ্র ওয়াস্তে করবে। কিছু লিল্লাহ্ দিলে তা নেয়া জায়িয। বাজে স্থানের লোকেরা ভালোমন্দ সুদখোর ইত্যাদির চাঁদা জমা করে ওয়াযকারীগণকে দেয়, তা না জায়িয। তবে হালাল মাল থেকে দিলে তা নেয়াতে কোনো দোষ নেই।

২৩. যে যেই স্থানে থাকেন, জামায়াতে নামাজ পড়বেন। মক্কা-মদীনা ব্যতীত সকল স্থানে আখিরে যোহরের নামাজ পড়বেন। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তিন জুম'আ তরক করবে, সে ব্যক্তি মাল'উন।

২৪. অনেক স্থানে দেখা যায়, পীরের ছেলে কিছু জানুক বা নাজানুক পীর সেজে বসে মুরীদ করতে থাকে। অন্য কোনো ভালো পীরের নিকট সাধারণকে যেতে নিষেধ করে। আমার ভয় হয়, আমার মৃত্যুর পর আমার পুত্রদের মধ্যে এরূপ হয়ে পড়ে নাকি। অতএব, আমার পুত্রদের মধ্যে যারা ইসলামী শরীয়ত মুতাবিক আমল করবে ও চলবে এবং তা'লীম ও শিক্ষা দিবে, তাদের অনুসরণ করবেন।

২৫. আমার বাড়িতে বৎসরের ২১, ২২ ও ২৩ ফাল্গুন তারিখ নির্ধারণ করে একটি ওয়াযের মজলিস করি। ঐ তারিখে আমার পীর কিংবা দাদা পীরের মৃত্যু হয়নি। আমি জানি আল্লাহ্ বলেছেন :

يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا -

"অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে রক্ষা করো দোজখ হতে।"[৩২৪] এ আয়াতের মর্ম অবলম্বনে, আমার বাড়িতে দেশী-বিদেশী সকলকে 'আম দাওয়াত দিয়ে বহু 'আলিম-'উলামা,

৩২৪. আল কুর'আন, ৬৬: ০৬

Dhaka University Institutional Repository

হাফিজ , কারী কর্তৃক ওয়ায-নছিহত করিয়ে ও নিজে করে শরীয়তের হুকুম-আহ্কাম জানিয়ে দেই। যদি কোনো দেশে কোনো মাস'আলা নিয়ে মতভেদ থাকে, তবে এ মাহফিল থেকে তার মীমাংসা করে নিন।

এ মাহফিলে প্রায় প্রত্যহ ২৫/৩০ হাজার লোক সমাগম হয়ে থাকে। ঐ তিন দিনের এক দিন ৬০-৭০ খতম কুর'আন শরীফ, সূরা ইখলাস, ফাতিহা, কালিমা ইত্যাদি পড়ানো হয়। এ সমস্তের সওয়াব হযরত নবী (স.)-এর ও যাবতীয় ওলি-অউলিয়া, গাওছ, কুতুব ও যাবতীয় মুসলিমগণের রূহের ওপর সওয়াব রেছানী করা হয়। এ জন্য এ মাহফিলের এক নাম ইসালে সওয়াব। যদি কেউ এ মাহফিলকে (প্রচলিত) ওরছ বা অন্য কিছু বলে, তবে তা কেউ শুনবেন না।

এ মাহফিল যাতে আল্লাহ্ কয়েম রাখেন, তার চেষ্টা আমার পুত্রগণ, খলীফাগণ ও মুরীদগণ করবেন। খলীফাগণের মধ্যে যদি কারো বাড়িতে এরূপ মাহফিল করতে সামর্থ হয়, তবে তিনি তা করবেন। সাবধান! কেউ যেনো অর্থের লোভ বা অন্য কোনোরূপ মান-মর্যাদার জন্য না করেন। বিশুদ্ধ হিদায়াতের নিয়তে করলে বহু নেকী পাবেন। আরও সাবধান থাকবেন যে, যেনো এ মাহফিলে কোনো প্রকার বিদ'আত ও হারাম কার্য বা নামাজের জামায়াত তরক না হয়। বাজে তামাশা ইত্যাদি না হয়। যদি কেউ তা করে, তবে আমি তার প্রতি দাবী রাখবো।

২৬. বাজে পীরের দরবারে অমাবশ্যা পূর্ণিমা বা পীরের মুত্যুর তারিখ নির্দিষ্ট করে 'ওরছ' ইত্যাদি হয়ে থাকে। এমন কি জামায়াতে নামাজ পড়া হয় না, তথায় মেয়েলোক যায়, তারা হালকা করে ও বেপর্দা চলে, এগুলো হারাম। ঐরূপ মজলিসে কেউ যাবেন না, যেরূপ সুরেশ্বর, মাইজভান্ডার ইত্যাদি স্থানে আছে। ঐভাবে ওরছ করা বিদ'আত ও হারাম।

২৭. এমন জলি যিক্র করবেন না যাতে নিদ্রিত ব্যক্তির নিদ্রা ভঙ্গ হয়, কুর'আন শরীফ ও নামাজ পড়ায় বিঘ্ন ঘটে।

২৮. 'জোয়াল্লীন' ও 'দোয়াল্লীন' নিয়ে যে স্থানে মতভেদ আছে, তৎসম্বন্ধে আমার মত এই যে, মক্কা ও মদীনা শরীফের মুহাক্কেক 'আলিমগণ যেরূপ দোয়াল্লীন পড়ে, আমিও তদ্রুপ পড়ি। দালকে জাল দ্বারা পড়লে নামাজে ফতুরি আসবে, কিন্তু যে ব্যক্তির চেষ্টা করা সত্ত্বেও মাখরাজ আদায় হয় না, তার জন্য মাফ।

২৯. কেউ জমি কট রাখবেন না, জায়সুদী ইত্যাদি দ্বারা কেউ সুদ খাবেন না ও কারো প্রতি যুল্ম করবেন না।

৩০. নিজের হাতে নাড়ি কাটাতে শরীয়তে কোনো বাঁধা নেই। এটি হযরত আদম (আ.)-এর সুন্নাহ্। এ নাড়ি কাটাতে তুচ্ছ-তাচ্ছিল করলে হযরত আদম (আ.)-কে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হবে। এতে ঈমান বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা আছে।

৩১. কেউ আপনাকে মা'রিফতী ফকীর মনে করে গরুর গোস্ত, মৎস ও কোনো হালাল প্রাণী জবেহ করা ও খাওয়া নিষেধ করে। এটা কুর'আন ও হাদীসের খিলাফ। যারা হালাল প্রাণী জবেহ করতে ও খেতে ঘৃণা করে, তারা কুর'আন শরীফের বিপরীত কার্য সম্পাদনকারী, কাজেই তারা বেঈমান।

৩২. হানাফী, মালিকী, হাম্বলী ও শাফি'য়ী এ চারি মাযহাবের কোনো মাযহাবকে এহানত করবেন না। আমি হানাফী, আমার মুরীদগণও হানাফী।

শিয়া, রাফেজী, খারিজী ইত্যাদিগের আকীদা বাতিল ও হারাম।
চার মাযহাব নয়, চারের মাযহাব, চারের মাযহাবই কুর'আন, হাদীস ও ফিক্হ থেকে উৎসারিত। ফিক্হ হচ্ছে, কুর'আন ও হাদীসের অনুবাদ (তরজমা) মাত্র। যা কুর'আন-হাদীসে স্পষ্টভাবে নেই, তারই খুলাছা (মূলমর্ম) হচ্ছে ফিক্হ। অতএব, এ চারের মাযহাবকে যে এহানত (অবজ্ঞা) করবে, সে কাফির হবে, কেননা এতে কুর'আন ও হাদীসকে অবজ্ঞা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

নবী করীম (স.)-এর যামানা থেকে আজ পর্যন্ত সকলেই হচ্ছে আহলে হাদীস ওয়াল কুর'আন। আর যে আহলে হাদীস ওয়াল কুর'আন হবে, তার 'আমল চারের কোনো এক মাযহাবের সাথে মিলবে।

৩৩. মিলাদ শরীফে কিয়াম মুস্তাহছান। যদি কেউ মিলাদ শরীফ পাঠকালে কিয়াম করে, তবে কেউ তাকে জবরদস্তি করে বসাবেন না। যদি কেউ বসে তাওয়াল্লাদ শরীফ পড়ে, তবে তাকেও কেউ জোর করে উঠাবেন না। সমান্য মুস্তাহছান বিষয় নিয়ে কেউ দলাদলি করে বিভক্ত হবেন না। কিয়াম করা আমি ভালই মনে করি। কিয়ামের সময় কেউবা বসে থাকে আবার কেউবা দাঁড়ায়, এটা ভালো নয়। তৎপ্রতি খেয়াল রাখবেন। কিন্তু কিয়াম মুস্তাহছান সুন্নাতে উম্মত। সুন্নাত তিন প্রকারঃ ১. সুন্নাতে উম্মত ২. সুন্নাতে সাহাবা ৩. সুন্নাতে নাবাবী।

৩৪. 'ইল্‌মে গায়িব আল্লাহ্‌তা'আলা হযরত নবী করীম (স.)-কে যতটুকুন জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি ততটুকুই জানেন। গায়েবের একমাত্র মালিক আল্লাহ্‌, এরূপ আকীদা রাখবেন। হযরত নবী করীম (স.) যে গায়িব জানেন, সে গায়েবকে 'ইল্‌মে হুসূলী বলে।

৩৫. দাড়ি রাখা, লম্বা জামা পরিধান করা ইত্যাদি সুন্নাতি লিবাছকে যারা অবজ্ঞা করবে, তারা বেঈমান হবে, যেহেতু হযরত নবী করীম (স.)-এর সুন্নাতকে অবজ্ঞা করা হয়। আর যে বিশ্বনবী (স.)-কে অবজ্ঞা করে, সে কাফির।

৩৬. কামিল পীরের নিকট মুরীদ হওয়ার পর পীর যদি মারা যায়, বে-শর'আ হয়, বা দূর দেশবাসী হয়, আর তাঁর নিকট যেতে অক্ষম হয়, তবে অন্য কামিল পীর দেখে মুরীদ হয়ে তা'লীম নিতে পারবে। কিন্তু ভালো পীর থাকা সত্ত্বেও পীরকে অবজ্ঞা করে অন্য পীর ধরলে ঈমান চলে যাওয়ার আশঙ্কা আছে।

৩৭. আমার মুরীদ ও মু'তাকিদদিগকে ও সকল মুসলিমকে বলছি, যদি কোনো ব্যক্তি শরীয়ত মুতাবিক 'আলিম কিংবা কামিল হয়, তবে তার ওয়ায শুনবেন, খাতেরদারী করবেন, তাতে আমার কোনো নিষেধ নেই।

যদি কোনো 'আলিম বা ওয়ায়িয, ওয়াযের মধ্যে আল্লাহ্‌ ও রাসূলের প্রশংসা উপলক্ষে মসনবীয়ে রুমী ইত্যাদি 'ইল্‌মে মুছিকির ওযনে অর্থাৎ রাগ-রাগিনীসহ পাঠ করে, তবে শ্রতার কর্তব্য এ যে, তথা থেকে উঠে আসা।

৩৮. আমি 'আলিম ও শিক্ষিত লোকদিগকে মুহাব্বাত ও তা'যীম করে থাকি। আপনারাও তা'যীম ও মুহাব্বাত করবেন। যে 'আলিম ও সাধারণ লোক শরীয়ত মুতাবিক চলেন, তাঁদেরকে কেউ তুচ্ছ জানবেন না। তুচ্ছ জানলে আল্লাহ্‌তা'আলা ও হযরত মুহাম্মাদ (স.) নারাজ হবেন, যেহেতু 'আলিমগণ হচ্ছেন নবীগণের ওয়ারিস।

৩৯. সকলে ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার করবেন, স্ত্রী, কন্যা ও পরিজনদিগকে কুলুখ ইত্যাদি 'আমল করাতে চেষ্টা করবেন। যেহেতু কুলুখ ব্যবহার করা সুন্নাতে মু'আক্কাদাহ্‌।

৪০. মাদ্রাসার তালিবুল 'ইল্‌মদিগকে যথা শক্তি জায়গীর রাখবেন ও সাহায্য করবেন, কিন্তু দাড়ি মুন্ডনকারী, এলবাট রাখা ও হুক্কা-বিড়ি খোর তালিবুল 'ইল্‌ম রাখবেন না। পরহেজগার নামাজী তালিবুল 'ইল্‌ম রাখবেন। শিক্ষকদিগেরও পরহেজগারি অবলম্বন করতে হবে। মাদ্রাসা, স্কুল ও মক্তবে বদকার শিক্ষক রাখবেন না।

৪১. আমার খলীফা ও মুরীদগণের মধ্যে হাজার হাজার 'আলিম, হাফিজ ও কারী আছেন। তারা আমার আদেশে বহু কিতাব ছাপিয়েছেন ছাপতেছেন। আমি সকলের কিতাব দেখতে পারিনি। কাজেই যদি কারো কিতাবে শরীয়তের খিলাফ কোনো মত লিখে থাকেন, তবে তা কেউ 'আমল করবেন না। বরং তার সংশোধনের জন্য তাকে জানিয়ে সংশোধন করবেন।

৪২. 'ইলম দুই প্রকার, 'ইল্‌মে জাহির ও 'ইল্‌মে বাতিন। 'ইল্‌মে জাহির হচ্ছে- শরীয়ত, কুর'আন, হাদীস, ফিক্‌হ ইত্যাদি। শরীয়ত মুতাবিক 'আমল করাই তরীকত। তরীকত ব্যতীত মা'রেফাত, হাকীকত হতে পারে না। যদি হয়, তা মিথ্যা বৈ কিছুই নয়। শরীয়ত ছেড়ে যারা মা'রেফাত 'আমল করে, তারা ফাসিক। শরীয়ত অনুযায়ী তরীকত মা'রেফাত এবং হাকীকত শিক্ষা করা ফরয। যারা তরীকত অনুযায়ী 'আমল করে না তারা ফাসিক। যারা সত্যই তরীকত, মা'রিফাত ও হাকীকত অবজ্ঞা করে তারা কাফির।

Dhaka University Institutional Repository

৪৩. কদমবুছি জায়িয আছে, পীরের পায়ে হাত দিয়ে সে হাতে তা'যীমের জন্য চুম্বন করা বিদ'আত। মাথা নিচু করে কদমবুছি করা নাজায়েয। যদি পীর ওপরে থাকে, তখন তাকে কদমবুছি করা হয়, তবে জায়িয হবে।

৪৪. আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজ্‌দা করা কুফ্‌রী। তাহিয়্যাতের সিজ্‌দা করা হারাম। এ হারামকে যারা মুবাহ জানে, তারা কাফির। নবী করীম (স.)-এর যামানার পূর্বে রুকুর নাম সিজ্‌দা ছিলো, তজ্জন্যই বিশ্বনবী বলেছেন, "যেন কেউ সালাম দেয়ার সময় পূর্ব যামানার সিজ্‌দার ন্যায় মাথা নত না করে।" যারা বর্তমানে তাহিয়্যাতের (তা'যীমের) সিজ্‌দা হালাল জেনে করে ও লয়, তারা কাফির।

৪৫. মোরগ বেধে খাওয়া সুন্নাত। হযরত নবী করীম (স.) মোরগকে বেঁধে রেখে তারপর খেয়েছেন, আমিও আমার মুরীদ ও সর্বসাধারণ ভাইদিগকে তাই আদেশ করি। 'জাল্লালা'-মোরগ না বেঁধে খাওয়া মাকরুহ তাহরীমী।

৪৬. হযরত নবী করীম (স.) শেষ নবী, তাঁর পরে আর কোনো নবী হবে না। যদি কেউ কোনো সময় পয়গম্বর বলে দাবী করে, সে মিথ্যাবাদী।

৪৭. বর্তমানে একদল ফকীর বের হয়েছে, তারা বাগদাদী সিজ্‌দা করে, তারা উত্তর দিকে সিজ্‌দা করে পীর সাহেব পীর সাহেব বলতে থাকে, এটি করা হারাম। এগুলোকে জায়িয মনে করলে বেদীন হয়ে যাবে।

৪৮. পীর খান্দানেই যে কেবল পীর হবে, এ ধরনের কথা কোনো কিতাবে নেই। যিনি শরীয়ত ও মা'রিফাত ইত্যাদিতে কামিল হবেন, তিনিই পীর হতে পারবেন, যে বংশেরই হোক না কেনো।

৪৯. আমার মুরীদ ও মু'তাকিদগণ, দরূদ ও ওযিফাসমূহ ও মুরাকাবা ইত্যাদি যথারীতি করবেন। মিথ্যা কথা বলবেন না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিবেন না। পর্দা-পুশিদা মতো চলবেন। সুদ, ঘুষ খাবেন না ও হারাম মাল খাবেন না। হারাম কার্য যেমন গান-বাজনা করবেন না ও শুনবেন না। এ সকল বিষয় থেকে পরহেজ না করলে কল্‌ব বন্ধ হয়ে যাবে। মা'রিফাতের কোনো স্বাদ পাবেন না। শরীয়তের খিলাফ দাবী করলে আল্লাহ্‌র নিকট দায়ী থাকবেন। আমি ঐরূপ খলীফা বা মুরীদ চাই না, তাদের নিকট কেউ মুরীদ হবেন না।

৫০. কেউ শির্‌কের গুনাহ করবেন না। যেমন- হিন্দুর পূজায় ভ্যাট দেয়া, পাঠা, কলা, দুধ ইত্যাদি বিক্রয় করা, শনি, রবিবার মানতে নাই। কারো মাল হারিয়ে গেলে গণকের কাছে যাবেন না। ধান-চালকে মা লক্ষী বলবে না। দু'আ করি, আল্লাহ্ যেনো মুসলিম ভাই-ভগ্নীদিগের ঈমান ঠিক রাখেন।

৫১. বাজারে ভেজাল ঘৃত, দধি, মিষ্টান্ন, সাদা চিনি হতে পরহেজ করবেন। আমি ঐ সকল মর্ম যতটুকুন অবগত হয়েছি, তাতে আমার উচিৎ হয় যে, সর্বসাধারণের পরহেজগারি অবলম্বন করার জন্য ঐ সকল জিনিস ব্যবহার করতে নিষেধ করি। অমুসলিমদের তৈরি মিষ্টান্ন ইত্যাদি না খাওয়া ভালো, কেননা তারা যা হালাল জানে, তা আমাদের জন্য হারাম, যেমন- গোবর, চনা ইত্যাদি।

৫২. কেউ জামাতা হতে মেয়েকে আটক রাখবেন না। জামাতার সাথে কোনো বিষয়ে বিবাদ হলে মেয়েকে আটকে রাখা হারাম। কেউ কন্যা ও ভগ্নী ইত্যাদি আটক করবেন না। যদি কোনো বিবাদ হয়, তবে তা মীমাংসা করে শীঘ্রই মেয়েকে স্বামীর ঘরে পাঠিয়ে দিবেন।

৫৩. নিজ স্ত্রীকে কেউ বাপের বাড়ি বা অন্যত্র ফেলে রেখে কষ্ট দিবেন না। তাদেরকে পর্দায় রেখে তাদের হক যথারীতি আদায় করবেন, নচেৎ গুনাহগার হবেন।

৫৪. কেউ হুক্কা, বিড়ি, সিগারেট ব্যবহার করবেন না। কেননা তা মাকরূহ তাহরীমী। মদ, গাজা সহ অন্যান্য যে কোনে নেশা জাতীয় দ্রব্য ব্যবহার করা হারাম।

৫৫. গোরস্থানের হিফাযত করবেন, গোরের ওপর দিয়ে পথ দিবেন না। গোরস্থানের নিকট পায়খানা-প্রস্রাবের স্থান করবেন না, করলে গুনাহগার হবেন ও বদ-দু'আ প্রাপ্ত হবেন, যথাসাধ্য কবরস্থানের সংরক্ষণ করবেন।

৫৬. বৃদ্ধ পিতা-মাতার খিদমত করবেন, তাঁদের সন্তুষ্টির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবেন এবং তাঁদের যত্ন নিবেন।[৩২৫]

৩২৫. ফকীহ মুহাদ্দিস আল্লামা রুহুল আমীন (র.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০

Dhaka University Institutional Repository

৪র্থ পরিচ্ছেদ

মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর খলীফাগণ

মুজাদ্দিদে যামান হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (র.) ইসলামের হিদায়াতের বানী সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য অসংখ্য খলীফা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর খলীফাগণের প্রকৃত সংখ্যা কত তা একমাত্র আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীনই জানেন। তবে শুনা যায়– তাঁর প্রায় ষাট হাজার খলীফা ছিলো। পরিপূর্ণ কামালিয়াত অর্জন করার পরই শুধুমাত্র খিলাফত দেয়া হতো। হযরত 'আল্লামা রুহুল আমীন (র.) 'হযরত পীর সাহেব কিবলার বিস্তারিত জীবনী' পুস্তকে প্রধান প্রধান কয়েকজন খলীফার নাম লিপিবদ্ধ করেছেন, যা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ

হুগলী

১. জনাব ফজলে যামান মাওলানা শাহ সৈয়দ আবদুল মাওলা হাসানি হোসাইনি।
২. জনাব মাওলানা আবদুদ্ দাইন, হুজুর কিবলার ভ্রাতুষ্পুত্র।
৩. জনাব মৌলভী আবদুল হক, ইনি সিতাপুর মাদ্রাসার ওয়াক্ফ সম্পত্তির মুতাওয়াল্লি।
৪. মাওলানা কাজী অবদুল মুহাইমিন সিদ্দিকী।
৫. মৌলভী দিয়ানতুল্লাহ সাহেব (ফুরফুরা)।
৬. মৌলভী কাজী ছাজ্জাদ আলী (সিতাপুর)।
৭. মাওলানা সৈয়দ কানায়াত হোসেন, ইনি হযরত পীর সাহেবের জামাতা (ফুরফুরা)।
৮. মাওলানা জিয়াউল হক।
৯. মৌলভী শাহ্ আবদুল মান্নান হালাবী।
১০. মৌলভী আবদুল মোমেন (আরামবাগ)।
১১. মৌলভী আবদুল গাফফার (মন্ডলকী)
১২. মৌলভী আবদুর রউফ।
১৩. মৌলভী মোহাম্মাদ সোলায়মান।
১৪. মৌলভী ছরিরুর রহমান।
১৫. কাজী মৌলভী মনছুরুল হক (মোল্লা শিমলা)।
১৬. মৌলভী হামিদুল হক (সীতাপুর)।
১৭. হাজি সূফী ইয়াকুব আলী (বাঁধপুর)।
১৮. ফখরুল 'ওলামা মাওলানা আবদুল আজীজ (কনকপুর)।
১৯. মৌলভী মোহাম্মাদ বশির (সাবরেজিস্টার, ফুরফুরা)।
২০. মৌলভী সূফী আবদুল জব্বার (ফুরফুরা)।
২১. হাফেজ মাওলানা নেছার আহমদ (হোজাঘাটা)।
২২. মাওলানা মোহাম্মদ নূর আলী (বাঁধপুর)।
২৩. মৌলভী মোহম্মাদ আবদুল জাব্বার (ফুরফুরা)।
২৪. কাজী মৌলভী আবদুল মান্নান (হযরত পীর সাহেবের জামাতা, আকুনি)।
২৫. ওস্তাদুল হুফ্ফাজ হাফিয আবদুল জলিল (ফুরফুরা)।
২৬. মাওলানা আবদুল হান্নান (মোস্তফাপুর)।
২৭. মৌলভী আবদুল ওহাব (ভাঙ্গা, মোহেশপুর)।
২৮. মৌলভী আবদুল করীম।
২৯. মৌলভী মোহাম্মদ ইউসুফ (রামপাড়া)।
৩০. হাফেজ আবদুল লতিফ (নওয়াবপুর)।
৩১. মাওলানা আবদুল বায়ান।
৩২. মাওলানা ওয়াহেদ ফারুকী (মোল্লাশিমলা)।[৩২৬]

৩২৬. ফজলুর রহমান মুন্সী, *সীরাতে আজীম* (ঢাকা: ইসলামিয়া কুতুবখানা, ২০০২ খ্রী.), খন্ড- ০২, পৃ. ৫০

Dhaka University Institutional Repository

ত্রিপুরা

১. মাওলানা আবদুল খালেক এম, এ, (প্রফেসর প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলকাতা)।
২. মৌলভী হাজী ইছা মোহাম্মদ মছিহ বি, এ।
৩. মৌলভী আনিসুর রহমান বি, এ।
৪. মৌলভী ইস্কেন্দার আলী আই, এ।
৫. মৌলভী মাকছুদুর রহমান।
৬. মৌলভী শাহ্ ইয়াছিন (দেবীপুর)।
৭. মাওলানা ছালামাতুল্লাহ (বাগাদী, চাঁদপুর)।
৮. মাওলানা ওয়ায়েজদ্দীন (রামপুর)।
৯. মাওলানা আজিমুদ্দীন (ধামতি)।
১০. মাওলানা কিরামত আলী (ধামতি)।[৩২৭]

নদীয়া

১. মৌলভী সূফী এরশাদ হোসেন সিদ্দিকী।
২. মাওলানা সূফী তাজাম্মোল হোসেন, ইনি জবনদস্ত ওলী ছিলেন, তাঁর অনেক মুরীদ আছে।
৩. মৌলভী উকিল তাওয়াক্কুল আলী বি, এ; বি, এল।
৪. মৌলভী আবদুল কুদ্দুস রুমী (জানিপুর)।
৫. মাওলানা জসীম উদ্দীন (বাঁশগ্রাম)।
৬. মাওলানা ফজলুর রহমান (কপুরহাট)।
৭. মাওলানা হাবিবুর রহমান (হরিপুর)।
৮. মাওলানা হাজী মোহাম্মাদ সৈয়দ ইসমাইল।
৯. মাওলানা নাজমুল হক (দোগাছি)।
১০. মৌলভী মোহাম্মাদ ইসমাইল (চুয়াডাঙ্গা)।
১১. মৌলভী হামিদুর রহমান (বাঁশগ্রাম)।
১২. মৌলভী মফিজ উদ্দীন।
১৩. মৌলভী রেজাউল হক।
১৪. মৌলভী মানসুরুল হক।
১৫. মৌলভী আবু ছায়াদাত মোহাম্মদ সিদ্দিকী।
১৬. মাওলানা তাওয়াক্কোল আলী।
১৭. হাজী মৌলভী আবদুল জাব্বার।
১৮. সূফী খেয়াল উদ্দীন জোয়াদ্দার।
১৯. মৌলভী আবদুস শুকুর।
২০. মৌলভী খোরশেদ আলী।
২১. মৌলভী মোহাম্মাদ এছহাক।
২২. কবি মৌলভী আবদুল হামিদ।
২৩. কাজী মোহাম্মাদ অবদুল ওয়াহেদ।[৩২৮]

মেদিণীপুর

১. মৌলভী ইছহাক।
২. মাওলানা নুরোল হক (পিয়ারা ডাঙ্গা)।
৩. মাওলানা আবদুল বারী (শামছআবাদ)।

---

৩২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১
৩২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

Dhaka University Institutional Repository

৪. মাওলানা আবদুল মাবুদ (পিয়ারা ডাঙ্গা)।
৫. মাওলানা আবদুদ্দাইন (পিয়ারা ডাঙ্গা)।
৬. মাওলানা বাহাউদ্দীন।
৭. মাওলানা মইনুদ্দীন।
৮. মাওলানা ফজলে করিম।
৯. মাওলানা মোহাম্মাদ জাফর (ভদরক)।
১০. মাওলানা মহিউদ্দীন।
১১. মাওলানা কছিমউদ্দীন।

হাওড়া

১. মৌলভী হাফিয তাওয়াক্কেল আলী।
২. মৌলভী আবদুর রহমান (সীতাপুর)।
৩. মৌলভী খলিলুর রহমান (সীতাপুর)।
৪. মাওলানা মোহাম্মাদ আলী (মিরেরচক)।
৫. মাওলানা জালাল উদ্দীন সিদ্দিকী (রাজখোলা)।
৬. মৌলভী ইকরামুল হক (ধশা)।
৭. মাওলানা নূর মোহাম্মাদ (ধশা)।
৮. মৌলভী মফিজ উদ্দীন (রাজখোলা)।

পূর্ণিয়া

১. মৌলভী তমিজ উদ্দীন।
২. মৌলভী মিহার উদ্দীন।

মুর্শিদাবাদ

১. মৌলভী আবদুল হাই।
২. হাজী ইবরাহীম।

বর্ধমান

১. ফখরুল মুহাদ্দিসীন মাওলানা গোলাম কিবরিয়া।
২. হাফিয আজফার হোসেন (আনখোলা)।
৩. ফখরুল মুহাদ্দিসীন মাওলানা আবু তাহের।

মালদহ

১. মাওলানা হেদায়েত উল্লাহ সাহেব।

পরগনা

১. মাওলানা গোলাম ছারওয়ার (শশীপুর)।
২. মৌলভী আবদুল জব্বার (শশীপুর)।
৩. মৌলভী সানাউল্লাহ।
৪. মৌলভী নূর মোহাম্মাদ।
৫. মৌলভী ইজহারুল হক (হাতিয়াড়)।
৬. মাওলানা ইয়াদ আলী (ফুলবাড়ী)।

Dhaka University Institutional Repository

৭. মাওলানা ইবরাহীম (জয়নগর), ইনি ২৪ পরগনার মুকুটমণি ছিলেন।
৮. মাওলানা খিলাফত হোসেন (বাজিতপুর)।
৯. মাওলানা আবদুর রশিদ (দেবীপুর)।
১০. মৌলভী সৈয়দ আলী (বকুন্ডা)।
১১. হাজী মছিহ উদ্দীন আহমদ (বশিরহাট)।
১২. হাজী খাতের আহমদ (হাসনাবাদ)।
১৩. মৌলভী রুহুল কুদ্দুস (সৈয়দপুর)।
১৪. মাওলানা ফয়জুল্লাহ (বড় গোবরা)।
১৫. মৌলভী নূর মোহাম্মাদ (এগারআনি)।
১৬. ডাক্তার সূফী গিয়াস উদ্দীন (কোমরপুর)।
১৭. ডাক্তার মৌলভী শহীদুল্লাহ (পিয়ারাডঙ্গা)।
১৮. হাজী সুলতান আহমদ (মোয়াজ্জেমপুর)।
১৯. মাওলানা বজলুর রহমান (দরগাহপুর)।
২০. মুহাম্মদ আমানত আলী (তারাগুনিয়া)।
২১. মৌলভী ফজলে মোহাম্মদ জালাল উদ্দীন (দুবদিয়া)।
২২. মৌলভী মোহাম্মদ আজিজুর রহমান (টোনা)।
২৩. মৌলভী গোলাম রহমান (আঠারবেকি)।
২৪. মৌলভী তমিজ উদ্দীন (আড়পাড়া)।
২৫. মোহাম্মদ মাকসুদ আলী, (লক্ষীপুর)।
২৬. মৌলভী মোহাম্মদ আফসার উদ্দীন (বেলগড়িয়া)।
২৭. মৌলভী মোহাম্মদ আফছার উদ্দীন (চৌমুহনী)।
২৮. মাওলানা মোহাম্মদ মাহফুজ (মাৎলা)।
২৯. মাওলানা মোহাম্মদ মুছা (বড়াবজেস্বর)।
৩০. মাওলানা জামাত আলী (কুদলিয়া)।
৩১. নগন্য খাদিম মাওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমীন (বশির হাট)।[৩২৯]

কলকাতা

১. মাওলানা আহমদ আলী জালালী, ইনি উচ্চস্তরের 'আলিম, ফুরফুরা সিনিয়র মাদ্রাসার ভূতপূর্ব সুপারিন্টেডেন্ট; তাঁর বহু মুরীদ আছে।
২. মাওলানা সৈয়দ আবুল কাছেম।
৩. মোহাম্মদ জালাল উদ্দীন এম, এ, স্বর্ণ মডেল প্রাপ্ত।
৪. মোহাম্মদ নাছির উদ্দীন বি, এ।
৫. মাওলানা সৈয়দ হাফিয বশির উদ্দীন।
৬. মৌলভী সৈয়দ গোলাম মহিউদ্দীন।
৭. হাফিয হাশেম (বালিগঞ্জ)।
৮. মাওলানা হাফিয হাবিবুর রহমান।
৯. মাওলানা হাফিয বশির উদ্দীন।
১০. মৌলভী শাহ্ সূফী শফিউদ্দীন, পীর সাহেবের খাছ খাদিম।
১১. মাওলানা আবদুল গফুর।
১২. মাওলানা ফজলুর রহমান নিজামী (খিদিরপুর

ঢাকা

৩২৯. আল্লামা সাইফুদ্দিন সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

Dhaka University Institutional Repository

১. মৌলভী বোরহান উদ্দীন (লৌহজং)।
২. মৌলভী হোছেন উদ্দীন (গাওদিয়া)।
৩. মৌলভী আবদুছ ছাত্তার, পীর সাহেবের খাছ খাদেম (ঢাকা)।

সিলেট

১. মৌলভী আলী মোহাম্মদ।
২. ফখরুল মুহাদ্দিসীন মাওলানা রেজওয়ানুল করীম বি, এ।
৩. শাহ আবদুল্লাহ।

রাজশাহী

১. মাওলানা মকবুল হোসেন (আক্কেলপুরী)।
২. মৌলভী মইনুল হক (শীকারপুর, নওগাঁ)।
৩. দিওয়ান নাছির উদ্দীন (নওগাঁ)।
৪. খোন্দকার খলিলুর রহমান (বাহাদুরপুর)।
৫. ডাক্তার রইছ উদ্দীন (বয়লা, নওগাঁ)।
৬. মৌলভী মানছুরুর রহমান (রাজশাহী টাউন)।
৭. মৌলভী হায়দার আলী প্রফেসর (রাজশাহী টাউন)।
৮. হাজী নূরুল হুদা (নাটোর)।

ময়মনসিংহ

১. মৌলভী আবদুর রহমান।
২. মৌলভী আবদুল ওয়াহেদ।
৩. মৌলভী ইয়ার মোহাম্মদ (পীরগঞ্জ)।
৪. মৌলভী নজির হোসেন খোন্দকার (হাড়িয়াবাড়ী)।
৫. মোসলেম বেগ (শশারিয়াবাড়ী)।
৬. মাওলানা আবদুল হামিদ (শশারিয়াবাড়ী)।[৩৩০]

বগুড়া

১. সূফী মৌলভী সায়িম উদ্দীন (খঞ্জনপুর)।
২. মীর মৌলভী আজিজ উদ্দীন (আক্কেলপুর)।
৩. মৌলভী মোহাম্মদ ইছহাক (হানাইল)।
৪. খোন্দকার রজব আলী।
৫. মৌলভী দিয়ানত আলী।
৬. মাওলানা মাওলা বখ্‌শ (বগুড়া)।
৭. মাওলানা মোহাম্মদ ইবরাহীম মোহাব্বতপুরী (পাঁচবিবি)।
৮. মাওলানা আশরাফ আলী খান পন্নী।
৯. মৌলভী কাজেম উদ্দীন খোন্দকার (মহাফেজ, ফৌজদারী অফিস)।
১০. মৌলভী হামিদ আলী খোন্দকার (সেরেস্তাদার, আদালত)।
১১. মৌলভী ময়িন উদ্দীন আহমদ (পালশা)।
১২. মৌলভী মোবারক আলী সাহেব (মালগ্রাম)।
১৩. সূফী জয়নাল আবেদীন (আদালত, বগুড়া)।

৩৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

Dhaka University Institutional Repository

১৪. হাজী মোহাম্মদ হোসেন খান (চাঁদনী বাজার)।
১৫. হাজী ইশারত আলী সাহেব (মহাকুড়ি)।
১৬. মিরাজ উদ্দীন পন্ডিত (ধনতলা, নশরতপুর)।
১৭. হাজী ইরফান আলী সেক্রেটারী, মোস্তাফাবিয়া মাদ্রাসা।
১৮. মৌলভী মাহতাব উদ্দীন খান (মরতজাপুর)।
১৯. খোন্দকার আশরাফ আলি, স্কুল সাব ইন্সপেক্টর।
২০. খোন্দকার রজব আলী (ইন্দইল)।[৩৩১]

চট্টগ্রাম

১. মাওলানা গোলাম রহমান (ইছাখালী)। তাঁর অসংখ্য মুরীদ রয়েছে।
২. মাওলানা আবদুল জাব্বার (বাঁশখালী, নিজামপুর), কাশ্‌ফ শক্তি সম্পন্ন বড় বুজুর্গ।
৩. মৌলভী আবদুছ ছোবহান।
৪. মৌলভী মোবারক আলী।
৫. মৌলভী মাকসুদুর রহমান।
৬. মৌলভী খলিলুর রহমান।
৭. মৌলভী মোহাম্মদ ইনাম শরীফ।
৮. মৌলভী আবদুর রহীম।
৯. মৌলভী ইছমাইল।
১০. মৌলভী কাজী গোলাম রহমান।
১১. মৌলভী বজলুর রহমান।
১২. মৌলভী মোহাম্মদ এছহাক।
১৩. মৌলভী আবদুর রহামান।
১৪. মৌলভী ইমাম উদ্দীন।
১৫. মৌলভী অছিউর রহমান।
১৬. মাওলানা ইলাহি বখশ।
১৭. হাফেজ মোহাম্মদ ইয়াকুব।
১৮. মাওলানা আবদুল গণি (সুফিয়া মাদ্রাসা)।
১৯. মৌলভী আবদুল গণি (দ্বিতীয়)।
২০. মাওলানা আজিজুর রহমান।

বরিশাল

১. মাওলানা শাহ সূফী নেছার উদ্দীন, পরহেজগার 'আলিম, জবরদস্ত ফাজেল, উচ্চ দরজার ওলী, বহু কিতাব প্রণেতা, তাঁর বহু সহস্র মুরীদ আছে।
২. মৌলভী আশরাফ উদ্দীন কবীর।
৩. মৌলভী ইছমতুল্লাহ শেরেজঙ্গী।
৪. মৌলভী সাখাওয়াত হোসেন (ইরনি)।
৫. মৌলভী বুজুর্গ আলী (নপাড়া)।
৬. মৌলভী মেহের উদ্দীন (পাকমেহার)।
৭. আবদুর রহমান খাঁ (জলিশাহ)।
৮. মৌলভী মোবারক আল মীর্জা (কালা)।
৯. মোহাম্মদ নজিবুল্লাহ (কেসুন্দী)।
১০. মৌলভী কাজী আবদুল হাদী (আমতলী)।

৩৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

Dhaka University Institutional Repository

১১. মৌলভী আবদুল গফুর (সোনাহারি)।
১২. মৌলভী মীর্জা আলী (এলেমপুর)।
১৩. মৌলভী মফিজ উদ্দীন (পাঙ্গাসী)।
১৪. মৌলভী মোহাম্মদ হাশেম।
১৫. মাওলানা ইয়াছির (টাউন মসজিদ)।

ফরিদপুর

১. মৌলভী আবদুল গফুর।
২. মৌলভী খবির উদ্দীন (মিষ্টভাষী বক্তা)।
৩. মাওলানা কামরুজ্জামান।
৪. মৌলভী হাফিয মহিউদ্দিন (মাজড়া)।
৫. মাওলানা আফছার উদ্দীন (রাজধরপুর)।
৬. মৌলভী আবদুর গফুর (জঙ্গরদী, নাগরকান্দা)।
৭. মাওলানা আবদুল গফুর (মহারাজপুর)।
৮. মৌলভী মোহাম্মদ আবু বকর।
৯. মৌলভী কাজী হাবিবুর রহমান (ভাঙ্গা)।
১০. মৌলভী আফছার আলী (রাজবাড়ী)।
১১. মৌলভী কলিম উদ্দীন (কালুখালী)।
১২. মৌ মোহাম্মদ আলী (মাতবরের চর)।[৩৩২]

পাবনা

১. মৌলভী রহমত উল্লাহ।
২. মৌলভী নাছির উদ্দীন।
৩. মোহাম্মদ তাইয়েবুল্লাহ।
৪. লাল মোহাম্মদ।
৫. মৌলভী মোহাম্মদ রাহিম উদ্দীন।
৬. মৌলভী মোহাম্মদ বাহাউদ্দীন (সোনাগাছা)।
৭. মৌলভী মোহাম্মদ ইয়াকুব।
৮. মৌলভী আবদুল মজিদ।
৯. মাওলানা ওছমান গণি (শাহাজাদপুর)।
১০. মাওলানা আবদুল জাব্বার (সিরাজগঞ্জ)।
১১. মৌলভী জয়নুল আবেদীন।
১২. মাওলানা রহমত উল্লাহ (শাহাজাদপুর)।
১৩. মৌলভী আবেদ আলী।
১৪. ডাক্তার আবদুল হামিদ (চন্দকোনা)।
১৫. মাওলানা ছগির উদ্দীন (শিবপুর)।
১৬. মৌলভী গোলাম ইয়াছিন (কাকিলাখালী)।
১৭. মৌলভী মখিজ উদ্দীন।
১৮. মাওলানা রওশন আলি।
১৯. মৌলভী আবদুছ ছামাদ (উলট মাদ্রাসা)।
২০. মৌলভী ছগির উদ্দীন (সোজাগির)।
২১. মাওলানা আবদুল গফুর (হাদল মাদ্রাসা)।

---

৩৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

Dhaka University Institutional Repository

২২. মাওলানা মীর মোহাম্মদ মহিউদ্দিন (কইজুড়ি)।
২৩. মৌলভী হাজী ইবরাহীম (হাদল)।
২৪. খোন্দকার মোহাম্মদ আবদুশ শুকুর (তবিলা)।
২৫. মাওলানা শামসুদ্দিন (আহমদপুর)।
২৬. মাওলানা ময়ছর উদ্দীন (ভারেঙ্গা)।
২৭. মাওলানা আলিম উদ্দীন (বোনওয়ারিনগর)।
২৮. মাওলানা আওকাতুল্লাহ (খাঁকড়া)।
২৯. মৌলভী আবদুল আজিজ।
৩০. মৌলভী আহমদ আলী (সিরাজগঞ্জ)।
৩১. মৌলভী খোন্দকার আবদুশ শুকুর (আহমদপুর)।
৩২. মৌলভী খোন্দকার আছাদুজ্জামান (ছড়াতৈল)।
৩৩. মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ (তারুটিয়া)।
৩৪. মৌলভী ওছমান গণি (চৌবাড়ি)।
৩৫. মৌলভী আবদুর রশিদ নূরী (আমডাঙ্গা)।
৩৬. মৌলভী আবদুছ ছামাদ (ছোনগাছা)।
৩৭. মাওলানা হারুনুর রশিদ (উলটদাব)।
৩৮. মৌলভী জহুরুল হক (ম্যারেজ রেজিস্টার, কাজিপুর)।[৩৩৩]

নোয়াখালী

১. মাওলানা আহমদ উল্লাহ (বর্তমান সুপারিন্টেন্ডেট, ফুরফুরা মাদ্রাসা)।
২. মাওলানা সৈয়দ আহমদ।
৩. মৌলভী তোফায়েল আহমদ।
৪. মাওলানা হাতেম আহমদ (শ্রীনদী)।
৫. মাওলানা শাহ ছালামাতুল্লাহ (আমানতপুর)।
৬. মাওলানা আবদুছ ছালাম (অশ্বদিয়া)।
৭. মৌলভী হাবিবুল্লাহ (আমানতপুর)।
৮. হাফেজ আবদুছ ছোবহান (আমানতপুর)।
৯. মৌলভী মোহাম্মদ ছিদ্দিকুল্লাহ (আমানতপুর)।
১০. মৌলভী নূরুল্লাহ (আমানতপুর)।
১১. মৌলভী করিম বখ্শ (সুজাপুর)।
১২. মৌলভী আবদুছ ছামাদ (ঘাটলা)।
১৩. মৌলভী আবদুছ ছোবহান (কালওয়া)।
১৪. মৌলভী বশিরুল্লাহ (কঙ্কাপুর)।
১৫. মৌলভী আবদুছ ছালাম (কঙ্কাপুর)।
১৬.মৌলভী আবদুল বারী (আবদুল্লাহপুর)।
১৭. মৌলভী আবদুল করিম আজিজ (মহব্বতপুর)।
১৮. মৌলভী ফজলুল হক (বলাবাড়ি)।
১৯. মৌলভী আবদুল করিম (বলাবাড়ি)।
২০. মৌলভী লুৎফর রহমান (বলাবাড়ি)।
২১. মৌলভী মোহাম্মদ মোছলেম (নয়ানি)।
২২. মৌলভী ছালামতুল্লাহ (গুপিনাথপুর)।
২৩. মৌলভী ফজলোল হক (এলায়াপুর)।
২৪. মৌলভী মোজাফফর আহমদ (চাঁদপুর)।

---

৩৩৩. তারিক মুহাম্মদ মুত্তাকী বিল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

Dhaka University Institutional Repository

২৫. মৌলভী আবদুল আজিজ (ভুলা বাদশাহ)।
২৬. মৌলভী ইবরাহিম (এলাদিনগর)।
২৭. মৌলভী আবদুল্লাহ (এলদিনগর)।
২৮. মৌলভী আইয়ুব (লক্ষণপুর)।
২৯. মৌলভী ইউনুছ (হাজিপুর)।
৩০. মৌলভী হাফেজ রাজা মিঞা (চরশাহী)।
৩১. মৌলভী আবদুল্লাহ (পদিপাড়া)।
৩২. মৌলভী কাজি মেনাজ উদ্দীন (নাজিরপুর)।
৩৩. মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদ হাফিজুল্লাহ (বশিকপুর)।
৩৪. মাওলানা শাহ্ মেহাম্মদ আবদুল্লাহ (কাজি, বাশিকপুর)।
৩৫. মাওলানা ফজলোল হক (পাঁচবেড়িয়া)।
৩৬. মৌলভী ফছিহোর রহমান।
৩৭. মাওলানা ওজিহুল্লাহ (সন্দিপ)।
৩৮. মাওলানা মোবারক আলী।
৩৯. মৌলভী মখলুকোর রহমান।
৪০. মৌলভী অবদুল করিম।
৪১. মৌলভী কামাল উদ্দীন।
৪২. মৌলভী নূরোজ্জামান।
৪৩. মাওলানা আবদুল গণি (ভবানিগঞ্জ)।
৪৪. মাওলানা গোলাম রহমান (ভবানিগঞ্জ)।
৪৫. মাওলানা আজিজোর রহমান (ভবানিগঞ্জ)।
৪৬. মৌলভী আবদুর রহিম (ভবানিগঞ্জ)।
৪৭. মৌলভী আমিনুল্লাহ।
৪৮. মৌলভী সেকেন্দর আলী।
৪৯. মৌলভী আহমদ আলী।
৫০. মৌলভী ইনায়েত উল্লাহ।
৫১. মৌলভী মোজাফফর আলী।
৫২. মাওলানা আবদুর রউফ (এনায়েতপুর)।
৫৩. মৌলভী করিম বখ্শ।
৫৪. মৌলভী কাজি মোনাওয়ার আলী খাঁ।
৫৫. মাওলানা আফছার উদ্দিন।
৫৬. মৌলভী অজিহুল্লাহ।
৫৭. মৌলভী ইনাম শরীফ।
৫৮. মাওলানা ফয়জোর রহমান (কল্যানদি)।
৫৯. মাওলানা মোহাম্মদ ছাবের।[৩৩৪]

যশোহর

১. মৌলভী আবদুল আজিজ (হরিপুর, ঝিনাইদহ)।
২. মৌলভী মোহাম্মদ তারিফ।
৩. মৌলভী দলিলুর রহমান।
৪. মাওলানা মোহাম্মদ মেহরুল্লাহ (শীকড়ী)।
৫. মৌলভী মোহাম্মদ ইউছোফ (কাশিপুর)।
৬. মৌলভী আবদুল গফুর।

৩৩৪. আল্লামা ইব্রাহীম হোসেন তর্কবাগীশ, *উত্তর বাংলার আউলিয়া প্রসঙ্গ* (রংপুর: মুহাম্মদী কুরআন মহল, ২০০১ খ্রী.), পৃ. ৫৮

Dhaka University Institutional Repository

৭. মৌলভী আবেদ আলী (এনায়েতপুর)।
৮. মৌলভী আবদুর রহমান (ঝিনাইদহ)।
৯. সুফি জিনাতুল্লাহ (ঝিনাইদহ)।
১০. মৌলভী ইজ্জতুল্লাহ (ঝিনইদহ)।
১১. মৌলভী আফতার উদ্দিন (ঝিনাইদহ)।
১২. মুনশী ইউছুফ (মইরম)।
১৩. মৌলভী কাওছার উদ্দীন (নড়াইল)।
১৪. মাওলানা আবদুল আউয়াল (বেরইল, নড়াইল)।
১৫. সুফি হযরত ছদরদ্দিন (গঙ্গারামপুর)।
১৬. মৌলভী মতিউল্লাহ।
১৭. মৌলভী মোহাম্মদ ইবরাহীম।
১৮. মৌলভী মোহাম্মদ আফতাব উদ্দীন।
১৯. মৌলভী মোহাম্মদ আবদুছ ছবুর।
২০. মৌলভী ফছিহোর রহমান।
২১. মৌলভী বদর উদ্দীন (ঝিকরগাছা)।
২২. মৌলভী রকিবুদ্দিন।
২৩. মৌলভী ছায়েম উদ্দীন।
২৪. মোহম্মদ গোলাম রহমান (বেগমপুর)।
২৫. মৌলভী ইয়াছিন (ছয়আনি)।
২৬. মৌলভী করিম বখ্শ (সাতবেড়ুয়া)।
২৭. মৌলভী নাজির হোসেন।
২৮. মৌলভী জাবেদ আলী।
২৯. মৌলভী মমতাজ উদ্দীন।
৩০. মৌলভী আফতাব উদ্দীন।
৩১. মৌলভী কাফিল উদ্দীন।
৩২. মাওলানা ছেরাজ উদ্দীন।
৩৩. মৌলভী ছিদ্দিক আহমদ।
৩৪. মৌলভী মোদাছছের শরীফ।
৩৫. মৌলভী হাফিয ইয়াকুব ।
৩৬. মৌলভী আহমদ আলী (কোট চাঁদপুর)।
৩৭. মাওলানা আহমদ আলী (এনায়েত পুর)।
৩৮. সুফি জহির উদ্দীন (খাজুরা, ঝিনইদহ)।
৩৯. মাওলানা মোজায়েয।
৪০. মাওলানা আজিজুর রহমান।
৪১. সূফী নওয়াব আলী খাঁ (বড়েঙ্গা)।
৪২. মৌলভী আবদুল লতিফ (শীকড়ী)।
৪৩. হাজি আকবর আলী (গোঁড়াপোতা)।
৪৪.মৌলভী অলিউল্লাহ (যুগিখালী)।
৪৫. হাজি হাফেজ মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ তৈয়ব আলী (পাইকপাড়া, নড়াইল)।
৪৬. মাওলানা ছানাউল্লাহ এম, এ (বাঁকড়া)।
৪৭. মৌলভী ফজলুল হক (বাঁকড়া)।
৪৮. মৌলভী ফজলুল করিম (বাঁকড়া)।
৪৯. ডাক্তার আবদুল ওয়াহেদ (ত্রিমহানি)।
৫০. মৌলভী রইছ উদ্দীন (ত্রিপুরাপুর)।[৩৩৫]

৩৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

Dhaka University Institutional Repository

খুলনা

১. মাওলনা মোয়েজ উদ্দীন হামিদী (হামিদপুর, কলারোয়া, বড় ওয়ায়েজ)।
২. মৌলভী খবির উদ্দীন (মুরলগঞ্জ)।
৩. মৌলভী গোলজার আহমদ (ফুলতলা)।
৪. মৌলভী নাজমোল হক (ফুলতলা)।
৫. মাওলানা তমিজ উদ্দীন (রঘুনাথপুর)।
৬. মাওলানা আবদুল জব্বার (রামনগর)।
৭. মৌলভী হাজি নাইম উদ্দীন (কুলিয়া)।
৮. মৌলভী লোকমান (জয়নগর)।
৯. মাওলানা বোরহানুদ্দিন (কুড়িকীহুনিয়া)।
১০. সুফি হাজি ইবরাহীম (মদিনাবাদ)।
১১. মৌলভী রহিম বখ্শ (গোবরা)।
১২. হাজি মৌলভী খায়রুল্লাহ (কামটা)।
১৩. শাহ মোবারক আলী (নেহালপুর)।
১৪. মাওলানা পীর মোহাম্মদ (দিঘুলিয়া)।
১৫. মৌলভী রহমতুল্লাহ (শোলপু)।
১৬. মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম (দরগাহপুর)।
১৭. মৌলভী জহর আলী (গাবুরা)।
১৮. মাওলানা ইলাহি বখ্শ (বারা)।
১৯. মৌলভী আবদুল করিম (শিদ্দিপাশা)।
২০. মাওলানা আবদুল করিম (বাগেরহাট)।
২১. মৌলভী আবদুছ ছাত্তার (বাগদিয়া)।
২২. মৌলভী সূফী সফদর হোসেন (বাগেরহাট)।
২৩. মাওলানা আবদুল গণি (হাকিমপুর)।
২৪. মৌলভী মহিউদ্দিন (হাকিমপুর)।
২৫. সূফী জহির উদ্দিন (খুলনা)।
২৬. মৌলভী আছিল উদ্দিন (পিছলাপুর)।
২৭. মৌলভী ইজহারুল হক (ওফাপুর)।
২৮. মৌলভী আবদুর রশিদ (ওফাপুর)।
২৯. মৌলভী অলিউল্লাহ (যুগিখালি)।
৩০. মৌলভী ইমাম আলী (যুগিখালি)।
৩১. মৌলভী মেহরুল্লাহ (রাজনগর)।
৩২. মাওলানা মোহাম্মদ কাছেম (দিঘুলিয়া)।
৩৩. হাজি মুন্শী মফিজ উদ্দীন (আগোরদাড়ি)।
৩৪. মৌলভী ছায়াদাতুল্লাহ (দরগাহপুর)।
৩৫. মৌলভী শামছোল হক (খলশি)।
৩৬. মৌলভী হোছেন আলী (খলশি)।
৩৭. মৌলভী মজিদ বখ্শ (ফিংড়ি)।
৩৮. মৌলভী মোহাম্মদ ইছহাক (শ্রীরামপুর)।
৩৯. মৌলভী সেকেন্দর আলী (ভাড়খালি)।
৪০. মৌলভী আবদুল জলিল (ভাড়খালি)।
৪১. মৌলভী শফিউদ্দিন (শিরোমণি)।
৪২. মৌলভী লুৎফর রহমান (দরগাহপুর)।
৪৩. মৌলভী শেখ আবদুল আজিজ (দরগাহপুর)।

Dhaka University Institutional Repository

৪৪. মৌলভী আবদুল মাজেদ (দরগাহপুর)।
৪৫. মুহাম্মদ কুরবান আলী (লাবশা)।
৪৬. মৌলভী আবদুল হোছায়েন (সাতক্ষীরা)।
৪৭. মৌলভী আবদুল আফু (চাঁদড়িয়া, সুলতানপুর)।
৪৮. কাজি আবদুল আলিম (গদাইপুর)।
৪৯. কাজি আবদুছ ছোবহান (মাইহাটি)।
৫০. সৈয়দ ফকির আহমদ (মাইহাটি)।
৫১. মাওলনা হাজি আবদুল কাদের (কাইসন্ডা, গদাইপুর)।
৫২. খোন্দকার আজিজুল্লাহ (ঘেনা)।
৫৩. হাফেজ আবদুল খালেক (লাবশা)।[৩৩৬]

রংপুর

১. মাওলানা মফিজদ্দিন (বাজিতপুর), ওলিয়ে কামিল ও পীর সাহেবের শ্রেষ্ঠ খলীফা, তাঁর অনেক মুরীদ আছে।
২. ক্বারি আবদুর রহিম (ফলগাছা)।
৩. মৌলভী ইলাহি বখ্শ (বাজনাপাড়া)।
৪. মৌলভী ছইদদ্দিন (ঘোড়াবান্ধা)।
৫. মাওলানা ইমামদ্দিন (গাইবান্ধা)।
৬. মাওলানা আজিজুর রহমান (ধানঘরা)।
৭. মাওলানা আবুল হোছেন (নিলফামারী)।
৮. মৌলভী আবদুল আহবাব কোরাইশী (ওলিপুর)।
৯. মৌলভী হাজি ফারাএজদ্দিন (ধুমেরকুটি)।
১০. কাজি মৌলভী নজির উদ্দীন (গোকুন্ড তিস্তা)।
১১. মৌলভী ইউছোফ আলী (দরিচর উলিপুর)।
১২. মৌলভী নাছিরদ্দিন আহমদ (ইসলামপুর)।
১৩. মুহাম্মদ শায়েখ উল্লা (মস্তফাপুর)।
১৪. মাওলানা বজলুর রহমান (তিস্তা)।
১৫. শাফাত আলী পন্ডিত (বেলকা)।
১৬. মৌলভী আবুল হোছেন (বজরা)।
১৭. মুহাম্মদ হাকিম উদ্দিন (বজরা)।
১৮. মৌলভী কছিম উদ্দিন (ঘাগোয়া)।
১৯. মুহাম্মদ রজ্জব আলী মিয়াজী (বজরা)।
২০. মু. আবুল হোসেন (বজরা)।
২১. মু. দরছ উদ্দিন (বানিয়াতপুর)।
২২. মৌলভী মফিজ উদ্দিন আহমদ (এমদাদপুর)।
২৩. মু. আবদুর রহমান মাজেদ মিয়া (মির্জাপুর)।
২৪. মু. আবদুছ ছাত্তার (একবারপুর)।
২৫. মৌলভী অবদুর রহমান (ছোটবউলের পাড়া)।
২৬. মৌলভী আবদুল আজিজ মাষ্টার (মাঠের হাট)।
২৭. মু. আকবর আলী খন্দকার (রাজনগর)।
২৮. মৌলভী আবদুল গফুর (চকচকা)।
২৯. মৌলভী আবদুর রহমান (দাউদপুর)।
৩০. মৌলভী আবদুর রহমান (টেঙ্গরজানী)।
৩১. মৌলভী আশমত উল্লা (বুড়িয়াল)।

৩৩৬. মুজাদ্দিদে আলফ সানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

Dhaka University Institutional Repository

৩২. মৌলভী ইয়াকুব আলী খোন্দকার (বাকচি)।
৩৩. মু. মহিউদ্দিন (চান্দামারী)।
৩৪. মু. মোহর উদ্দিন (চান্দামারী)।
৩৫. মু. ইছামদ্দিন (চান্দামারী)।
৩৬. মু. কছিম উদ্দিন (চান্দামারী)।
৩৭. মৌলভী আবদুল হাই (কাশদহ)।
৩৮. মৌলভী রকিউদ্দিন হায়দার (হারাগাছা)।
৩৯. মৌলভী বেশারতউল্লা মির (বল্লমঝাড়)।
৪০. মৌলভী মির আবদুল মান্নান (মন্দুয়ার)।
৪১. মৌলভী কছর উদ্দিন (মদনের পাড়া)।
৪২. মু. কিশমতউল্লা (খোলাহাটা)।
৪৩. ম. কছিমদ্দিন (হাজিপুর)।
৪৪. মু. নূর আহমাদ (একবারপুর)।
৪৫. মু. মানিক উল্লা মিয়াজী (ইসলামপুর)।
৪৬. মু. জেশারত উল্লা ডাক্তার (মাঠের হাট)।
৪৭. মৌলভী তোফাজ্জল হোসেন (কামাল খামার)।
৪৮. মৌলভী শাহাব উদ্দিন (কামাল খামার)।
৪৯. মু. ছফিউদ্দিন (শিলঘাগড়ী ধুবড়ী)।
৫০. মৌলভী ছফির উদ্দিন (মাকছুদ খাঁ)।
৫১. খন্দকার আবুল হোসেন (কয়ারমারী)।
৫২. মু. ইছাবউদ্দিন (দুদিয়া বাড়ী)।
৫৩. মৌলভী তমিজউদ্দিন (চৌধুরানী)।
৫৪. মু. আবদুল আজিজ (চৌধুরানী)।
৫৫. মৌলভী শহিদুর রহমান (শেখপাড়া)।
৫৬. ম. জামাল উদ্দিন ব্যাপারী (তিস্তা)।
৫৭. মোহাম্মদ ইছমাইল হোসেন (তরফ মাহদী)।
৫৮. মু. হাছান মাহমুদ (তরফ মাহদী)।
৫৯. মৌলভী গোলাম হোসেন (তরফ মারু)।
৬০. মু. হাফেজ উদ্দিন (বোজর্গশেরপুর)।
৬১. মু. আমির উদ্দিন (খোর্দ্দশেরপুর)।
৬২. মৌলভী আবদুল বারী (তিতুলিয়া, ফরিদপুর)।
৬৩. হাজি হারাণ উল্লা (মুরাদপুর)।
৬৪. মু. আকবার আলী (গড়ার চকি)।
৬৫. মু. ইহছান উল্লা (নয়াপাড়া)।
৬৬. মু. নছিম উদ্দিন (নয়াপাড়া)।
৬৭. মু. আবদুল মাজেদ (নয়াপাড়া)।
৬৮. মু. ছমির উদ্দিন কবিরাজ (শেরপুর)।
৬৯. মু. ময়েন উদ্দিন (নজরমামুদ)।
৭০. মু. বাচ্চা মিঞা (এমাদপুর)।
৭১. মোহাম্মদ কালু মিয়াজী (বোজর্গশেরপুর)।
৭২. আবুল হোসেন সরকার (ফরিদপুর)।
৭৩. মু. আকবর আলী (কৌকুড়ী)।
৭৪. ইছাব উদ্দিন (ফরিদপুর)।
৭৫. শাফাত উল্লা প্রধান (ফরিদপুর)।
৭৬. মু. বছির উদ্দিন (খোর্দ্দা)।

Dhaka University Institutional Repository

৭৭. মু. শমশের উদ্দিন (খোর্দ্দা)।
৭৮. মু. রফিকুল হক (ঘগোয়া)।
৭৯. মু. ইনায়েত উল্লা তসিলদার (এমামগঞ্জ)।
৮০. মু. মহির উদ্দিন (তাম্বুলপুর)।
৮১. মু. রহিম উদ্দিন (বজরা)।
৮২. মু. জেলাল উদ্দিন (বজরা)।
৮৩. মোঃ ইছাব উদ্দিন মন্ডল (পুটিমারী)।
৮৪. মোঃ শরফদ্দিন (এমাদপুর)।
৮৫. মৌলভী হাফেজ উদ্দিন (বাইটকামারী)।
৮৬. মু. আছবর উল্লা (পত্নচড়া)।
৮৭. মু. বাদাশী মন্ডল (রছুলপুর)।
৮৮. মু. সাহেব উল্লা মন্ডল (পত্নিচড়া)।
৮৯. মু. আমির উল্লা আকন্দ (কোচারপাড়া)।
৯০. মু. মহব্বত আলী মিঞা (শ্রীরামপুর)।
৯১. মৌলভী আবদুছ ছামাদ (ধুতিচোরা)।
৯২. মু. আফাজ উদ্দিন (নুনগোলা, কোলার বাতা)।
৯৩. মু. আবদুল গফুর (নুনগোলা, কোলার বাতা)।
৯৪. হাজি রজব আলী (নারায়ণপুর)।
৯৫. মু. আবদুল অহিদ (টেঙ্গুরজানী)।
৯৬. কিশামত উল্লা সরকার (কান্দির হাট)।
৯৭. হাজি শহর উল্লা (নটাবাড়ী)।
৯৮. মু. আমির উল্লা মন্ডল (তেয়ানী)।
৯৯. মু. শফিক উদ্দিন (নটাবাড়ী)।
১০০. মু. তছির উদ্দিন (নজর মামুদ)।
১০১. মু. আবদুর রহমান হাজি (দেওডোরবা)।
১০২. মির মফিজুল হক (মন্দুয়ার)।
১০৩. মু. খোশাল আহমদ (খাশেরভিটা)।
১০৪. মু. ফজলে রহমান পন্ডিত (তাম্বুলপুর)।
১০৫. মৌলভী ফজলুর রহমান মিঞা (ধানঘর)।
১০৬. মু. ইনায়েত উল্লাহ (জিগাবাড়ী)।
১০৭. মু. আশমত উল্লা (কয়ামারী)।
১০৮. হেকিম মোহাম্মদ আবদুল গণি (গাইবান্ধা টাউন)।
১০৯. মু. ফজলে হক মন্ডল (চক মামরূজপুর)।
১১০. মু. এরফান আলী (রাজনগর)।
১১১. মু. বছির উদ্দিন মন্ডল (হরিপুর)।
১১২. হানিফ উদ্দিন সরকার (হরিপুর)।
১১৩. মু. ইউছুফ উদ্দিন অহমদ (মুরারীপুর)।
১১৪. মু. খাদিস হোসেন মন্ডল (হরিপুর)।
১১৫. মৌলভী মু. আবদুল কুদ্দুছ মন্ডল (পবনাপুর)।
১১৬. মু. বয়েন উদ্দিন আকন্দ (ঘোড়াবান্ধা)।
১১৭. মু. নাজির উদ্দিন আহমদ (ঘোড়াবান্ধা)।
১১৮. মৌলভী শেখ বছির উদ্দিন আহমদ (গুপিনাথপুর)।
১১৯. ডাক্তার বছর উদ্দিন আহমদ (গুপিনাথপুর)।
১২০. মৌলভী যাকারিয়া (ঝাড় বিছলা)।
১২১. মাওলানা ছমির উদ্দিন (ধর্মপুর)।

Dhaka University Institutional Repository

১২২. হাজি হছরতুল্লাহ (নটাবাড়ী)।[৩৩৭]

বিভিন্ন স্থান

১. মাওলানা আবদুল মাজিদ (পেশওয়ার)।
২. হাজি সূফী মির মোহাম্মদ (বাকওয়া, গয়া)।
৩. মৌলভী শাহ্ আবদুল ওয়াজিদ (দ্বারভাঙ্গা)।
৪. মাওলানা বদখশানি (বদখশান)।
৫. মৌলভী মোয়াজ্জেম হোসেন মাক্কী।
৬. মাওলানা বদরুদ্দীন (মক্কা, মিছফালা)।
৭. মাওলানা মোহাম্মদ ওমার বোখারী (বোখারা শহর)।

ইন্তিকাল

তিনি ১৯৩৪ খ্রী. হতে বহুমুত্র রোগে ভুগছিলেন। ১৯৩৮ খ্রী. তাঁর আরো কিছু রোগ দেখা দেয়। ফলে তিনি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েন। তখন তিনি চিকিৎসার জন্য কলকাতা গমন করেন এবং সেখানে কিছুদিন অবস্থান করেন। ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে তিনি ফুরফুরায় ফিরে যান। ১৯৩৯ খ্রী. মার্চ মাসের ৫,৬ ও ৭ তারিখে ইসালে সাওয়াব অনুষ্ঠানে হাজার হাজার ভক্তের সাথে তিনি নিয়ম মাফিক দেখা-সাক্ষাৎ করেন ও তাদের যথারীতি তা'লীম দেন। তিনি মাহফিলের আখেরী মুনাজাতও পরিচালনা করেন। ২৫ মুহাররাম, ১৩৫৮; ০৩ চৈত্র, ১৩৪৫; ১৭ মার্চ, ১৯৩৯ শুক্রবার প্রাতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ফুরফুরায় মিয়াপাড়া মহল্লায় তাঁকে দাফন করা হয়। এখনো প্রতি বৎসর ফাল্গুনের ২১,২২ ও ২৩ তারিখে সেখানে ইসালে সাওয়াব মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

শাহ অবূ বকর সিদ্দিকী (র.) সে যুগের একজন শ্রেষ্ঠ হাদী ও সমাজ সংস্কারক ছিলেন। কেউ কেউ তাঁকে সে যুগের অন্যতম মুজাদ্দিদ বলেও আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর কিছু কারামতেরও উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩৩৮]

৩৩৭. আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯
৩৩৮. দিওয়ান মুহাম্মদ ইব্রাহীম তর্কবাগীশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়
ফুরফুরার পীর সাহেবগণ

পর্যায়ক্রমে গদ্দীনশীন পীর ছাহেবান

১.হযরত মাওলানা শাহ সূফী আবূ নসর মুহাম্মদ আবদুল হাই সিদ্দিকী (রহ.),
২.হযরত মাওলানা আবুল আনসার মুহাম্মদ আবদুল কাহ্হার সিদ্দিকী (রহ.)
৩.হযরত মাওলানা আবুবকর আব্দুল হাই মিশকাত সিদ্দিকী (বর্তমানে গদ্দীনশীন পীর)

১ম পরিচ্ছেদ

আবু নসর মুহাম্মদ আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.)

উপমহাদেশের একজন মুহাক্কিক 'আলিম, বিখ্যাত ওয়ায়িয, সমাজ সংস্কারক, হক্কানী পীর ও সূফী; উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যাঁর বিশেষ অবদান অবিস্মরণীয়, তিনি হচ্ছেন, হযরত মাওলানা আবু নসর মুহাম্মদ আবদুল হাই সিদ্দিকী।

জন্ম

তিনি পৌষ ১৩১০ বাং, ১৩২৩ হিঃ, মুতাবিক ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতের পশ্চিম বাংলার হুগলী জিলার ফুরফুরা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাওলানা শাহ্ সূফী আবু বকর সিদ্দিকী (র.), যিনি আমীরুশ শারী'আহ ও মুজাদ্দিদে যামান বলে খ্যাত। তাঁর মাতা নেজিয়া খাতুনও বিদূষী মহিলা ছিলেন। কথিত আছে যে, পিতা-মাতা উভয়েরই বংশীয় নিসবাত ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর সাথে রয়েছে। সে কারণে তাঁরা সিদ্দিকী উপাধী ধারণ করে আসছেন। আবদুল হাই পিতার জেষ্ঠ্য পুত্র।[৩৩৯]

নাম ঃ আবদুল হাই।
কুনিয়াত ঃ আবু নসর।
বংশীয় উপাধী ঃ সিদ্দিকী আল কুরায়শী, তবে তিনি বড় হুযূর নামে খ্যাতি অর্জন করেন।
সামাজিক উপাধী ঃ আমীরুস শারী'আহ্, শায়খুল আরিফীন, কাইয়ূমে যামান, শায়খুল ইসলাম, সুলতানুল আরিফীন, হাকীমুল ইনসান, রাহনুমায়ে হিযবুল্লাহ্, পীরে কামিল, শাহ্ সূফী ইত্যাদি।

তাঁর পিতা মুজাদ্দিদে যামান (র.) বলতেন– "বাবা আবদুল হাই আমার কা'বার গিলাফ ধরা সন্তান।" কারণ তিনি বিবাহিত জীবনে দীর্ঘদিন পুত্র সন্তান হতে বঞ্চিত ছিলেন। অতঃপর বাংলা ১৩০৯ সালে পবিত্র হজ্জে গমন করেন। সে সময় তিনি কা'বা শরীফের গিলাফ ধরে নেক সন্তানের বাসনায় দরবারে ইলাহীতে ব্যাকুল হয়ে কামনা করেন। আল্লাহ্তা'আলা তাঁর মাহবুবের দু'আ মঞ্জুর করেন। হজ্জের পরের বছর মুজাদ্দিদে যামান যখন ৪৫ বছর বয়সে উপনীত হন, তখন মাওলানা আবদুল হাই সিদ্দিকী সাহেব জন্মগ্রহণ করেন। যিনি মুজাদ্দিদে যামান, পীর আবু বকর সিদ্দিকী (র.)-এর কা'বার গিলাফ ধরা সন্তান "বড় হুযূর" নামে বিখ্যাত।[৩৪০]

শিক্ষা জীবন

বাল্যকাল থেকেই বড় হুযূর অত্যন্ত মেধাবী ও বিনয়ী ছিলেন। খানদানী রিওয়াজ মুতাবিক তিনি প্রথমে স্বগৃহে মাওলানা আবদুল গফুর (যশোর) ও নোয়াখালীর মাওলানা হাফিজুল্লাহ সাহেবদ্বয়ের নিকট 'ইল্‌মে দীনের তা'লীম গ্রহণ করেন। ৬ বছর বয়সে তাঁকে ফুরফুরা মাদ্রাসায় ভর্তি করানো হয়। এখান থেকে প্রাথমিক শিক্ষা

৩৩৯. কুরআন হাদীস রিসার্চ সেন্টার, *খলিফাতুল্লাহ* (ঢাকা: ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, দারুস সালাম, মিরপুর, সন নেই), খন্ড, ০১, পৃ. ১৮
৩৪০. মোঃ মুবারক আলী রহমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪

Dhaka University Institutional Repository

শেষে তিনি পেশোয়ারের মাওলানা আবদুল মজিদ সাহেবের কাছে তাফসীর এবং ২৪ পরগনার মাওলানা সরওয়ার সাহেবের নিকট ফিক্হ ও উসূলে-ফিক্হ প্রভৃতি বিষয়ে তা'লীম হাসিল করেন।

অতঃপর তাঁকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি করিয়ে দেয়া হয়। তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের সাথে মাদ্রাসা আলিয়ায় অধ্যয়ন করেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল অত্যন্ত সুমিষ্ট। তিনি যখন সুমধুর কণ্ঠে শে'র-আশ'আর পড়তেন, তখন নীরব-নিস্তব্ধে মানুষ তা শ্রবণ করতেন। ছাত্র জীবন থেকে তাঁর আদব-আখলাক ছিল উন্নত আদর্শের। ফলে ওস্তাদ ও ছাত্রমহলে তিনি প্রিয়জনরূপে পরিচিতি লাভ করেন। খেল-তামাশায় তিনি জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট না করে শে'র-আশ'আর ও কিতাব পাঠে সময় কাটাতেন।

মাদ্রাসা শিক্ষা সমাপ্ত করে কুড়ি বছর বয়সে বাংলা ১৩৩০ সালে তিনি পিতার সাথে পবিত্র হজ্জে গমন করেন। পিতা মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর কা'বার গিলাফ ধরা সন্তান প্রাণপ্রিয় বড় হুযূরকে নিয়ে কা'বার মালিকের দরবারে দু'আ-শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন এবং বিশেষ অনুমতিক্রমে কতিপয় বিশিষ্ট খলীফা ও বড় হুযূর সাহেবসহ মদীনা মুনাওয়ারায় নবী করীম (স.)-এর রওযা মুবারক মস্জিদে নববীতে সারারাত মুরাকাবা, মুশাহাদা ও যিক্র-আযকারে যাপন করেন। মুজাদ্দিদে যামান, নবী (স.)-এর রওযা মুবারকে একরাত একদিন সমানে বসিয়ে বড় হুযূরকে 'ইল্মে লাদুনির ফয়েজ প্রদান করেন।[৩৪১]

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে বড় হুযূর মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর সান্নিধ্যে থেকে সিহাহ্ সিত্তাহ্, ফিক্হ ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করে গভীর জ্ঞানার্জন করেন। অতঃপর তিনি স্বীয় পীর ও মুর্শিদ মুজাদ্দিদে যামানের খিদমতে থেকে 'ইল্মে বাতিনী ও 'ইল্মে যাহিরীর তা'লীম পেতে থাকেন এবং তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আসামের দিক-দিগন্তে তথা প্রান্তে প্রান্তে ইশা'আতে ইসলামের খিদমতে আত্মনিয়োগ করেন। বাংলা ১৩৩০ সাল থেকে ১৩৪৫ সাল পর্যন্ত প্রায় পনেরো বছর কঠিন মেহনত ও রিয়াযত করে কামালাত ও খিলাফাত হাসিল করেন।

সে সময় ইশা'আতে ইসলাম তথা সভা-সমিতি ও মাহ্ফিলে ওয়ায-নসিহতের রাস্তা অত্যন্ত দুর্গম ছিলো। মহৎ অথচ কঠিন ব্রত নিয়ে আরাম-আয়েশ পরিত্যাগ করে পিতার মহান শিক্ষায় জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। পিতার জীবদ্দশায় তাঁর অনেক কাজের সহায়তা করতেন। এমনকি মুরীদগণকে বাতিনী তা'লীম দিতেন। অনেক সময় তাঁর অনুমতিক্রমে বয়াতও করতেন।[৩৪২] তিনি মহান পিতার দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে জীবনের শেষ নিঃশ্বাসটি পর্যন্ত ইশা'আতের রাহে ত্যাগ করে গিয়েছেন।[৩৪৩]

১৩৩৮ সালের কার্তিক মাসে আসাম সফরে গৌহাটির জনাব আবদুল মল্লিক সাহেবের বাসায় (সোসাইটি বেকারী) বড় হুযূর তাঁর জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন– "বাবা! সে সময় সফর করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিলো। রাস্তাঘাট দুর্গম, এখনকার মতো যানবাহন তো মোটেই ছিলো না। মালদহ জেলায় একদিন আমাকে ষাট মাইল গরুর গাড়ীতে যাতায়াত করে মাহ্ফিল করতে হয়েছে। কোনো কোনো সময় একাধারে গরুর গাড়ীতে প্রায় দু'শত মাইল পর্যন্ত সফর করতে হয়েছে। দু-চারদিন যেতে না যেতেই সঙ্গের অনেকে অসুস্থ হয়ে বিদায় নিয়েছে। আল্লাহ্র মেহেরবানী আর আমার পীরের উসিলায় আমি এমনিভাবে মাসের পর মাস ওয়ায-মাহ্ফিল করে চলেছি।"[৩৪৪]

মুজাদ্দিদে যামান বড় হুযূরকে 'ইত্তেহাদী' ফয়েয প্রদান করেন। ফলে তিনি বে-খেয়াল, বে-তাব দিওয়ানা হন। অনেকদিন তিনি দিওয়ানা মাস্তানের ন্যায় বিচরণ করতেন। এমনকি খাওয়া-দাওয়ায় তাঁর খেয়াল থাকতো না। প্রসঙ্গতঃ বড় হুযূর বলেন– "আমার মাস্তী হালাত দেখে আম্মাজান খুবই বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি আমাকে ধরে ধরে ভাত খাওয়াতেন, কখনও দু-চার লোকমা খেতাম, কখনও মুখের লোকমা ফেলে দিয়ে পালিয়ে

৩৪১. মৌঃ আবদুস সাত্তার, পীর সাহেবের জীবন চরিত, পৃ. ১০৫

৩৪২. মৌঃ আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৭-১০৮

৩৪৩. কুরআন হাদীস রিসার্চ সেন্টার, *ওপেন সিক্রেট* (ফুরফুরা শরীফের পীর আবদুল হাই সিদ্দিকীর কিছু জানা, কিছু অজানা ঘটনা ও বাণীর দুর্লভ সংকলন), প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, ২০০১ খ্রী.), পৃ. ৩৮

৩৪৪. মোঃ মোবারক আলী রহমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫

Dhaka University Institutional Repository

যেতাম। আমার মাস্তী হালাত দেখে ওয়ালেদ সাহেব আম্মাজানকে বলেন–'হ্যাগো! ছেলেটির ওপর জোর ইত্তেহাদী ফয়েয পড়ে গেল। ওর দিকে একটু খেয়াল রেখো।"[৩৪৫]

খিলাফত লাভ

মুজাদ্দিদে যামান (র.) ১৯৩৭ সালে ঈসালে সওয়াবের মঞ্চে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন– "আমার স্থানে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র মাওলানা আবদুল হাই সিদ্দিকী এ সমুদয় কার্য সম্পাদন করবেন।"[৩৪৬] ইতিপূর্বে মুজাদ্দিদে যামান (র.) হজ্জে যাওয়ার প্রক্কালে বাংলা ১৩২৯ সালের ২৩শে ফাল্গুন রাতে বড় হুযূরকে তাঁর কায়েম মাকাম (স্থলাভিষিক্ত) স্থির করে যান।[৩৪৭] মুজাদ্দিদে যামানের ইন্তিকালে খান বাহাদুর মাওলানা আহমদ আলী এনায়েতপুরী সাহেবের প্রস্তাবে, শর্ষীণার হযরত মাওলানা নিসার উদ্দীন আহমদ সাহেবের সমর্থনক্রমে এবং মুফতী আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী (মেজ হুযূর), সূফী আবদুল জব্বার সিদ্দিকী , মাওলানা হাজী আবদুল ওয়াহেদ ফারুকী প্রমুখ আলিমগণসহ জানাযা নামাযে সমবেত সমস্ত ব্যক্তিদের সর্বসম্মতিক্রমে বড় হুযূর হযরত মাওলানা আবদুল হাই সিদ্দিকী সাহেবকে গদ্দীনশীন (বা কায়েম মাকাম) মনোনীত করা হয়।[৩৪৮] উপস্থিত সকলে তাঁর হাতে তাজদীদে বায়'আত গ্রহণ করেন।[৩৪৯]

মহান পীরের সার্থক উত্তরাধিকারী বড় হুযূরকে মুজাদ্দিদে যামান (র.) হজ্জে যাওয়ার প্রাক্কালে তাঁর কায়েম মাকাম মনোনীত করে যান; সে সূত্রে তাঁকে ১৩৪৫ সালে 'গদ্দীনশীন' নির্বাচন করা হয়। বড় হুযূরের দূরদর্শিতা অত্যন্ত প্রখর ছিল, ফলে তিনি অনেক সময় বলতেন– "গদ্দীনশীন যদি লোকের দেয়া হয়, আমি তা চাই না। আর যদি আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আমার পীরের দেয়া হয়, আমি তার হকদার।" তিনি শেষ জীবনে গদ্দীনশীন প্রথার সুফল ও কুফল সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করে মহান পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ কল্পে তাঁর দেয়া 'কায়েম মাকাম' মাথায় নিয়ে ১৯৬৭ সালে হজ্জে যাওয়ার প্রাক্কালে মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর ঘোষিত স্থান থেকে গদ্দীনশীন সম্বন্ধে ঘোষণা করেন– "বিভিন্ন দুনিয়াবী পীরদিগের মধ্যে গদ্দীনশীন প্রথা নিয়ে বিরাট দলাদলি সৃষ্টি হয়, অতএব আমাদের ফুরফুরা শরীফের সিলসিলার মধ্যে কোনো গদ্দীনশীন থাকবে না, তা আমি তুলে দিলাম।"[৩৫০] মুজাদ্দিদে যামান যেমন নির্দোষ শব্দ 'কায়েম মাকাম' ব্যবহার করতেন, তদ্রুপ বড় হুযূরও 'কায়েম মাকাম' শব্দটি পছন্দ করতেন।[৩৫১]

কর্মময় জীবন বা বাস্তব জিন্দিগী

তাঁর পিতার ইন্তিকালে (২৫শে মুহাররম'১৩৪৫/১৭ই মার্চ'১৯৩৯) তিনি পিতার স্থলাভিষিক্ত হন এবং পিতার আরদ্ধ কার্যাবলী সম্পন্ন করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। পিতার ন্যায় তিনিও শিরক, বিদ'আত ও কুফরীর বিরদ্ধে সংগ্রাম করেন। সমাজে বিরাজিত যাবতীয় অপসংস্কৃতি, কুসংস্কার ও ইসলাম বিরোধী আচার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হন। খৃষ্টান মিশনারীদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধেও তিনি রুখে দাঁড়ান।

তাঁর পিতার ইন্তিকালে আঞ্জুমানে ওয়ায়িযীন ও জমিয়তে ওলামায়ে বাংলার সভাপতির দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পিত হয়। এ সময়ে যশোর, নদীয়া, দিনাজপুর, বগুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে খৃষ্টান মহিলা মিশনারীরা পলদীতে যেয়ে সরলমনা মুসলিম মহিলাদেরকে খৃষ্টান বানানোর চেষ্টা করছিলো। তিনি আঞ্জুমানে ওয়ায়িযীনের সদস্যগণকে এ অঞ্চলে প্রেরণ করেন। ফলে খৃষ্টান মহিলাদের এ প্রচেষ্টা অনেকটা ব্যর্থ হয়। তাঁর নেতৃত্বে জমিয়ত ওলামা ভারতে মুসলিম স্বাধীন রাষ্ট্র কায়িমের আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। তদানিন্তন নিখিল বাংলা ও আসামে তাঁর জমিয়তে ওলামা শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয়। জমিয়তে ওলামায়ে বাংলার লক্ষ্য ছিল শারী'আতী সমাজ গঠন ও স্বাধীনতা অর্জন। ১৯৪৬ খৃষ্টব্দে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে পশ্চিম বাংলা, আসাম ও পূর্ববঙ্গ

৩৪৫. মৌঃ আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০
৩৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬
৩৪৭. প্রাগুক্ত,পৃ. ৪৬
৩৪৮. শরিয়তে ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬-৭৭
৩৪৯. দেওয়ান মুহাম্মদ ইব্রাহীম তর্কবাগীশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১-১২
৩৫০. পীরজাদা বাকিবিল্লাহ সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৮
৩৫১. মোঃ মোবারক আলী রহমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭

Dhaka University Institutional Repository

(বর্তমানে বাংলাদেশ) হতে পাকিস্তান সমর্থকারীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভের পশ্চাতে তাঁর অশেষ অবদান ছিল।[৩৫২]

তিনি বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। যেমন- জমিয়তে ওলামায়ে হানফিয়া, সিদ্দিকীয়া নূরুল ইসলাম বায়তুল মাল, হিযবুল্লাহ্ প্রভৃতি। মানবজাতির কল্যাণে তিনি নিবেদিত ছিলেন। তাই তিনি ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে খিদমতে খালক ও ইশা'আতে ইসলামের জন্য বিশ্ব ইসলামী মিশন কুরআনী সুন্নী জমি'আতুল মুসলিমীন হিযবুল্লাহ্ গঠন করেন। লিখনী, বক্তৃতা, পত্রিকা প্রকাশ, গবেষণা ও মানব সেবার মাধ্যমে সুন্দর ব্যবহার ও হিকমাতের সাথে মানুষকে আল্লাহ্র পথে আহবান করাই ছিলো এ প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

তিনি বাংলা ভাষায় পত্র-পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগও গ্রহণ করেন। ১৯৬২ সালে তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে কলকাতা হতে 'নেদায়ে ইসলাম' নামক একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। অদ্যবধি কলকাতা ও ঢাকা হতে পৃথক পৃথক ভাবে এ মাসিক পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দে ঢাকা থেকে তাঁর নির্দেশে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'মানবতা'। তাঁর রচিত বহু প্রবন্ধ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর নির্দেশে ও তত্ত্বাবধানে প্রচুর ইসলামী পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ভারত ও বাংলাদেশের বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা। নারী শিক্ষার প্রতি তিনি অত্যধিক জোর দিতেন। তিনি বলতেন, "কেবলমাত্র পুরুষ শিক্ষা ও প্রগতির দ্বারা সমাজের জাগরণ আসে না। নারী জাতিরও শিক্ষা সংস্কারের বিশেষ প্রয়োজন।"[৩৫৩]

তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ফুরফুরার অদূরে অবস্থিত চকতাজপুর নামক স্থানে পশ্চিম বঙ্গ সিদ্দীকা গার্লস হাই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ মাদ্রাসার ছাত্রীদের জন্য এর সংলগ্ন ছাত্রী নিবাসও নির্মাণ করা হয়। পশ্চিম বঙ্গে নিউস্কীম মাদ্রাসাগুলির সরকারী অনুমোদনের জন্য তিনি আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালান। ফলে প্রায় কয়েকশত নিউস্কীম মাদ্রাসা সরকারী অনুমোদনের সুযোগ পায়।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারত বিভক্তির পর ইসলামী শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র কলকাতা 'আলিয়া মাদ্রাসা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা শহরে স্থানান্তরিত হলে পশ্চিম বাংলার মুসলিমরা ইসলামী শিক্ষা গ্রহণে এক সংকটের সম্মুখীন হয়। তিনি মুজাহিদে মিল্লাত মাওলানা বজলুর রহমান দরগাহপুরী, ধর্মতলা শাহী মস্জিদের ইমাম ক্বারী মহিউদ্দীন, মাওলানা মুফতী আবদুর রশিদ, হাজী আবদুল্লাহ প্রমুখ ব্যক্তিদের আপ্রাণ প্রচেষ্টায় এবং তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী মাওলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেবের ব্যবস্থাপনায়, মাদ্রাসা আলিয়া কলকাতায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মাদ্রাসার ছাত্রাবাস খোলা হয়। মাদ্রাসা পুনঃ প্রতিষ্ঠায় বড় হুযূরের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণে এবং উক্ত মনীষীদের প্রচেষ্টায় কলকাতা মাদ্রাসা আলিয়া তার হৃতগৌরব ফিরে পায়। ফলে বাংলা ও বহির্বঙ্গের হাজার হাজার ছাত্র 'আলিম হওয়ার সুযোগ লাভে ধন্য হয়েছে এবং হচ্ছে।[৩৫৪]

বড় হুযূর উভয়বঙ্গ ও আসামে অসংখ্য মাদ্রাসা, খানকাহ, পাঠাগার, স্কুল, চিকিৎসালয় প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান কায়িম করে গিয়েছেন। তার সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা খুবই দুরূহ। নিম্নে কতিপয় বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করা হলো:-

১. উলুবেড়িয়া হাজী ইসহাক দারুল 'উলুম সিনিয়র মাদ্রাসা, হাওড়া।
২. ডানকুনি সিদ্দিকীয়া সিনিয়র মাদ্রাসা, হুগলী।
৩. বনগ্রাম হযরত পীর আবু বকর দারুল 'উলুম সিনিয়র মাদ্রাসা, চব্বিশ পরগনা।
৪. হাসনেচা সিদ্দিকীয়া সিনিয়র মাদ্রাসা, চব্বিশ পরগনা।
৫. উলাসী সিদ্দিকীয়া সিনিয়র মাদ্রাসা, নদীয়া।
৬. দোঁক সিদ্দিকীয়া সিনিয়র মাদ্রাসা, হুগলী।
৭. কলুবাটী সিদ্দিকীয়া সিনিয়র মাদ্রাসা।
৮. ভগবতীপুর ইউনিয়ন হাই মাদ্রাসা।

---

৩৫২. আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬
৩৫৩. সিরাজুল ইসলাম, *হযরত মাওলানা আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.)-এর জীবন ও বাণী* (কলকাতা: মুজাদ্দিদীয়া লাইব্রেরী, ১৯৮৩ খ্রী.), পৃ. ৩১
৩৫৪. আবু সালেহ মোঃ রেজওয়ানুল করীম, *মোমতাজুল মোহাদ্দেসীন ছাত্র পরিচিতি* (কলকাতা: আলীয়া মাদ্রাসা লাইব্রেরী, ১৯৭১ খ্রী.), পৃ. ১৬

Dhaka University Institutional Repository

৯. শীতলপুর সিনিয়র মাদ্রাসা, হুগলী।
১০. কুপিলা সিদ্দিকীয়া সিনিয়র মাদ্রাসা, মুর্শিদাবাদ।
১১. পুমাইপুর সিদ্দিকীয়া সিনিয়র মাদ্রাসা, মুর্শিদাবাদ।
১২. জয়দেবপুর সিনিয়র মাদ্রাসা, পশ্চিম দিনাজপুর।
১৩. বনপুরা নসরুল্ 'উলুম সিদ্দিকীয়া মাদ্রাসা, মেদেনীপুর।
১৪. কামারখালী নাসরুল ইসলাম সিদ্দিকীয়া মাদ্রাসা, ফরিদপুর প্রভৃতি।

মাওলানা আবদুল হাই সিদ্দিকী পশ্চিম বঙ্গ, আসাম, বিহার ও বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্তরকে 'ইল্ম ও তাসাউফের শিক্ষা দ্বারা উদ্ভাসিত করেছেন। তাঁর মুরীদের সংখ্যা অসংখ্য। ভারত ও বাংলাদেশ ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও তাঁর ভক্ত ও মুরীদ আছে। তিনি মুরীদগণকে কাদিরিয়া, নকশাবন্দীয়া, মুজাদ্দিদিয়া ও মুহাম্মাদীয়া তরীকার সবক দিতেন। বিভিন্ন স্থানে তিনি খানকাহ স্থাপন করেন। পাবনা জিলার পাকশীতে স্থাপন করেন একশত স্তম্ভ বিশিষ্ট একটি খানকাহ। এর নাম দেন 'রিয়াযুল জান্নাত।' ঢাকার মীরপুর এলাকায় অবস্থিত দারুস সালামেও তিনি একটি খানকাহ স্থাপন করেন। এ খানকাহতে প্রতি বৎসর ঈসালে সওয়াব-এর মাহ্ফিল অনুষ্ঠিত হয়।

তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ওয়ায়িয ছিলেন। তাঁর ওয়ায শুনার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষের ভীড় জমতো। সকল শ্রেণীর মানুষের অন্তরে তাঁর ওয়ায এমনভাবে রেখাপাত করতো যে, শ্রবণকারীর অনেকেই সত্যিকারের ইসলামী যিন্দিগীতে ফিরে আসে। আজীবন তিনি দীন ইসলামের বাণী পৌঁছিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে নিরলসভাবে ভারতের নানা জায়গায় এবং বাংলাদেশের গ্রাম হতে গ্রামান্তরে ওয়ায নসীহত করে মানুষকে আল্লাহ্র পথে আহবান করেছেন। তিনি তাঁর অধিকাংশ সভাতেই কুর'আন ও সুন্নাহ্র আলোকে মানুষের কর্তব্য ও দায়িত্ব এবং মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কে বক্তব্য রাখতেন। রাজনীতিও বাদ যেত না। তিনি বলতেন, "স্বাধীনতা ও মানবতা দুটি কথা। যেখানে স্বাধীনতা নেই, সেখানে মানবতা নেই আর মানবতাহীন স্বাধীনতা মূল্যহীন।"[৩৫৫] তবে পেশাদার রাজনৈতিক নেতাদের ন্যায় তিনি রাজনীতি করতেন না, কিন্তু রাজনীতির মঞ্চে তাঁর রাজনৈতিক মতবাদের যথেষ্ট গুরুত্ব ছিলো যা রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি যথেষ্ট প্রভাব পড়তো। ফলে বড় বড় রাজনৈতিক নেতারা তাঁর দরবারে হাজিরা দিতেন, পরামর্শ ও দু'আ নিতেন। তিনি অত্যন্ত সাধাসিধা জীবন যাপন করতেন। ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে তিনি দ্বিতীয়বার হজ্জ পালন করেন। তাঁর জীবনে বহু কারামত প্রকাশিত হয় বলে তাঁর জীবনী গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত হয়েছে। কেউ কেউ তাঁকে 'কাইয়ূমে যামান' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষের যাতায়াত তাঁর দরবারে হতো। তিনি সবার সাথে হসিমুখে মিষ্টি মধুর আলাপন করতেন। তাঁর সংস্পর্শে যারা এসেছেন, সকলে তাঁর ব্যবহারে ও গুণে মুগ্ধ হয়ে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাই আমরা দেখতে পাই তাঁর ইন্তিকালের সংবাদ শুনে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষকে শোকাতুর হতে।[৩৫৬]

ইসলাম মিশন

শায়খুল আরিফীন বড় হুযূর দীন ও মিল্লাতের সার্বিক উন্নতি-বিধানকল্পে সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গিতে ইংরেজী ১৯৬৩ সালে (অধুনা) বাংলাদেশের মাটিতে 'ইসলাম মিশন' প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশে মিশনের কাজে ব্যাপক সাঁড়া পড়ে যায়। বিভিন্ন জেলায় শাখা প্রতিষ্ঠা হয়। ব্যাপক কর্মসূচীর মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানে গঠনমূলক কাজ আরম্ভ হয়ে যায়। ফলে সর্বত্র মিশনের সুনাম ও সুযশ ছড়িয়ে পড়ে। পশ্চিম বঙ্গ-ভারতে মিশনের তেমন প্রভাব না পড়লেও বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে মিশনের দাওয়াত পৌঁছে যায়। প্রতিনিধি প্রেরণ ও শাখা কমিটি গঠনের কাজ চলতে থাকে।

৩৫৫. মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০
৩৫৬. মোঃ মোবারক আলী রহমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩

Dhaka University Institutional Repository

মিশনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়– পাকশী খানকাহ শরীফ, জেলা পাবনা, বাংলাদেশ। ১৯৭০ সালের এক প্রস্তাববলে মিশনের নাম 'বিশ্ব ইসলাম মিশন, কুরআনী সুন্নী জমিয়তুল মুসলিমীন হিজবুল্লাহ্' রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সাধারণতঃ বিশ্ব ইসলাম মিশন মানব কল্যাণ সংস্থা নামে পরিচিত।

বিশ্ব ইসলাম মিশনের ব্যাখ্যায় তিনি বলতেন, কুর'আন ও সুন্নাহ্ অনুসারী আল্লাহ্ওয়ালা মুসলিমের দল। মিশনের প্রধান উদ্দেশ্য তাকরীরি বা ওয়ায নসীহতের মাধ্যমে দীন ও মিল্লাতের খিদমত। তাহরীরি বা লিখনীর মাধ্যমে পত্র-পত্রিকা, বই-পুস্তক প্রকাশ করে ইসলমের মহিমা বিকাশ। খিদমতে খাল্‌ক– আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে ভালোবাসা, সেবা করা, কল্যাণ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য এবং অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কর্মসূচী গ্রহণ। বিশ্ব ইসলাম মিশন বাংলাদেশে গঠিত এবং কাতার, সৌদি আরব, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। খুলনা সদরের নূরপুরে মিশনের প্রেস, ইয়াতিমখানা, দাতব্য চিকিৎসাকেন্দ্র প্রভৃতি খাতে আড়াই তিন লাখ টাকারও অধিক ব্যয় করে দ্বিতল বিল্ডিং স্থাপন করেন।

ঢাকা, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, পাবনা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি প্রতিটি জেলায় মিশনের কাজ চলতে থাকে। ইদানিং ঢাকার মিরপুরে 'দারুস সালাম' খানকাহ্ শরীফে কয়েক কোটি টাকা প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে।

বড় হুযূর নামের চেয়ে কাজ পছন্দ করতেন বেশি। মিশনের নাম-ধামের তুলনায় কাজ হলে তাঁর ইচ্ছা পূরণ হবে। বড় হুযূর বলতেন "তোমরা আল্লাহ্‌র হও, না হয় আল্লাহ্ওয়ালার হও। আল্লাহ্ তোমাদের তারাক্কী দেবেন। আল্লাহ্ওয়ালা না হয়ে পীর সাজতে যেয়ো না। খুশবু হও ; তোমাকে চেঁচাতে হবে না; লোকে খুশবু খুঁজে নিবে।"[৩৫৭]

সুলতানুল আরিফীন ন'হুযূরকে আবেগভরা কণ্ঠে বলতে শুনেছি– "বড় হুযূর জীবনে অনেক টাকা পয়সা নাড়াচাড়া করেছেন, দু'হাতে সব খরচ করে গিয়েছেন। আয়াশ, আরাম 'জানে' দেন নি। জীবনে তিনি যে কষ্ট-মেহনত করে সভা-মাহফিল করে বেড়িয়েছেন, এমন কষ্ট কেউ স্বীকার করবে না। বাড়িতে এবং অন্যান্য জায়গায় প্রতিষ্ঠানগুলো তাঁরই গড়া, তেমন আর কেউ করেনি।"

আসামের এক জলসায় বড় হুযূর সন্তুষ্টচিত্তে স্বপ্রতিভ হয়ে আমাকে বলেন– "বাবা! আমার জীবনী লিখ, আমার সাথে থাকতে হবে।" হুযূরের কথায় সম্মতি দিয়ে আরজ করেছিলাম, হুযূর দু'আ করুন; আমার 'হায়াতে একরাম' বইখানা এবারই ছাপা হবে, তারপর আমি আপনার সাথে থাকব। সত্য বলতে গেলে আমার মনে তখন খেয়াল হয়েছিল– হুযূর হায়াতে থাকতে নিজের জীবনী লিখার আদেশ করছেন; এ কেমন কথা! এ ছিল কার্তিক মাসের কথা। মাত্র ছয় মাস পরেই তিনি আমাদের থেকে যখন বিদায় নিলেন,তখনই বুঝতে পারলাম, তাঁর অগ্রীম সিগন্যাল; আসলে আমরা ওলীগণের কথার তাৎপর্য বুঝতে পারি না।[৩৫৮]

ইন্তিকাল

১৯৭৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই মে এক সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে তিনি কলকাতার সেন্ট ম্যারিস নার্সিং হোমে ভর্তি হন এবং পরের দিন অর্থাৎ ১৩ই মে' ১৯৭৭ আকাশবাণী কলকাতা থেকে ঘোষণা হলো– "আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেব মাওলানা আবু নসর মুহাম্মাদ আবদুল হাই সিদ্দিকী গত রাত এগারোটায় সেন্ট ম্যারিস নার্সিং হোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। রবিবার (১৫ই মে) দ্বিপ্রহরের পর ফুরফুরা শরীফে তাঁর নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হবে।"[৩৫৯] ফুরফুরার আকাশ থেকে শুকতারা খসে পড়লো। লক্ষ লক্ষ মানুষ শোকাতুর, আপনজনকে হারিয়ে পাগলপারা।

তিনি ইংরেজী ১৯৭৭ সালের ১৩ই মে, মুতাবিক বাংলা ১৩৮৪ সালের ৩০শে বৈশাখ, হিজরী ১৩৯৭ সালের ২৪শে জমাদিউল আউয়াল শুক্রবার দিবাগত রাত প্রায় দশটা পঞ্চাশ মিনিটে ইন্তিকাল করেন। 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজি'উন।' ১৫ই মে রবিবার বাদ যোহর প্রায় লক্ষাধিক লোকের জামায়েতে তাঁর বড় সাহেবজাদা

---

৩৫৭. দিওয়ান মোহাম্মদ ইব্রাহীম তর্কবাগীশ, *হযরত আবদুল হাই সিদ্দিকীর জীবনী ও বক্তৃতা* (রংপুর: জৈনপুর কুতুবখানা, ১৯৭৭ খ্রী.); পৃ. ৩৫
৩৫৮. মুফতী আহমদ ইয়ার খান, *আউলিয়ায়ে কিরামের ওসীলায় খোদার রহমত* (চট্টগ্রাম: মুহাম্মদী কুতুবখানা, ২০০৫ খ্রী.), পৃ. ৬৮
৩৫৯. আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান, প্রাগুক্ত, ১৬৮

Dhaka University Institutional Repository

আলহাজ্জ মাওলানা আবুল আনসার মুহাম্মদ আবদুল কাহ্হার সিদ্দিকী সাহেব জানাযা সম্পন্ন করেন এবং ছোট হুযূর সওয়াব রেসানী করেন। অতঃপর তাঁকে তাঁর পিতা মুজাদ্দিদে জামান হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (র.)-এর ডান পার্শ্বে (পশ্চিম দিকে) দাফন করা হয়। ইন্তিকালের সময় তিনি চার পুত্র, এক কন্যা, স্ত্রী-পরিজনসহ লক্ষ লক্ষ ভক্ত মুরীদান রেখে যান।[৩৬০]

সংস্কারমূলক কর্মসূচী

সাড়ে সাত বছরের মুসলিম শাসনামলে ভারতীয় উপমাহাদেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে মুসলিমগনের যে এক চেটিয়া দখলদারিত্ব ছিলো–১৯৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে তার দৃঢ় ভিত নড়ে যায় প্রচন্ডভাবে। গোলামী জিঞ্জিরে আবদ্ধ হয়ে হারানো গৌরবের শোকে মুহ্যমান মুসলিম জাতি একদিকে হয়ে পড়ে নিষ্ক্রিয়, অপরদিকে ইংরেজদের অত্যাচার-উৎপীড়ন, জেল-যুল্ম, বেপরোয়া ফাঁসী এবং হিন্দুদের মুসলিম নিধন যজ্ঞে মুসলিমরা একে একে হতে থাকে দুর্বল। ধর্ম চিন্তা, নৈতিকতা, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে দেখা দেয় চরম বন্ধ্যাত্ব ও অধঃপতন।

১৭৯৯ সালে শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ (র.)-এর চিন্তাধারা অনুযায়ী মহীশুরের টিপু সুলতানের ইংরেজদের কাছে পরাজয় এবং সর্বশেষ ১৮০৫ সালে দিল্লী ইংরেজদের দখলে চলে গেলে মুসলিমদিগের অবশিষ্ট মনোবল একেবারে চুর্ণ বিচুর্ণ হয়ে যায়। ১৮৩১ সালে বালাকোটের ময়দানে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী (র.)-এর শাহাদাত এবং পরবর্তীতে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে যাবার পর উপমহাদেশে মুসলিমগণের রাজনৈতিক জীবনের ন্যায় শিক্ষা, সংস্কৃতি, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনও সংকীর্ণ ও দুর্বিসহ হয়ে ওঠে।[৩৬১]

এমনই এক পরিস্থিতিতে শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.) যখন কর্মজীবনে প্রবেশ করলেন, তখন সমাজের যে অবস্থার চিত্র তাঁর চোখের সামনে ফুটে ওঠলো তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

১. মুসলিমরা শিক্ষা দীক্ষায় চরমভাবে পিছিয়ে পড়েছিলো। মুসলিমগনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা মাদ্রাসার সংখ্যা ছিলো একেবারে নগন্য।

২. হিন্দুরা সর্বপ্রকার সুযোগ পেয়ে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করে সমাজের অধিকাংশ বড় বড় পদসহ জমিদারী পর্যন্ত বাগিয়ে নিয়েছিলো। অপরদিকে মুসলিমরা হয়ে পড়েছিলো অস্পৃশ্য, মুর্খ ও নির্যাতিত গরীব প্রজা। হিন্দু রাজা ও জমিদাররা মুসলিমদের ঐতিহ্য ধ্বংস করার জন্য অর্থনৈতিক নিপীড়নের সাথে সাথে ধর্মীয় ব্যাপারে বিপর্যয় ঘটানোর সর্বত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলো।

৩. আশরাফ-আতরাফের শ্রেণীভেদ, বংশ গৌরব ও জাতি বৈষম্য মুসলিম সমাজকে জর্জরিত করে তুলেছিলো। কুলি, তাঁতী, তৈলী, চাষী প্রভৃতি পেশাজীবী লোকদের হেয় দৃষ্টিতে দেখা হ'তো এবং তাদের সাথে কোনো আত্মীয়তা করতে মানুষ ঘৃণা করতো।

৪. তাড়ী, মদ, গাঁজা, ভাং, আফিম, সুদ-ঘুষ, গান-বাজনা, বে-নামাজ, বে-পর্দা ইত্যাদিতে সমাজ ছেয়ে গিয়েছিলো।

৫. বিভিন্ন বিদ'আতী ফকীরের অতি জঘন্য দল ও মত সমাজের সর্বস্তরে শিখড় গেড়ে বসেছিলো।

৬. কবরপূজা, কবর চুম্বন, হাজত মানত করা, বিনা প্রয়োজনে কবরে বাতি জ্বালানো, কাওয়ালীর মজলিস করা, মুহাররাম মাসে তাজিয়া বের করা, ইমাম হোছাইনের দরগাহ তৈরী করা, পীরের নামে অজীফা পড়া, ফকীরি বিদ্যা সিনায় সিনায় আসা, জ্বীন হাসিল করা, মৃত পীর বা নবীকে মজলিসে হাজির-নাজির জানা, পীরের কবরকে গোসল দিয়ে সে পানি পান করা, উত্তর-পশ্চিম কোনে বাগদাদী সিজ্‌দা করা, কুর'আন শরীফে ৪০ পারা ধারণা করা এবং তম্মধ্যে ১০ পারা ফকীরদের সিনায় সিনায় আসা, শরীয়ত থেকে মা'রিফাতকে ভিন্ন

৩৬০. মোঃ মোবারক আলী রহমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪

৩৬১. মাওলানা রুহুল কুদ্দুস ও সিরাজুল ইসলামম, *হযরত আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.)-এর জীবনী ও বাণী* (কলকাতা: ন্যাশনাল লাইব্রেরী, ১৯৮৩ খ্রী.), পৃ. ৩২

Dhaka University Institutional Repository

জানা, নবী করীম (স.)-এর পেটে বাঁধা পথর পাবার দাবী করা, ওয়ায়ের মজলিসে মিথ্যা হাদীস বলা, সৈয়দ ছাড়া অন্য কেউ পীর হতে পারবে না ধারণা করা, সূর্যাস্তের দশ মিনিট পর ইফতার করা ইত্যাদি হাজারো বাতিল, কুফ্‌রী ও শির্‌কী আকীদা ও কার্যাবলীতে সমাজ ছেয়ে গিয়েছিলো।[৩৬২]

৭. মুসলিমগণ এতো নীচে নেমে গিয়েছিলো যে, গোড়া পীর, তেনা পীর, মানিক পীর, সত্য পীর, ইটা পীর, ঢেলা পীর ইত্যাদির নামে মানত, সিন্নি, ওর্‌স বা স্মৃতি বার্ষিকী মেলা করাই ছিলো তাদের কাছে ধর্মানুষ্ঠান।

৮. নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদার, ইংরেজদের পাচাটা গোলাম নবী করীম (স.)-এর খত্‌মে নবুওয়্যাতকে অস্বীকারকারী ভন্ড মুরতাদ মীর্জা গোলাম আহমদ প্রবর্তিত কাদিয়ানী ধর্মমতের প্রচারকার্য তখন পূর্ণদমে চলছিলো। বিচারপতি জাষ্টিস স্যার জাফরুল্লাহ্‌ খান, মুহাম্মদ আলী (এম. এ; এল. এল . বি) খাজা কামাল উদ্দীন (লন্ডন ওকিং মসজিদের ইমাম) সহ বহু উকিল, ব্যারিষ্টার, মাষ্টার ও উচ্চ রাজকর্মচারীগণ কাদিয়ানী ধর্মমত গ্রহণ করে ইসলামের ছদ্মাবরণে এ মতবাদের প্রচার কার্য চালাচ্ছিলো। সরল বিশ্বাসে তাদের কথা মেনে নিয়ে বেঈমান হচ্ছিলো বাংলার মুসলিমগণ।

৯. শিয়াদের আকীদা-বিশ্বাস এবং রুসম-রেওয়াজ সমাজে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করছিলো। আশুরার দিন কারবালার স্মরণে তাজিয়া বের করে, বুক চাপড়িয়ে মাতম করে এবং আরও অনেক বে-শর'আ কাজ করে শোক প্রকাশ করা হতো।

১০. খৃষ্টান মিশনারীদের ব্যাপক প্রচারাভিযানের ফলে এদেশের সরলপ্রাণ মুসলিমগণ দলে দলে খৃষ্টান হয়ে যাচ্ছিলো।

১১. কমুনিজম বা নাস্তিকতাবাদ তখন বাংলার মাটিতে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছিলো।

১২. খারিজী, মু'তাজিলী ও কাদিরিয়া, জাবরিয়া দলের প্রসার ঘটতে শুরু করেছিলো।

১৩. হিন্দুয়ানী ধ্যান-ধারণা ও পূজা পার্বন মুসলিম সমাজে বিস্তার লাভ করেছিলো। মুসলিম পুরুষ ও মহিলারা দল বেঁধে হিন্দুদের পূজায় শরীক হতো, পূজায় চাঁদা প্রদান ছাড়াও মুসলিমরা লক্ষ্মী পূজা, স্বরস্বতী পূজা, পদ্মাদেবীর পূজা, ওলাউটা দেবীর পূজা, শীতলাদেবীর পূজা করতেও মোটেই ইতস্তত করতো না। ঠাকুর ঘরে মানত মানা সাধারণ ব্যাপার ছিলো। সুলক্ষণ ও কুলক্ষণ, যাত্রা অযাত্রা, বিয়ের দিন তারিখ, অমাবশ্যা পূর্ণিমা ইত্যাদি নিয়ে হাজারো কুসংস্কারে সমাজ ছেয়ে গিয়েছিলো।

১৪. মুসলমানী পোষাক ছেড়ে সার্ট, প্যান্ট, কোট, টাই, ধূতি ইত্যাদি বিজাতীয় পোষাক পরিধান করা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। এমনকি মুললিমদের হিন্দুয়ানী নাম রাখা হ'তো এবং নামের পূর্বে 'শ্রী' যুক্ত হ'তো।

১৫. সুদ খাওয়া, সুদী কারবার করা, জমি বন্ধক রাখা, সুদ জাতীয় পন্থায় জমি ও ফসলের কারবার করা এদেশে মারত্মক ব্যাধির ন্যায় বিস্তার লাভ করেছিলো। খুব কম সংখ্যক লোক পাওয়া যেতো যারা সুদ খেতো না।

১৬. বিয়েতে পণ প্রথা, হলুদ বাটা, গায়ে হলুদ, ফুল সাজান, পাত্র-পাত্রী নামে দিয়ার ভাসান ইত্যাদি কঠিন গুনাহ্‌র কাজ শরীয়তী বলে ইসলামকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলো।

১৭. নতুন নতুন মিথ্যা মাযার ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠেছিলো এবং সেগুলো গাঁজাখোর, লম্বাচুলধারী মেয়ে পুরুষে পাশবিক ভোগের আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছিলো। এছাড়া গ্রামে গঞ্জে, হাটে-বাজারে বাউল ফকীরদের গান বাজনা আর গাঁজার আসর গড়ে ওঠেছিলো। ভন্ড পীরে ছেয়ে গিয়েছিলো গোটা দেশ।

১৮. গ্রামে গঞ্জে বিরাট বিরাট মেলা বসতো। এ সকল মেলায় নারী পুরুষের সমাগমসহ যাদু তেলেসমতি, নাচ-গান, জুয়া, ঘোড়া দৌড়, নৌকা বাইচ ইত্যাদি বেশরীয়ত কাজ চলতো।

---

৩৬২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

মোটকথা, শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স.)-এর নবুওয়্যাত প্রাপ্তির সময়ে সমগ্র বিশ্ব বিশেষ করে আরব জাহানে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো, যার কারণে ঐতিহাসিকরা ঐ সময়কে 'জাহিলিয়া যুগ' বলে উল্লেখ করেছেন, ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিমদের ওপরও তখন অনেকটা তদ্রুপ জাহিলিয়য়াত তথা মুর্খতা চেপে বসেছিলো।[৩৬৩]

সে সময়ে উপমহাদেশের মুসলিমগণের অবস্থা কতটা শোচনীয় হয়ে পড়েছিলো তার প্রমাণ আমরা পাই জার্মান ঐতিহাসিক Hans Kohn এর A History of Nation in the East গ্রন্থের ১৫ পৃষ্টায়–
"In India specially, many people were Mohamment only name. They observed their lows of inheritance and marriage, and prayed to their neighbors many Gods."

অর্থাৎ, তৎকালে অনেক লোক বিশেষ করে ভারতে, শুধু নামে মাত্র মুসলিম ছিলো। তারা হিন্দুদের রীতিনীতি মেনে চলতো। তাদের পূজা পার্বনের অনুষ্ঠান উপভোগ করতো। বিবাহশাদী ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ব্যাপারে তাদের নিয়মকানুন মেনে চলতো এবং তাদের বহু দেব-দেবীর উপাসনা করতো।[৩৬৪]

জাতির এমন এক মহা দুর্যোগময় মূহূর্তে যোগ্য পিতার উত্তরসূরী হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.) সর্বপ্রকার জাহিলিয়াত আর বাতিল মতবাদের মুলোৎপাটন করে এদেশের মুসলিম সমাজকে কুর'আনী আলোর নূরানী আভায় আলোকিত করার প্রত্যয়ে দীপ্ত শপথ নিয়ে এগিয়ে আসেন। প্রথমে পিতার সাথে এবং পরে পিতার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে তিনি আজীবন সমাজ সংস্কারের কাজে স্বীয় জান-মাল উৎসর্গ করে গিয়েছেন।

তাঁর গৃহীত বহুমুখী সংস্কার কর্মসূচীর ফলে এদেশের যমিন থেকে জাহিলিয়াতের অন্ধকার ধীরে ধীরে দূর হয়ে যেতে থাকে। ইসলামের মৃত্যুঞ্জয়ী বাণী সুধা পান করে ঈমানদীপ্ত হয়ে ওঠে বাংলার মুসলিম সমাজ।
হযরতের গৃহীত বহুমুখী সমাজ সংস্কারমূলক কর্মসূচীগুলোর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য–

১. তাকরীরি ইশা'আত বা ওয়ায নছীহত

সারাটি জীবন হযরত নিজে এবং তাঁর অনুসারী খোলাফা, ওলামা, ওয়ায়েযীনদের মাধ্যমে সারা বাংলা ভারতের আনাচে কানাচে হাজার হাজার মাহফিল, ওয়ায নছীহত করে দীন ইসলামের সঠিক বুঝ মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন।

২. যিক্রের হালকা, ওয়ায ও ঈসালে সওয়াব মাহফিল প্রতিষ্ঠা

তিনি অসংখ্য সাপ্তাহিক ও মাসিক যিক্রের হালকা এবং বার্ষিক ওয়ায ও ঈসালে সওয়াব মাহফিল প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। এগুলো সপ্তাহ, মাস বা বছরের একটি নির্দিষ্ট তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

৩. লাইব্রেরী ও গবেষণা বিভাগ প্রতিষ্ঠা

তিনি বাংলা, ইংরেজী, আরবী, উর্দু ও ফার্সি ভাষায় অসংখ্য কিতাব সংগ্রহ করে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন এবং কুর'আন হাদীসের আলোকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করার জন্য গবেষণা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন।

৪. প্রকাশনা কার্যক্রম

লিখনীর মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে নিম্নরূপ প্রকাশনা কার্যক্রম শুরু করেন–
ক. প্রেস প্রতিষ্ঠা
খ. বই পুস্তক প্রকাশ
গ. পত্রপত্রিকা প্রকাশ

---

৩৬৩. মাওলানা সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০
৩৬৪. মুহাম্মদ ইব্রাহীম তর্কবাগীশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৭

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. ইস্তিহার, পোষ্টার, হ্যান্ডবিল ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচার।

৫. মস্‌জিদ স্থাপন

তাঁর তত্ত্বাবধানে ও পৃষ্টপোষকতায় অসংখ্য মস্‌জিদ গড়ে ওঠে।

৬. মাদ্রাসা স্থাপন

সারা দেশে তাঁর নেতৃত্বে শত শত মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়।

৭. খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা

ভারতীয় উপমহাদেশে তাঁর প্রচেষ্টায় অসংখ্য আধ্যাত্মিক তা'লীমগাহ্ বা খানকাহ্ প্রতিষ্ঠিত হয়।

৮. খুলাফা বা প্রতিনিধি নিয়োগের মাধ্যমে

দেশবিদেশে তিনি অসংখ্য কামিল-মুকাম্মিল খুলাফা বা প্রতিনিধি নিয়োগ করে তাদের মাধ্যমে সংস্কার আন্দোলনকে আরো বহুদূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন।

৯. বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠন প্রতিষ্ঠা

বিভিন্ন সংগঠন এবং সংস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি সংস্কার কার্যক্রমকে আরো জোরদার করেন। এ ধরনের সংগঠন ও সংস্থারগুলোর মধ্যে ছিলো–
ক. আঞ্জুমানে ওয়ায়েযীন,
খ. জমিয়তে ওলামায়ে বাংলা ও আসাম,
গ. নূরুল ইসলাম বায়তুল মাল,
ঘ. শন্তি কমিটি,
ঙ. হিযবুল্লাহ্ কমিটি,
চ. বিশ্ব ইসলাম মিশন কুরআনী সুন্নী জমিয়তুল মুসলিমিন হিযবুল্লাহ্,
ছ. পশ্চিম বঙ্গ মুসলিম বন্যা সাহায্য সমিতি,
জ. নিখিল বঙ্গ তাবলীগ মিশন প্রভৃতি।

১০. বাহাস মুহাসাবা

হযরতের নেতৃত্বে এবং নির্দেশে বাতিলপন্থীদের বিরুদ্ধে অনেকগুলো বাহাস মুহাসাবা অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল বাহাসে বাতিলপন্থীদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে।

১১. মানবসেবা কার্যক্রম

মানব সেবার ছদ্মাবরণে খৃষ্টান মিশনারীরা বহু মুসলিমকে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করছিলো। তাদের এ ঈমান বিধ্বংসী কার্যক্রম থেকে নিঃস্ব অসহায় দুর্গত মুসলিমগণের রক্ষার জন্য হযরত পীর সাহেব বিভিন্ন মানবসেবা কার্যক্রম গ্রহণ করেন। এ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল–
ক. দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন,
খ. বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র ও নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন,
গ. ইয়াতিমখানা স্থাপন,
ঘ. কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন,
ঙ. আর্ত-পীড়িত- দুর্গতদের সহযোগিতা প্রদান ইত্যাদি।[৩৬৫]

---

৩৬৫. মু. সিরাজুল ইসলাম ও রুহুল কুদ্দুস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬; মোঃ মোবারক আলী রহমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩; মুহাম্মদ ইব্রাহীম তর্কবাগীশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠায়
হযরত আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.)

ইসলামের শিক্ষা হলো দুনিয়ার মুসলিমগণ পরস্পর ভাই ভাই। আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন তাদেরকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন এবং দলে দলে বিভক্ত হতে নিষেধ করেছেন। যতদিন মুসলিমগণ একতাবদ্ধ ছিল, দুনিয়ার কোনো শক্তি তাদের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সাহস পায়নি। যখন থেকে তাদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হলো, দলাদলির সূচনা ঘটলো আর তখন থেকেই শুরু হয়েছে তাদের অধঃপতন।

হযরত আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.)-এর সমসাময়িক সময়ে মুসলিমগণ হাজারো দলে বিভক্ত ছিলো। যে যার দল নিয়ে মেতে থাকতো। প্রত্যেকেই নিজ দলে বেশি লোক ঢুকানোর জন্যে অন্য দলের কুৎসা রটিয়ে বেড়াতো। এক মুসলিম আরেক মুসলিমকে দেখতে পারতো না। এক আলিম আরেক আলিমকে, এক পীর আরেক পীরকে, এক পীরের মুরীদ আরেক পীরের মুরীদকে, এক দল আরেক দলকে একেবারেই সহ্য করতে পারতো না। প্রত্যেক দলই ধারণা করতো– একমাত্র আমার দলই সত্য পথে রয়েছে, আর সবাই পথভ্রষ্ট। মুসলিমদের মধ্যকার এ বিভেদের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বিধর্মীরা তাদেরকে একেবারে কোনঠাসা করে ফেলেছিলো।

মুসলিমদের এ ঘোর দুর্দিনে ফুরফুরার হযরত বড় হুযূর আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.) তামাম বিশ্বের মুসলিমগণের মধ্যে একতা ও সংহতি প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। বড় হুযূর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'সাপ্তাহিক মানবতা' পত্রিকায় বলা হয়েছে–

"আল্লাহ্পাক কালামে মজীদে ঘোষণা করেছেন বিশ্বের এক প্রান্তের মুসলমান অপর প্রান্তের মুসলমানের ভাই। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়-আজ মুসলমানের ভেতর শতদল। পীরে পীরে দলাদলি, আলিমে আলিমে হানাহানি। এ রকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যে এক পীর আরেক পীরকে দেখতে পারে না, এক আলিম আরেক আলিমের নিন্দা করে। প্রত্যেকেই নিজের দলে লোক বেশি ঢোকানোর জন্য অন্য দলের কুৎসা রটায়।

সে কারণে কুর'আন মাজীদের ঘোষণা– "মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই।"[৩৬৬] -এর অস্তিত্ব বাস্তবে পাওয়া যায় না। কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি-আমাদের পীর মুর্শীদ বড় হুযূর কুর'আনের নির্দেশ অনুযায়ী 'মুসলমান ভাই ভাই'-এর বাস্তব নযীর দেখিয়ে গিয়েছেন।"[৩৬৭]

হযরত বড় পীর সাহেব ঘোষণা করেন–
"তামাম বিশ্বের মুসলমান আমার ভাই। 'ইন্নামাল মু'মিনূনা ইখওয়াহ্।' মায়ের পেটের ভাই বুনিয়াদী রেশ্তা আর মু'মিন ভাই আবাদী রেশ্তা। দেওবন্দীরা আমার ভাই, তাবলীগ জামাত আমার ভাই, জৈনপুরী আমার ভাই, আহলে হাদীসও আমার ভাই। যতক্ষণ না কোনো মুসলিম কুফরে পৌঁছে যায়-সে আমার ভাই।"[৩৬৮]

কত বড় ঘোষণা! বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধের, এর চেয়ে উত্তম নিদর্শন আর কি হতে পারে ? ১৯৫৭ সালের ২৪শে নভেম্বর জমিয়তে ওলামা ও হিযবুল্লাহ্ কমিটির বার্ষিক অধিবিশনে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেছিলেন–

"আজ আমাদের মধ্যে নূতন মুসলিম, নব্য আলিম, নব্য পীর জন্ম লাভ করে শত শত মত ও পথের সৃষ্টি করত: ইসলাম হতে আল্লাহ্র মনোনীত দীন ও তার পথ হতে, রাসূলের আদর্শ হতে বিচ্যুত হয়ে পড়ছে। সমাজকে বিভ্রান্ত করে কুফ্র ও শির্কের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তারা যেন নব্য ইসলাম সৃষ্টি করছে। কেহ কেহ বা নাস্তিক ভাবাপন্ন হয়ে পড়ছে। এ অপেক্ষা দুঃখ, ক্ষোভ এবং ত্রাসের কারণ আর কি হতে পারে ? এ নতুন নতুন পথের পথিক চালকগণ আজ মুসলিম সমাজকেও খন্ড বিখন্ড করে ছাড়ছে।

হাজেরিনে মজলিস! আমি এ খন্ডিত সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে চাই। একতাই শক্তি। আমাদিগকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হতে হলে নিজেদের ভিতর থেকে এ ভেদ-জ্ঞান দূর করতে হবে।

---

৩৬৬. আল কুর'আন, ৪৯: ১০
৩৬৭. সাপ্তাহিক মানবতা, বর্ষ-৫ম, সংখ্যা-৪র্থ (অক্টোবর, ১৯৮৪ খ্রী.), পৃ. ১২
৩৬৮. আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫

Dhaka University Institutional Repository

পীরানে পীর বুযুর্গানদের নাম করে আজ দলাদলি সৃষ্টি করা হচ্ছে। আপনারা আজ শুনতে পান-এরা ফুরফুরাভী দল, এরা জৈনপুরী দল, ওরা দেওবন্দী ফেরকা। ফলত এ দল ও ফেরকা পোরস্তী ইসলাম সমর্থন করে না। আমরা যেদিন সত্যিকারের মুসলিম হবো, সেদিন এ ফেরকা পোরস্তী থাকবে না। ঐক্যহীন সমাজ ধ্বংস হয়ে যেতে বাধ্য। সুতরাং সকল ভেদাভেদ বিস্মৃত হয়ে চলুন আমরা ঐক্যবদ্ধ হই।"[৩৬৯]

হযরত বড় হুযূর (র.) মুসলিমগণকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন–
"খুব হুশিয়ার! মুসলিম ঐক্য ছিন্ন করে ইসলামকে ধ্বংস করার মানসে বাতিল শক্তি লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে ওঠে পড়ে লেগেছে। এমতাবস্থায় নিজেদের মধ্যে সামান্য বিষয়ে মতবিরোধ না করে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে দৃঢ় হস্তে ধারণ করুন। সর্ব উন্নতির পথ হচ্ছে ইত্তিফাক (একতা)। সে জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا -

"অর্থাৎ তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"[৩৭০]

আল্লাহ্‌র রশি কুর'আন, আল্লাহ্‌র রশি ইসলাম, আল্লাহ্‌র রশি আমার রাসূলুল্লাহ্ (স.)। এ তিন রশিকে তোমরা মজবুত করে ধরো। যেথায় স্বার্থ সেথায় দল। যেথায় দল সেথায় অশান্তি, অবনতি। যেথায় দল সেথায় ধ্বংস। যেথায় ইত্তিফাক-সেথায় শান্তি উন্নতি। আজ আমাদের রাজনীতিতে শতদল, সমাজনীতিতে শতদল, ধর্মনীতিতে বহু দল। এ অবস্থায় আবার শান্তি ? এ ধ্বংস আর অশান্তির পথে চললে কখনও শান্তি আসতে পারে না। যতোদিন না দলাদলি মিটবে, ততোদিন শান্তি পাবে না, কখনই পেতে পারে না।[৩৭১]

তিনি আরও বলতেন, "দুনিয়ায় লক্ষ লক্ষ মস্‌জিদ আছে। সব মস্‌জিদে ইমাম কি একজন ? লক্ষ লক্ষ মস্‌জিদে লক্ষ লক্ষ ইমাম থাকে। ঐরূপ দুনিয়ায় সোয়াশ কোটি মুসলিমদের মধ্যে অসংখ্য নেতা থাকবে। কিন্তু যে যেই নেতার অনুসারীই হোক না কেনো, সবাই পরস্পর ভাই ভাই। দুনিয়ার কোটি কোটি মুসলিমের কোটি কোটি নাম। নাম আলাদা আলাদা হওয়ায় চিনতে সুবিধা হয়। কিন্তু নাম ভিন্ন হলেও মানুষ হিসেবে সবাই সমান। ঠিক তেমনি, কোন্ নেতার অনুসারী তা চেনার জন্য দেওবন্দী, জৈনপুরী, ফুরফুরাভী ইত্যাদি নাম হয়তো হতে পারে, কিন্তু মুসলিম হিসেবে সবাই ভাই ভাই। নামে ভিন্ন হলেও যেমন হাকীকতে ইনসান এক, তেমনি বিভিন্ন নেতার অনুসারীদের ভিন্ন নামে ডাকা হলেও তারা সবাই এক, সবাই ভাই ভাই।"[৩৭২]

হযরত আশরাফ আলী থানভী (র.)-এর ওপর একদল আলিম কাফির ফাতওয়া দিলে তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন– "হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী (র.) যদি মুসলিম না হন তবে তো উপমহাদেশের কেউ মুসলিম নন। শুনে রেখে দাও, আমি দু'জনের মতে চলি। একজন হলেন আমার ওয়ালেদ সাহেব মুজাদ্দিদে যামান হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (র.), আর অপর জন হলো হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.)।"[৩৭৩]

হযরত বড় হুযূর (র.) তাঁর সমসাময়িককালের সমস্ত হক্কানী আলিম ও পীর-মাশায়েখগণকে বরহক্ব বলে জানতেন এবং তাদেরকে পূর্ণ সমর্থন করতেন। তিনি দলাদলি বা ফেরকা পোরস্তী না করে সবাই মিলে-ঝিলে কাজ করার পক্ষপাতি ছিলেন। তিনি কোনো দিন কোনো হক্কানী পীর-মাশায়েখের কুৎসা রটনা করেননি। কাউকে এরূপ করতে দেখলে তিনি কঠোরভাবে নিষেধ করতেন।

ওয়াযের ভেতর অনেক আলিম ও পীর-মাশায়েখ বিভিন্ন দলের নাম উল্লেখ করে তাদের দোষত্রুটি ও কুৎসা বর্ণনা করে থাকেন। এতে মুসলমানদের মধ্যে দলাদলি ও ফেরকা পোরস্তী আরও জোরদার হয়। তাই হযরত বড় হুযূর (র.) কখনও ফেরকা পোরস্তী উস্কে দেবার মতো কোনো কথা ওয়াযের মাহ্‌ফিলে বলতেন না। নাত

৩৬৯. মাসিক নেদায়ে ইসলাম, বর্ষ-১৫শ, সংখ্যা-৬ষ্ঠ (পৌষ' ১৩৬৮ বাং.), পৃ. ১৬-১৮
৩৭০. আল কুর'আন, ০৩: ১০৩
৩৭১. দিওয়ান মুহাম্মদ ইব্রাহীম তর্কবাগীশ, টেপ রেকর্ড থেকে সংগৃহীত বক্তৃতা (ঢাকা: মার্কাজে ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, সন নেই), পৃ. ৬৬-৭২
৩৭২. আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬
৩৭৩. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ করে কখনও কোনো দলের দোষত্রুটি ও কুৎসা বর্ণনা করতেন না। বিশেষ প্রয়োজন হলে হক্ব প্রকাশ করার জন্য ইঙ্গিত-ইশারায় নাম উল্লেখ না করে বতিলপন্থীদের মুখোশ উন্মোচন করে দিতেন।

সামান্য বিষয় নিয়ে ঝগড়া না করার আহবান

সামান্য ব্যাপার নিয়ে ফিৎনা-ফাসাদ ও ঝগড়া-ঝাটি করে নিজেদের ধ্বংস ডেকে না আনার জন্য তিনি প্রতিটি জলসায় মুসলমানদেরকে হুঁশিয়ার করে দিতেন। তিনি বলতেন– "সাবধান! জুযিয়াত মাস'আলা নিয়ে ফিৎনা-ফাসাদ করো না, মুসলমানের ঘরে অগুন ধরিয়ে দিও না।"[৩৭৪]

নিজেদের মধ্যে ঝগড়া ফাসাদ না করার উপদেশ দিয়ে তিনি বলেন,
'মহান আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন এরশাদ করছেন :

يايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم فى شيئ فردوه الى الله
والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذالك خير واحسن تاويلا -

"অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস করো তবে তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহ্‌র আনুগত্য করো রাসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে[৩৭৫] ক্ষমতার অধিকারী; কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপন করো আল্লাহ্ ও রাসূলের নিকট। এটাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।"[৩৭৬]

অর্থাৎ আল্লাহ্ ও রাসূলের হুকুম মতো ফায়সালা করে লও। হে জগতবাসী! যদি তোমাদের মধ্যে কোনো কথা নিয়ে বা কোনো বিষয় নিয়ে মতভেদ হয়-ঝগড়া করো না, ফাসাদ করো না, আল্লাহ্‌র কুর'আনের দিকে ফিরে যেও। কুর'আনই তোমাদেরকে মীমাংসা করে দিবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين -

"অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে ও নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না; করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। তোমরা ধৈর্য ধারণ কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"[৩৭৭]

অতএব সাবধান! তোমরা ঝগড়া করবে না, করলে কমজোর হয়ে পড়বে। ঝগড়া-ফাসাদ কওমকে কমজোর করে ফেলে এবং ইয্যত-হুরমত বিনষ্ট করে।"[৩৭৮]

মিলাদ-কিয়াম নিয়ে বাড়াবাড়ি না করার উপদেশ

মিলাদ ও কিয়াম নিয়ে আলিমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। একদল আলিম মিলাদ ও কিয়ামকে অপছন্দ করেন, বাকীরা জায়িয ও মুস্তাহাব বলে জানেন। মিলাদ ও কিয়ামকে কেন্দ্র করে তৎকালীন মুসলিম সমাজ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়েছিলো। স্থানে স্থানে মিলাদ-কিয়ামকে কেন্দ্র করে ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি এমনকি রক্তারক্তি পর্যন্ত হতে থাকে। এ চরম মুহূর্তে হযরত বড় পীর (র.) ঘোষণা করেন–

"মিলাদ-কিয়াম মুস্তাহাব। আমি নিজে করি। আমার মুরীদ মু'তাকিদীনরাও করে থাকে। মিলাদ-কিয়াম কোনো মুসলমানের মাপকাঠি না। মিলাদ-কিয়াম করলেও কেউ জাহান্নামে যাবে না, না করলেও কেউ জাহান্নামে যাবে না। বরং যারা মিলাদ-কিয়াম ও খুটিনাটি বিষয় নিয়ে ফিৎনা-ফাসাদ করবে তারাই জাহান্নামে যাবে।"[৩৭৯]

---

৩৭৪. সাপ্তাহিক মানবতা, বর্ষ-৫ম, সংখ্যা- ৪র্থ, পৃ. ১৩
৩৭৫. এ আয়াতে মু'মিনগণকে সম্বোধন করা হয়েছে, সুতরাং এই স্থলে 'তোমাদের মধ্যে' অর্থ মু'মিনদের মধ্যে, কাফির এবং মুশরিকদের মধ্যে নয়। উদ্ধৃত: আল-কুরআনুল করীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০
৩৭৬. আল কুর'আন, ০৪: ৫৯
৩৭৭. আল কুর'আন, ০৮: ৪৬
৩৭৮. দিওয়ান মুহাম্মদ ইব্রাহীম তর্কবাগীশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪
৩৭৯. মেজলা পীরজাদা মাওলানা আবু ইব্রাহীম সিদ্দিকী, *অসিয়ত ও নছিহত* (হুগলী: হেদায়াতুল মুসলিমীন লাইব্রেরী, ১৯৯৩ খ্রী.), পৃ. ০৫

Dhaka University Institutional Repository

আহলে হাদীসও আমার ভাই

হযরত বড় হুযূর (র.)-এর সময়ে লা-মাযহাবী ও মাযহাবী অর্থাৎ আহলে হাদীস ও হানাফীর মধ্যে মতবিরোধ চরম আকার ধারণ করে। দু'দলের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটি, মারামারি, হানাহানি লেগেই থাকতো। এ সমস্যার সমাধানের জন্য হুযূর ঘোষণা করেন–
"হানাফী, শাফেয়ী, হাম্বলী, মলিকী চার ভাই না, আমরা হলাম পাঁচ ভাই। আহলে হাদীসও আমাদের আর এক ভাই।" তিনি আরো বলতেন–
"আহলে হাদীস-আহলে হানীফ, আহলে হানীফ-আহলে হাদীস।" হযরতের এ ঘোষণার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সাপ্তাহিক মানবতায় বলা হয়–

"তিনি (ফুরফুরার পীর সাহেব) ইঙ্গিত ইশারায় মাযহাবী ও লা-মাযহাবীদের বিভেদ বিশৃংখলা মিটিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ উপরোক্ত ভাষণের দ্বারা তিনি বুঝিয়ে দিচ্ছেন-আয় মুসলমান! তোমরা আহলে হাদীস ও আহলে হানাফী বলে দু'দল হয়ে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে সমাজকে কলুষিত করছো কেনো ? আসলে হানাফী মাযহাব ও অন্যান্য মাযহাবগুলো কুর'আন ও হাদীস থেকেই এসেছে। অতএব মাযহাবী ও লা-মাযহাবী নিয়ে ফিতনা শুরু করা যে একেবারেই অমূলক এটাই বড় হুযূর ইঙ্গিত ইশারায় বুঝিয়ে দিয়েছেন।"[৩৮০]

তাবলীগ জামাতা সম্পর্কে

হযরত বড়হুযূর (র.)-এর সময়কালে 'তাবলীগ জামাত' বেশ প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। কেউ কেউ তাবলীগ জামাতকে পছন্দ করতো, কেউ কেউ করতো না। অনেক চরমপন্থী আবার ওহাবী বলে তাবলীগ জামাতকে কাফির ফতোয়া দিতেও দ্বিধাবোধ করতো না। তাবলীগ ওয়ালারাও বে-তাবলীগ ওয়ালাদের বিশেষ পছন্দ করতো না। এ পরিস্থিতিতে হযরত আবদুল হাই (র.) মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঘোষণা করেন–

"তাবলীগ ও হিযবুল্লাহ, হিযবুল্লাহ ও তাবলীগ। অর্থাৎ যদি কুর'আন ও সুন্নাহ্ মুতাবিক হয় তা'হলে তাবলীগ জামাতের সাথে হিযবুল্লাহ্র কোনো মতবিরোধ নেই। প্রকৃত পক্ষে হিযবুল্লাহ ও তাবলীগ একই দল।"[৩৮১]

তিনি বলতেন– "তাবলীগ জামাত আমাদের কাজকেই সহজ করে দিচ্ছে। তাবলীগ জামাত কাজ করছে রুমী মিস্ত্রীর আর আমরা কাজ করছি চীনা মিস্ত্রীর। রুমী মিস্ত্রী ঘর করে দেয়, চীনা মিস্ত্রী তাতে রং ছড়িয়ে দেয়। তাবলীগ জামাত হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র। আর পীর মাশায়েখদের তা'লীমগাহ হচ্ছে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা পেলে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া যেমন অনেকটা সহজ হয়, তেমনি তাবলীগ জামাতভুক্ত হয়ে একজন মুসলমান ইসলামের প্রাথমিক জিনিসগুলো শিখে নিলে পীর মাশায়েখদের জন্য তাদের উচ্চ পর্যায়ের তা'লীম দেয়া অনেকটা সহজ হয়ে যায়।"

তিনি আরো বলতেন– তোমরা তাবলীগ করো, কিন্তু তাফরীক করো না। মুসলমানদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করো না।" একবার ফুরফুরা দরবারের এক খলীফা তাবলীগ জামাতের বিরুদ্ধে একটি বই লিখে প্রকাশ করলে হুযূর তার ওপর অত্যন্ত রাগান্বিত হন এবং এ বইটি প্রচার না করার জন্য তাকে সতর্ক করে দেন।

ঐক্য রক্ষার অনন্য নযীর

বিভিন্ন সময়ে বাতিলপন্থীরা হযরত আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.)-কে পরাস্ত করার জন্য নানা ধরনের ফন্দি আঁটতো। তারা হুযূরের বিভিন্ন জলসা পন্ড করার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতো। কিন্তু হুযূর মুসলমানদের বৃহত্তর ঐক্যের স্বার্থে এদের সাথে সংঘর্ষ এড়িয়ে এমন বুদ্ধিদীপ্ত ফায়সালা উপস্থাপন করতেন যার ফলে বাতিলপন্থীরা লা-জওয়াব হয়ে যেতো। উদাহরণ স্বরূপ এখানে দু'টি ঘটনা উল্লেখ করা হলো-

---

৩৮০. সম্পাদক, *সাপ্তাহিক মানবতা*, বর্ষ- ৫ম, বিশেষ স্মরনিকা, ১৯৮৪ খ্রী, পৃ. ১৩
৩৮১. সাপ্তাহিক মানবতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

১. একবার ফেনী শহরের দক্ষিণাঞ্চলে বড় হুযূর এক জলসায় উপস্থিত হয়ে দেখেন, লোকজন সব দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে আছে। দায়িত্বশীলদের কাছে জিজ্ঞেস করে জানা গেলো, বিপক্ষের লোকেরা বড় হুযূরকে কাফির জানে এবং তারা তাই জলসাকে পন্ড করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। একথা শুনে বড় হুযূর মঞ্চে ওঠে দাঁড়ালেন এবং উচ্চস্বরে পাঠ করলেন- 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (স.)। অতঃপর উপস্থিত বিপক্ষ দলের লোকদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'বাবারা! আবদুল হাই এখন মুসলমান হয়েছে তো ?' বড় হুযূরের আকস্মিক এ অভিনব পদক্ষেপে বিপক্ষ দলের লোকেরা সব লা-জওয়াব হয়ে গেল। অতঃপর আর দ্বিরুক্তি না করে সবার সাথে মিলে মিশে ওয়ায শুনতে লাগলো।

২. আরেক বারের ঘটনা। ফেনীর মিজান ময়দানে জলসা। বড় হুযূরের পূর্ববর্তী বক্তাকে উপস্থিত জনতার একাংশ মিলাদ-কিয়াম সম্পর্কে নানা ধরনের প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। তারা জলসা পন্ড করার পাঁয়তারা করতে থাকে। বড় হুযূরের কাছে এ খবর পৌঁছলে তিনি মঞ্চে উঠেই বলে উঠেন– "বাবারা! যারা মিলাদ-কিয়াম করে তারা জাহান্নামে যাবে না, আর যারা মিলাদ কিয়াম করে না তারাও জাহান্নামে যাবে না। বরং যারা মিলাদ-কিয়াম নিয়ে ঝগড়া করে, তারাই জাহান্নামে যাবে।" হযরত পীর সাহেব (র.)-এর ফায়সালা শুনার পর উপস্থিত বিরুদ্ধবাদীদের আর কিছুই বলার থাকে না। গন্ডগোল করার কোনো অজুহাত খুঁজে না পেয়ে অগত্যা তারা বাধ্য হয়ে ওয়ায শুনতে থাকে।[৩৮২]

এভাবে হিকমতের মাধ্যমে বড় হুযূর মুসলমানদের পারস্পরিক ঝগড়া-ঝাটির মীমাংসা করে তাদেরকে নিজেদের মধ্যকার অনিবার্য সংঘর্ষের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন এবং মুসলমানদের মধ্যকার ঐক্য ও সংহতিকে সুদৃঢ় করেছেন।

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি ঐক্যের আহবান

হযরত বড় হুযূর নিজেদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়ে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে উদ্দেশ্য করে বলেন– "আমি আপনাদের হুঁশিয়ার করছি, আপনারা সচেতন হউন নিজেদের ভবিষ্যত সম্বন্ধে। হিন্দুস্তান আর পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রই কায়েম হয়েছিলো একতার বলে। এর উন্নতি কি দলাদলিতে হবে ? একতার বলে কায়েমকৃত রাজ্যে যদি দলাদলি-বিভেদের কঠিন প্রাচীর গড়ে তোলেন, তবে রাজ্যের উন্নতি আশা করা আকাশ-কুসুম অবাস্তবতার স্বপ্ন দেখা মাত্র!

যেথা স্বার্থ সেথা দল। যেথা দল সেথা বিভেদ, যেথা বিভেদ সেথা অবনতি। ব্যক্তিগত আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থ বাদ দিয়ে সামগ্রিক উন্নতির দিকে লক্ষ্য দিন। আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে জয় সুনিশ্চিত।

আলো আর অন্ধকার পাশাপাশি দু'টো হ'তে পারে না। সূর্য ডুবে যাক, আলো থাকুক অথবা অন্ধকার থাকুক এটা যেমন অসম্ভব, তেমনি অসম্ভব দলগত স্বার্থগত আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব নিয়ে সামগ্রিক উন্নতি কামনা করা। যদি দেশের উন্নতি কামনা করেন, জনগণের হিতাকাংখী হন, তবে এত দল ও মতের-প্রশ্নের প্রশ্রয় দেন কেনো ? হিন্দুস্থানেরও যে অবস্থা, এখানেও (বাংলাদেশেও) সে অবস্থা। সমস্ত স্বার্থগত, দলগতহীন মনোভাব ত্যাগ করে সুসংবদ্ধ হয়ে দেশ ও দশের উন্নতি সাধনের তরে কঠিন দীপ্ত অগ্নি শপথ গ্রহণ করুন।"[৩৮৩]

দোয়াল্লীন ও যোয়াল্লীন সমস্যার সমাধান

হযরত পীর সাহেব (র.)-এর সময়ে নামাজের মধ্যে সূরা ফাতেহায় 'দোয়াল্লীন' না 'যোয়াল্লীন' পড়তে হবে-এ নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। এমনকি বিভিন্ন স্থানে 'দোয়াল্লীন' ও 'যোয়াল্লীন' পন্থীদের বাহাস, তর্কবিতর্ক, ঝগড়াঝাটি এমনকি মারামারি পর্যন্ত হতে থাকে। হুযূর এ সমস্যার ফায়সালা দিয়ে বলেন–

৩৮২. ঘটনা দুটো প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে ফেনী নিবাসী সুফি মোঃ আবদুল কাশেমের মাধ্যমে সংগৃহীত, উদ্ধৃত: আবদুল্লাহ মামুন আলিফ আল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০
৩৮৩. দিওয়ান মুহাম্মদ ইব্রাহীম তর্কবাগীশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১-২৯২

Dhaka University Institutional Repository

"দোয়াল্লীন ও যোয়াল্লীন সম্পর্কে মতভেদ আছে। তৎসম্বন্ধে আমার মত এই যে, মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের মুহাক্কিক আলিমগণ যেরূপ 'দোয়াল্লীন' পড়েন, আমিও তদ্রূপ পড়ি। ض কে ظ দ্বারা পড়লে নামাজে ফতুরী আসবে। কিন্তু যে ব্যক্তির চেষ্টা করা সত্বেও মাখরাজ আদায় হয় না-তার জন্য মাফ।"[৩৮৪]

হযরত মাওলানা আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.) বুঝতে পেরেছিলেন যে, মুসলমানদের একতা যদি নষ্ট হয়ে যায়, তবে তারা কমজোর হয়ে পড়বে এবং অচিরেই ধ্বংস হয়ে যাবে। মুসলমানদের এ অবশ্যম্ভাবী করুন পরিণতির কথা চিন্তা করে হুযূরের প্রাণ কেঁদে ওঠতো। আর তাইতো তিনি মুসলমানদের ভেতর ইত্তেফাক ও ইত্তেহাদ অটুট রাখার জন্য সারা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করে গিয়েছেন।

আজাদী আন্দোলন ও হযরত আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.)

১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে অস্তমিত হয় আমাদের স্বাধীনতার সূর্য। পরাধীনতার জিঞ্জিরে আবদ্ধ হবার পর এ দেশবাসী অথর্ব হয়ে বসে থাকেনি। এরা দেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য আন্দোলন শুরু করে। আজাদীর স্বপক্ষে সর্ব প্রথম অস্ত্র হাতে তুলে নেন মীর কাশিম আলী খান। শুরু হয় এক দীর্ঘ জীবন পণ লড়াই। শহীদী খুনের কালিতে রচিত হয় লক্ষ লক্ষ শহীদের নযীরবিহীন আত্মত্যাগের এক রক্তাক্ত ইতিহাস।

মীর কাশিম আলীর পর ইংরেজদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান মহীশুরের হায়দার আলী এবং তাঁর পুত্র টিপু সুলতান। তাঁদের পাশাপাশি ময়দানে নেমে পড়েন শ্রদ্ধেও আলিম সমাজ এবং পীর আউলিয়াগণ।

টিপু সুলতানের শাহাদাতের পর হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (র.) এবং তাঁর পুত্র শাহ আবদুল আজীজ (র.)-এর চিন্তাধারার আলোকে হযরত সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী (র.)-এর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে এক অপ্রতিরোধ্য 'মুজাহিদ আন্দোলন'।[৩৮৫] তাঁর খুলাফাদের মাধ্যমে এ আন্দোলন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৩১ সালের ৫ই মে বালাকোটের ময়দানে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী (র.)-এর শাহাদাতের পর মুজাহিদ আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়লেও একেবারে থেমে যায়নি। তাঁর খুলাফারা এ আন্দোলনকে আরো বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যান। দেখতে দেখতে চলে আসে ১৮৫৭ সাল। শুরু হয় 'সিপাহী বিপ্লব'। বৃটিশ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রাম এ বিপ্লবের মাধ্যমে যেন চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ বিপ্লবও ব্যর্থ হয়।

সিপাহী বিপ্লব ব্যর্থ করে দেবার পর ইংরেজরা মরিয়া হয়ে ওঠে। তারা মুসলমানদের ওপর শুরু করে দেয় অমানুষিক নির্যাতন। ছোট শিশু, বৃদ্ধ, অসহায় নারী, পীর-ফকীর থেকে শুরু করে বড় বড় আলিম পর্যন্ত কাউকেই তারা ছেড়ে দেয়নি। নিরপরাধ হাজার হাজার আলিম, পীর, আউলিয়ায়ে কিরামকে তারা ফাঁসি দিতে থাকে। পলাশীর পূর্বে যে বাঙ্গালী মুসলমান সারা পৃথিবীর অন্যতম জাতি হিসেবে পরিগণিত হতো, মাত্র একশত বছরের ব্যবধানে ইংরেজরা তাঁদেরকে একটি সর্বহারা সম্প্রদায়ে পরিণত করলো।

সিপাহী বিপ্লবের পর এদেশের মুসলমানরা সশস্ত্র সংগ্রামের প্রতি অনাগ্রহী হয়ে পড়েন এবং তখন থেকেই শুরু হয় নিয়মতান্ত্রিকভাবে আজাদী হাসিলের প্রচেষ্টা। আজাদী আন্দোলনের এ পর্যায়ে বেশ কয়েটি সংগঠন গড়ে ওঠে। তন্মধ্যে 'জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ'-এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। আজাদী আন্দোলনে এ সংগঠনের অবদান চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

হযরত পীর আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.)-এর পিতা মুজাদ্দিদে যামান মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (র.) ছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ এর সভাপতি। বৃদ্ধ পিতার প্রধান সহকারী হিসেবে যুবক আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.) পিতার সাথে জমিয়তে ওলামার বিভিন্ন সভা ও অধিবিশনে যোগদান করতেন।

১৯২৬ সালে 'আল্লামা সোলায়মান নদভী সাহেবের সভাপতিত্বে কলকাতা মহানগরীতে জমিয়তের ৭ম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ ইতিহাস বিখ্যাত অধিবিশনে জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব করে। এ প্রস্তাব কংগ্রেসের দু'বছর এবং মুসলিম লীগের বারো বছর আগে গৃহীত হয়। এ অধিবেশনকে

৩৮৪. মাওলানা ইব্রাহীম সিদ্দিকী, *অসিয়ত ও নছীহত* (ফুরফুরা: মুজাদ্দেদীয়া লাইব্রেরী, ১৩৮৫ বাং.); পৃ. ০৪
৩৮৫. অ. ক. ম. আলীম, *ভারতের মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস* (ঢাকা: হোসাইনিয়া কুতুবখানা, ১৯৮১ খ্রী.), পৃ. ৭৮

Dhaka University Institutional Repository

সাফল্য মন্ডিত করতে বৃদ্ধ পিতার পাশে থেকে হযরত আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.) অক্লান্ত পরিশ্রম করেন এবং নির্ধারিত দিনে উপাস্থিত থেকে অধিবিশনের রওনক বৃদ্ধি করেন।

১৯৩০ সালে জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ কংগ্রেসকে সমর্থন করে আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচি প্রস্তুত করে এবং বিলাতি পন্যদ্রব্য বর্জন ও গোল টেবিল বৈঠক পরিত্যাগের প্রস্তাব গ্রহণ করে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক জমিয়তের সভাপতি বড় হুযূর এর পিতা মুজাদ্দিদে যামান (র.) জমিয়তের এ নীতির ঘোর প্রতিবাদ করেন। কিন্তু জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের অন্যান্য নেতৃবর্গ এ নীতি পরিবর্তন করতে রাজি হলেন না। তাই তিনি জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ থেকে সরে এসে 'জমিয়তে ওলামায়ে বাংলা ও আসাম' গঠন করলেন। তিনি ছিলেন এ সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। মুসলমানদের সর্ববিধ উন্নতিকল্পে বাংলা-আসাম তথা সারা ভারতের কোটি কোটি মুরীদকে নিয়ে তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম লীগকে সমর্থন করে গিয়েছেন।[৩৮৬]

পিতা মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর ইন্তিকালের পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে বড় হুযূর (র.) 'জমিয়তে ওলামায়ে বাংলা ও আসাম' -এর স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হন। পিতার নীতি অনুসরণ করে তিনিও আজাদী হাসিলের আন্দোলনে মুসলিম লীগকে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছিলেন। যদিও তিনি মুসলিম লীগের সদস্য ছিলেন না, কিন্তু লীগের ওপরে তাঁর এমনই প্রভাব ছিল যে, নির্বাচনের সময় তাঁর সাথে পরামর্শ করে এবং তাঁরই মনোনীত ব্যক্তিকে সদস্য পদে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেয়া হতো।[৩৮৭]

বাংলার বিখ্যাত রাজনীতিবিদ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কাছে কোনো নির্বাচন প্রার্থী মুসলিম লীগের নমিনেশন প্রাপ্তির জন্যে গেলে তিনি তাকে বলে পাঠাতেন– "ফুরফুরার পীর সাহেবের কাছে যাও। হুযূর নমিনেশন দিলেই আমার দেয়া হবে। আর হুযূর না দিলে আমি দিতে পারবো না।[৩৮৮]

অধ্যাপক মুহাম্মদ হামিদুল ইসলাম সাহেব 'মাওলানা আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.)' প্রবন্ধে লিখেছেন–
"ফুরফুরা শরীফের ঐতিহ্যবাহী সিদ্দিকী পরিবারের সন্তান হওয়ার কারণে মাওলানা আবদুল হাই সিদ্দিকী জন্মগত ভাবেই সুষ্ঠু রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন। রাজনৈতিকভাবে তিনি তদানীন্তন ভারতীয় মুসলিম উম্মাহ্র স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত একমাত্র সক্রিয় রাজনৈতিক সংগঠন 'মুসলিম লীগ' এর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। উপমহাদেশে মুসলিম জাতির স্বাধীনতা তথা আল্লাহ্তা'আলার যমিনে তাঁরই মনোনীত একমাত্র জীবন বিধান ইসলাম প্রতিষ্ঠার উদগ্র আকাঙ্খা নিয়ে সর্বান্তঃকরণে তিনি 'মুসলিম লীগ'-এর পক্ষে কাজ করেন। তৎকালীণ মুসলিম লীগ কর্মকর্তাগণ, যেমন- কায়িদি আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা আবুল কাশেম মুহাম্মদ ফজলুল হক এবং লীগের সদস্য ও কর্মীদের মধ্যে ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আলহাজ্জ খান বাহাদুর আহসানুল্লাহ আই.সি.এস ও প্রফেসর হযরত মাওলানা আবদুল খালেক প্রমুখ সুধীবৃন্দ লীগের যে কোনো বিষয়ে মাওলানা আবদুল হাই সিদ্দিকীর সাথে পরামর্শ করতেন। তাঁরা সকলেই তাঁকে অত্যন্ত মুহাব্বত করতেন। এমনকি নিখিল ভারত মুসলিম লীগ নেতা কায়িদি আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ যে কোনো সময় কলকাতা এলে ফুরফুরা শরীফে এসে মাওলানা আবদুল হাই সিদ্দিকীর সাথে দেখা না করে ফিরে যেতেন না। তিনি যখনই হযরত পীর সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করতেন, তখনই কথা বলার প্রাক্কালে অতীব মুহাব্বতের সাথে সালাম করার পরই প্রাণভরে তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে সম্বোধন করতেন।"[৩৮৯]

১৯৪৩ সালে (২২শে ফাল্গুন ১৩৫০ সোমবার) ফুরফুরার ঈসালে সওয়াব মাহফিলে 'জমিয়তে ওলামা বাংলা ও আসাম' -এর এক বিশেষ অধিবিশেন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবিশনে মুসলিম লীগের বেশ কয়েকজন নেতৃবৃন্দের শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ এবং শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত জিন্নাহ সাহেবের নেতৃত্বের প্রতি আনাস্থা দেখিয়ে আল্লামা রুহুল আমীন (র.) মুসলিম লীগের সাথে সমস্ত প্রকার সম্পর্ক ছেদের প্রস্তাব করেন এবং হযরত বড় হুযূর (র.)-এর অনুপস্থিতিতে তাঁর পক্ষে তাঁর মেঝ ভাইয়ের স্বাক্ষর নিয়ে এ প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেন। সে সাথে তিনি ঘোষণা করেন- 'মুসলিম লীগের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই।'

---

৩৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০
৩৮৭. মাওলানা মহিউদ্দীন খান, *মাসিক মদীনা*, সংখ্যা-২য়, বর্ষ-২৯ (ঢাকা: মদনি বুক ডিপো, মে' ১৯৯৩ খ্রী.), পৃ. ২৭
৩৮৮. মোঃ আতাউর রহমান, *স্মরণীয় জীবন কথা* (ঢাকা: হিযবুল্লাহ প্রকাশনী, ১৪০৩ বাং.), পৃ. ৬১
৩৮৯. মাসিক মদীনা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

Dhaka University Institutional Repository

বড় হুযূর যখন এ সংবাদ পেলেন তখন গর্জে ওঠলেন। তিনি এ সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিয়ে ঘোষণা করলেন– "হ্যাঁ গো, আমরা জিন্নাহ্‌র বা ঐ নেতাদের দল করি, না মুসলমানদের দল করি ? আমরা মুসলমান, আর মুসলমানদের দল হলো মুসলিম লীগ। মুসলমান হয়ে মুসলমানদের দল ত্যাগ করা কোনো প্রকারেই সম্ভব হবে না।"[৩৯০] তাঁর এ ঘোষণায় জমিয়তে ওলামা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়লো। আলিমদের একাংশ বড় হুযূরের পক্ষে রইলেন। অবশিষ্টরা আল্লামা রুহুল আমীনের পিছনে থেকে জোরেসোরে মুসলিম লীগের বিরোধিতা শুরু করলেন।

এদিকে আবার জিন্নাহ সাহেবের সাথে মতান্তরের ফলে শেরেবাংলা এ.কে ফজলুল হক সাহেব মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগ করে 'কৃষক শ্রমিক প্রজা পার্টি' নামে পৃথক দল গঠন করলেন। একদিকে রুহুল আমীন (র.)-এর নেতৃত্বাধীন জমিয়তে ওলামা এবং অপর দিকে শেরেবাংলার বিরোধীতার ফলে মুসলিম লীগ এক মহা সংকটময় অবস্থায় পতিত হয়।

এ চরম বিপর্যয়ের মুখে মুসলিম লীগের হাল ধরলেন ফুরফুরার বড় হুযূর (র.)। তাঁর স্বপক্ষীয় জমিয়তে ওলামার হাজার হাজার আলিম এবং লক্ষ লক্ষ মুরীদদেরকে নিয়ে তিনি বাংলা ভারতের আনাচে-কানাচে মুসলিম লীগের পক্ষে প্রচার কার্য চালানোর জন্য ময়দানে নেমে পড়লেন। হযরত পীর সাহেব (র.)-এর আপ্রাণ প্রচেষ্টায় মুসলিম লীগ আবারও জনপ্রিয়তার শীর্ষে আরোহন করলো।

জুলফিকার আহমদ কিসমতী তাঁর বইয়ে লিখেছেন– "মূলত বাংলা আসামে মুসলিম লীগের যে জনপ্রিয়তা ছিলো, তার অধিক কৃতিত্ব একমাত্র ফুরফুরার পীর সাহেবেরই। তিনি এদেশের বাঙ্গালী মুসলমানদের মনে পাকিস্তানের জন্য যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন, তা' চিরদিন একদিকে যেমন ইতিহাসে অম্লান হয়ে থাকবে, তেমনি বাংলার আলিম সমাজও তা থেকে অজীবন প্রেরণা লাভ করবে। পাকিস্তান আন্দোলনে ফুরফুরার পীর সাহেবের ও তাঁর লক্ষ লক্ষ মুরীদের অপরিসীম ত্যাগ রয়েছে।"[৩৯১]

মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দের অনেকেরই আমল-আখলাক ঠিক ছিলো না। এ ব্যাপারে হযরত পীর সাহেব (র.)-এর ঘোরতর আপত্তি ছিলো। তিনি তাঁদের সংশোধনের জন্য তাকীদ করতেন এবং তাঁদের হিদায়েতের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ চাইতেন। তিনি মনে করতেন, একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন মুসলমানদের শুধুমাত্র তখনই বাস্তবায়িত হবে, যখন তাদের মধ্যে জাতীয় ঐক্য-সংহতি স্থাপিত হবে। হযরত পীর সাহেব বুঝতে পেরেছিলেন যে, শুধুমাত্র মুসলিম লীগের মাধ্যমেই এ লক্ষ অর্জন করা সম্ভব। তাই তিনি মুসলমানদের বৃহত্তর স্বার্থে সামান্য কয়েকজন নেতার দোষত্রুটির অযুহাতে মুসলিম লীগ ত্যাগ করা সমীচীন মনে করেন নি। হযরত পীর সাহেব (র.)-এর গৃহীত এ পদক্ষেপ হতে তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করা যায়।

আল্লামা রুহুল আমীন (র.) এবং তাঁর সঙ্গী সাথীরা পরে তাঁদের ভুল বুঝতে পেরে হযরত বড় হুযূর (র.)-এর কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন। বড় হুযূর তাঁদের ক্ষমা করে দেন।

শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হক সাহেব মুসলিম লীগ ত্যাগ করে নতুন দল গঠন করার পর একদিন বড় হুযূরের (র.)-এর খিদমতে হাজির হন। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার এক পর্যায়ে বড় হুযূর পাকিস্তান আন্দোলনে মুসলিম লীগের ভূমিকা সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা করে শেরেবাংলাকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন এবং মুসলিম লীগে ফিরে আসার আহবান জানালেন। শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হক সাহেব নিজের ভুল স্বীকার করে বললেন– "হুযূর! এখন আমি কী করি ? আমি একটা দলে ঢুকে পড়েছি, এখন এ দল থেকে কী করে বেরিয়ে আসি ?"

হযরত পীর সাহেব (র.) তাঁকে পরামর্শ দিয়ে বললেন– "আগামীকাল আমি পেপারে ই'লান করে দিব-ফুরফুরার পীর সাহেবের নির্দেশ- 'হক সাহেব, আপনি যেখানেই থাকুন মুসলিম লীগে যোগ দিন।' আপনি তখন পীরের নির্দেশ পালনার্থে মুসলিম লীগে যোগ দিবেন।"

---

৩৯০. কুরআন হাদীস রিসার্চ সেন্টার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩
৩৯১. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫-৬৬

Dhaka University Institutional Repository

শেরেবাংলা হুযূরের এ প্রস্তাবে রাজি হয়ে বিদায় আরজ করলেন। পরদিন পত্রিকায় হযরত পীর সাহেবের নির্দেশে বিজ্ঞপ্তি ছাপা হয়। কিন্তু নতুন দলের সহকর্মীদের বিরোধীতার কারণে হক সাহেবের আর মুসলিম লীগে যোগ দেয়া হয়নি। পরে তিনি হুযূরের কাছে এ ব্যাপারে মাফ চেয়েছিলেন। হযরত পীর সাহেবকে তিনি এত শ্রদ্ধা করতেন যে, শেষ বয়সে অসুস্থাবস্থায় হুযূরকে অনুরোধ করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে তাঁর হাতে শেষ তওবা করে ইন্তিকাল করেন। শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীসহ মুসলিম লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবর্গ যখন তাঁর দরবারে আসতেন তখন তাঁরা হুযূরকে এতই আদব করতেন যে, তাঁর সামনে একেবারে জড়োসড়ো হয়ে সাধারণ লোকের মত মাটিতে বসে পড়তেন।

শেরেবাংলাকে হযরত পীর সাহেব যেদিন মুসলিম লীগে ফিরে আসার আহবান জানালেন সেদিনেরই ঘটনা। শেরেবাংলা দরবার হতে বিদায় নিয়ে চলে যাবার কিছুক্ষণ পরই কংগ্রেস নেতা মাওলানা আবুল কালাম আজাদ দরবারে এলেন। তাঁকে দেখেই হুযূর বললেন- 'আসেন মাওলানা সাহেব! এইতো কিছুক্ষণ আগেই হক সাহেব বিদায় নিয়ে গেলেন। আপনার সাথে কি দেখা হয়েছে ?'

আলোচনার এক পর্যায়ে হযরত পীর সাহেব (র.) মাওলানা আজাদ সাহেবকে বললেন– "বলুনতো দেখি আপনি যে কংগ্রেসে যোগ দিলেন, আপনার উলিল আমর কে ? শুনুন, আমার উলিল আমর দু'জন। প্রথম জন হ'লেন আমার ওয়ালেদ সাহেব হুযূর মুজাদ্দিদে যামান হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (র.), আর দ্বিতীয় জন হ'লেন হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী (র.)। তাঁরা দু'জনই মুসলিম লীগ সমর্থন করে গেছেন। তাই আমি মুসলিম লীগ সমর্থন করছি। কিন্তু আপনি যে কংগ্রেসে যোগ দিলেন, আপনার পিছনে কার সমর্থন আছে ?"

মাওলানা আজাদ সাহেব হুযূরের একথার সদুত্তর তো দিলেনই না, বরং রেগে গিয়ে বললেন- 'হুযূর, আপনি মুসলিমলীগ ত্যাগ করুন। নইলে আমার হাতে যে ১২টা পেপার আছে, তার সবগুলোতে ফুরফুরার বিরুদ্ধে এমনভাবে লিখবো, ফুরফুরার নাম নিশানা ডুবিয়ে ছাড়বো।' জবাবে বড় হুযূর গর্জে ওঠে বললেন– "মাওলানা সাহেব! থাকতে পারে আপনার হাতে ১২টা পেপার, কিন্তু শুনে রাখেন, আমার পিছনে আছেন স্বয়ং আল্লাহ্।"[৩৯২]

মুসলিম লীগকে সমর্থন করতে গিয়ে হযরত পীর সাহেব (র.) এমন হাজারো হুমকীর মুকাবিলা করেছেন। মুসলিম লীগের সে ঘোর দুর্দিনে তিনি যদি লীগের পাশে এসে না দাঁড়াতেন, তা'হলে হয়তো মুসলমানদের আজাদীর স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই থেকে যেত, বাস্তব রূপ লাভ করতো না কোনদিন!

দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকায় বলা হয়েছে–
"আজাদী সংগ্রামকালে ফুরফুরার মরহুম পীর আবদুল হাই সিদ্দিকী সাহেব পিতার ন্যায় বিরাট অবদান রেখেছিলেন। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ পর্যন্ত ফুরফুরার অনুসারী লাখ লাখ মুরীদ নিয়ে মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি পাকিস্তানের জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন।"[৩৯৩] হযরত বড় হুযূরের অন্তরঙ্গ সফর সাথী ও খলীফা মাওলানা আমিনুল্লাহ এনায়েতপুরী সাহেব পাকিস্তান আন্দোলনে হযরতের ভূমিকা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন–

"হুকুমতে ইসলাম তথা আল্লাহ্‌র যমিনে আল্লাহ্‌র আইন কায়েম করার ইরাদায় ফুরফুরার হযরত পীর সাহেব যখন মুসলিম লীগকে প্রত্যক্ষ সমর্থন দিলেন, বাংলার ঘরে ঘরে মুসলিম লীগের বিজয়ের সূচনা তখনই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। সুষ্ঠু রূপে নির্বাচনের কাজ তরান্বিত করার জন্য তিনি প্রতিটি জেলায় কর্মী নিয়োগ করেন। আমীরে শরীয়ত হযরত পীর সাহেবের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও বাগ্মীতায় সকলেই ছিলেন গভীর শ্রদ্ধাশীল। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের আওয়ামী লীগের মন্ত্রী যশোরের জনাব মশিউর রহমান সাহেব হযরত পীর সাহেব সম্পর্কে আলাপ চারিতার এক পর্যায়ে বলেছিলেন–

৩৯২. মাওলানা আবুল বাসার জিহাদী, সাপ্তাহিক মানবতা, বর্ষ- ৫ম, সংখ্যা- ১১, পৃ. ১৩
৩৯৩. সম্পাদক, দৈনিক সংগ্রাম (১৯শে মে, ১৯৭৭ খ্রী.), পৃ. ০৫; উদ্ধৃত: আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭

Dhaka University Institutional Repository

“আমরাও রাজনীতি করি আর হযরত পীর সাহেবও রাজনীতি করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মতো একাগ্রতা, দৃঢ়তা, মতামতের তড়িৎ সিদ্ধান্ত, দৃঢ় প্রত্যয় ও আত্মবিশ্বাস আর কারো দেখিনি। সে সময় আমরা মুসলিম লীগের কর্মী ছিলাম। হুযূর আমাকে যশোরের ও জনাব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবকে ফরিদপুর মুসলিম লীগের নির্বাচনী দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তিনি আমাদেরকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। অনেক সময় মাথায় ও পিঠে হাত বুলিয়ে স্নেহ করতেন। দ্বিধাহীন কণ্ঠে আমাদের একথা স্বীকার করতেই হবে যে, বঙ্গবন্ধুসহ আমাদের রাজনীতির হাতে খড়ি হয়েছিলো হুযূরের আপাত্যস্নেহে ও অনুপ্রেরণার ফলে। আর তিনিই ছিলেন আমাদের রাজনীতির ওস্তাদ।”[৩৯৪]

খুলনা তথা বাংলার কৃতি সন্তান জনাব খান বাহাদুর আবদুস সবুর সাহেব ১৯৬৪ সালে যশোর সার্কিট হাউজে বলেছিলেন– “আলিম ওলামা অনেকেই রাজনীতি করেন, কিন্তু ফুরফুরার হযরত পীর সাহেবের ন্যায় গভীর প্রজ্ঞার রাজনীতিবিদ আলিম আমার নযরে পড়ে নাই। আমরা সকলেই তাঁর প্রতি অনেক সময় নির্ভরশীল হয়ে থাকতাম।”

আমীরে শরীয়ত হযরত পীর সাহেব যখন প্রত্যক্ষ ও প্রকাশ্যে মুসলিম লীগকে শুধুমাত্র সমর্থন-ই নয়, তার বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশ নিলেন, তখন কিছু সংখ্যক কংগ্রেসী নেতা ও তাদের সমর্থকগণ প্রচার শুরু করলেন যে, মিঃ জিন্নাহ শিয়া, তাই মুসলিম লীগ নয়, শিয়া লীগ। শিয়া লীগ বর্জন করো। আর ফুরফুরার পীর সাহেব ভুল পথে চলেছেন, তিনি অর্থের মোহে বিভ্রান্ত হয়েছেন-ইত্যাকার বিদ্বেষী প্রচার ব্যাপক হারে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে লাগলো। এ অহেতুক মিথ্যা অপপ্রচারের জবাব দান প্রসঙ্গে হযরত পীর সাহেব বলেন–

“মুসলিম লীগ তথা আমার বিরুদ্ধে এ সমস্ত অপপ্রচার যখন ব্যাপক হারে চলতে থাকে, ঠিক তখনই কলকাতার মোহাম্মদ আলী পার্কে আয়োজিত এক জনসভায় প্রথমেই আমি ঘোষণা দিলাম, ‘জিন্নাহর মতে আমি নই, আমার মতে জিন্নাহ।’ মুসলিম লীগ নয়, শিয়া লীগ, ফুরফুরার পীর সাহেব শিয়া দল সমর্থন করে ভুল পথে ভ্রান্ত মতে চলছেন ইত্যাদি বর্ণনা দিয়ে যারা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টায় মেতে ওঠেছেন, আপনারা জেনে রাখুন, মিঃ জিন্নাহর মত আমি গ্রহণ করিনি, বরং আমার মত জিন্নাহ সহ মুসলিম লীগের সমস্ত নেতা ও কর্মীগণ গ্রহণ করেছেন। আপনারা মুসলিম লীগ, কংগ্রেস অথবা অন্য যে কোনো দলে যে কোনো শ্রেণীর সদস্য হয়েছেন অথবা হবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু আমি ফুরফুরার পীর মুসলিম লীগ অথবা অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের দু'আনার সদস্যও নই। মুসলমান হিসেবে আমার ঈমানের তাকীদে আমি মুসলিম লীগ সমর্থন করি। মিঃ জিন্নাহসহ বিভিন্ন নেতৃবর্গ এ মর্মে আমার নিকট ওয়াদাবদ্ধ-মুসলমানের স্বাধীন স্বতন্ত্র আবাস ভূমি পাকিস্তান যদি হাসিল হয়, তা'হলে সেটা হবে হুকুমাতে ইসলাম অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্র। অধুনা বিশ্বের কোথাও কোনো রাষ্ট্রে হুকুমাতে ইসলাম কায়িম নেই। সমস্ত রাষ্ট্রগুলো চলছে মনগড়া ভৌতিক আইনে। সমগ্র বিশ্বে কোথাও যা নেই সে হুকুমাতে ইসলাম বা আল্লাহ্‌র দীন ও প্রভুত্ব কায়েম হবে আজাদী যমিন পাকিস্তানে-এর থেকে আনন্দের বিষয় আর কী হতে পারে ? তাই অতি আনন্দের সঙ্গে আমি মুসলিম লীগ সমর্থন করি ও বাংলার প্রতিটি মুসলমানের প্রতি আমার জোর তাকীদ রইলো-তারাও যেনো মুসলিম লীগকে সমর্থন সহ সম্ভাব্য সকল রকম সহযোগিতা করেন। আল্লাহ্‌র দীন বা প্রভুত্ব এ যমিনে যাতে কায়েম না হয়, তার জন্য এর বিরোধী দল বিভিন্ন ভ্রান্ত অমূলক বক্তৃতায় আপনাদেরকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টায় মেতে উঠেছেন। বাংলার মুসলমান সাবধান হোন! মুসলিম লীগ বিরোধীদের ভ্রান্তমূলক অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে হুকুমাতে ইসলাম কায়েমের জন্য মুসলিম লীগের পতাকা তলে সমবেত হোন ও মুসলিম লীগের মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দিয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করুন। আপনারা যারা আজ আমার বিরুদ্ধে চলছেন, এ কিছুদিন পূর্বে আমি ছিলাম তাদের নিকট অতি শ্রদ্ধেয়, জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। স্বার্থ আপনাদেরকে দিশেহারা করে দিয়েছে। অন্ধ স্বার্থের করাঘাতে সত্য আপনাদের নিকট পরাভূত। জেনে রাখবেন, ইসলামী রাষ্ট্র তথা আল্লাহ্‌র দীন বা প্রভুত্ব কায়েমের জন্য, পাকিস্তান হাসিলের জন্য প্রয়োজন হলে আমার জীবনের শেষ বিন্দু পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত।”

৩৯৪. রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, প্রাগৃক্ত, পৃ. ১০১

Dhaka University Institutional Repository

এ ভাষণের পর কংগ্রেসীদের প্রচার প্রচারণা দুরূহ হয়ে পড়লো। বিভিন্ন স্থানে কংগ্রেসী কর্মীগণ লাঞ্ছিত ও ধীকৃত হতে লাগলো। অতঃপর হযরত পীর সাহেব মুসলিম লীগের প্রার্থী মনোনয়ন দান শুরু করলেন। তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। তাঁর মতামত মুসলিম লীগের সমস্ত নেতৃবর্গই বিনা দ্বিধায় মেনে নিতেন। কিন্তু সমস্যা হলো যশোরের নড়াইল কেন্দ্রের মনোনয়ন নিয়ে। উক্ত কেন্দ্রে কংগ্রেসের অতি প্রভাবশালী নেতা যশোর তথা বাংলা ভারতের অতি প্রসিদ্ধ ও যশোরের মুসলিম রাজনৈতিক জাগরণের অগ্র-নেতা জনাব সৈয়দ নওশের সাহেবের সঙ্গে ভোট প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হযরত পীর সাহেব মনোনয়ন দিলেন মৌলভী আবদুল আউয়াল নামীয় জনৈক অপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে। এ মনোনয়নে হযরত পীর সাহেবের সঙ্গে এক মত হতে পারছিলেন না জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেব। তিনি বললেন- হুযূর, আপনার সব মনোনয়ন বিনা দ্বিধায় মেনে নিচ্ছি, ব্যতিক্রম শুধু এটাতে। কেননা জনাব সৈয়দ নওশের আলী সাহেব বাংলার অতি সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি। বাংলার লোকেরা তাঁকে দ্বিতীয় সোহরাওয়ার্দী বলে থাকে। কাজেই তাঁর মুকাবিলায় তাঁর-ই মতো আর একজনকে না দিলে ঐ কেন্দ্র হতে অবশ্যই আমরা একটি সদস্য হারাবো। জবাবে মৃদু হেসে হযরত পীর সাহেব বললেন–

"শুনুন, যশোরের মুসলিম রাজনীতির জনক, বাংলার দ্বিতীয় সোহরাওয়ার্দী অতিপ্রসিদ্ধ সৈয়দ নওশের আলীকে ভোট প্রতিদ্বন্দীতায় আদনা আবদুল আউয়াল দ্বারা পরাজিত যদি না করতে পারি, তা'হলে আমি ফুরফুরার পীর সাহেব কী জন্য ? যান, আপনাকে চিন্তা করতে হবে না, যা করার ইনশাআল্লাহ্ আমি করবো।"[৩৯৫]

অতঃপর হযরত পীর সাহেব উক্ত কেন্দ্রে ব্যক্তিগত প্রচারক পাঠিয়ে ঘোষণা করলেন যে, ভোট আদান-প্রদানে টাকা পয়সাতো দূরের কথা, এক খিলি পান খাওয়াও হারাম। প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় জানা যায়, এ অঞ্চলের ভোটারেরা বাড়ি হতে সঙ্গে চিড়ামুড়ি নিয়ে ভোট কেন্দ্রে ভোট দিতে এসে অনেকে জিজ্ঞাসা করছিল, ফুরফুরার পীর সাহেবের বাক্স কোন্‌টি ? নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গেলো, জনাব মৌলভী আবদুল আউয়াল সাহেব বিপুল ভাটে জয়লাভ করেছেন, আর জনাব সৈয়দ নওশের আলী সাহেবের জামানতের টাকা হয়েছে বাজেয়াপ্ত।

জনাব সৈয়দ নওশের আলী সাহেবকে ভোট প্রতিদ্বন্দীতায় পরাজিত করা ছিলো অসম্ভব ও আশ্চর্যের ব্যাপার, যা নাকি আমরা জানতে পারছি পরবর্তী ঘটনায়। নির্বাচনের পর মুসলিম লীগের সদস্যদেরকে জনাব মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সাহেব দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক অধিবিশনে আহবান করেছিলেন। বিশেষ ট্রেন যোগে মুসলিম লীগ সদস্যগণ যখন দিল্লী যাচ্ছিলেন সে সময় প্রতি ষ্টেশনে হাজার হাজার জনতা তাদেরকে মুবারকবাদ জানাতে এসে আবেগ ও বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বার বার বলছিলো- 'সে লোকটাকে দেখাও যিনি সৈয়দ নওশের সাহেবকে পরাস্ত করেছেন।'

এ প্রসঙ্গে মৌলভী আবদুল আউয়াল সাহেব বলেছেন– "জনাব সৈয়দ নওশের আলী সাহেবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দীতায় আমাকে বেগ পেতে হয়নি। আমি শুধু ভোটারদেরকে বলতাম, ফুরফুরার হযরত পীর সাহেব আমাকে দাঁড় করিয়েছেন, আমি তাঁরই লোক। অতএব আমাকে ভোট দিবেন। জয়লাভের পর বাংলার সর্ব সাধারণের নিকট আমি একজন দর্শনীয় ব্যক্তি হয়ে গেলাম। আমাকে দেখবার জন্য জনতার সে কী আকুল আগ্রহ! সকলেরই ধারণা-আমি বিরাট প্রভাবশালী ব্যক্তি। আর তা না হলে কখনই সম্ভব হতো না অতি প্রসিদ্ধ সৈয়দ নওশের আলী সাহেবকে শোচনীয় রূপে পরাস্ত করা। অথচ আমি কিছুই করিনি। আর কিছু করা আমার পক্ষে কখনই সম্ভব ছিল না। যা কিছু অসম্ভব সম্ভব হয়েছে হুযূরের সমর্থন ও তাঁর নামের বদৌলতে।"[৩৯৬]

অনুরূপভাবে নোয়াখালীর রামগাতিগঞ্জে হযরত পীর সাহেবের মনোনীত প্রার্থীকে পরাজিত ও কংগ্রেস প্রার্থীকে বিজিত করার উদ্দেশ্যে হিন্দু মহা সভার শ্রী রাজেন্দ্রলাল রায় চৌধুরী প্রচুর অর্থের প্রতিশ্রুতিতে প্রলুব্ধ করিয়ে প্রতিদ্বন্দী হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন জনাব গোলাম সরোয়ার হোসাইনীকে। অতঃপর হযরত পীর সাহেবের প্রার্থীর নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করেন কংগ্রেস প্রার্থীসহ শ্রী রাজেন্দ্রলাল রায় চৌধুরীর প্রার্থী গোলাম সরোয়ার হোসাইনী। পরাজয়ের কারণে প্রতিশ্রুত অর্থ দিতে অস্বীকারের ফলে পুত্রসহ জমিদার শ্রী রাজেন্দ্রলাল রায় চৌধুরী নিজস্ব পূজা মন্ডপে নিহত হন এক পূজাকালীন উৎসবে। নোয়াখালীতে এ ঘটনার প্রেক্ষিতে শুরু

৩৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫
৩৯৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

Dhaka University Institutional Repository

হলো হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা। যার মীমাংসার কারণে রামগাতিগঞ্জে সপ্তাহকাল অবস্থান করেছিলেন শ্রী শ্রী করম চাঁদ মহাত্মা গান্ধী। পরবর্তীতে এ দাঙ্গাই রূপ নিলো বাংলা ভারতের হিন্দু মুসলিম দাঙ্গায়।

জনাব হযরত পীর সাহেব অনেক সময় বভিন্ন আলাপ প্রসঙ্গে বলতেন– 'ও বাবা এনায়েতপুরী, ভালো করে শুনে রেখো, ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। আমার পরে এ ইতিহাসের সন্ধান কোথাও পাবে না।' তিনি দুঃখ করে কবলতেন– "তোমরা মনে করো জিন্নাহ সাহেব পাকিস্তান এনেছেন। কিন্তু জিন্নাহ সাহেব যখন তিন তলার উপরে নরম বিছানায় ঘুমে অচেতন, আর ঠিক সে সময় আমি স্বাধীনতার নির্বাচনে লোকদের সাথে আলাপ আলোচনা শেষে বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তির ইস্পাত কঠিন উত্তর দিয়ে রাত তিনটায় ঘরে ফিরে ঠান্ডা ভাত খাচ্ছি।[৩৯৭]

এ স্বাধীনতা আন্দোলনে বিভিন্ন নেতার রয়েছে বিভিন্ন প্রকারের অক্লান্ত পরিশ্রম। রাত দিন তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। আমি ও আমার একনিষ্ঠ অনুসারীগণও করেছেন। কিন্তু অনেক নেতার পরিশ্রমের পিছনে ছিলো স্বার্থের ইঙ্গিত। মন্ত্রী হওয়া ও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার সন্ধানে অনেকেই ছিলেন। কিন্তু আমার দাবী কী ছিলো ? আমি কী মন্ত্রী হতে চেয়েছি বা একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমার যতটুকু প্রাপ্য তার থেকে অধিক কিছু আমি দাবী করেছি ? আমি কিছুই চাইনি। শুধু এ আশা করেছিলাম যে, ওয়াদাকৃত আজাদী যমিন পাকিস্তানে হুকুমাতে ইসলাম কায়িম হবে। সুদীর্ঘ বছর পার হয়ে গেলো। এই মুনাফিকের দল তাও করলো না। এরা আল্লাহ্‌কে, আল্লাহ্‌র রাসূল (স.)-কে ঠকালো, অতঃপর আল্লাহ্‌ওয়ালাদেরও ঠকালো। তারপর এমন দিন আসছে যে এরাও ঠকবে। আর এমন ঠকা ঠকবে যে আফসোস আর আত্মধিক্কার ছাড়া প্রকাশের দ্বিতীয় কোনো ভাষা থাকবে না।

আপনাদের দেশে আসতে হচ্ছে আজকে পাসপোর্ট ও ভিসা করে। নিজ দেশে আজ আমি প্রবাসী। এতেও আমার আফসোস ছিলো না, যদি এদেশে হুকুমাতে ইসলাম কায়িম হতো, তাহলে আমার সমস্ত বেদনার হতো অবসান। আমরা জানতাম-ভারত ভাগাভাগী হয়ে গেছে, আজাদী যমিন হুকুমাতে ইসলাম পাকিস্তানে হয়তো আমরা নাও পড়তে পারি। তবুও পাকিস্তান চেয়েছিলাম। কেননা সেখানে হুকুমাতে ইসলাম কায়িম হবে। আল্লাহ্‌র যমিনে আল্লাহ্‌র প্রভুত্ব কায়িম হবে, সমস্ত বিশ্ব মুসলিম রাষ্ট্রের পথ দিশারী হবে পাকিস্তান। সে পাকিস্তানে আমি যদি বাস নাও করতে পারি, তাতে কী হয়েছে ? আমার অন্য মুসলমান ভাইয়েরাতো সে ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানে অতি সুখ ও শান্তির সঙ্গে বসবাস করবে আর সেখান থেকে ঘটবে মানবতার পূর্ণ বিকাশ।

অতঃপর ১৯৪৭ সালের ১৪ ই আগস্ট, ভারত ভাগ হয়ে রূপ নিলো হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান। ভৌগলিক সীমা রেখায় আমরা পড়লাম হিন্দুস্তানে আর আপনারা পড়লেন পাকিস্তানে। অর্থাৎ আমরা বিভক্ত হয়ে পড়লাম সাবের ও শাকেরের মাকামে। পাকিস্তান ভূখন্ডে যারা আছেন, তারা হবেন শাকের আর হিন্দুস্থানে আমাদেরকে হতে হবে সাবের। ওয়াদার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন না করে মুখে মুখে আলহামদুলিল্লাহ্ অথবা শুধু মাত্র জিন্দাবাদ বললে প্রকৃত শাকের হওয়া যায় না। আর না শোকর বান্দার নিকট হতে আল্লাহ্‌পাক অতি অবশ্যই ছিনিয়ে নেন তাঁর প্রদত্ত নি'য়ামত। আর আমরা যারা রয়েছি সাবেরের মাকামে, আমাদের রয়েছে বিষাদের মাঝে মহা আনন্দ। কেননা প্রকৃত সাবেরের সাথে রয়েছে স্বয়ং আল্লাহ্। - ان الله مع الصابرين বলে আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীন তাঁর প্রকৃত সাবের বান্দাহ্‌দেরকে দিয়েছেন সুসংবাদ।"[৩৯৮]

বড় হুযূর (র.)-এর খলীফা ও হিজবুল্লাহ্‌র রাজশাহী বিভাগীয় মুবাল্লিগ মাওলানা সাজ্জাদ আলী খান মাদানীপুরী (বাংগাবাড়ীয়া, নওগাঁ) 'স্বাধীনতা আন্দোলন এবং ১৯৪৫ ও ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে ফুরফুরার পীর সাহেব হযরত মাওলানা আবু নসর মোহাম্মদ আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.)-এর বলিষ্ঠ ভূমিকা' শীর্ষক এক প্রবন্ধে লিখেছেন– "পূর্ব হতেই ভারতের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব থাকায় রাজনৈতিক সমস্যা বিরাজ করছিল। এক সময় ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানদের অধিকার রক্ষার জন্য অনন্যোপায় হয়ে মুসলিম নেতারা এ

৩৯৭. মাওলনা আমিনুল্লাহ এনায়েতপুরী, *মুসলিম রাজনীতিতে ফুরফুরার পীর সাহেব* (ফুরফুরা: মুজাদ্দেদীয়া লাইব্রেরী, ১৯৭৬ খ্রী.), পৃ. ২০
৩৯৮. মাওলনা আমিনুল্লাহ এনায়েতপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

Dhaka University Institutional Repository

দুই জাতির ভিত্তিতে ভারত বিভাগের দাবি করেন। কংগ্রেস নেতাগণ ভারত বিভাগের তীব্র বিরোধীতা করতে থাকেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বৃটিশ সরকার খুব বিব্রত হয়ে পড়েন। এর ফলে ভারতের স্বাধীনতার পথ সুগম হয়। প্রতিশ্রুতি মুতাবিক ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য বড় লাট লর্ডওয়াভেল একটি অন্তবর্তী সরকারের পরিকল্পনা রচনা করেন এবং বৃটিশ সরকারের অনুমোদনক্রমে ১৯৪৫ সালের ১৪ই জুন এ পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। এ পরিকল্পনায় অন্তবর্তী সরকারের প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের মধ্যে মতানৈক দেখা দেয়। মুসলিম লীগের দাবি ছিল যে, ভারতে মুসলিম লীগই মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি ও ক্ষমতাসম্পন্ন দল। কিন্তু কংগ্রেসের দাবি ছিলো যে, কংগ্রেসই ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং ভারতের সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার একমাত্র তাদেরই।

এ পরিস্থিতিতে বৃটিশ সরকার কংগ্রেস ও লীগের প্রতিনিধিত্ব করার দাবি পরীক্ষা করার প্রয়োজন উপলব্ধি করে ১৯৪৫ সালের ২১ শে আগস্ট বড় লাট ঘোষণা করেন যে, আগামী শীত মৌসুমে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভাগুলির জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনের পর শীঘ্রই একটি সংবিধান সভা গঠিত হবে এবং প্রধান দলগুলির সহায়তায় অন্তবর্তী সরকার গঠিত হবে।

কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি বৃটিশ সরকারের সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তাব গ্রহণ করে। কংগ্রেস জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে অখন্ড ভারতের আদর্শে নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করতে প্রস্তুত হয়। তৎকালীন কতগুলি মুসলিম দল মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করার দাবি করতো, আবার কংগ্রেসের অখন্ড ভারতের নীতিতে বিশ্বাসীও ছিল। ফলে তারা মুসলিম লীগ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

মুসলিম লীগ ভারতের মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এটি প্রমাণ করার জন্য লীগ নেতাগণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দীতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মুসলিম লীগ ও মুসলমানদের ইতিহাসে এ নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিলো।

সর্বভারতের মধ্যে বাংলাদেশের মুসলমানদের সংখ্যা ছিল সবচাইতে বেশি। বাংলাদেশের মুসলমানগণ নির্বাচনে অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদের অপেক্ষা বেশি ভোট দিয়ে মুসলিম লীগের শক্তির পরিচয় দিয়েছিল। এ সাফল্যের পিছনে ফুরফুরার পীর সাহেবের ঐকান্তিক চেষ্টা, সমর্থন ও রূহানী দোয়া সহায়ক ছিলো।

মুসলিম লীগ পাকিস্তান দাবির ভিত্তিতে এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। ফুরফুরার পীর সাহেব রাজনীতি করেনি। কিন্তু মুসলমানদের বৃহত্তর স্বার্থে তিনি সাময়িকভাবে মুসলিম লীগকে জোর সমর্থন দান করেন এবং নেতাগণকে পরামর্শ দেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দী, জনাব খাজা নাজিমুদ্দিন, এ. কে. ফজলুল হক ইনারা সকলেই ফুরফুরার পীর সাহেবের মুরীদ ও ভক্ত ছিলেন। মাওলানা আকরাম খাঁ সাহেব ফুরফুরার পীর সাহেবের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা পোষণ করতেন।[৩৯৯]

১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় আইন সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৩০টি মুসলিম আসনের সব ক'টি মুসলিম লীগ দখল করে। ফুরফুরার পীর সাহেবের নিকট তৎকালীন মুসলমানরা ভারতের মুসলমানদের স্বার্থে পরামর্শ ও দু'আ কামনা করতেন। কখনও ফুরফুরার হযরত পীর সাহেব বিভিন্ন মিটিংয়ে তাঁর পক্ষ হতে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তৎকালীন ফুরফুরার মুহাদ্দিস (দেওবন্দ থেকে ফারেগ) হযরত মাওলানা ইসহাক মাদানীপুরী সাহেবকে পাঠাতেন।

১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রাদেশিক নির্বাচনী সংস্থার কর্মসচিব জনাব সোহরাওয়ার্দী ফুরফুরার হুযূরের নিতান্ত ভক্ত ও মুরীদ ছিলেন। পদাধিকার বলে প্রাদেশিক আইন সভার (বাংলার) জন্য নমিনেশন লিস্ট তৈরি করার ব্যাপারে তিনি ফুরফুরার পীর সাহেবের ওপরে সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছেড়ে দেন। ফলে ফুরফুরার পীর সাহেব এককভাবে সারা বাংলার মুসলিম লীগের প্রার্থীদের তালিকা তৈরি করেন এবং তা অনুমোদনের জন্য প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মাওলানা আকরাম খাঁ সাহেব লাহোরে জিন্নাহ

৩৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

Dhaka University Institutional Repository

সাহেবের নিকট নিয়ে যান। জিন্নাহ সাহেবের একান্ত পরিচিত ব্যক্তি যশোর জেলার বিশিষ্ট নেতার নাম তালিকায় না থাকায় জিন্নাহ সাহেব অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং মাওলানা আকরাম খাঁ সাহেবের সাথে কথোপকথন শুরু করেন।[৪০০]

জিন্নাহ সাহেব: ইয়ে লিস্ট কোন বানায়া হ্যায় ? অর্থাৎ এ নমিনেশনের তালিকা কে বানিয়েছেন ?

উত্তরে মাওলানা আকরাম খাঁ: ইয়ে লিস্ট ফুরফুরার পীর সাহেব তৈরি করেছেন।

জিন্নাহ সাহেব: আপলোগ মোল্লা মুন্সী মে লিস্ট বানা লেতে হ্যায় ? অর্থাৎ আপনারা মোল্লা মুন্সীদের নিকট থেকে লিস্ট তৈরি করেন ?

মাওলানা আকরাম খাঁ: ইয়ে মোল্লা মুন্সী নেহি, ইনহোনে আগার বিগাড় যায়ে তো সারা বাংলা, আসাম বিগাড় যায়ে গা। আপ দাস্তাখাত লাগা দিজিয়ে।
অর্থাৎ ইনি মোল্লা মুন্সী নহেন। ইনি যদি বিরোধী হয়ে যান, সমস্ত বাংলা ও আসামের মানুষ (লীগ) বিরোধী হয়ে যাবে। কাজেই আপনি এ প্রার্থী তালিকা অনুমোদনের সই দ্বিধাহীন চিত্তে করে ফেলুন।

জিন্নাহ সাহেব: হ্যাঁ আচ্ছি বাত হ্যায়, বাস আওর কুই বাত নেহি। মাই দাস্তাখাত লাগাতা হুঁ। অর্থাৎ হ্যাঁ এমন কথা! আর কোনো কথার প্রয়েজন নেই। আমি সই করে দিলাম।

লাহোর থেকে অনুমোদনকৃত প্রার্থীদের তালিকা মাওলানা আকরাম খাঁ সাহেব নিয়ে আসলেন। উল্লেখ্য যে, মাওলানা আকরাম খাঁ সাহেব অন্য মাযহাবের লোক ছিলেন। তথাপিও তিনি মুসলমানদের বৃহত্তর স্বার্থে ফুরফুরার পীর সাহেবের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁদের সঙ্গে কোনো দিন কোনো মনোমালিন্য ঘটেনি।

ফুরফুরার পীর সাহেব মুসলিম লীগের এ প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচন তথা পাকিস্তান আন্দোলনকে রূপায়িত করার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মুরীদ ও মুহিব্বীনগণ স্বীয় পীরের নির্দেশ পালন করার জন্য মাঠে ময়দানে নেমে মুসলিম লীগের সফলতার জন্য প্রচার কার্য চালাতে থাকেন।

একদিনের ঘটনা এ রকম ছিলো যে, জনাব সোহরাওয়ার্দী পীর সাহেবকে বললেন, নওশের আলীকা মকাবিলামে এক আদনা ছা ম্যারেজ রেজিস্টার কিস তারেহছে জিত সাখতা ? ইয়েতো শের কা মুকাবিলা মে গীধাড় হ্যায়।"

অর্থাৎ সোহরাওয়ার্দী বললেন, হুযূর! নওশের আলীর প্রতিপক্ষ সামান্য একজন ম্যারেজ রেজিস্টার। এ লিস্ট আপনি তৈরি করেছেন। আমরা মুরীদ হিসেবে আপনার কাজের প্রতিবাদ করার কোনো সাহস করি নি। আমার জ্ঞানে নওশের আলী একজন সিংহ বাঘ, আর নওশের আলীর প্রতিপক্ষ একজন সামান্য ম্যারেজ রেজিস্টার, শক্তির তুলনায় একজন শিয়াল সমতুল্য। ঐ ব্যক্তি কেমন করে জিততে পারে ?

ফুরফুরার হুযূর তখন বলেছিলেন– "শের কা মুকাবিলা মে গীধাড় জিত সাখতা হ্যায়। ইয়েহো তুম লোগোকা দেখলানে কে লিয়ে রাখাহু। ইলেকশেনকা বাত তুম লোগমে হোগা কেহ হাম লোক ছাব কুছ কিয়ে হ্যায়। তুমলোগোকো ফাকিরী দেখলানেকে লিয়ে এতনাহি বাকী রাখতাহু।"[৪০১]

অর্থাৎ আমি বাঘের মুকাবিলায় (নওশের আলীর প্রতিপক্ষ) শিয়ালতুল্য ম্যারেজ রেজিস্টারকে দাঁড় করিয়েছি তোমাদেরকে ফকিরী দেখাইবার জন্য। এ ম্যারেজ রেজিস্টারই ইলেকশানে আল্লাহ্ চাহে জিতবে। কারণ আমি বুঝতে পারছি ইলেকশান হয়ে গেলে তোমরা বলবে, হুযূর আমরাইতো সব কিছু করলাম। তোমাদের জ্ঞানে চক্কর লাগিয়ে দেয়ার জন্য বাঘের সঙ্গে শিয়াল দাঁড় করিয়েছি। তোমরা শেষে দেখবে, এ শিয়ালই বাঘকে হার মানিয়েছে।

৪০০. আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫
৪০১. মাওলনা আমিনুল্লাহ এনায়েতপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবে ইলেকশান শেষে দেখা গেলো, নওশের আলীর জামানতের টাকা পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। তাঁর বাক্স খালি, ভোট নেই।

জিন্নাহ সাহেব নির্বাচনের আগে ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারীর শেষের দিকে কলকাতায় আসেন। সে সময় তিনি ফুরফুরার পীর সাহেবের সঙ্গে দেখা সাক্ষাত করেন। মুসলমানদের মহা পরীক্ষার দিনে যখন বড় বড় আলিমগণ পর্যন্ত অখন্ড ভারতের প্রচারণায় ব্যক্তি স্বার্থে মুসলমানদের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে কংগ্রেসের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন, ঠিক সে সময় ফুরফুরার পীর সাহেব কংগ্রেসের ফাঁদে পা না দিয়ে মুসলমানদের এ সংগ্রামে মুসলিম লীগকে সমর্থন করায় তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং দোয়া গ্রহণ করেন। ফুরফুরার পীর সাহেব কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রাদেশিক নির্বচনের তালিকায় যাদের নাম ছিল, তারা প্রত্যেকেই জয়লাভ করেছিলেন। ১১৯টি মুসলিম আসনের মধ্যে ফুরফুরার পীর সাহেব কর্তৃক অনুমোদিত ১১৩টি আসনে ১১৩ জনই জয়লাভ করেন। ৬টি আসনে তৎকালীন মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম সাহেবের (বর্ধমান) মনোনীত প্রার্থী ছিলেন। ফুরফুরার পীর সাহেবের সঙ্গে সামান্যতম বেয়াদবী করার কারণে ঐ ৬টি আসনে আপত্তি হয় এবং পরবর্তীকালে পীর সাহেবের প্রার্থীগণ ঐ ৬টি আসনেও জয়লাভ করেন। অর্থাৎ হযরত পীর সাহেব কর্তৃক (বাংলা) প্রাদেশিক আইন সভায় মনোনীত প্রার্থীরা সকলেই একে একে জয়লাভ করেন।

নির্বাচনের দ্বারা 'মুসলিম লীগ' ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী নেতৃস্থানীয় ও ক্ষমতাসম্পন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়। মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবীর প্রতি ভারতীয় মুসলমানদের সমর্থন আছে নির্বাচনের মাধ্যমে এটাও প্রমাণ হয়ে যায়। কংগ্রেস নেতাগণ দাবী করেছিলেন যে, কংগ্রেস হিন্দু-মুসলমানসহ সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এ নির্বাচনের পর মুসলমানদের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করার দাবী নস্যাৎ হয়ে যায় এবং পাকিস্তান দাবী প্রকট হয়ে ওঠে।

লর্ড এটলীর শ্রমিক সরকারের নির্দেশে ভারতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে ভারতের বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিত্বের দাবির পরীক্ষা হয়। কংগ্রেস অখন্ড ভারতের আদর্শে এবং মুসলিম লীগ পাকিস্তান দাবির ভিত্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে। মুসলিম লীগ প্রায় একচেটিয়া মুসলমান আসনগুলি দখল করে ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক জীবনের প্রতিনিধিত্ব করার দাবি সামঞ্জস্য বিধান করতে প্রয়াস পায় এবং ১৯৪৬ সালের ১৯ শে ফেব্রুয়ারী বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলীর ঘোষণা মতে ভারতে একটি বৃটিশ সরকারের মন্ত্রী মিশন প্রেরিত হয়। এ মন্ত্রী মিশন ভারতীয় নেতাদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। ভারতের মুসলিম লীগ তাদেরকে জানায় যে, ভারতের মুসলমানেরা সংখ্যালঘু নয়। তারা একটি জাতি এবং অত্মনিয়ন্ত্রণ তাদের জন্মগত অধিকার।

কংগ্রেস সভাপতি মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ৩রা এপ্রিল মন্ত্রী মিশনের সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি সর্ব ভারতীয় (অখন্ড ভারত) যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। এভাবে আলোচনার পর আলোচনা চলতে থাকে। মুসলিম লীগকে পাকিস্তান দাবি থেকে সরে পড়ার জন্য অর্থাৎ ভারত বিভাগের দাবি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে কংগ্রেস নেতাগণ ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশ ও পাঞ্জাব বিভাগের দাবি উত্থাপন করেন। কিন্তু জিন্নাহ কিছুতেই পাকিস্তান দাবি হ'তে সরে পড়েননি।

ইংরেজ ও কংগ্রেসের যৌথ ষড়যন্ত্রের মুখে জিহাদ করে পাকিস্তান অর্জন করতে হয়। ষড়যন্ত্রকারীদের এরূপ ধারণা ছিল যে, খন্ডিত পাকিস্তান অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এবং প্রতিরক্ষার ব্যাপারে এত দুর্বল হবে যে এর পক্ষে টিকে থাকা অসম্ভব হবে। কিন্তু আল্লাহ্‌পাকের অপার করুনায় ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়।[৪০২]

ফুরফুরার পীর সাহেব যদি মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ব্যক্তিবর্গের মতো কংগ্রেসের দাবির সমর্থনে অখন্ড ভারতের দাবি সমর্থন করতেন, তাহলে নির্বাচনে নিঃসন্দেহে বাংলা ও আসামের মুসলিম লীগ প্রার্থীগণের পরাজয় ঘটতো। পাকিস্তান আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া বাংলা-আসামের যমিনে বানচাল হতো এবং সমগ্র ভারতে এর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতো।

---

৪০২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

Dhaka University Institutional Repository

এ বাংলাদেশ পূর্ব পাকিস্তান হিসেবে ঘোষিত না হলে আজ স্বাধীন বাংলাদেশের সৃষ্টি হতো না। ফলে এ দেশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকতো। তাই ফুরফুরার পীর সাহেব সময় সময় বলতেন– "মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশি?" এ কথার দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি বাংলার স্বাধীনতার জন্মদাতা। তাঁর অভাবে এ পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের জন্ম অসম্ভব ছিলো। এ দেশকে ও দেশবাসীকে তিনি অন্তর দিয়ে ভালোবাসতেন। তিনি বলতেন– "আমি যখন এ যমিনের বাইরে যাই, তখন আমার শরীরটা সঙ্গে যায়, কিন্তু রূহটা থাকে এ দেশে।"[৪০৩]

হযরত মাওলানা সিদ্দিকী (র.)-এর ওছীয়ত ও নছীহত

বিছমিল্লাহির রহমানির রহীম

১. সকলে কালিমা তাওহীদের ওপর কায়িম থাকবেন, হযরত নবী করীম (স.)-কে আখিরী যামানার শেষ নবী বলে মান্য করবেন, কেননা তাঁর পরে আর কোনো নবী আসবে না। তাঁর পরে আর কেউ নবী হবে এরূপ ধারণা কেউ করলে ঐ ব্যক্তি সাথে সাথে কাফির হয়ে যাবে।

২. সুন্নতের তাবেদারী নাজাতের একমাত্র পথ। শরীয়ত ও তরীকতের খিলাফ কাউকে করতে দেখলে তার তাবেদারী করবেন না।

৩. সুন্নতি পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার সব বিষয়ে সুন্নতে মু'আক্কাদার প্রতি খেয়াল রাখবেন, গায়ের কাওমের রীতি-নীতি অনুসরণ করবেন না, কারণ তা শরীয়ত অনুযায়ী না জায়িয। হযরত নবী করীম (স.) বলেছেন :

من تشبه بقوم فهو منهم -

"অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিজাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদের দলভুক্ত গণ্য হবে।"[৪০৪]

৪. কোট, প্যান্ট, এলবার্ট, কলারওয়ালা জামা, ওয়াসকোট, পার্সীকোট, সাহেবী টুপি, ইংরেজী জুতা এবং কাছামারা ইত্যাদি না জায়িজ কার্য করবেন না। কিস্তি টুপি আমি পছন্দ করি না। নবী করীম (স.) গোল টুপি ব্যবহার করতেন।

৫. মেয়েদেরকে পুরুষদের পোষাক এবং পুরুষদেরকে মেয়েদের পোষাক পরাবেন না, এগুলি না জায়িয ও হারাম।

৬. স্ত্রীলোকদের মাথার চুল কাটবেন না, এটা না জায়িয ও হারাম।

৭. পুত্র ও কন্যাদেরকে দীনের 'ইল্‌ম শিক্ষা দিবেন।

৮. স্ত্রীলোকদিগকে পর্দায় রাখার বিশেষ ব্যবস্থা করবেন। পর্দার ব্যবস্থা করে তাদেরকে বিদ্যা-বুদ্ধি, হুনুর-হিকমত শিক্ষা দিবেন।

৯. কোনো কবর, আস্তানা, পীর-দরবেশকে তা'জীমের সিজ্‌দা বা পায়ে চুম্বন করবেন না, এটা কঠিন হরামের কাজ।

১০. কোনো পীরের কবরে মান্নত-নিয়াজ বা ফুল-শির্নী চড়াবেন না, পীরের নামে হাজত মান্নত হারাম জানবেন।

১১. পীরকে আল্লাহ্‌র মত হাজির নাযির জানা শির্‌ক।

---

৪০৩. হযরত পীর সাহেব (র.)-এর ভাষণ ও ইতিহাসের পাতা থেকে সংকলিত, নেদায়ে ইসলাম, ৪৪ বর্ষ, ১১তম সংখ্যা; উদ্ধৃত: আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭

৪০৪. *সুনানু আবী দাউদ*, হাদীস নং- ৪০৩১

Dhaka University Institutional Repository

১২. টকি, থিয়েটার, বাইস্কোপ, নাচ, গান, বাজনা বা কাওয়ালীর মজলিশ হারাম। খবরদার ঐ স্থানে যাবেন না।

১৩. হুক্কা, বিড়ি, সিগারেট, গাজা, সিদ্দি, আফিম সেবন করবেন না। এগুলো মাকরুহ তাহরিমী ও হারাম, তবে মহিতার পাতা খাওয়া যায়, না খাওয়া ভালো।

১৪. সুদখোর, ঘুষখোর, জিনাকার, মদ্যপানকারী বা কোনো হারাম ব্যবসায়ীর দাওয়াত গ্রহণ করবেন না। এদের কোনো হাদিয়া-তোহ্ফা জেনে-শুনে গ্রহণ করবেন না।

১৫. হারাম খানেওয়লার মাল জানা অবস্থায় গ্রহণ করা জায়িয নয়।

১৬. হারাম উপার্জনের মাল হারাম এবং তা গ্রহণ করা থেকে নিজেকে পরহেজ করবেন।

১৭. পুত্র-কন্যার বিবাহে পণ দেয়া ও নেয়া হারাম। তাদের বাড়িতে জানা অবস্থায় দাওয়াত খাওয়া নিষেধ।

১৮. পূজা, মেলা, কাওয়ালী ইত্যাদি যে কোনো হারাম কার্যে সাহায্য করাও হারাম।

১৯. আমার খলীফা, মুরীদ, সন্তান, কুর'আন, হাদীস ও ফিক্হের বিপরীত কথা বললে তার তাবেদারী করবেন না।

২০. এক মুষ্টির ওপরে দাড়ি ছাটা বা কামান হারাম। গোঁফগুলি ছোট করবেন, মাথায় মেয়েদের মতো লম্বা চুল রাখবেন না, এটা না যায়েজ।

২১. ফুটবল, ব্যাটবল, তাস এরূপ বেকার বেহুদা কাজ না জায়িয।

২২. শবেবরাত, বিবাহে বা উৎসবে বোম ফুটানো, বাজী পোড়ানো, কলের গান ইত্যাদি ফজুল খরচ হারাম।

২৩. যেখানে থাকুন জামাতে নামাজ পড়বেন। জুম'আ ত্যাগ করবেন না। বাংলার গ্রামে জুম'আ জায়িয।

২৪. পীরের আম মজলিসে পীরের কদম বুচি ও মুসাফাহা করবেন না, সালাম দেয়া সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ।

২৫. পেশাব পায়খানার সময় কুলুখ ব্যবহার করবেন।

২৬. শরীয়তপন্থী পীরের কাছে বয়াত গ্রহণ করবেন, বেশরীয়তী পীরের মুরীদ হওয়া হারাম।

২৭. আমার বাড়িতে আমার ওয়ালেদ সাহেব ২১/২২/২৩ শে ফাল্গুন মাহফিলে ওয়ায ও ইসালে সাওয়াব করে গিয়েছেন, আমিও করি। আমার বাড়ির কায়েম মোকাম ইসালে সওয়াব বাংলা ভাগ হয়ে যাওয়ার পর পাকশী ও মীরপুর দারুস্ সালামে ওয়ায মাহফিল ও ইসালে সাওয়াব হেদায়েতের জন্য করে থাকি।

২৮. বাজে পীরের দরবারে অমাবশ্যা, পূর্ণিমা বা পীরের মৃত্যুর তারিখে নির্দিষ্ট করে 'ওরস' ইত্যাদি হয়ে থাকে, এমনকি জামায়াতে নামাজ পড়া হয় না, তথায় মেয়েলোক যায়। তারা হালকা করে ও বেপর্দা চলে, গান-বাজনা ও সিজদা ইত্যাদি করে। লোক জামায়েত করার জন্য নিজের এজেন্ট দিয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে গরু, মহিষ, ছাগল খরিদ করত পীরের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরিশেষে সেখানে নিলামে তাবাররুক বিক্রি করে আসল টাকা ওঠায়ে লভ্যাংশ এজেন্টদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এরূপ স্থানে যাওয়া হারাম এবং পীরের নামে দেয়া গরুর গোশ্ত খাওয়া হারাম।

২৯. জলি যিক্র জায়িয দুরস্ত আছে, কিন্তু নির্জন স্থানে করতে হবে; লোকালয়ে করা জায়িয নেই।

Dhaka University Institutional Repository

৩০. 'যোয়াল্লীন' ও 'দোয়াল্লীন' সম্পর্কে মতভেদ আছে। তৎসম্বন্ধে আমার মত এ যে, মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের মুহাক্কেক আলিমগণ যেরূপ দোয়াল্লীন পড়েন আমিও তদ্রূপ পড়ি, দালকে জাল দ্বারা পড়লে ফতুরি আসবে। কিন্তু যে ব্যক্তির চেষ্টা করা সত্ত্বেও মাখারেজ আদায় না হয় তার জন্য মাফ।

৩১. কেহ জমি কটবন্ধক রাখবেন না। জায়-সুদী ইত্যাদি দ্বারা কেউ সুদ খাবেন না ও যুল্ম করবেন না।

৩২. হানাফী, মালেকী, হাম্বলী ও শাফেয়ী এ চার মাযহাবের কোনো মাযহাবকে ইহানত করবেন না। আমি হানাফী, আমার মুরীদগণও হানাফী। শিয়া, রাফিজী ও খারিজী ইত্যাদিদের আকীদা বাতিল।

৩৩. চার মাযহাব নহে চারের মাযহাব, চার ইমামেরই দলিল হচ্ছে কুর'আন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস।

৩৪. যা কুর'আন ও হাদীসে স্পষ্টভাবে নেই তাকে কিয়াস বলে। এ কিয়াসকেও মান্য করতে হবে। চার মাযহাবকে যে ইহানত (অবজ্ঞা) করবে তার কাফির হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা এতে কুর'আন ও হাদীসকে অবমাননা করা হয়। নবী করীম (স.)-এর যামানা থেকে আজ পর্যন্ত সকলেই হচ্ছে আহলে হাদীস ও আহলে কুর'আন। যে আহলে হাদীস ও আহলে কুর'আন হবে তার আমল চারের কোনো এক মাযহাবের সাথে মিল থাকবে।

৩৫. আমি নিজে মিলাদ-কিয়াম করি। যারা করে না তারা জাহান্নামী হবে না, যারা করে তারাও জাহান্নামী হবে না, বরং যারা মিলাদ-কিয়াম এবং খুটিনাটি বিষয় নিয়ে ঝগড়া-ফাসাদ করে তারাই জাহান্নামী।

৩৬. 'ইল্‌মে গায়িব আল্লাহ্‌তা'আলা মুহাম্মাদ (স.)-কে যতদূর জানিয়ে দিয়েছেন তিনি ততদূর জানেন। গায়েবের মালিক আল্লাহ্‌তা'আলা এরূপ আকিদা রাখবেন। হযরত নবী করীম (স.) যেরূপ গায়িব জানতেন সে গায়েবকে 'ইল্‌মে হুসুলী বলে।

৩৭. দাঁড়ি রাখা, লম্বা জামা পরা ইত্যাদি সুন্নতকে যে অবজ্ঞা করবে তার ইমান থাকবে না। যেহেতু এর দ্বারা হযরত নবী করীম (স.)-এর সুন্নাতকে অবজ্ঞা করা হয়।

৩৮. হামজাত আমল করা দুরুস্ত নাই।

৩৯. মিথ্যা সৈয়দ দাবি করা হারাম।

৪০. নবী করীম (স.)-কে আল্লাহ্‌তা'আলার নূরের অংশ মনে করা ঠিক নয়। তিনি আল্লাহ্‌র নূরে আলোকিত এরূপ বিশ্বাস রাখবেন।

৪১. মাছ, গরুর গোশ্‌ত, লবন ফকিরিতে খাওয়া ঠিক নয়, এরূপ কথা না জায়িয।

৪২. যারা জিন ও ফিরিস্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করে তারা কাফির।

৪৩. মহররমে তাজিয়া বের করা হারাম ও না জায়িয, এসব থেকে সাবধান থাকবেন।

৪৪. খবরদার কেউ জীবজন্তু বা স্বীয় পীরের ছবি রাখবেন না।

৪৫. নবী করীম (স.)-এর মিরাজ স্বশরীরে হয়েছিল, সিনা ছাক, চাঁদ দুই টুকরা এগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করবেন।

৪৬. বিনা চাওয়ায় ওয়ায়েযকে ওয়াযের পর যে হাদিয়া বা নযরানা দেয়া হয় তা গ্রহণ করা জায়িয। তবে হালাল মাল হওয়া চাই, এটাকে উজরাত বলে না । বিবেচনা করে নযরানা দিতে হবে। হক্কানী 'আলিমের তা'যিম রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর তা'জীম।

৪৭. খাটি শরীয়তপন্থী পীর বা 'আলিমকে ভালো বাসবেন।

Dhaka University Institutional Repository

৪৮. মানুষের হকের দিকে খুব খেয়াল রাখবেন। কারো হক যেন নষ্ট না হয়।

৪৯. সাংসারিক ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবেন।

৫০. যা উপার্জন করবেন তিন ভাগ করবেন। এক ভাগ জমা রাখবেন, এক ভাগ দান-সদ্কা করবেন, এক ভাগ সংসারে খরচ করবেন।

৫১. তাকওয়া ও পরহেজগারী যথাসাধ্য করবেন। আধুনিক দুনিয়ার হাওয়ায় মজে যাবেন না।

৫২. দীন বজায় রাখার চেষ্টা করবেন।

৫৩. যিক্র, মুরাকাবা দুবেলা অর্থাৎ সকাল-সন্ধ্যায় ঠিক রাখবেন।

৫৪. আমার নিকট থেকে যারা বাতিনী শিক্ষা লাভ করেছেন তারা যথারীতি 'আমল করবেন।

৫৫. 'বিদ'আতে সাইয়ে'আকে' আমি লা'নত করি। হযরত নবী করীম (স.) ও সাহাবায়ে কিরামের যামানার পর জাগতিক বিষয়ে যা কিছু নতুন বের হবে তা যে কেবল বিদ'আতে সাইয়ে'আহ হবে তা ঠিক নহে।

৫৬. মনের কথা পীর বলতে পারে, হাত দেখে গণনা করতে পারে, পীরের বাড়িকে কেবলা মনে করা বা সেদিকে মুখ ফিরিয়ে বসা হারাম।

৫৭. যে সমস্ত পীর 'ইলম-কালাম জানে না, দীনের জন্য ওয়ায নছীহতে যান না, তা'লীম তাছাউফ দেন না, শরীয়ত বিরোধী কাজ দেখলে নিষেধ করেন না, অবাধে মেয়ে ছেলের সাথে মেলামেশা করে এরূপ লোকের কাছে মুরীদ হওয়া না জায়িয।

৫৮. পীরের ছেলে পীর হবে এমন কথা কুর'আন-হাদীসে নেই। যোগ্যতা থাকলে নিশ্চয়ই হবে।

৫৯. আমি হীন হায়াতে আমার বড় ছেলেকে কায়েম মোকাম করে গেলাম যেভাবে আমার ওয়ালেদ সাহেব আমাকে করে গিয়েছেন।

৬০. ইসলাম ছাড়া দুনিয়ায় যতো মতবাদ আছে সব কুফ্রী মতবাদ।

৬১. কোনো 'আলিম, মাওলানা, পীর, নেতা, লিডারের, এমন কি আমার রাসূল (স.)-এরও ইসলামের আইনে রদবদল করার অধিকার নেই, এটি আল্লাহ্র বিধান।

৬২. বিশ্ব ইসলাম মিশন 'কুর'আনী সুন্নী জমিয়াতুল মুসলিমীন হিযবুল্লাহ্'-র ঝান্ডা ইমাম মেহ্দী (আ.)-এর হাতে সোপর্দ হবে। আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলকে খুশি করতে হলে এ মিশনের সহযোগিতা করুন।[৪০৫]

৪০৫. আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২

Dhaka University Institutional Repository

২য় পরিচ্ছেদ

হযরত মাওলানা আবুল আনসার মুহাম্মাদ আবদুল কাহ্‌হার সিদ্দিকী (র.)

মুহিউস সুন্নাহ্ হযরত আবুল আনসার মুহাম্মাদ আবদুল কাহ্‌হার সিদ্দিকী আল কুরাইশী (র.) ছিলেন সমকালীন উপমহাদেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রখ্যাত ‘আলিমে দীন, হক্কানী পীর, বিখ্যাত ওয়ায়িয, সমাজ সংস্কারক এবং জাতির একজন প্রধান আধ্যাত্মিক নেতা। তাঁর সুস্পষ্ট ও শরীয়ত সম্মত বক্তব্য, শির্‌ক ও বিদ‘আত বিরোধী অবস্থান এবং সত্যের পক্ষে মযবুত ও আপোষহীন দৃঢ় প্রত্যয়ের জন্য তাঁকে বলা হয় শেরে ফুরফুরা বা ফুরফুরার বাঘ। মুজাদ্দিদে যামান আমীরুশ শরীয়ত ফুরফুরার বিখ্যাত পীর হযরত অবুবকর সিদ্দিকী (র.)-এর নাতি, তাঁর স্থলাভিষিক্ত ও তাঁর সকল প্রতিষ্ঠানের মোতাওয়াল্লী। পরতাপে কাইউমে যামান , হাকীমুল ইনসান হযরত আবু নসর মোহাম্মাদ আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.)-এর জ্যৈষ্ঠ পুত্র এবং তাঁর কায়িম মাকাম। তিনি ছিলেন কুরাইশ বংশীয় ও ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর ৪১তম বংশধর। পিতার ইন্তিকালের পর ঐতিহ্যবাহী দরবারে ফুরফুরার পীর হিসেবে ১৯৭৭ সনের মে মাসে তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় ৩০ বছর যাবৎ এ গুরুদায়িত্ব তিনি অত্যন্ত সফলতার সাথে পালন করে গিয়েছেন।[৪০৬]

জন্ম

হযরত মাওলানা আবদুল কাহ্‌হার সিদ্দিকী ভারতের পশ্চিম বঙ্গের হুগলী জেলার জাঙ্গীপাড়া থানার অন্তর্গত বিশ্ববিখ্যাত ফুরফুরায় ১৯৪০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আম্মা ছিলেন ধৈর্য, অতিথি সেবা, ইবাদাত-বন্দেগী, তাকওয়া-পরহেজগারী ও পর্দা-পুশিদার দিক দিয়ে স্থানীয় নারী সমাজের শ্রদ্ধার পাত্রী; বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার অন্তর্গত আনাখোনা গ্রামের সম্ভ্রান্ত বংশীয় পরহেজগার ও তাহাজ্জুদগুজার জনাব হাফিয মৌলভী মোহাম্মদ আফজার হোসেন সাহেবের তৃতীয় কন্যা।[৪০৭]

ফুরফুরার পীর হযরত মাওলানা আবুল আনসার মোহাম্মাদ আবদুল কাহ্‌হার সিদ্দিকী (র.) সম্পর্কে আবেগ সংবরণ করে কিছু বলা বা লিখা খুবই কঠিন ব্যাপার। নিজের মুরীদ, যাদের তিনি পীর ছিলেন, তারা তো তাঁকে সম্মান করে বলেই মুরীদ হয়েছে। কিন্তু মুরীদ ছাড়াও বহু গণ্যমান্য ‘আলিম, সমাজ নেতা, পাশ্চাত্য শিক্ষিত মানুষ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট এবং তাঁকে সম্মানের চোখে দেখেন। এর কারণ কেবল এ নয় যে, তিনি ভালো ‘আলিম, শরীয়ত ও মা’রিফতের জ্ঞানী ছিলেন এবং তা মেনে চলতেন, বরং এজন্যও যে, তিনি অত্যন্ত সমাজ সচেতন ছিলেন, সমাজের শিক্ষাব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, নৈতিক মুল্যবোধের গুরুত্ব, নেতৃবৃন্দের উদারতা, পারস্পরিক ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপদ্ধতি ছিলো উচ্চমানের। কারণ, তাঁর বংশগত ঐতিহ্য ছিলো অসাধারণ। উপমহাদেশে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, শায়খুল ইসলাম, ফুরফুরার পীর আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.)-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও সাহচর্যে তাঁর মনন ও মেধা বিকশিত হয়েছিলো।

শিক্ষা জীবন

শায়খুল ইসলাম হযরত আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.) তাঁর পুত্রকে যোগ্য ‘আলিম ও দরবারে ফুরফুরার ভবিষ্যত উত্তরসূরি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ছোটবেলা থেকেই উপযুক্ত শিক্ষা-দিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ফুরফুরা মাদ্রাসাতেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। তৎকালীন সিলেবাস অনুযায়ী মুমতাজুল মুহাদ্দিসীন ক্লাস পর্যন্ত বিভিন্ন কিতাব যেমন- তাফসীরে জালালাইন, তাফসীরে কাশ্‌শাফ, তাফসীরে বায়জাভী, সিহাহ সিত্তাহসহ সকল কিতাব তৎকালীন শীর্ষস্থানীয় ‘আলিম ও মুহাদ্দিসের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। কুর’আন, হাদীস, ফিক্‌হ, ‘আকাঈদ , মানতিক, ফালসাফা, ইতিহাস ও কাব্য সাহিত্যে তিনি বিশেষ বুৎপত্তিলাভ করেন। মাদ্রাসার সিলেবাস সমাপ্ত করে তিনি পিতার সান্নিধ্যে থেকে শরীয়তে ইসলাম, তাসাউফ ইত্যাদি বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।[৪০৮]

---

৪০৬. সৈয়দ আশরাফ হোসেন, *হযরত ন'হুজুর পীর কেবলার জীবন চরিত* (ঢাকা: ইসলামিয়া কুরআন মহল, ১৯৯৯ খ্রী.), পৃ. ১৯
৪০৭. মাওলানা আবুল বাশার জিহাদী, *জিন্দা পীরের জবনী* (হুগলী: হেদায়াতুল মুসলিমীন লাইব্রেরী, ২০১১ খ্রী.), পৃ.৩৩
৪০৮. ইয়াকুব ও খুরশিদ আনোয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

Dhaka University Institutional Repository

মরহুম পীর সাহেব (র.)-এর শিক্ষাজীবন সম্পর্কে মুফতীয়ে ‘আজম মাওলানা আবু ইব্রাহীম মুহাম্মাদ ওবায়দুল্লাহ সিদ্দিকী লিখেছেন– “আমার মরহুম বড় ভাই ফুরফুরার গদ্দিনশীন পীর হযরত মাওলানা আবুল আনসার মুহাম্মাদ আবদুল কাহ্হার সিদ্দিকী আল কুরাইশী (র.)-এর শিক্ষাজীবন কেটেছে তৎকালীন বাংলা ভারতের প্রখ্যাত ওলামায়ে কিরামের তত্ত্বাবধানে। স্থানীয় মাদ্রাসার মক্তব সেকশনে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। মাওলানা আবদুল হক সাহেবসহ বেশ কয়েকজন যোগ্য শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে তিনি উর্দু, ফার্সি ও আরবী কায়দা, আমপারা, বর্ণ পরিচয়, ধারাপাত, উর্দু পাহেলি, কুর’আন শরীফ নাজেরাসহ তৎকালীন সিলেবাস অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা সম্পাদন করেন।

দোঁক মাদ্রাসায় সালে আউয়াল, সালে দুয়াম, ছুয়াম, চাহারাম, পাহ্চমসহ সালে শশম পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। এ সময় তিনি বাকারাতুল আদব, উর্দু পাহেলি ও দুসরি, তাজবিদুল কুর’আন, মিজান ও মুনশা’ইব, রওযাতুল আদব, আযীযুন নুহাত নাহু, উর্দু তেসরি, ফার্সি দুসরি, আরবী আদব, কিতাবুল মুনসেফ, উর্দু চৌথি, হিদায়াতুন নাহু, কায়লবী আদবের কিতাব, নাহুর কিতাব কাফিয়া, সরফের কিতাব সাফিয়া, ফিকাহ কুদুরী, উসূলে শাশি, তারিখে হাবীবে এলাহী ইত্যাদিসহ তাজবীদ ও তরজমাসহ কুর’আন শরীফ অধ্যয়ন করেন। তাছাড়া সমমানের বাংলা, ইংরেজী, গণিত, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ও অধ্যয়ন করেন। এ সময় তাঁর শিক্ষকগণের মধ্যে মাস্টার রহিম বক্স পণ্ডিত সাহেব, মাওলানা আবদুল আযিয সাহেব, মাওলানা আবদুল মতিন সাহেব, মাওলানা আবু বকর সাহেব, মাওলানা বশিরুল্লাহ সাহেব, মাস্টার আবদুর রায্যাক সাহেব প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আলেমে আউয়াল, আলেমে দুয়াম, ফাযিলে আউয়াল ফাযিলে দুয়াম ও মুমতাযুল মুহাদ্দিসীন ক্লাসের বিভিন্ন কিতাব যেমন- আরবী আদব, সাহিত্য আল মুকতারাত, আল মুনতাখাবাত, মাকামাতে হারিরী, আল মুখতায়াত, আল মুতানাব্বি, সাবা মুয়াল্লাকা, ফারায়েযের কিতাব, বালাগাতের কিতাব, তারিখে ইসলাম, ফিকাহ হিদায়া, শরহি বিকায়া, মানতিকের কিতাব মাইবুজি, সুল্লামুল ‘উলূম, উসূলে ফিকাহ, নূরুল আনোয়ার, মুসালিমুস্ সুবূত, হিকমতের কিতাব হিদায়াতুল হিকমাহ, তাফসীরে জালালাইন, তাফসীরে কাশশাফ, মিশকাত শরীফ, আবু দাউদ শরীফ ইত্যাদি তিনি মাওলানা বশিরুল্লাহ সাহেব (প্রাইভেট শিক্ষক), মাওলানা মোস্তফা সাহেব (সুপারিনটেন্ডেন্ট, ফুরফুরা সিনিয়র আলিয়া মাদ্রাসা), মাওলানা খলিলুল্লাহ সাহেব (শিক্ষক, কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা), মাওলানা আশরাফ সাহেব, মাওলানা আবদুল গণি সাহেব (সুপারিনটেন্ডেন্ট, ফুরফুরা মাদ্রাসা), প্রমুখ সনামধন্য ‘আলিম ও শিক্ষকবৃন্দের নিকট অধ্যয়ন করেন। মাওলানা বশিরুল্লাহ সাহেব ফুলটাইম গৃহশিক্ষক হিসেবে সকল বিষয়ে হুযূর সাহেবকে বিশেষভাবে শিক্ষা প্রদানের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। বাংলা, ইংরেজী, গণিত, ভূগোল ইত্যাদি জেনারেল বিষয়গুলো মাস্টার রহিম বক্স পণ্ডিত ও মাস্টার আবদুর রায্যাক সাহেবের কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন।

আমাদের আব্বা হুযূর পরতাপে কাউয়ুম শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা আবু নসর মোহাম্মাদ আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.) ছোট বেলা থেকেই তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে বড় ভাইকে গড়ে তুলেছিলেন। নিজের সরাসরি তত্ত্বাবধানে যোগ্য শিক্ষকমন্ডলী ও ওলামায়ে কিরামের দর্স-তা’লীমের মাধ্যমে তিনি বড় ভাই সাহেবকে যোগ্য আলিম হিসেবে গড়ে তুলেন। সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে আল্লাহ্র ওলীদের সোহবত ও তাওয়াজ্জুহ থেকে আমার বড় ভাই ‘ইলমে লাদুনির ফায়েজ পেয়েছিলেন। যেমনিভাবে মুজাদ্দিদে যামান (র.) তাঁর বড় ছেলে শায়খুল ইসলাম বড় হুযূরকে, মেজ হুযূরকে, আল্লামা রুহুল আমীন (র.)-কে ‘ইলমে লাদুনির ফায়েয দিয়েছিলেন তেমনিভাবে আমার বড় ভাই সাহেবও ‘ইলমে লাদুনির ফায়েয পেয়েছিলেন।”[৪০৯]

পারিবারিক জীবন ও সন্তান-সন্ততি

বিশ্বনবী জনাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স.)-এর পারিবারিক জীবনের হুবহু নমুনা আমরা দেখতে পাই হযরত মরহুম পীর সাহেবের পারিবারিক জীবনে। মা-বাবা, স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, জামাই, পুত্রবধু, নাতি-নাতনি, আত্মীয়-স্বজন সবার হকই তিনি সুষ্ঠুভাবে আদায় করেছেন।

৪০৯. আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯

Dhaka University Institutional Repository

অনেকে মনে করেন ওলী আল্লাহ্‌দের জন্যে সংসারের সাথে সম্পর্ক শুন্য হওয়া শর্ত। কিন্তু ইসলাম বলছে 'লা রুহবানিয়াতা ফিল ইসলাম।' ইসলামে কোনো সন্ন্যাসবৃত্তি নেই। বনে গিয়ে আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন হওয়ার থেকে সংসারের মধ্যে অবস্থান করে আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন থাকা অনেক বেশি মর্তবাসম্পন্ন। প্রকৃত আল্লাহ্‌র ওলিতো তাঁরাই যাঁরা সুন্নত পালনের নিয়তে সংসারী হন, সে সাথে মুহূর্তের জন্যেও আল্লাহ্‌র স্বরণ থেকে গাফেল হন না। হক্কুল্লাহ্‌র সাথে সাথে সমস্ত হক্কুল ইবাদ যথাযথভাবে আদায় করে থাকেন। এ শ্রেণীর আল্লাহ্‌র ওলির এক জলন্ত উদাহরণ ফুরফুরার পীর সাহেব (র.)।

১৯৬৫ সনে মরহুম পীর সাহেব (র.)-এর সাথে মোসাম্মৎ সাইয়েদা খাতুন ওরফে নাহার বেগমের বিবাহ সম্পন্ন হয়। মোসাম্মৎ সাইয়েদা খাতুন ওরফে নাহার বেগম অতিথি সেবা, ধৈর্য, ইবাদাত বন্দেগী. তাকওয়া পরহেজগারি, পর্দা-পুশিদার দিক দিয়ে নারী সমাজের শ্রদ্ধার পাত্রী। তিনি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার চন্ডিতলা থানার অন্তর্গত বাঁদপুর গ্রামের আলহাজ খোন্দকার মোহাম্মদ আবদুল কাইউম সাহেব ও মোসাম্মৎ জীবন্নেসা ওরফে বশিরা খাতুন-এর দ্বিতীয়া কন্যা।[৪১০]

সন্তান-সন্ততি

মরহুম পীর সাহেব (র.) পারিবারিক জীবনে তিন পুত্র ও পাঁচ কন্যা ও সন্তানের জনক। প্রথম চার কন্যার পর দুই পুত্র, তারপর পঞ্চম কন্যা ও সবশেষে তৃতীয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

প্রথম পুত্র : মুহতারাম হযরত মাওলানা আবু বকর আবদুল হাই মিশকাত সিদ্দিকী। ফুরফুরার বর্তমান গদ্দিনশীন পীর। দুই কন্যা ও এক পুত্র সন্তানের জনক।

দ্বিতীয় পুত্র : মুহতারাম আবুল আরাফাত মুহাম্মদ মোস্তফা মাদানী সিদ্দিকী। উচ্চতর দীনি শিক্ষাগ্রহণের জন্য এখনও পড়াশুনা করছেন। মরহুম পীর সাহেব হুযূর (র.)-এর প্রতিষ্ঠিত সিদ্দিকীয়া মিডিয়া সেন্টার পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। এখনও অবিবাহিত আছেন।

তৃতীয় পুত্র : মুহতারাম ফতেহ আলী মুহাম্মদ আয়াতুল্লাহ্‌ সিদ্দিকী। উচ্চতর দীনি শিক্ষাগ্রহণের জন্য এখনও পড়াশুনা করছেন। বর্তমান গদ্দিনশীন পীর সাহেব হুজুরের সাথে বিভিন্ন মাহফিলে ওয়ায ও দাওয়াতের কাজে নিয়োজিত আছেন। মরহুম পীর সাহেব হুযূর (র.)-এর প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন দীনি প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক হিসেবে কাজ করছেন। মরহুম হুযূর বলতেন, 'আয়াতুল্লাহ হবে আমার মতো।' এখনও অবিবাহিত আছেন।

প্রথম কন্যা : মুহতারামা উম্মে 'আয়েশা সিদ্দীকা মোসাম্মৎ শবনব। সবার বড়। জামাতা ছারছীনার বর্তমান পীর শাহ মোঃ মুহেবুল্লাহ। দুই পুত্র ও তিন কন্যা সন্তানের জননী।

দ্বিতীয় কন্যা : মুহতারামা উম্মে আসলাম লতিফা খানম তাবাসসুম। জামাতা মুহতরাম ডাঃ আবদুল করীম সাহেব। সৌদি আরব প্রবাসী। তিন পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের জননী।

তৃতীয় কন্যা : মুহতারামা ফাতেমা আবুল আনসার আফসানা। জামাতা মরহুম মুহতারাম ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বহুগ্রন্থের লিখক, প্রখ্যাত ওয়ায়িয ও বক্তা। তিন কন্যা ও এক পুত্র সন্তানের জননী।

চতুর্থ কন্যা : মুহতারামা ইয়াকুতুন নিসা। জামাতা মুহতারাম আবু ইব্রাহীম একজন পরহেজগার ব্যবসায়ী। চার পুত্র সন্তানের জননী।

পঞ্চম কন্যা : মুহতারামা খিয়াম সিদ্দীকা। জামাতা মুহতারাম মাওলানা কাওছার মোঃ বাকী বিল্লাহ কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক। এক কন্যা সন্তানের জননী।[৪১১]

---

৪১০. সৈয়দ আশরাফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১
৪১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

মা-বাবার দু'আ

হযরত পীর সাহেব তাঁর আব্বা-আম্মার প্রাণ খোলা দু'আ পেয়েছিলেন। তাঁর আব্বা হযরত মাওলানা আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.) প্রায় জলসাতেই ছেলের জন্য দু'আ করতেন, মানুষের কাছে দু'আ চাইতেন। তিনি কাঁদতেন আর বলতেন– 'আল্লাহ্ তার হায়াত কিসমত বড় করুন।' ছেলেকে তার মা রাগ করে কিছু বললে তিনি বলতেন– 'আমার মরা হাজা ছেলে, খবরদার বদ দু'আ করো না।' হজ্জের সফরে রাসূলে করীম (স.)-এর দরবারে তিনি ছেলেকে 'ইলমে লাদুনীর সবকে বসিয়ে খাসভাবে দু'আ করেছিলেন। তিনি যখন ছেলের ওয়ায শুনতেন তখন আবেগ অতিশয্যে তাঁর চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়তো। তিনি ছেলের প্রশংসা করে বলতেন– 'আনসার মিয়ার দিলটা ভালো।' তিনি ছেলেকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। ছেলের দাড়িতে হাত দিয়ে আদর করতেন। চুল লম্বা হলে চুল ধরে নেড়ে বলতেন, 'পীর সাহেবের ছেলের মাথায় এত বড় লম্বা চুল কেন ?' ছেলের ঘরে পর পর চারটা মেয়ে হওয়ায় তিনি তাকে সান্তনা দিয়ে বললেন– 'মেয়ে হওয়া সুন্নতগো বাবা। তোমার দাদারও অনেক মেয়ে ছিলো।'

দাদার মতো ওলি

বড় হুযূর হযরত আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.)-এর আহলিয়া কয়েকটি ছেলে মারা যাওয়ায় কাঁদছিলেন। বড় হুযূর তাঁকে শান্তনা দিয়ে বললেন, 'কচির মা কেঁদ না।'[৪১২] আমি দু'আ করছি আল্লাহ্পাক তোমাকে এমন ছেলে দিন, যে তার দাদা তোমার শ্বশুরের মতো ওলি হয়ে দুনিয়ায় আসবে।' এর কিছুকাল পরেই মরহুম হুযূর জন্মগ্রহণ করেন।

হযরত আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.) একদিন স্বপ্নে দেখেন যে, মুজাদ্দিদে যামান আবু বকর (র.) পালকিতে চড়ে যাচ্ছেন আর বলছেন, "তোমার ছেলে দেখতে গিয়েছিলাম গো মা।" উল্লেখ্য যে, তখন পর্যন্ত বড় হুযূরের কোনো পুত্র সন্তান জীবিত থাকতেন না। শৈশবেই তাঁর ছয় সন্তান মারা যান। এমতাবস্থায় এ স্বপ্ন অত্যন্ত গুরত্ববহ। এ ঘটনার পরই বড় হুযূরের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন মরহুম পীর হযরত মাওলানা আবুল আনসার মোহাম্মদ আবদুল কাহ্হার সিদ্দিকী সাহেব। তাঁর চেহারা ও দৈহিক গড়ন হুবহু মুজাদ্দিদে যামানের অনরূপ।

হযরত বড় হুযূর (র.) তাঁর জীবনের শেষ হজ্জে আরাফাতের ময়দানে জাবালে রহমত পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে মাগরিব বাদ বহু ভক্ত, মুরীদ এবং দেশ-বিদেশের হাজিদের সামনে ফুরফুরার মারহুম হুযূর অর্থাৎ তাঁর বড় ছেলে মাওলানা আবুল আনসার মোহাম্মদ আবদুল কাহ্হার সিদ্দিকী সাহেবের বুকে হাত রেখে বলেছিলেন, "আমি দু'আ করি, আল্লাহ্ তোমাকে তোমার দাদা মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর মতো ওলি করে দিন।"

এ ঘটনা শুনাতে গিয়ে বিনয়ের সঙ্গে ফুরফুরার মরহুম পীর সাহেব হুযূর বলতেন, "দাদার মতো ওলি তো আর হতে পারবো না, তাঁর কাজটুকু করে যাই; ঐ কাজের ওলি আর কি।"

মাগুরার হাজি সাহেব নামে খ্যাত মুজাদ্দিদে যামানের প্রধান খলীফা খোন্দকার আবদুল হামিদ (র.) বর্তমান পীর সাহেবকে কিশোর বয়সে দেখলেই বলে ওঠতেন, 'আমার পীর।' আর কাঁদতে থাকতেন। কারণ তাঁর সঙ্গে হাজি সাহেবের পীর মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর চেহারা, 'আদল, আদব আখলাকের ছিলো হুবহু মিল। পশ্চিমবঙ্গের কুরআনী খিদমতের অগ্রদূত উস্তাদুল হুফ্ফাযকে হযরত আবদুল লতিফ (র.) যিনি 'বড় হুযূর সাহেব' নামে সুপরিচিত ছিলেন, মরহুম পীর সাহেবকে কোলে করে আদর করে বলতেন, 'আপনি আমার পীর, আমার ইসলাম, আপনি আমার ইমান।'

মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর বিশেষ খলীফা প্রখ্যাত 'আলেম হযরত মাওলানা দরগাহপুরী (র.) একবার মদীনা শরীফে পীর সাহেব হুযূরকে আদর করে বললেন, 'তুমি তো আমার দাদার মতো দেখতে।' মুজাদ্দিদে যামান হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (র.)-এর বিশিষ্ট খলীফা হযরত মাওলানা হাতেম আলী (র.) শৈলপুর মাদ্রাসার এক মাহফিলে পীর সাহেব হুযূরকে স্টেজে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'আমার পীরকে দেখতে হলে এনাকে দেখুন।'[৪১৩]

---

৪১২. ড. আবদুল গফুর সিদ্দিকী, *বালান্ডর পীর গোরাচাঁদ* (চব্বিশ পরগণা: মুহিদ কুতুবখানা, ১৩৯২ বাং.), পৃ. ৬৯
৪১৩. মাওলানা বাকীবিল্লাহ সিদ্দিকী, *হযরত ন' হুজুরের জীবন চরিত* (ঢাকা: ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, ১৯৯৯ খ্রী.), পৃ. ২৮

Dhaka University Institutional Repository

দাদার উত্তরাধিকারী

মরহুম হযরত বড় হুযূর আবু নসর মোহাম্মদ আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.) তাঁর ইন্তিকালের ৬ মাস পূর্বে পাকশী রিয়াজুল জান্নাত খানকাহ শরীফে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন, "আমার ওয়ালেদ সাহেব মুজাদ্দিদে যামান (র.) তাঁর মৃত্যুর প্রায় ছ'মাস পূর্বে আমাকে হুযূরের কায়েম মোকাম বলে ঘোষণা করে যান। আমিও তোমাদের বড় ভাই সাহেবকে (অর্থাৎ হযরত আবুল আনসার মোহাম্মদ আবদুল কাহ্হার সিদ্দিকী আল কুরাইশী) আমার অবর্তমানে কায়িম মাকাম গদ্দীনশীন বলে ঘোষণা করলাম।"[৪১৪]

ভারতের কলকাতায় বসবাসকারী মাওলানা তাহের সাহেব, যিনি দেওবন্দ মাদ্রাসার একজন অন্যতম শিক্ষক, তার পত্রিকাতে তিনি লিখেছিলেন, "ফুরফুরা শরীফের বর্তমান গদ্দীশীন পীর হচ্ছেন একমাত্র হযরত মাওলানা আবুল আনসার মোহাম্মদ আবদুল কাহ্হার সিদ্দিকী আল কুরাইশী সাহেব, অন্য কেহ নহেন।" ভারতের পত্রিকায় ছাপানো এ লিখার মূল্য অনেক, কারণ ফুরফুরার মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর অনেক আওলাদ আছেন যারা অনেকেই পীর এবং ওয়ায়িযীন, তাদের বহু ভক্ত ও মুরীদ আছেন। কিন্তু ফুরফুরার গদ্দীনশীন পীর বলতে একজনের অধিক হতে পারে না।

ইশা'আতে ইসলাম

ছাত্র জীবন থেকেই লেখা-পড়া করার পাশাপাশি তিনি ইশা'আতে ইসলামের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। পিতার সাথে বাংলা ও আসামের আনাচে-কানাচে যেয়ে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। দীনী মাহফিলে পিতার সাথে যোগদান করে হাজার হাজার মানুষের সামনে তিনি ওয়ায নছীহত করতেন। পিতার ইন্তিকালের পর তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন এবং পিতার আরদ্ধ কার্যাবলী সম্পন্ন করায় আত্মনিয়োগ করেন। পিতার ন্যায় তিনিও সমাজে যাবতীয় অপসংস্কৃতি, কুসংস্কার ও ইসলাম বিরোধী আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে সব সময় সোচ্চার ছিলেন। বহু সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসা, মস্জিদ, খানকাহ, ইয়াতিমখানা, মিডিয়া, পত্র-পত্রিকা, গবেষণা ও প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি হিদায়াতের কাজকে সম্প্রসারিত করে অনেক দূও এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন।

দুনিয়ার মানুষদের সৎপথে ডাকার জন্যে আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীন যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। হযরত নবী করীম (স.)-কে প্রেরণের মধ্য দিয়ে সমাপ্তি ঘটেছে এ নবুওয়্যাতী সিলসিলার। এরপর হতে আজ চৌদ্দ শত বছর যাবৎ প্রকৃত ওয়ারেসাতুল আম্বিয়া বা হক্কানী পীর-মাশায়েখগণ এ হিদায়াতের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করে আসছেন। ফুরফুরার মরহুম পীর সাহেব তাঁদেরই একজন সার্থক উত্তরসূরি ছিলেন। হিদায়াতের কাজে তিনি নযিরবিহীন ত্যাগ স্বীকার করে গিয়েছেন। কিডনী সমস্যা, ডায়াবেটিস, প্রেসার ইত্যাদিসহ হুযূর আরও বেশ কয়েকটি জটিল রোগে ভুগেছেন। পায়ের সমস্যার কারণে নিচে বসতে পারতেন না। শেষ বয়সে ভালোভাবে হাটতে পারতেন না, নামাজ পর্যন্ত বসে পড়তেন। এ অসুস্থ শরীর নিয়েই দৈনিক ৩/৪ টি করে জলসা করেছেন। এমনও অনেক সময় দেখা গেছে যে, আজ দিনাজপুর, আগামীকাল ঢাকা, তার পরের দিন চট্টগ্রামে জলসা। সুস্থ শরীর নিয়ে সামান্য একটু সফর করলেই আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ি, সেখানে অসুস্থ শরীর নিয়ে হুযূর নিজের আরমকে হারাম করে সারা বছর এভাবে হিদায়াতের কাজে সফর করেছেন।

বিভিন্ন জলসায় হুযূর যে হাদিয়া পেতেন তার প্রায় সবটাই তিনি হিদায়াতের কাজে মাহফিল, মস্জিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহতে খরচ করতেন। তাছাড়া পারিবারিক জমিজমা ও অন্যান্য ব্যবসার টাকাও সব ইসলামের খিদমতে ব্যায় করেছেন।

ভন্ড পীর-ফকীরদের দরবারে ওরশ, ওয়ায, ইসালে সওয়াব ইত্যাদির নামে গান-বাজনা ইত্যাদির জলসা বসে। সে সমস্ত জলসায় নারীরাও বেপর্দাভাবে যাতায়াত করে। কবর সিজ্দা, পীর সিজ্দা, পীর-মুরীদি ও মা'রেফাতের নামে ধোঁকা দেয়া, শির্ক, বিদ'আত ও সুন্নাত বিরোধী কর্মকান্ডে সারা দেশ ভরে গিয়েছে। ফলে মানুষের দীন, ঈমান, 'আমল সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ফুরফুরার মরহুম পীর সাহেব (র.) এ সকল বাতিলপন্থীর প্রতিরোধ করে এদের কর্ম ও 'আকীদা-বিশ্বাসের অসারতা ও ভয়াবহতা মানুষের সামনে তুলে ধরে এদের খপ্পর থেকে সরল প্রাণ মুসলমানদের ঈমান রক্ষার জন্য আজীবন প্রাণপন চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন। নিজের জীবনের

---

৪১৪. সুফী মোঃ রুস্তম আলী খান, *অমর এক জীবন কথা* (কলকাতা: ন্যাশনাল লাইব্রেরী, ১৯৭৫ খ্রী.), পৃ. ১৩৮-১৩৯

Dhaka University Institutional Repository

ঝুঁকি নিয়ে বাতিলপন্থীদের এলাকায় উপস্থিত হয়ে তিনি নির্ভীকভাবে মানুষদেরকে হক ও বাতিলের পার্থক্য বুঝিয়ে দিতেন। তাদেরকে এসব শরীয়ত বিরোধী কাজ হতে ফিরে আসার আহবান জানাতেন। বিদ'আতকে ছেড়ে দিয়ে বিশুদ্ধ হাদীসের ওপর আমল করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতেন।[৪১৫]

কাদেরিয়া, চিশিতীয়, নকশবন্দীয়া, মুজাদ্দেদিয়া তরীকার নামে যেসব জায়িয 'আমল-ওযিফা সমাজে প্রচলিত, তিনি সেগুলোকে জায়িয জানতেন, কিন্তু রাসূলে কারীম (স.) থেকে সরাসরি সহীহ হাদীসের মাধ্যমে যেসব আমল-ওযিফা বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর ওপর 'আমল করাকে উত্তম মনে করতেন এবং এ ব্যাপারে সবাইকে সব সময় উদ্বুদ্ধ করতেন। যখনই কোনো বিষয়কে সুন্নাত বা নবীজী (স.)-এর প্রিয় বা পছন্দনীয় বলে জানতে পারতেন তখনই তা বিনা দ্বিধায় মেনে নিতেন ও সবাইকে সে বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতেন। জায়িয-না জায়িয-এর তুলনায় সুন্নাত না খিলাফে সুন্নাত তার ওপরই তিনি বেশি গুরুত্ব দিতেন। জায়িয অথচ খিলফে সুন্নাত এমন বিষয়ও তিনি এড়িয়ে চলতেন। বিদ'আতের বিসর্জন, সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন এবং শির্ক বিদ'আত মুক্ত কুরআনী সমাজ গড়ায় বিশেষ অবদানের জন্য 'কুরআন শিক্ষা সোসাইটি' তাঁকে জাতীয় পর্যায়ে ২০০৩ সনে বিশেষ অ্যাওয়ার্ড বা পদক প্রদান করে।[৪১৬]

শির্ক হতে বাঁচার জন্য প্রয়োজন হলে জীবন উৎসর্গ করতে নবী করীম (স.) হুকুম করেছেন–
"তোমাদের যদি কেটে বা পুড়ে ফেলা হয় অথবা ফাঁসি দেয়া হয়, তথাপি আল্লাহ্‌র সাথে কখনও শির্ক করবে না।"[৪১৭]

অথচ বড়ই আফসোসের বিষয়-ঈমান রক্ষার জন্যে, শির্ক থেকে বেঁচে থাকার জন্যে কোনো ত্যাগ স্বীকার তো দূরে থাক, নিজের ইচ্ছায় বা অগোচরে আমরা এমন সব 'আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করছি বা এমন সব কাজ করে বসছি, যা সরাসরি শির্কের পর্যায়ভুক্ত। আমাদের মধ্যে কুফরী 'আকীদা, শির্কী বিশ্বাস, তাওহীদ বিরোধী শির্ক-বিদ'আত কাজ এমন ভাবে বিস্তার লাভ করেছে যে, নিজেদের অজান্তেই আমরা ঈমান হারাতে বসেছি, অথচ ভাবছি যে, আমি মুসলমান।

মুসলমানদের এ ঘোর দূর্দিনে মুসলিম সমাজকে শির্ক-বিদ'আত মুক্ত করে তাদের ঈমান ও 'আমল হিফাজতের জন্যে বহুমুখী কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন ফুরফুরার মরহুম পীর সাহেব হুযূর হযরত মাওলানা আবুল আনসার মোহাম্মদ আবদুল কাহ্‌হার সিদ্দিকী সাহেব। নিজের আরামকে হারাম করে অসুস্থ শরীর নিয়ে বৃদ্ধ বয়সে বাংলা-ভারতের আনাচে-কানাচে ঘুরে ঘুরে তাকরীরি (বক্তৃতা) ও তাহরীরি (লিখনি) ইশা'আতের মাধ্যমে তিনি মুসলমানদেরকে শির্ক সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছেন। সহজ সরল যুক্তি দিয়ে তিনি মুসলিম সমাজে প্রচলিত শির্কী বিদ'আতী 'আকীদা-বিশ্বাস ও কাজগুলোর অসারতা ও জঘন্যতা প্রমাণ করে এগুলো পরিত্যাগ করার আহবান জানিয়েছেন। তাঁর সার্বক্ষণিক চিন্তা ছিল একটাই– কি করে মুসলিম সমাজকে যাবতীয় শির্ক হতে মুক্ত করে প্রকৃত তাওহীদের রঙে রাঙানো যায়।

শুধু ওয়ায, বক্তৃতা, মৌখিক প্রচার বা লিখনীর মাধ্যমে মানুষকে উপদেশ দিয়ে, শির্ক-বিদ'আত পরিত্যাগ করে সৎ পথে আসার আহবান জানিয়েই তিনি বসে থাকেন নি– বরং ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, তাঁর প্রতিটি আচরণে, প্রতিটি কাজে আমরা দেখেছি এর বাস্তব প্রতিফলন।

কেউ বিপদে পড়ে দু'আ চাইতে এলে হুযূর বলতেন– বাবা! বিপদ মুক্তি আল্লাহ্‌র হাতে, আমার হাতে কোনো ক্ষমতা নেই। আপনি সালাতুল হাজত পড়ে আল্লাহ্‌র কাছে মুক্তি চান, আল্লাহ্ পাকই ইনশাআল্লাহ্ মুক্ত করে দিবেন। আমি দু'আ করছি।" কেউ জোর হাতে সামনে দাঁড়ালে বা বসলে তিনি রেগে গিয়ে তাকে স্বাভাবিকভাবে বসতে বলে বলতেন– "আমি ঠাকুর নাকি যে এভাবে বসেছেন?"[৪১৮]

---

৪১৫. মোঃ হালিম আরামবাগী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩
৪১৬. ওশিদুল ইসলাম, *মেজ হুজুরের জীবন চরিত* (চব্বিশ পরগণা: মুহিত কুতুবখানা, ১৩৯২ বাং.), পৃ. ৯১
৪১৭. আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩
৪১৮. আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫

Dhaka University Institutional Repository

ফুরফুরার মরহুম পীর সাহেব (র.) ছিলেন শিরক-বিদ'আতের বিরুদ্ধে আপোষহীন। সকল প্রকার শিরক-বিদ'আত হতে মুসলিম সমাজকে মুক্ত করার জন্য তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তাঁর সংগ্রাম ছিলো সমাজকে শিরক-বিদ'আত মুক্ত করার সংগ্রাম। এ ব্যাপারে যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে তিনি সদা প্রস্তুত ছিলেন। হুযূরের জীবন প্রতিজ্ঞা ছিলো– "মুসলিম সমাজকে শিরক বিদ'আত মুক্ত কারার জন্য প্রয়োজন হলে আমি আমার সমস্ত সম্পদ, বিবি, বাচ্চা সব কিছু এমনকি নিজের জানও কুরবানী করতে প্রস্তুত। শরীরের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে হলেও মুসলিম সমাজকে শির্ক বিদ'আত মুক্ত করবোই ইনশাআল্লাহ্।"[৪১৯]

কয়েক যুগ আগেও উপ-মহাদেশের দীনী শিক্ষা প্রচারের এক মাত্র মাধ্যম ছিল আরবী, উর্দু ও ফার্সি ভাষা। তৎকালীন সমাজে বাংলা ভাষায় দীনী কিতাব খুঁজে পাওয়া দুষ্কর ছিলো। ফুরফুরার তরফ থেকে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় দীনী কিতাব ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ইসলামী বিশ্বকোষেও এ কথা উল্লেখ রয়েছে।[৪২০]

ফুরফুরার মরহুম পীর সাহেব (র.)-এর নির্দেশে শত শত দীনী কিতাব প্রকাশিত হয়েছে। কুর'আন-হাদীসের ওপর গবেষণা করার জন্য তিনি 'কুর'আন-হাদীস রিসার্চ সেন্টার' এবং এ গবেষণালব্ধ কিতাব প্রকাশের জন্য 'ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা' প্রতিষ্ঠা করেছেন। ইতোমধ্যে এ প্রতিষ্ঠান থেকে শতাধিক কিতাব প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি কিতাব আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছে। বেশ কয়েকটি ভারত থেকেও প্রকাশিত হয়েছে। বহু আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে হুযূর আজীবন মাসিক নিদায়ে ইসলাম পত্রিকা প্রকাশ অব্যহত রেখে ছিলেন। এখনও তাঁর উত্তরসূরিরা এ পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ করছেন। এছাড়া মানবতা, Voice of Islam, Message of Islam প্রভৃতি সাময়িকী আকারে মাঝে মাঝে প্রকাশ করেছেন। উর্দু 'সাদায়ে কওম' ও আরবীতে 'হেলালে ইসলাম' পত্রিকা প্রকাশ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এছাড়া টেবলয়েট সাইজে দু'এক মাস পর পর ৪ পৃষ্ঠার সাময়িকী পত্রিকা এবং বিভিন্ন উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ কপি হ্যান্ডবিল ছাপিয়ে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন।

শিক্ষা বিস্তারে ফুরফুরার অবদান অপরিসীম। ইংরেজ আমলে যখন মুসলমানদের শিক্ষার হার ছিলো নিতান্তই নগন্য, সে সময়ে ফুরফুরার প্রচেষ্টায় অসংখ্য মাদ্রাসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। মুসলমানদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলার এক বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গৃহীত হয় ফুরফুরার তরফ থেকে। ফলে শিক্ষাব্যবস্থা দিন দিন উন্নত হতে থাকে এবং মুসলমানদের এক বিরাট অংশ শিক্ষিত হয়ে ওঠেন।

নারী শিক্ষা বিস্তারে ফুরফুরার অবদান চিরস্মরনীয় হয়ে থাকবে। ফুরফুরার মরহুম পীর সাহেব নারী শিক্ষার প্রতি অত্যধিক জোর দিতেন। তিনি বলতেন, "কেবলমাত্র পুরুষ জাতির শিক্ষা ও প্রগতির দ্বারা সমাজের জাগরণ আসবে না। নারী জাতিরও শিক্ষা-সংস্কারের বিশেষ প্রয়োজন। আদর্শ মাতা না হলে আদর্শ সন্তান আশা করা যায় না। তবে নারীদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে পর্দার সাথে। তাদের জন্য ভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।" ফুরফুরার মরহুম পীর সাহেবের প্রচেষ্টায় ঢাকার দারুস সালামসহ দেশের অরও বেশ কয়েটি স্থানে অনেকগুলো মহিলা মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছে।

মাদ্রাসা ও মস্‌জিদ প্রতিষ্ঠায় হযরত পীর সাহেবের আত্মত্যাগ সত্যিই নযিরবিহীন। বাংলা-ভারতের আনাচে কানাচে তিনি অসংখ্য মাদ্রাসা ও মস্‌জিদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। এছাড়া আরো অনেক জায়গায় জমি খরিদ করে গিয়েছেন মাদ্রাসা-মস্‌জিদ করার নিয়তে। নিজের কষ্টার্জিত টাকার প্রায় সবটাই তিনি ব্যয় করতেন মাদ্রাসা-মস্‌জিদের কাজে। মাদ্রাসার আয়ের ঘাটতি নিজের তহবিল হতে পূর্ণ করে দিতেন।

একবারের ঘটনা। দারুস সালাম মাদ্রাসার খুব অর্থ সংকট দেখা দেয়। হযরত পীর সাহেবের হাতেও টাকা নেই। এখন কী করবেন ? হযরত পীর সাহেব স্বীয় বিবির সোনার অলংকারগুলো তাঁর ইযাযত নিয়ে মাদ্রাসায় দিয়ে দিলেন। এমনকি ঘরের মূল্যবান জায়নামাযটিও দিয়ে দিলেন। এসব বিক্রি করে অর্থের সংস্থান করা হলো।

৪১৯. রশিদুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮
৪২০. আবদুল হক ফরিদী, আ.ফ.ম. সম্পা, *বিস্তারিত ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬ খ্রী.), পৃ. ৩০৬

Dhaka University Institutional Repository

আরেকবার মাদ্রাসা অর্থসংকটে পড়লে হযরত পীর সাহেব (র.)-কে তা জানানো হলো। হুযূর বললেন, "বাবা হাতে টাকা নেই। ঘরের অলংকার বা তদ্রুপ কোনো মূল্যবান বস্তুও দেখছি না যে বিক্রি করবো! এখন কি করা যায় ?" অত:পর একজনের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে তা মাদ্রাসায় দান করে দিলেন।

ঢাকার দারুস সালাম 'মার্কাজে ইশ'আতে ইসলাম' এবং পাবনার পাকশীতে 'দারুশ শরীয়ত রিয়াযুল জান্নাত' নামে বহুমুখী দু'টি ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র বা কমপ্লেক্স তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন। দারুস সালামে আগ্রার তাজমহলের নকশায় এবং পাকশীতে হুমায়ুন টোম্বের নকশায় এতদঞ্চলের বিশাল দু'টি দর্শনীয় মস্‌জিদ নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। মস্‌জিদ ছাড়াও এসব কেন্দ্রে সুবিশাল মাদ্রাসা, ইয়াতিমখানা, মুসাফিরখানা, খানকাহ, ওযুখানা, ইসালে সওয়াবের দর্শনীয় স্থায়ী স্টেজ ও গেট, কুতুবখানা ইত্যাদি স্থাপিত হয়েছে। শুধুমাত্র দারুস সালামেই প্রায় দেড় হাজার ছাত্র-ছাত্রী দীনী শিক্ষা লাভ করছে। পাকশী ও দারুস সালাম মাদ্রাসা দু'টোকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের জন্য হুযুর আজীবন সচেষ্ট ছিলেন। নামও দিয়েছিলেন 'পাকশী কুরআনী ইউনিভার্সিটি' ও 'দারুস সালাম কুরআন-হাদীস বিশ্ববিদ্যালয়'। আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে হুযূরের স্বপ্ন এখনও বাস্তবায়িত হয়নি।[৪২১]

বিশ্বব্যাপী দাওয়াতী তৎপরতা

ফুরফুরার মরহুম পীর হযরত মাওলানা আবুল আনসার মোহাম্মদ আবদুল কাহ্হার সিদ্দিকী (র.) তাঁর ইসলামী দাওয়াতী কর্মকান্ডকে বাংলা-ভারতের গন্ডি পেরিয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেবার জন্যে আজীবন প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন। আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টনকে কুর'আন পড়ে ইসলামকে বুঝার জন্য আহবান জানিয়েছেন। আমেরিকা, কানাডা, ডোমেনিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, জার্মানি, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, বৃটেন ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত অন্যান্য দেশ, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ, সৌদি আরব, দুবাই বাহরাইন, ইরানসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন আরব দেশসমূহ, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, মালোয়েশিয়া, পাকিস্তান, চীন প্রভৃতি দেশে তাঁর অসংখ্য ভক্ত-মুরীদ আছেন। টেলিফোন, চিঠি-পত্র দেশে এলে সাক্ষাতের মাধ্যমে এসব প্রবাসী ভক্ত-মুরীদগণ হুযূরের পরামর্শ ও নছীহত গ্রহণ করতেন। ঐ সব দেশ সফর কারার জন্য হুযূরকে দাওয়াত দেয়া হতো। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা ও সময়ের স্বল্পতার কারণে তিনি অনেক দেশেই যেতে পারেননি। দু'বার লন্ডন, তিনবার অস্ট্রেলিয়া (২০০০, ২০০২ ও ২০০৫), একবার ইরাক, পাকিস্তান ও মালোয়েশিয়া সফর করেছেন। আমেরিকা ও জাপান সফরের আয়োজন প্রক্রিয়াধীন ছিল। হজ্জ, ওমরা ও যিয়ারত উপলক্ষে প্রায় পঞ্চাশ বার সৌদি আরব সফর করেছেন। এসব সফরে তিনি ছোট বড় অসংখ্য মাহফিলে ও আলোচনা সভায় ওয়ায-নছীহত করেছেন, মানুষকে ইসলামের দিকে ডেকেছেন।

একবারের লন্ডন সফরে অঠাশটি জলসায় পীর সাহেব হুযূর ওয়ায করেছেন। তিনি যখন লন্ডন সফরে যান তখন বাংলাদেশের তাবলীগের তৎকালীন কেন্দ্রীয় আমীর ইঞ্জিনিয়ার আবদুল মুকিত সাহেব (র.) তাবলীগের লন্ডন মার্কাজকে হুযূরের যাতে কষ্ট না হয় তা দেখা শোনার নির্দেশ দিয়ে চিঠি লিখে দেন। লন্ডনে হুযূর তাবলীগের মার্কাজে অবস্থানকালে সেখানকার আমীর আবদুল মুকিত নামে এক বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার সাথী রাত তিনটায় তাহাজ্জুদের ওয়াক্তে হুযুরকে ওযুর পানি এগিয়ে দেবার জন্য অপেক্ষা করতেন। সেখানে তাবলীগের কেন্দ্রীয় আমীর হযরতজীর জন্য রাখা খাছ বিছানায় হুযূরকে শুতে দেয়া হয়।

ইরাক সফরের ঘটনা বলতে গিয়ে হুযূর বলতেন– "বাবা কি বলবো, বাগদাদে বড় পীর আবদুল কাদির জিলানী (র.)-এর মাযারটাই কেবল পড়ে আছে, ইসলামের কিছুই নেই। দু'চারটা দোকান পর পর মদের দোকান। বেপর্দা বেহায়াপনা যে এত নীচু পর্যায়ে পৌঁছেছে যা বলে বুঝানো যাবে না।"[৪২২]
পাকিস্তান সফরের সময় সেখানকার বেশ কয়েকজন বড় বড় ওলামা মাশায়েখের সাথে হুযূর দীনী বিষয়ে মত বিনিময় করেন।

৪২১. ডহযবুল্লাহ গবেষণা পরিষদ, *তাযকেরাতুল আউলিয়া* (ঢাকা: মুহাম্মদীয়া কুতুবখানা, ১৯৮৮ খ্রী.), পৃ. ১৩৩
৪২২. মুবারক আলী রহমানী, *ফুরফুরা শরীফের ইতিবৃত্ত* (কলকাতা: নাসারীয়া প্রকাশনী ট্রাষ্ট, ১৯৮৪ খ্রী.), পৃ. ৫৭

Dhaka University Institutional Repository

ভারত হুযূরের নিজের দেশ হলেও বছরে অধিকাংশ সময় বাংলাদেশে থাকার কারণে তিনি যখন ভারতে যেতেন আমাদের মনে হতো তিনি কোনো বিদেশ সফরে গিয়েছেন। বছরে প্রায় দু'মাস তিনি ভারতে সফর করতেন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মাঝে তিনি দীনের দাওয়াত দিতেন।

বিভিন্ন দেশের নাগরিক এবং ওলামা-মাশায়েখগণ বাংলাদেশে এলেই ঢাকার দারুস সালামে হুজুরের সাথে সাক্ষাত করতে আসতেন। মিশরের আলিমরা দারুস সালামে এসে হুযূরের সাথে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা শেষে হুযূরের প্রশংসা করে বলেন, 'হাযা শায়খ সহীহ' অর্থাৎ এ পীর সাহেব সহীহ পথে আছেন। আলজেরিয়ার অধিবাসী ড. আবদুল ওয়াহেদ সাহেব যখন বাংলাদেশে আসেন তখন হুজুরের ভূয়সী প্রশংসা করে বলতেন– 'আপ হক পার হ্যায়' অর্থাৎ আপনি হকের ওপর আছেন। অনেক সময় তিনি বলতেন , 'হাম বহুত জায়গামে বহুত পীর দেখা মাগার শায়খে ফুরফুরাকে তারেহ এ্যয়ছা পীর নেহি দেখা।' ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গ রাজ্যের লস এ্যাঞ্জেলস নিবাসী আমেরিকান নও মুসলিম ইব্রাহীম বাংলাদেশে এসে দারুস সালামে হুযূরের খিদমতে বেশ কয়েকদিন অবস্থান করেন। তিনি হুযূর সম্পর্কে বলতেন– 'আমার জীবনে দেখা সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ।" উপ-মহাদেশের প্রখ্যাত 'আলিম শায়খুল হিন্দ হোসাইন আহমাদ মাদানী (র.)-এর সাহেবজাদা আওলাদে রাসূল (স.) হযরতুল 'আল্লাম মাওলানা আস'আদ মাদানী সাহেব (র.) ঢাকার দারুস সালামের দরবারে ফুরফুরায় কয়েক বছর আগে এসেছিলেন। ফুরফুরার মরহুম পীর সাহেবকে উদ্দেশ্য করে তিনি এক পর্যায়ে বললেন, "হামলোক সব একই হ্যায়।" অর্থাৎ আমরাতো সবাই একই। ঢাকায় আরমানিটোলায় এক মাহফিলের পর আস'আদ মাদানী সাহেব পীর সাহেবকে অত্যন্ত মুহাব্বাতের সাথে জড়িয়ে ধরে বললেন– "হামারি সাত আপকা পুরানা তা'আল্লুক হ্যায়।" অর্থাৎ আমার সাথে আপনার সম্পর্ক তো পুরানো। আস'আদ মাদানী তাঁর জুব্বাখানা খুলে ফুরফুরার হুযূরকে হাদীয়া দেন। ইরানের সাবেক প্রেসিডেন্ট রাফসানজানি বাংলাদেশ সফরে এসে অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় ওলামা-মাশায়েখদের সাথে হুযূরকে বিশেষ ভাবে দাওয়াত দেন এবং তাঁকে দিয়ে মাহফিলের আখেরী মুনাজাত করান। প্রেসিডেন্ট নিজ আসন ছেড়ে ওঠে এসে হুযূরকে জড়িয়ে ধরে সম্মান দেখান।

যা হোক, বিশ্বব্যাপী মরহুম পীর সাহেব হুযূরের দাওয়াতী তৎপরতা এবং বিভিন্ন দেশ সফরের বিষয়ে আলোচনা করছিলাম। ঈসায়ী ২০০০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ১৮ দিনের এক হিদায়াতী সফরে হযরত পীর সাহেব অস্ট্রেলিয়া গিয়েছিলেন। এটা ছিল তাঁর প্রথম অস্ট্রেলিয়া সফর। উক্ত সফরের পেছনে যার উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা সবচেয়ে বেশি, হুযূর যাকে 'ডাক্তার সাহেব' বলে ডাকতেন, সে সর্বজন পরিচিত শ্রদ্ধেয় তারিক সিদ্দিকী, যাঁকে অস্ট্রেলিয়ায় হুযূর তাঁর খলীফা হিসেবে মনোনীত করেছিলেন, তিনি হুযূরের প্রথম বারের অস্ট্রেলিয়া সফরের ওপর একটি অনবদ্য বর্ণনা স্বকণ্ঠে ক্যাসেটে বন্দি করে আমাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন হুযূরের ইন্তিকালের কয়েক বছর আগে। কিন্তু দুঃখ জনক হলেও সত্য হুযূরের জীবদ্দশায় আমরা ক্যাসেটের সে বর্ণনাকে লিপিবদ্ধ করে ছাপাতে পারিনি। এটা আমাদের এক ধরনের অবহেলা বলে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।[৪২৩]

হঠাত করেই গত ২০ ডিসেম্বর ২০০৬ খ্রী. আমাদের প্রাণপ্রিয় পীর ও মুর্শিদ ইন্তিকাল করলেন। এরপর আকস্মিকভাবেই ক্যাসেটটির কথা মনে পড়লো। এর ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে আমরা উদ্যোগ নিলাম ক্যাসেটবন্দি বর্ণনাকে লিপিবদ্ধ করার। ক্যাসেটটি পুরনো হয়ে যাওয়ায় লিপিবদ্ধ করার কাজে আমাদের কর্মীবাহিনীকে বেশ কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। এজন্য তাদেরকে শুকরিয়া জানাচ্ছি। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ডা. তারিক সিদ্দিকী সাহেবের প্রতি, যিনি অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করে সফরের বর্ণনাটি ক্যাসেটবন্দি করে দিয়েছেন। বর্ণনাটি প্রায় বছর ছয়েক আগে প্রণীত। চলুন তাহলে ডাক্তার সিদ্দিকী সাহেবের মুখে শোনা যাক হুযূরের এ অস্ট্রেলিয়া সফর ২০০০ এর ঘটনাপুঞ্জী। ডাক্তার তারিক সিদ্দিকী সাহেব বর্ণনা করেছেন–

ফুরফুরা মানুষের অন্তরে গেঁথে আছে

অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশের অনেক মানুষ বাস করে। অমি এখানে কিছুদিন থেকে আছি। সত্যিই আমার জানা ছিলো না যে, মানুষের মধ্যে ফুরফুরার এমন মুহাব্বত এখানেও আছে। কেননা এদেশে আমি ব্যক্তিগতভাবে যতো মানুষকে চিনি প্রত্যেকেই অন্য ধরনের জীবনযাপনেই ব্যস্ত। অর্থাৎ তরীকত পন্থী লোক এখানে পাওয়া মুশকিল। হয়তো নামাযী, হয়তো বিভিন্নভাবে দীনের কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন, নিজেকে আবদ্ধ রাখেন,

৪২৩. আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০

কিন্তু বেশির ভাগ মানুষ একেক জন একেক ছকে জীবন যাপন করেন। আমার দীর্ঘ দিনের শখ ছিল, ইচ্ছে ছিলো আমার মুর্শিদ ফুরফুরার পীর হযরত মাওলানা আবুল আনসার মুহাম্মদ আবদুল কাহ্হার সিদ্দিকী সাহেবকে কীভাবে অস্ট্রেলিয়ায় আনা যায়। কিছু দিন আগে যখন ফোন করলাম হুযূর বললেন যে, 'লন্ডনে ভিসা হয়েছে, অস্ট্রেলিয়াতে (এম্বেসিতে) গিয়েছিলাম, ওরা মেডিকেল করতে দিয়েছে।' আমি জানি মেডিকেল করতে দেয়া মানে ভিসা দিয়ে দিবে। অবাক হয়ে গেলাম। কারণ কোনো স্পন্সর ছাড়া, কোনো ইনভাইটেশন ছাড়া, কোনো একটা সূত্র ছাড়া অস্টেলিয়াতে, বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো থার্ড ওয়াল্ড কান্ট্রির মানুষের ভিসা পাওয়া মুশকিল; কেউ পেয়েছে বলে আমার জানা নেই। আমি এখান থেকে স্পন্সর পাঠাবার চিন্তা করছিলাম। ঐ জন্যই ফোনটা করেছিলাম যে, এখান থেকে ভিসা কিভাবে পাঠাবো, দেশের থেকে কী কী কাগজ লাগবে ইত্যাদি আলাপ করবো।

অমরা দুনিয়াদার মানুষ। দুনিয়ার নিয়মকানুন গুছিয়ে চিন্তা করি। আল্লাহ্র ওলিদের জন্য আল্লাহ্র দুনিয়ার নিয়মের বাইরেও নিয়ম থাকে। তাই প্রত্যক্ষ করলাম। হুযূরের সঙ্গে যিনি এম্বেসিতে গিয়েছিলেন, তিনি অস্ট্রেলিয়া হতে বিয়ের জন্য বাংলাদেশে যান, ইয়াং বয় ইকরাম হাই চৌধুরী। তিনি এসে বললেন– 'তারিক ভাই, আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমি সঙ্গে ছিলাম, যদি প্রয়োজন হয় আমি কিছু বলবো, স্পন্সরশিপ লাগলে আমি দিব। অবাক হয়ে গেলাম আমরা কোনো কথা বলার আগেই হুযূরের পাসপোর্টটা দিয়ে দিলো। বললো, এ আপনার ভিসা। সত্যি এমন আমিও জীবনে শুনিনি। আলহামদুলিল্লাহ্।

ভিসা হওয়ার সংবাদ এখানে বসেই পেলাম। এখন অপেক্ষা করছি কবে আসবেন। আমি আমার কাজ থেকে ছুটি নিলাম। ফোনে সংবাদ পেলাম সেপ্টেম্বরের ১২ তারিখ মঙ্গলবার রাত ৯টার সময় প্লেন সিডনিতে ল্যান্ড করবে। ঘর গুছাতে গুছাতে গুছানোই যেনো আর শেষ হয় না, হুযূরকে কোন ঘরে থাকতে দিব, হুযূরের জন্য কীভাবে কী গুছিয়ে রাখবো, যতই করি মন ভরে না। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে গেলো। এয়ারপোর্ট যেতে আমার বাসা থেকে প্রায় এক ঘন্টারও বেশি সময় লাগে। অনেক দূর। সিডনিতে বহু রাস্তায় সত্তর কিলোমিটার স্পিডেও চালানো যায়। তবুও দূরত্ব। সে জন্য চিন্তা। এয়ারপোর্টে যখন যাচ্ছি ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছি। যেনো আল্লাহ্ জানিয়ে দিলেন যে, প্লেন ঠিক মতোই ল্যান্ড করেছে এবং আমি যেনো পৌঁছে গেছি হুযূর বের হওয়ার আগেই। গাড়ি কার পার্কে পার্ক করে এক রকম ছুটতে ছুটতে চললাম ভিতরের দিকে। এরাইভাল ডেস্কের ইনফরমেশন সেন্টারে জিজ্ঞেস করলাম যে, মালোয়েশিয়ান এয়ারলাইন্স ল্যান্ড করেছে কিনা। বললো হ্যাঁ টাইম মতোই ল্যান্ড করেছে। অর্থাৎ সাড়ে নয়টায়। আমার বেশ বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল পৌঁছতে। তবুও মানুষের ভিড়, সবাই আত্মীয়স্বজনকে রিসিভ করতে গিয়েছে, ইমিগ্রেশন পার হয়ে যখন পেসেঞ্জাররা বেরিয়ে আসছেন, আমি সে ভিড়ের ফাঁকে পেসেঞ্জারের দিকে লক্ষ্য করে দেখছি, অজস্র মানুষ আসছে। সত্যি দেখার মতো দৃশ্য! কেননা হুযূর যখন বের হয়ে আসলেন, তার সামনে কোনো মানুষ নাই। এমনকি তার পেছনে সব মানুষ, চারদিকে মানুষ, শুধু সামনেটায় একটা মানুষও নাই। যেন সবাই গার্ড অফ অনার দিয়ে তাঁকে নিয়ে আসছে আলহাদুলিল্লাহ্। অন্তরটা ভরে গেল। যেন একজন প্রেসিডেন্ট বলা ঠিক হবে না, রাজা বলা ঠিক হবে না, এমন সুন্দরভাবে হেঁটে আসছেন। তাঁর হাঁটার কায়দা, কীভাবে তিনি হেঁটে আসছেন, কীভাবে তাঁর প্রতিটি পা ফেলছেন, কিভাবে তাকিয়ে আছেন, যেন মোহময়! একটু কাছে আসতেই আমি এগিয়ে গেলাম। ইকরাম ভাই এবং তার স্ত্রী সঙ্গে ছিলো। তাঁর পেছনে ছিলো। ট্রলিতে মাল ছিলো পেছনে ইকরামের হাতে। বাইরে এসে দেখলাম ইকরামের কিছু আত্মীয়স্বজনও এসেছেন তাকে রিসিভ করার জন্য।

আমরা লাউঞ্জ থেকে বের হয়ে গাড়ির দিকে যাবো, এমন সময় হুযূরকে রিসিভ করার জন্য আরো কয়েকজন লোক এসেছেলেন তাদের সাথে দেখা হলো। একজন আমার পিঠে টোকা দিয়ে বলছেন, আপনি কি তারিক ? বললাম হ্যাঁ। অর্থাৎ তিনি ফোনে জেনে নিয়েছিলেন হুযূর কখন আসবেন। তিনিও নিজের কাজ বন্ধ করে এয়ার্পোটে হাজির হয়েছেন। তাঁর পরিচয় হচ্ছে মোহাম্মদ ফেরদৌস। ঢাকার গোড়ানের মো. ফারুক, যিনি হুযূরের একনিষ্ঠ ভক্ত ও হুযূরের বহু কাজের আঞ্জামদাতা, বাংলাবাজার প্রেসের মালিক, তাঁর ছোট ভাই। তিনি তাঁর ছোট ভাইকে ফোন করে বলেছেন, খবরদার! সব কাজ বন্ধ করে দাও, হুযূরের খিদমত করো। তিনি এয়ার্পোটে নিজের কাজ বন্ধ করে হাজির ছিলেন। তিনি বললেন, হুযূর আমার বাসায় যাবেন কি ? হুযূর বললেন, পরে আসবো। এখন একটু ডাক্তার সাহেবের বাসায় যাই। আলহামদুলিল্লাহ্। গাড়ি পার্কিংয়ে এসে গাড়িতে উঠলাম। আসতে আসতে একটু কথা হলো। কিছুক্ষণ গাড়ি চালানের পরে হুযূর বলছেন– বাসা কত

দূরে ? এখন বুঝলাম দীর্ঘ সফরের ক্লান্তি সবাইকেই পেয়ে বসে। আমরা অস্ট্রেলিয়াতে আসি, আমরা বয়সে অনেক নবীন, আমরাও ক্লান্ত হয়ে যাই। কেননা সত্যি দীর্ঘ সফর। বিশেষ করে মালোয়েশিয়াতে কোনো হল্টেজ হয়নি। ফলে বাংলাদেশ থেকে একটানা প্রায় চৌদ্দ ঘন্টার সফর। স্বাভাবিকভাবেই দেহ মন ক্লান্ত হয়ে যায়।[৪২৪]

পৃথিবীর অপর প্রান্তে

অস্ট্রেলিয়া একটি মহাদেশ। যেমন এশিয়া একটি মহাদেশ, ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা এগুলো এক একটি মহাদেশ। অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের একটি বৈশিষ্ট্য হলো এ মহাদেশটি পৃথিবীর অন্যান্য মহাদেশ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। একটি দেশ নিয়েই একটি মহাদেশ। আয়তনে প্রায় আমেরিকার সমান অথচ একটি ভূখন্ডে বৈচিত্রও অদ্ভুত ধরনের। দেশটির মাঝখানে বিশাল বিশাল মরুভূমি। চারদিকে সাগর। সাগরের পাড়ে পাড়ে জন বসতি গড়ে উঠেছে। জনসংখ্যার প্রায় সত্তরভাগ সিডনিতেই বসবাস করে। যদিও সিডনি রাজধানী নয়, কিন্তু এর আবহাওয়া কিছুটা সহনীয়। গরম কালে অতিরিক্ত গরম পরে না। শীতকালে অস্ট্রেলিয়ার অন্যান্য এলাকার তুলনায় শীত কম।

সিডনিতে যখন হুযূরকে নিয়ে পৌঁছলাম রাতে ঘরে হিটারের ব্যবস্থা করলাম। কেননা এখানে দিনে যতই গরম পড়ুক রাতে লেপ বা কম্বল লাগবেই। রাত বারোটার পর থেকে ঠান্ডা পড়া শুরু হয় এবং ফজর ওয়াক্ত পর্যন্ত ঠান্ডা পড়তেই থাকে। সুতরাং ঘরে হিটারের ব্যবস্থা রাখতেই হয়।

সকালে ওঠে হুযূর বললেন– রাতে বেশ ঠান্ডা পড়ে। বিশেষ করে মাত্র কালকে বাংলাদেশ থেকে বের হয়েছেন। মাত্র চব্বিশ ঘন্টার ব্যবধানে ভিন্ন ধর্মী একটি আবহাওয়ার চাপ সহ্য করা অনেকের জন্যেই মুশকিল। আমরা এদেশে থাকি। তবু যখন এখানে আসি, বাংলাদেশ থেকে আসার পর পরই আমাদের অনেকের ঠোঁট ফেটে যায়, হাত-পা জ্বলতে থাকে আবহাওয়ার বৈশিষ্টের কারণে। যদিও কয়েক দিনের মধ্যেই তা আবার ঠিক হয়ে যায়। সুতরাং, হুযূরের জন্য আমারও চিন্তা হচ্ছিল কী করা যায়। পরদিন থেকে সে সমস্ত অসুবিধা দূর করার জন্য কিছু ব্যবস্থা নিলাম।[৪২৫]

প্রথম দিন হুযূরকে তাই বললাম যে, আপনি একটু বিশ্রাম করুন, আমি একটু বাইরে গিয়ে ঘরের জন্য কেনা কাটা করে আসি। আসার পর হুযূর বললেন যে, আপনি আমাকে ছাড়া চলে গেলেন ? বললাম– কিছু কেনাকাটা করে আসলাম। পরে আবার হুযূরকে নিয়ে বের হলাম। দোকানগুলো দেখে বললেন, বিশেষ করে ঘর বাড়িগুলে, আগে তো লন্ডন গিয়েছেন, হুযূরের একটি কমেন্ট, একেকটি কথা যেন অনেক ভাব ব্যক্ত করে, এক কথায় অনেক ভাব বুঝিয়ে দিতে পারেন; যেমন বললেন যে, বৃটিশরা যেখানে গেছে তাদের প্রভাব রেখে গেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম– তার মানে ? বললেন যে, লন্ডন গিয়েছি সেকানকার বাড়ি ঘরগুলো একই প্যাটার্নের, এমনকি ইন্ডিয়াতেও বৃটিশরা যেসব এলাকাতে ছিলো সেখানেও বাড়ি ঘরের একই কধরনের প্যাটার্ন দেখা যায়। রাস্তা বাড়িঘর একই কায়দায় তারা গড়ে তুলেছে। এটা ইংরেজ সভ্যতার একটা অংশ। মূলত অস্ট্রেলিয়াও লন্ডনের সভ্যতা। তার কারণ হচ্ছে এখানে আদি বাসি যারা ছিলেন তারা পৃথিবীর কাছে প্রায় অপরিচিতই রয়ে গিয়েছিলেন। প্রায় দু'শ বছর আগে লন্ডনের একজন নাবিক সমুদ্রে ঘুরতে ঘুরতে অস্ট্রেলিয়ার সন্ধান পান। ফিরে গিয়ে রানীকে যখন বললেন, তখন বৃটিশের কারাগার থেকে অসংখ্য বন্দিকে অস্ট্রেলিয়াতে তারা দীপান্তর করেন। মজার কথা হচ্ছে যে কাপ্তান তাদেরকে নিয়ে এসেছিলেন, সিডনির বন্দরে তাদেরকে নামিয়ে দিয়ে তার ফেরত চলে যাওয়ার কথা ছিল। তিনি উল্টো চিঠি লিখে লন্ডনকে জানান– এমন সুন্দর দেশ ছেড়ে আমি আর যাবো না। এভাবেই লন্ডনের মানুষ এখানে বসবাস শুরু করেন। দেশ গড়ে তোলেন। লন্ডনের ধাচে এখানকার সভ্যতা এজন্যই গড়ে উঠেছে। অস্ট্রেলিয়ায় কোনো বায়ু দুষণ নাই। বায়ুর মতো এখানকার পানিও বেশ সুন্দর ও বিশুদ্ধ। একদিন হুযূর কলের পানি খেয়ে বললেন– পানিটা বেশ মিষ্টি। যেন খাবার এমনিতেই হজম হয়ে যায়।[৪২৬]

মানুষ নিয়ে আমাদের কারবার

৪২৪. এ. কে. এম. আমজাদ আলী এনায়েতপুরী, *কারামতে আউলিয়া ও শাহ সাহেবের জীবনী* (কলকাতা: ন্যাশনাল লাইব্রেরী, ১৯৯৫ খ্রী.), পৃ. ৪৮
৪২৫. মহিউদ্দিন খান, *দরবারে আউলিয়া* (ঢাকা: নেছারিয়া কুতুবখানা, ২০০৮ খ্রী.), পৃ. ৭০
৪২৬. আবু সালেহ মোঃ রেজওয়ানুল করীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২

হুযূরকে বিশ্রামের জন্য যখন আমি সময় ছেড়ে দিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম সব সময় ব্যাস্ত থাকেন, অস্টেলিয়ায় এসেছেন– আমি একটু বিশ্রমের সুযোগ করে দেই। তারপর মাঝে মধ্যে দূরে কোথাও নিয়ে যাবো যেন এদেশটার পরিচয় একটু লাভ করতে পারেন এবং সারা বছর যেভাবে তিনি মাহফিল করেন প্রতিদিন দু'তিনটা চারটা করে, সে ব্যস্ততা থেকেও একটু মুক্ত হওয়া যাবে। কিন্তু দ্বিতীয় দিনেই হুযূর বললেন যে, এভাবে কি আমাদের ভালো লাগে। মানুষ নিয়ে আমাদের কারবার। আমাদের কাছে মানুষ আসবে। কথা বলবে, তার সমস্যার কথা বলবে, আমরা সমাধানের চেষ্টা করবো। তার সাথে কথা বলবো। সে দু'টো প্রশ্ন করবে। আমরা তার সাথে ইসলামের আলোচনা করবো, দীনের কথা বলবো। এ না হলে কি আমাদের চলে?

আমি বুঝতে পারলাম আর দশ জন মানুষের যেমন চিন্তাধারা তেমন করলে হুযূরের সাথে পারা যাবে না। কেননা নিছক বেড়ানো তাঁর উদ্দেশ্য নয়। নিছক দেশ দেখায় তাঁর কোনো আনন্দ নেই। ইসলামের কাজ তিনি সকল অবস্থায় করতে চান। আমি ফোন বন্ধ করে রেখেছিলাম, এখন ফোন খুলে দিলাম। কয়েকজনকে ফোন করলাম যে , হুযূর আমার বাসায় এসে গেছেন, আপনারা দেখা করতে চাইলে আসতে পারেন। যেই না বলা মানুষ যেনো বাঁধ ভাঙ্গা বন্যার মতো ছুটে পড়তে লাগলেন। যে সমস্ত মানুষকে আমি আগে কোনো দিন চিন্তাও করি নি যে তারা পীরের খবর রাখেন, কেননা তার জন্মের পর থেকে তিনি আমেরিকাতে ছিলেন, সেখানে পড়াশুনা করেছেন, সেখান থেকে ইমিগ্রেশন নিয়ে এখানে চলে এসেছেন, এদেশে বিয়ে করেছেন, কেউবা বাংলাদেশ থেকে বিয়ে করে এখানে এনেছেন, সবাই চাকুরিতে ব্যস্ত। তাদের আচার-আচরণ কথায় কখনোও বোঝা যায়নি যে, পীর কাকে বলে– এগুলো বোঝেন অথবা পীরের সাথে কথা বলার জন্য তাদের আগ্রহ আছে। অথচ তারা এমনভাবে ছুটে আসলেন যে, হুযূরের কাছ থেকে আর নড়তে চান না। আমার ঘরে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত আলাপ করে আবার বলছেন– আমার বাসায় যেতে হবে, আমার বচ্চা একা আছে, ওর মা অমুক যায়গায় গেছে চাকুরিতে, সুতরাং হুযূর যদি অনুমতি দেন আমি সন্ধ্যার সময় আবার আসবো। বেচারার গাড়ি নাই ট্রেনে আসবেন। তাই আমি একটু আপত্তি করে বললাম, আপনি আবার কষ্ট করে আসবেন! তবু বললেন– না ভাই, অন্য দিন আমি কাজ করি রাতের বেলা, দিনে ঘুমাতে হয়, আজকের দিনটা ছাড়া আমার সময় নেই, আপনি অনুমতি দিন, আমি আবার আসবো, হুযূরের সাথে থাকতে আমার ভালো লাগছে।

ইকরামের এক বন্ধু খবর পেয়ে সেও ছুটে আসলো। হুযূরের পাশে বসে আছে। উঠতে চায় না। কী আবেগ, কী প্রেম–সত্যিই অবাক লাগে। এভাবে বহু মানুষ এসে দেখা করে গেছেন। তাদের কথা বলছেন। বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর জেনেছেন। একদিন যেতে না যেতেই আমি আমার পরিচিতদের আরো বললাম যে, সেফটনে বাংলাদেশীদের যে মস্‌জিদ আছে, সেখানে মাহফিল করা দরকার। ঠিক হলো পরের শুক্রবার জুমার সময় হুযূর কিছু বলবেন এবং পরের রবিবার অর্থাৎ ২৪ সেপ্টেম্বর সেফটনে যোহর বাদ মাহফিল হবে। মাহফিলের আয়োজন আমার অনুপস্থিতিতেই সবকিছু হলো। কেননা আমি হুযূরকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় দাওয়াতে ব্যস্ত হয়ে গেলাম। আনোয়ারুল আলম মিঝু ভাই, মাহফুজ ভাই এবং হারুন ভাই তিনজন এতো ওতোপ্রতোভাবে জড়িয়ে গেলেন যাদের সাথে আমার অল্প দিন আগে পরিচয় হয়েছে। অথচ তারা বললেন– তারিক ভাই, আপনার কোনো চিন্তা করতে হবে না। আপনি হুযূরের সাথে সময় কাটান, আপনি সেখনে থাকেন, মাহফিল আমরা করবো। মানুষকে আপনি দাওয়াত দেয়ার কাজে ব্যস্ত থাকেন। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ছাপানোর জন্য আপনি আমাদেরকে খালি সময় এবং কী কী লিখতে চান বলে দেন, আমরা ব্যবস্থা করছি। ফেরদৌস ভাই বললেন তারিক ভাই, আপনি কোনো চিন্তা করবেন না, পত্রিকায় আমি ছাপিয়ে দেবো। সত্যিই তাই করলেন তিনি। এখানে বাংলাদেশীদের একটি মাত্র পত্রিকা চালু আছে। ২৩ শে সেপ্টেম্বর তা ছাপা হওয়ার কথা। সেখানে বিজ্ঞাপন গেলো। ২৪ শে সেপ্টেম্বর মাহফিল হবে। দুপুর ১২ টা ৫২ মিনিটে আযান হবে। এবপরে খাবার পরিবেশন হবে। তারপর ওয়ায মাহফিল শুরু। মহিলাদের জন্য মসজিদ সংলগ্ন স্থান ঘেরাও করে পর্দার ব্যবস্থা করা হলো। যদি গরম পরে সে জন্য কয়েকটি ফ্যানের ব্যবস্থা করা হলো। এখানে আমাদের 'ইসলামী দা'ওয়াহ সার্কেল' নামে একটি সাংগঠনিক তৎপরতা সফলভাবে চালু আছে। বহু যুবক ছেলে, চাকুরিজীবী, বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত মানুষ তারা সাংগঠনিকভাবে ইসলামের খিদমত করে যাচ্ছেন। বিশেষ করে তাদের দা'ওয়াহ তৎপরতা প্রশংসার দাবিদার। বহু ক্যাসেট, বই এবং আলোচনা অনুষ্ঠান তারা মাঝে মাঝে আয়োজন করেন। খবর পেয়ে তারাও বললেন যে, আমরা সেখানে স্টল খুলবো। মস্‌জিদের আঙ্গিনাতে তারা স্টল

খুললেন। বাংলাদেশ দারুস সালাম মার্কাজে ইশা'আতে ইসলামের পক্ষ থেকে কিছু বই ডাকযোগে আমার বাসায় পাঠানো হয়েছিল। সেগুলো সেখানে দিলাম নাম মাত্র মূল্যে এবং কিছু বিনা পয়সায় বিতরণের জন্য।[৪২৭]

জুমাবার সেফ্টন দারুস সালাম মস্‌জিদে
হুযূরের সংক্ষিপ্ত ওয়াজ

শুক্রবার এখনে ছুটির দিন নয়। ফলে জুমার নামাযে যারা আসেন অফিস থেকে আসেন। একারণে শুক্রবারে কেবল নামাযের সময়টুকু মস্‌জিদে মানুষ থাকেন। নামায শেষ হলে তারা আবার কর্মস্থলে ছুটে যান। এমতাবস্থায় জুমার আযানের পর সুন্নত নামাযের সময় শেষে মাত্র কয়েক মিনিট সময় থাকে যখন কোনো অতিথি, ওয়ায়িযীন বা বক্তা কিছু বলতে চাইলে তাকে সময় দেয়া সম্ভব হয়। ফলে এ স্বল্প সময়ের মধ্যে মাত্র কয়েক মিনিটে হুযুরকে সেদিন বক্তব্য রাখতে হলো। যিনি দেশে ঘন্টার পর ঘন্টা মাহফিল করেন, আমি ভাবছিলাম এত সংক্ষেপে কেমন করে তিনি তাঁর মূল কথা বুঝিয়ে বলবেন, মানুষকে কী সংবাদই বা দেবেন। কিন্তু যাই হোক যখন তিনি মাইক্রোফোন হাতে নিলেন মাত্র তিন চারটি বাক্যের মাধ্যমে এমন সুন্দরভাবে একটি ওয়াজ পরিবেশন করলেন উপস্থিতিরা অবাক না হয়ে পারে নি।

প্রথমে বললেন, "আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ্। আপনাদের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বর্ণের মানুষকে দেখে আমার ভালো লাগছে। নানান দেশের নানান পরিবেশ থেকে বিভিন্ন দেশের মুসলমানরা এখানে সমবেত হয়েছেন, অস্ট্রেলিয়াতে আছেন, এ মস্‌জিদেও অনেক দেশের লোক দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং এ থেকে আমার কুর'আনের আয়াত মনে পড়ছে انما المؤمنون اخوة অর্থাৎ "মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই।"[৪২৮] অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে- ادخلوا فى السلم كافة অর্থাৎ "তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ করো।"[৪২৯] সুতরাং আমাদের পরিপূর্ণভাবে মুসলমান হতে হবে। কুর'আনে আল্লাহ্ বলেছেন :

افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض-

"অর্থাৎ তোমরা কুর'আনের কিছু অংশ মানবে, কিছু অংশ মানবে না তা কি হয়?"[৪৩০] সুতরাং আমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে কুর'আনের অনুসরণ করতে হবে। আমরা কিছু মানবো কিছু মানবো না এভাবে পরিপূর্ণ মুসলমান হওয়া যায় না।"

অতঃপর কুর'আনের অপর একটি আয়াত তুলে ধরে বললেন :

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا-

"অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌র রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইওনা।"[৪৩১] সুতরাং আমরা নানা দেশের মুসলিম, আপনারা এখানে আছেন, আমাদেরকে মুসলিম হিসেবে একতাবদ্ধ থাকতে হবে। নিজেদের মধ্যে বিভেদ দলাদলি কখনোই করা যাবে না। এরপর বললেন যে, "মুসাফিরের দু'আ কবুল হয়। আমি একজন মুসাফির। আমি আপনাদের জন্য দু'আ করছি, আল্লাহ্ আপনাদের কবুল করুন। আপনারাও আমার জন্য দু'আ করুন। আমীন।"

জুমার নামায শেষে অগত মুসলিম, বিশেষত বাঙালিদের অনেকেই হুযূরের সাথে পরিচয় হওয়ার জন্য এগিয়ে এলেন। মস্‌জিদের ইমাম বাংলাদেশেরই মানুষ। তার কুর'আন তিলাওয়াত অত্যন্ত সুন্দর। 'আলিম হিসেবে অত্যন্ত ভালো। তিনি হুযূরকে অনেকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। নিজেও হুযূরের সাথে পরিচিত হলেন এবং সিডনিতে প্রথম দাওয়াত তার বাসাতেই হলো। তিনি হুযূরকে তার ঘরে আতিথ্য গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানালেন। দাওয়াত লেগেই থাকলো। মানুষ যখন জানতে শুরু করলো, এরপরেই শুরু হলো আমার বাসায় ফোনের পালা। যে যেখান থেকে খবর পেয়েছেন ছুটে এসেছেন। আজকে আমার বাসায়, কাল ওনার বাসায়।

৪২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০
৪২৮. আল কুর'আন, ৪৯: ১০
৪২৯. আল কুর'আন, ০২: ২০৮
৪৩০. আল কুর'আন, ০২: ৮৫
৪৩১.আল কুর'আন, ০৩: ১০৩

কোনো এক বাসায় গেলে আশপাশের থেকে অনেকেই দেখা করতে আসেন। সেখানে এসে আরেকজন দাওয়াতের সন্ধান দেন। কোনো এক জায়গায় ছোটখাটো মাহফিল বা আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন হলে সেখানে কয়েক বাসা থেকে খাবার চলে আসতো, শেষে আমার ফ্রিজেই জায়গা হয় না। এ অবস্থা দেখে হুযূর বলেই ফেললেন– এযে দারুস সালামের মতো হয়ে গেলো দেখছি। অর্থাৎ বাংলাদেশে যেমন দাওয়াতের পর দাওয়াত লেগে থাকে, এখানে এত অল্প সময়ের মাঝে মানুষের মধ্যে এমন ব্যাপক সাঁড়া জেগে গেল যে, চিন্তাই করা যায় না।

ওয়টসন্‌স বে

ফারুক ভাই, যার কথা একটু আগে উল্লেখ করেছি যে, বাংলাদেশে ফুরফুরার মাহফিলে এবং অনেক কাজে তাঁর অবদান আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি, তাঁর ছোট ভাই ফেরদৌস এখানে আছেন। তিনি বার বার হুযূরের খোঁজ-খবর নিতে লাগলেন এবং কখন তাঁর বাসায় হুযূরকে নিয়ে যাবো সেজন্য অস্থির হয়ে গেলেন। একদিন আমরা তাঁর বাসায় গেলাম। হুযূর যেনো নিজের ঘরে যাওয়ার মতোই খুশি হয়ে গেলেন। কারণ তারা আমাদের নিজেদের লোকই। ফারুক ভাই তথা ফেরদৌস ভাইর অব্বা জনাব আবদুস সাত্তার (র.) ছিলেন ফুরফুরার পীর মুজাদ্দিদে যামান হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (র.)-এর একজন বিশিষ্ট খলীফা। জনাব ফেরদৌসের আতিথেয়তা ও আন্তরিকতা আমাদের মুগ্ধ করলো। নিজের কাজ বাদ দিয়ে তিনি বললেন, হুযূর আপনাকে কোথায় নিয়ে যাবো বলুন। হুযূর বললেন– 'না বাবা, দুনিয়া আল্লাহ্ দেখিয়েছেন। আমরা মানুষের কাজে এসেছি। আল্লাহ্ আল্লাহ্ করতে এসেছি। আমরা আর কী বেড়াবো ?' আমি ফেরদৌস ভাইকে গোপনে ডেকে ইশারা করলাম যে, না, আপনি চলুন। হুযূরকে বললাম, আপনি সিডনিতে এসেছেন, এটা আমাদের দায়িত্ব। এখানে কিছু দেখার জিনিস আছে। আল্লাহ্র সৌন্দর্য। দুনিয়াকে আল্লাহ্ বিছিয়ে রেখেছেন। কুর'আনের হুকুম তো নিশ্চয়ই আছে যে, দুনিয়া দেখে যাও। আমি ফেরদৌস ভাইকে অনুরোধ করলাম– আপনি গাড়ি নিয়ে চলুন, আমি বলছি কোথায় কোথায় যেতে হবে। আপনার কাছেই ওয়াটসন্‌স বে আছে সেখানে চলুন।

আমরা গাড়ি ঘুরিয়ে নিলাম ওয়াটসন্‌স বের দিকে। হুযূর বললেন– কোথায় যাচ্ছেন? বললাম– হুযূর, এখানে একটি জায়গা আছে, একদিকে খাড়া পাহাড়। পাহাড় সাধারণত ঢালু হয়, কিন্তু এ পাহাড়টি খাড়া সমুদ্র থেকে দাড়িয়েছে। দু'পাশেই সমুদ্র। একদিকে সমুদ্র স্থবির নিশ্চল। অন্যদিকে অত্যন্ত দুর্বার, সব সময় ভীষণ গর্জন ও স্রোত। একটি জায়গাতে বড় একটি পাথর খন্ডের উপর যখন এই স্রোত আছড়ে পড়ে তখন দুধের মতো সাদা ফেনা বিস্তির্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে যখন আমরা পৌঁছলাম তিন চারটি সিড়ি বেয়ে উপরে উঠে হুযূর সে দৃশ্য দেখে বললেন– হ্যাঁ, সুন্দর। কিছু দূরে দেখা গেল একটি নোঙ্গর বাঁধা আছে। নোঙ্গরটি বিশাল। অনেকটা লাঙ্গলের আকৃতির। নোঙ্গরের নীচে লেখা আছে– প্রায় দেড়শ' বছর আগে, যখন এখানে নাবিক এসেছিলেন, এ পাহাড়ের সাথে ধাক্কা লেগে জাহাজ এবং তার আরোহী পঞ্চাশ জনই নিহত হয়। জাহাজের কোনো ধংসাবশেষই পাওয়া যায়নি, কেবলমাত্র জাহাজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে এ নোঙ্গরটি পাওয়া গেছে। নোঙ্গর দেখেই বুঝা যায় জাহাজটি কত বিশাল ছিলো।[৪৩২]

আমরাই বড়লোক আমাদের ঈমান আছে

ফেরার পথে আমরা অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত স্থাপত্যকর্ম 'অপেরা হাউজ' দেখলাম। অলিম্পিক গেম্‌স উপলক্ষে সেখানে সমগ্র বিশ্বের সব বিত্তশালী লোকদের সমাগম হয়েছিল। ভিড়ও ছিল প্রচন্ড। ফেরদৌস ভাই আমাদেরকে অপেরা হাউজের কাছে নামিয়ে দিয়ে বললেন, এখানে তো অলিম্পিকের কারণে গাড়ি পার্ক করতে দেবে না। আপনারা দেখে নিন, আমি একটু পরে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে আসছি। একটি দৃশ্য দেখে হুযূর জিজ্ঞেস করলেন, কিসের আনন্দ এতো? বললাম, যারা অলিম্পিকে স্বর্ণ পেয়েছে তাদের মেডেল বিতরণ করা হচ্ছে। হুযূর আমাকে বললেন– 'এখানে হাজার হাজার মানুষ। কিন্তু আমরাই এখানে বড়লোক, কেননা আমাদের ঈমান আছে। আমরা মুসলমান। কিছুক্ষণ পর ফেরদৌস ভাই গাড়ি নিয়ে এসে আমাদের নিয়ে গেলেন। আমরা হারবার ব্রিজের ওপর দিয়ে অপরূপ দৃশ্য দেখতে দেখতে বাড়ির দিকে চললাম।

সেফ্‌টন মস্‌জিদের মাহফিল

---

৪৩২. মহিউদ্দিন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

২৪ শে সেপ্টেম্বর সেফ্টন বাংলাদেশীদের যে মস্জিদ আছে, যার নাম দারুস্ সালাম মস্জিদ, যা দারুস্ সালাম সেফ্টন মস্জিদ নামেই বেশিরভাগ পরিচিত। সেখানে যোহর বাদ মাহফিলের আয়োজন করা হলো। সিডনিতে বাংলাদেশীদের পক্ষ থেকে একটি মাত্র বাংলা পত্রিকা বের হয়। এক শুক্রবার পর পর বের হয়। ঘটনাক্রমে ২২ শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার ঐ পত্রিকা ছাপার কথা থাকায় তাতে আমরা বিজ্ঞাপন দেয়ার ব্যবস্থা করলাম। ফেরদৌস ভাই বললেন– বিজ্ঞাপন আমি দেবো। সুতরাং সেভাবেই আয়োজন করা হলো। বিজ্ঞাপন পড়ে অনেকেই মুগ্ধ হয়েছেন। একজন তো ফোন করে বললেন, 'তারিক ভাই, বিজ্ঞাপন আমার মন কেড়ে নিয়েছে। বিজ্ঞাপনেই আমি খুশি হয়ে গেছি।' কেননা এখানে সুস্পষ্টভাবে এমন কিছু কথা ছিল যে, ওয়ায মাহফিলে যদি কেউ নাও আসেন তবুও ইসলাম সম্পর্কে জানার, বুঝার আগ্রহ তার জন্মাবে এবং ইসলামের একটা পরিপূর্ণরূপ তিনি পেয়ে যাবেন। কেননা সিডনিতে বিচ্ছিন্নভাবে বা বিভিন্ন এলাকায় অনেকেই ইসলামের কাজ করে। তাদের সকলেরই উদ্দেশ্য ভালো। তাদেরকে দাওয়াত দেয়া এবং এক করাও আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। বিজ্ঞাপনে একটি বক্তব্য ছিলো– "ইসলামের আইনে কোনো মানুষ, বাপ-মা, কোনো পীর, আলিম, এমনকি নবী করীম (স.)-এরও কোনো ব্যক্তিগত অধিকার নেই। নবী (স.) যা বলেছেন ওহি থেকে বলেছেন। ইসলামের আইন একমাত্র আল্লাহ্র আইন।" এরপরেই ছিলো– "আমি ফুরফুরার পীর। আমার মত হচ্ছে কুর'আন ও সুন্নাহ্।"[৪৩৩] যিনি এ ওয়াজ করে থাকেন এবং কোনো মানুষের ব্যক্তিগত মতামত অনুসরণ করেন না বা করতে নিষেধ করেন তিনি হচ্ছেন পাক-ভারত উপমহাদেশের প্রায় সাড়ে সাত শ' বছরের ঐতিহ্যবাহী ফুরফুরার বর্তমান পীর। যিনি ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর ৪১ তম বংশধর, মাওলানা আবুল আনসার মুহাম্মদ আবদুল কাহ্হার সিদ্দিকী আল কুরাইশী।

ইসলামের আইন একমাত্র আল্লাহ্র আইন। এ কথাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । কেননা রাসূলে করীম (স.) যা কিছু বলেছেন তাঁর নিজের মনগড়া কোনো কথা বলেন নি। কুর'আনের আয়াতই তার প্রমাণ :

وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى-

"অর্থাৎ এবং সে মনগড়া কথাও বলে না। ইটি[৪৩৪] তো ওহী যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।"[৪৩৫]
সুতরাং সমস্ত সুন্নাহ্, সমস্ত হাদীস ওহী থেকে এসেছে। ইসলামের আইন কুর'আন এবং সুন্নাহ্। কুর'আন-সুন্নাহ্ উভয়ই ওহী ভিত্তিক। কুর'আন আল্লাহ্র কথা, সুন্নাহ্ ওহীর মাধ্যমে প্রদত্ত রাসূলে করীম (স.)-এর কথা এবং তাঁর আচরণ, যা ওহীর ভিত্তিতে পরিচালিত। সেখানে তাঁর ব্যক্তিগত মতামত নেই। সুতরাং কুর'আনের আইন একমাত্র আল্লাহ্র আইন। ইসলামে পরিপূর্ণরূপে কেউ যদি দাখিল হতে চান তাকে কুর'আন-সুন্নাহ্ মানতে হবে। ইসলামের পরিপূর্ণ আইন যদি কেউ মানতে চান তাকে কুর'আন-সুন্নাহ্ মানতে হবে। কুর'আন মানতে হলেও সুন্নাহ্কে মানতে হবে। ঘটনাক্রমে বলতে হয়, বিভিন্ন জায়গায় দাওয়াতের মাঝে হুযূরসহ আমরা একদিন এক জায়গায় গেলাম। সেখানে কুর'আনের আলোচনা হচ্ছিল। আলোচনার এক পর্যায়ে কথা উঠলো, কুর'আনে আছে :

ذالك الكتاب لاريب فيه -

"অর্থাৎ এ সে (মহা) গ্রন্থ আল-কুর'আন যাতে কোনো প্রকার সন্দেহ সংশয়ের বিন্দু মাত্র অবকাশ নেই।"[৪৩৬]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় অনেক রকম কথা আসলো। এরপর যখন হুযূরকে বক্তব্য দেয়ার অনুরোধ করা হলে তিনি বললেন, "আপনাদের বক্তব্য শুনলাম। আপনারা সিডনিতে বসে ধর্মের আলোচনা করছেন, কুর'আনের আলোচনা করছেন খুশির কথা। কুর'আনে আল্লাহ্ বলেছেন :

ذالك الكتاب لاريب فيه -

"অর্থাৎ এই সেই (মহা) গ্রন্থ আল-কুর'আন যাতে কোনো প্রকার সন্দেহ সংশয়ের বিন্দু মাত্র অবকাশ নেই।"[৪৩৭]
এ কথাটা এখানেই শেষ নয়। এ কুর'আনে বেহেশতের আলোচনা আছে, বেহেশতে সন্দেহ নেই, দোযখের

৪৩৩. মাওলানা আতাউর রহমান কালামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১
৪৩৪. ইহা অর্থাৎ কুর'আন; উদ্ধৃত: আল-কুরআনুল করীম, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৬৯
৪৩৫. আল কুর'আন, ৫৩: ৩-৪
৪৩৬. আল কুর'আন, ০২: ০২
৪৩৭. প্রাগুক্ত।

আলোচনা আছে, দোযখে সন্দেহ নেই, নবীদের কথা অছে, সেখানে সন্দেহ নেই। সুতরাং কুর'আনে নবীকে অনুসরণ করার হুকুম আছে, এতে সন্দেহ করলেও চলবে না। কুর'আনে আছে 'নবী ওহী ছাড়া কথা বলেন না', এতে সন্দেহ করলেও চলবে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, 'সন্দেহ নেই' এ কথাটা কেবল কুর'আন নয়, এর সঙ্গে সঙ্গে এসে যাবে সুন্নাহ্‌র ওপরও সন্দেহ নেই। কেননা সুন্নাহ্‌র আইন কুর'আনের আইন দ্বারা পাচািলিত, আল্লাহ্‌র ওহী দ্বারা পরিচালিত, সুতরাং সেখানেও কোনো সন্দেহ নেই।"

আরেকটু ব্যাখ্যা করে হুযূর বুঝিয়ে বলেন– "যেমন কুর'আনে আল্লাহ্ বলেছেন : واركعوا واسجدوا "অর্থাৎ রুকু করো, সিজদাহ্ করো।[৪৩৮] প্রশ্ন হচ্ছে কুর'আনে রুকুর হুকুম আছে, সিজদাহ্‌র হুকুম আছে। কিন্তু রুকুটা কেমন সে বর্ণনা নেই, সিজদাহ্ কীভাবে করতে হবে তার নিয়ম-কানুন লেখা নেই। কুর'আনে আছে : واقيموا الصلوة "অর্থাৎ সালাত কায়েম করো।"[৪৩৯] নামাযের টাইম বলা আছে, রুকু ও সিজদাহ্‌র কথাও বলা আছে, কিন্তু কীভাবে করতে হবে সে নিয়ম-কানুন লেখা নেই। কোন্ নামায কত রাকাত পড়তে হবে তা লেখা নেই। সুতরাং কুর'আনের এ হুকুম মানতে হলেও কুর'আনের অন্য আয়াতে যেতে হবে। সে আয়াতটি কী? তা হচ্ছে : واطيعوا الرسول "অর্থাৎ রাসূলের আনুগত্য করো।"[৪৪০] অর্থাৎ নবী কিভাবে নামায পড়েছেন তা দেখো। সুতরাং কুর'আনকে বুঝতে হলে নবীর কাছে যেতে হবে, সুন্নাহ্‌র কাছে যেতে হবে, হাদীসের কাছে যেতে হবে। নবীর জীবন ছাড়া, সুন্নাহ্ ছাড়া, হাদীস ছাড়া কুর'আনকে বুঝা যাবে না। অতএব সুন্নাহ্ বা হাদীস হচ্ছে কুর'আনেরই তাফসীর। সুতরাং ذالك الكتاب لاريب فيه এ কথাটা কুর'আনের বেলায় অবশ্যই ঠিক, কিন্তু কুর'আনের হুকুমের মধ্য দিয়েই কুর'আনের আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যার মধ্য দিয়েই এ নবীর ওপরেও সন্দেহ নেই, নবীর প্রতি আল্লাহ্ যে ওহী নাযিল করেছেন তাতে সন্দেহ নেই, কুর'আনে আল্লাহ্ বলেছেন, "নবী ওহী ছাড়া কিছু বলেন না" তাতেও সন্দেহ নেই। সুতরাং নবীর মুখ দিয়ে ও আচরণ থেকে যেসব হাদীস বের হয়েছে, সুন্নাহ্ বের হয়েছে সেগুলোতেও সন্দেহ নেই।" এভাবে হুযুর বুঝিয়ে বললেন, "সুন্নাহ্ এর অনুসরণ ছাড়া, সুন্নাহ্‌র তাবেদারী ছাড়া কুর'আনকে অনুধাবন করা, বুঝা ও ও মেনে চলা সম্ভব নয়।"

সেফ্‌টন মাহফিলে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা হয়েছিল। যোহর নামায শেষে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন হতে লাগলো। খাওয়া দাওয়ার শেষে হুযূরের ওয়াজ মাহফিল শুরু হলো। মেয়েদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা হয়েছিল পর্দার ভেতরে। সেখানে মাইকের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। বহু সংখ্যক মেয়েরাও মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন।

সেফ্‌টনের ইমাম সাহেব ফারুক ভাই। তিনি ঘোষণা দিলেন যে, এখন ওয়ায মাহফিল শুরু হচ্ছে। আপনারা ধৈর্য ধরে বসুন। দু'একজন যারা বিদেশী আছেন তাদের জন্য পরে ইংরেজিতে ওয়াযের তরজমা করা হবে। সুতরাং আপনারা প্রথমে ধৈর্য ধরে ওয়াজ শুনুন। হুযূর মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে সবাইকে সালাম দিয়ে ওয়ায শুরু করলেন কুর'আনের একটি আয়াত দিয়ে।

"اعوذ بالله من الشيطان الرجيم-

بسم الله الرحمن الرحيم-

ان الله وملئكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما-

কুর'আনুল কারীমে মহান আল্লাহ্ ইমানদারদেও উদ্দেশ্যে বলেছেন যে, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ নবীর প্রতি রহমত নাযিল করেন এবং ফেরেশতাগণও নবীর জন্য রহমতের দু'আ করে। হে মুমিনগণ! তোমরাও নবীর জন্য রহমতের দু'আ করো এবং তাঁকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।"[৪৪১]

---

৪৩৮. আল কুর'আন, ২২: ৭৭
৪৩৯. আল কুর'আন, ০২: ৪৩
৪৪০. আল কুর'আন, ০৪: ৫৯
৪৪১. আল কুর'আন, ৩৩: ৫৬

নবীর প্রতি মুহাব্বতের নিদর্শন হিসেবে আপনারা দরূদ ও সালাম পেশ করবেন। নবীর প্রতি ভালোবাসা ইমানের নিদর্শন। সাহাবীরা কেমনভাবে নবীকে ভালোবেসেছেন সেটা আমাদের জানতে হবে। কেননা নবীকে তারা কাছ থেকে দেখেছেন। নবীর সঙ্গে কেমন আচরণ করতে হয় তার নিদর্শন সাহাবীরা।" এরপর বললেন–

"আমাদের পরিপূর্ণভাবে ইসলামে দাখিল হতে হবে। অস্ট্রেলিয়ায় এসে আমার মন ভরে গেছে। নানা দেশের নানান বর্ণের মুসলমান এখানে আছেন। কুর'আনের আয়াত হচ্ছে বিশ্বের সকল মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। আমরা যদি পরিপূর্ণভাবে ইসলামে দাখিল হই, আমাদের বিভেদ করা চলবে না। কুর'আনে আছে মুসলমান হচ্ছে হিযবুল্লাহ্। সুতরাং আমরা কোনো গোষ্ঠির নামে, দলের নামে বিভেদ করবো কেনো? কেউ লেবানন থেকে এসেছে, কেউ বাংলাদেশ থেকে এসেছে, কেউ পাকিস্তান থেকে এসেছে, কেউ সিরিয়া থেকে এসেছে, কেউ অস্ট্রেলিয়াতে নতুন মুসলিম হয়েছে, সকল মুসলিম আমরা ভাই ভাই। এখানে বংশের নামে, বর্ণের নামে, পেশার নামে, কোনো গোষ্ঠির নামে বিভেদ করা চলবে না। দুনিয়ার সকল মুসলিম হিযবুল্লাহ্। যখন আমরা হিযবুল্লাহ্ হবো, আমাদের বিজয় সুনিশ্চিত। আল্লাহ্ বলেছেন :

الا ان حزب الله هم المفلحون-

"অর্থাৎ জেনে রেখো, আল্লাহ্‌র দলই সফলকাম হবে।"[৪৪২] আর আমরা জয়লাভ করেই চলেছি। কেননা আজ আমরা যেখানে নামায পড়ছি, শুনলাম এটা একটা চার্চ ছিলো। চার্চটা যখন বিক্রি হয়েছে, বাংলাদেশের মুসলিমগণের নেতৃত্বে এখানে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই চার্চ কেনা হয়েছে। এখন এখানে নামায হচ্ছে। কিছুদিন আগে যেখানে খ্রিষ্টানরা ইবাদাত করতো, আজ আমরা সেখানে 'আল্লাহু আকবার' লিখে রেখেছি। আজ সেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আযান দিয়ে পড়া হচ্ছে। সুতরাং এর চেয়ে বড় বিজয় আর কী হতে পারে? কাফিরের দেশে বসে, খ্রিষ্টানদের সভ্যতার ভেতরে থেকে চার্চ কিনে আমরা সেখানে নামায পড়ছি। এটাইতো ইসলামের বিজয়। "

পাশাপাশি তিনি বললেন– "আপনারা জানেন যে, আল্লাহ্‌র দীন আল্লাহ্ই রক্ষা করবেন। বাবরী মস্‌জিদের ঘটনা আপনারা জানেন। বাবরী মস্‌জিদ যখন ধ্বংস হয়ে গেলো। আমরা সারা দুনিয়ার মুসলিমরা দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু আল্লাহ্‌র হেদায়াত কিভাবে আসে! যে বাবরী মস্‌জিদ ভেঙেছিল সেই মানুষটি পরে মুসলিম হয়ে গেছে, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। বাবরী মস্‌জিদ ভাঙ্গার নেতৃত্ব যে শিব প্রাসাদ দিয়েছিলো সেই শিব প্রাসাদ মুসলিম হয়েছেন। এটাও ইসলামের বিজয় যে আল্লাহ্ পাক ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরার জন্য যিনি মস্‌জিদ ভেঙ্গেছেন তার অন্তরকে এমনভাবে ঘুরিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি এখন অনুশোচনা করছেন, তিনি নিজেই বললেন– আমি চাই আমার পরিবার, গোটা দেশ, সারা পৃথিবীর মানুষ যেনো ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় লাভ করে।"[৪৪৩]

এরপর বললেন– "আমাদের সম্মিলিতভাবে একজোট থাকার জন্য সবাইকে সব সময় সজাগ থাকতে হবে। যেমন ঘরে ডাকাত পড়লে লাইন কেটে দেয়, কখনো টেলিফোনের লাইন কেটে দেয়, পানির লাইন কেটে দেয় যেন মানুষ পুলিশকে বা আশপাশে জানাতে না পারে, এভাবে লাইন কেটে দিয়ে ডাকাতি করে। তো আজ আমাদের ইসলাম ধর্মের ঘরে ডাকাত পড়েছে। আমাদের পিতা, তামাম মুসলিম মিল্লাতের পিতা ইব্রাহীম (আ.)-এর ঘরে আজ ডাকাত পড়েছে। তারা টেলিফোনের লাইন কেটে দিচ্ছে। কী রকম? বলছে ইনি তাবলীগ, ইনি জামাতে ইসলামী, ইনি অমুক, ইনি তমুক ফলে যারা কারো প্রতি আকৃষ্ট থাকে সেখান থেকে লাইনটা কেটে দেয়। যেন ইসলামের আলোচনায় তারা ঢুকতে না পারে। এভাবে আমাদের মাঝে বিভেদ ঘটাচ্ছে। সুতরাং আমাদের সজাগ থাকতে হবে। আজ দেখেন আমাদের নিজেদের জীবনে ইসলাম নেই। ইসলাম যেনো যেতে বসেছে। আমরা একটু নামায পড়ে নিলাম মনে করলাম হয়ে গেলো। মারা যাওয়ার সময় দেখেন সবাই কালিমা পড়ে মুর্দারকে 'আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ্' বলে কবরে শোয়ায়। কেনো, তখন কেনো 'আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ্' বলছেন? জীবিত থাকতে তিনি কোন্ মিল্লাতের ছিলেন তার খবর নেই। মারা যাওয়ার সময় ছেলে নিতে চায় না, মা নিতে চায় না, ভাই নিতে চায় না, বিবিও নিতে চায় না, ঘরে পঁচে যাবে গন্ধ হবে। লাশের দায়িত্ব যখন কেউ নেয় না, আমরা তখন নবীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেই। এটা খুব অন্যায় কথা।

৪৪২. আল কুর'আন, ৫৮: ২২
৪৪৩. এ. কে. এম. আমজাদ আলী এনায়েতপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

আমাদের জীবিত থাকাবস্থায় নবীর ঘাড়ে যাওয়া দরকার। ইসলামের দুর্গে প্রবেশ করা দরকার। সুন্নতের তাবেদারী হওয়া দরকার। তবেই না আমরা মিল্লাতে রাসূল হতে পারবো। আমরা দাবি করতে পারবো আমরা 'আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ্'।"[৪৪৪]

অতঃপর হুযূর মেয়েদের উদ্দেশ্যে বললেন– "মেয়েরা নবী হয় নি কিন্তু নবীদের মা হয়েছে তারা। একটা মেয়ে যখন ঠিক হয়ে যায়, ভালো থাকে, ইসলামের পথে চলার চেষ্টা করে তখন তার পরিবারও তার থেকে ফায়দা পায়। মা যদি ভালো হয় সন্তানও ভালো হয়। হযরত গঞ্জে শক্কর (র.)-এর মা যিনি লোভ দেখিয়ে দেখিয়ে বাচ্চাকে নামায পড়া শিখিয়েছেন। হযরত কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকি (র.)-এর মা কুর'আন পড়তেন যা শুনে শিশু বয়সেই তিনি কুর'আন মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। সুতরাং আমাদের মেয়েদের আর তাদের মায়েদেরও সে চিন্তা করতে হবে। মা যদি ভালো হয় সন্তান ভালো হয়। যার ঘরে আল্লাহ্ ওয়ালা বিবি আছে তার ঘরে ইসলাম আছে। মেয়েদের সম্মান আল্লাহই দিয়েছেন। হযরত জিব্রাইল (আ.) একদিন এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! খাদিজা (রা.) আসছেন, আপনি তাঁকে বলবেন, আমি আসার সময় আল্লাহ্ পাক আমাকে বলেছেন, নবীকে বলো আমার সালাম যেন খাদিজাকে পৌঁছে দেন। নবী করীম (স.) এত সম্মান করেছেন, এমনকি তাঁর দুধ মাকে দেখেও তিনি দাঁড়িয়ে পড়েছেন। নেজের চাদর বিছিয়ে বসতে দিয়েছেন। মেয়েলোক পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে, রমযানে রোযা রেখে পর্দার সাথে থেকে নিজের আব্রুর হেফাজত করে এবং স্বামীর খেদমত করে তার জন্য বেহেশতের আটটি দরজাই খোলা থাকবে, যেটা দিয়ে খুশি তিনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন। পক্ষান্তরে কোনো মেয়েলোক যদি আধন্যাংটা হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে যান, আকৃষ্ট হয়ে ইনি তিনি সে তাকান, ঐ মেয়েটা যেন হাজার হাজার জিনা করতে করতে হাশরের ময়দানে যাচ্ছে। সুতরাং মেয়েরা সাবধান থাকবেন। আপনারা বিদেশ বাড়িতে আছেন। আপনাদের ওপরেই এদেশের পরিবারে ইসলাম কায়েম থাকা অনেক খানি নির্ভর করছে। যতটুকু জায়গা আপনার গায়ের বেগানা পুরুষ দেখবে ততটুকু জায়গা জান্নাতে যাবে না।"

এখানে ঘটনাক্রমে বলতে হয়, ওয়ায মাহফিল শেষে আমাকে কয়েকজন বললেন যে, হুযূরের ওয়ায মেয়েদের ওপরে এমনভাবে তাছির করেছে, মানুষের ওপরে প্রভাব ফেলেছে যে, ওয়াজ মাহফিলেই তাদের কয়েকজন কেঁদেছে, তাওবা করেছে। এরপরে হুযূর নবীর প্রতি মুহাব্বাত ও ভালোবাসার নিদর্শন বিষয়ে কিছু ঘটনা উল্লেখ করে বললেন–
"নবীর ওপরে দরূদ পড়বেন। ইশাবাদ কি শুয়ে পড়বেন, নবীর ওপরে কিছু দরূদ পড়বেন। তবে মনে রাখবেন, নবী হাজির নাজির হয়ে যান এখান থেকে আবার কোনো পয়েন্ট বের করবেন না। আমাদের দেশের লোক কেবল পয়েন্ট বের করে। এখানে মনে রাখবেন নবী হাজির নাজির হয়ে যান না। ফেরেশতারা এ দরূদ ও সালাম নবীর কাছে পৌঁছে দেন। নবী হায়াতুন নবী, কিন্তু তা আলমে বরযখে, তা দুনিয়ার আত্মীয়স্বজন যাদের কাছে তারা ফুরফুরার কথা শুনেছেন তারা খুশি হয়েছেন যে, এমন একজন ওলী আল্লাহ্ এবং পীরকে তারা স্বচখে দেখার সুযোগ লাভ করেছেন।"[৪৪৫]

জনাব তারিক সিদ্দিকী সাহেবের বর্ণনা এখানেই শেষ। আঠারো দিনের এই সফর শেষে হুযূর ফিরে এলেন বাংলাদেশে। এরপর তিনি আরো দু'বার অস্ট্রেলিয়া যান ২০০২ ও ২০০৫ সনে। এ দু'সফরে তিনি ছোট বড় মাহফিলে ওয়াজ-নছীহত করেছেন, মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন।[৪৪৬]

ইন্তিকাল

জনাব আবুল আনসার মুহাম্মদ আবদুল কাহ্হার সিদ্দিকী সহেব (বড় হুযূর) ২০ ডিসেম্বর ২০০৬ সন, বুধবার মহান আল্লাহ্র ডাকে সাঁড়া দিয়ে আমাদের সকলকে কাঁদিয়ে পৃথিবী ত্যাগ করেন। জানাযা হয় ২২ ডিসেম্বর, শুক্রবার। ২০ থেকে ২২ ডিসেম্বর প্রতিদিন বহু মানুষ দারুস্ সালামে, মার্কাজে ইশা'আতে ইসলাম কমপ্লেক্সে এসেছেন। দেশের দূর দূরান্ত এবং বিদেশ থেকেও অনেকে এসে যেন জানাযায় শরীক হতে পারেন সেজন্য শুক্রবার ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিলম্ব করা হয়। কয়েক লক্ষ মানুষ জানাযায় শরীক হয়েছিলেন; কমপ্লেক্সের বিশাল

---

৪৪৪. মহিউদ্দিন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮
৪৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২
৪৪৬. আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৫

চত্বর, পার্শ্বের একটি মাঠ, মিরপুর রোড পর্যন্ত বিশাল খোলা প্রান্তর, পার্শ্ববর্তী এলাকাতেও স্থান সংকুলান না হওয়ায় মানুষ মিরপুর রোডের ওপর দাঁড়িয়ে যায় এবং রাস্তার গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এদেশে এমন ঘটনা বিরল।

৩য় পরিচ্ছেদ

হযরত মাওলানা আবু বকর আবদুল হাই মিশকাত সিদ্দিকী

মুহিউস সুন্নাহ্ শেরে ফুরফুরা আমীরুল ইত্তিহাদ হযরত মাওলানা আবুল আনসার মুহাম্মদ আবদুল কাহ্হার সিদ্দিকী (র.)-এর সুযোগ্য বড় সাহেবজাদা হযরত মাওলানা আবু বকর মুহাম্মদ আবদুল হাই মিশকাত সিদ্দিকী ফুরফুরার বর্তমান গদ্দিনশীন পীর। ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর তিনি ৪২ তম বংশধর। তাঁর (মিশকাত সিদ্দিকীর) দাদা মুজাদ্দিদে যামান আবু বকর সিদ্দিকী (র.)-এর স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি হিসেবে তিনি কাজ করে যাচ্ছেন। মুজাদ্দিদে যামান হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (র.) তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ও প্রতিষ্ঠনের ভবিষ্যৎ মুতাওয়াল্লি নির্বাচন সম্পর্কে লিখিত দলিলে বলে গিয়েছেন যে, আমার পরে আমার বড় ছেলে, তার পরে তার বড় ছেলে এভাবে চলবে। সে হিসেবে মুজাদ্দিদে যামান এর পরে তাঁর বড় ছেলে বর্তমান হুযূরের দাদা হযরত মাওলানা আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.) মুতাওয়াল্লির দায়িত্ব পান। তাঁরপর তাঁর বড় ছেলে বর্তমান পীর সাহেবের আব্বা হযরত মাওলানা আবুল আনসার মুহাম্মদ আবদুল কাহ্হার সিদ্দিকী (র.) মুতাওয়াল্লির দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর ইন্তিকালের পরে একই নিয়মে তাঁর বড় ছেলে বর্তমান পীর সাহেব হুযূরের ওপর এ গুরু দায়িত্ব এসে পরেছে। পিতার ইন্তিকালের পর ঐতিহ্যবাহী দরবারে ফুরফুরার গদ্দিনশীন পীর হিসেবে ২০০৬ সনের ২২ শে ডিসেম্বর জুমাবার তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

ফুরফুরার মরহুম পীর সাহেব বলতেন– "মিশকাত ভালো 'আলিম হয়েছে, আমার পিতা যেমন আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন তেমনি আমি মিশকাতকে দায়িত্ব দিয়ে যাচ্ছি। আমি চলে যাবো, কিন্তু আপনাদেরকে একটি তলোয়ার দিয়ে যাচ্ছি, সে হচ্ছে আমার মিশকাত।"

২২ ডিসেম্বর ২০০৬ মরহুম পীর সাহেব (র.)-এর জানাযা দাফনের পূর্বে দরবারের মুরুব্বি হিসেবে সবার শেষে বক্তব্য রাখেন মেজ হুযূর হযরত মাওলানা আবু ইব্রাহীম মুহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ সিদ্দিকী। তিনি হযরত পীর সাহেব হুযূরের জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। ১৯৭৭ সনে ১৩ই মে মরহুম হুযূর কীভাবে পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন, কীভাবে পিতার মুরীদ -মু'তাকেদিন তাঁর হাতে তাজদীদে বায়াত হলেন ইত্যাদি নানা বিষয় তুলে ধরেন। মেজ হুযূর বলেন যে, "মিশকাতকে আমার জায়গায় দায়িত্ব দিলাম, তাকে সামনে রেখে কাজ করবেন।" সুতরাং মিশকাত বর্তমান ফুরফুরার পীর। এরপর সবাইকে তাঁর হাতে তাজদীদে বয়াত হবার আহবান জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন।

এরপর বর্তমান পীর হযরত মাওলানা আবু বকর আবদুল হাই মিশকাত সিদ্দিকী উপস্থিত লক্ষ লক্ষ ভক্ত-মু'তাকেদীনকে তাজদীদে বায়াত করালেন। বায়াত করানের পূর্বে অল্প সময় তিনি বায়াত সম্পর্কে আলোচনা করলেন। এরপর বায়াত শেষে তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত ও ইবাদাত ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সারগর্ভ ওয়ায করলেন। অতঃপর বললেন, "আমাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তার অর্থ আমি বড় কিছু হয়ে গিয়েছি তা নয়। বরং আমি আপনাদের খাদিম হিসেবে কাজ করবো। আমার মুরুব্বি চাচারা আছেন। আমি দায়িত্ব নিয়েছি তাঁদের পদতলে থেকে কাজ করার জন্য।" বর্তমান পীর হিসেবে হুযূরের বক্তব্য শেষ হলে জুম'আর খুতবা ও নামায অনুষ্ঠিত হলো। তিনিই খুতবা দিলেন ও ইমামতি করলেন।

তারপর পিতার পক্ষ থেকে তিনি সবার কাছে ক্ষমা চাইলেন। পিতার কাছে কারো কোনো দেনা-পাওনা থেকে থাকলে তার জিম্মাদরী গ্রহণ করলেন এবং এ ব্যাপারে তাঁর সাথে যোগাযোগ করার অনুরোধ করলেন। এরপর পিতার জানাযার নামাযের ইমামতি করলেন।

জন্ম

১৯৭৮ সনের ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারী) মাসে পাবনার পাকশীতে বাৎসরিক ওয়ায মাহফিল ও ইসালে সওয়াব চলাকালে বর্তমান পীর সাহেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আম্মা মোসাম্মৎ সাইয়েদা খাতুন ওরফে নাহার বেগম অতিথি সেবা, ধৈর্য, ইবাদত বন্দেগী, তাকওয়া-পরহেজগারী, পর্দা-পুশিদার দিক দিয়ে নারী সমাজের শ্রদ্ধেয় পাত্রী ছিলেন। তিনি ভারতের পশ্চিম বঙ্গের হুগলী জেলার চন্ডিতলা থানার অন্তর্গত বাঁদপুর গ্রামের আলহাজ

খোন্দকার মোহাম্মদ আবদুল কাইউম সাহেব ও মোসাম্মত জীবন্নেসা ওরফে বশিরা খাতুন-এর দ্বিতীয়া কন্যা। মরহুম পীর সাহেব হুযূরের সাথে ১৯৬৫ সনে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয়। তিনি পর পর চারটি কন্যা সন্তানের জননী হন। কিন্তু কোনো পুত্র সন্তান হচ্ছিল না। হযরত আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.) ১৯৭৭ সনে পাকশীতে ওয়াজ মাহফিল ও ইসালে সওয়াবে সমবেত হাজার হাজার মুসল্লিকে নিয়ে দু'আ করতে গিয়ে বলেন– "আপনাদের বড় ভাই সাহেবের কোনো ছেলে সন্তান নাই। তাঁর জন্য দু'আ করেন আল্লাহ্পাক যেন তাঁকে একটি ছেলে সন্তান দান করেন।"[৪৪৭] এর পরের বছরেই ১৯৭৮ সনে মহান রব্বুল 'আলামীন মরহুম পীর সাহেব হুযূর (র.)-কে একটি পুত্র সন্তান দান করলেন। তিনিই হলেন বর্তমান পীর হযরত মাওলানা আবু বকর আবদুল হাই মিশকাত সিদ্দিকী । ১৯৭৮ সনে পাকশী মাহফিল চলাকালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মাহফিলের দ্বিতীয় দিনে তাঁর জন্য বিশেষ দু'আ করা হয়।

মুহিউস সুন্নাহ্ শেরে ফুরফুরা হযরত মাওলানা আবুল আনসার মুহাম্মদ আবদুল কাহ্হার সিদ্দিকী (র.) তাঁর বড় সাহেবজাদাকে ছোট বেলা থেকেই তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। নিজের সরাসরি তত্ত্বাবধানে যোগ্য শিক্ষকমন্ডলী ও ওলামায়ে কিরামের দর্স-তা'লীমের মাধ্যমে তিনি বর্তমান পীর সাহেব হুযূরকে যোগ্য 'আলিম হিসেবে গড়ে তুলেন। সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে আল্লাহ্র ওলীদের সোহবত, তাওয়াজ্জুহ ও দু'আ পেয়ে তিনি 'ইল্মে লাদুনীর ফয়েজ পেয়েছেন। মরহুম পীর সাহেব হুযূর (র.) একদিন একান্তে নিজের কল্বের দিকে ইশারা করে বললেন– "আল্লাহ্পাক আমাকে যা দিয়েছেন তা সব মিশকাতকে দিয়ে যাবো ইনশাআল্লাহ্।

শিক্ষা জীবন

বর্তমান পীর সাহেব হুযূরের শিক্ষাজীবন শুরু হয় প্রথমে ভারতের ফুরফুরায় এবং ঢাকার দারুস্ সালাম মাদ্রাসায়। বেশ কয়েকজন যোগ্য শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে কুর'আন শরীফ নজরানাসহ তৎকালীন সিলেবাস অনুযায়ী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পাদন করেন এরপর উচ্চ শিক্ষার্থে সৌদি আরব গমণ করেন। রিয়াদস্থ ইমাম মুহাম্মদ বিন সউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেন।

ছেলেবেলা থেকেই মরহুম পীর সাহেব (র.) তাঁর বড় সাহেবজাদাকে বিভিন্ন দীনি কর্মকান্ডে শরীক করতেন। ১৯৮১ সনে যখন তাঁর বয়স তিন কি সাড়ে তিন বছর হবে, তখন তাঁকে দিয়েই দারুস্ সালাম মার্কাজে ইশা'আতে ইসলাম কমপ্লেক্সের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। আট বছর বয়সেই দারুস্ সালাম বার্ষিক মাহফিলের সময় তাঁকে দিয়ে জুম'আর নামাজের খুতবা পড়াতেন। ওয়ায মাহফিলে যাওয়ার সময় অনেক সময় ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। সৌদি আরব থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করে দেশে ফেরার পর থেকে বর্তমান পীর সাহেব হুযূর পিতার সাথে বিভিন্ন মাহফিলে যোগদান করে ওয়ায করতেন। বিভিন্নমুখি দাওয়াতী কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতেন। মরহুম পীর সাহেব হুযূর (র.) কোনো মাহফিলে নিজে যেতে না পারলে তাঁকে পাঠাতেন। মরহুম পীর সাহেবের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা, মস্জিদ, খানকাহ্, কুতুবখানা ইত্যাদি পরিচালনা সংক্রান্ত সকল মিটিং-এ অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্তগ্রহণ তাঁকেই করতে হতো। এসব বিষয়ে মরহুম পীর সাহেব (র.)-কে কিছু জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন, "আপনাদের বড় ভাই সাহেবের সাথে আলাপ করে নিন। তিনি যেভাবে বলবেন তাই আমার মত। সংগঠনের কাজগুলো তাঁকে নিয়ে করবেন।"[৪৪৮] এভাবে পিতার প্রতিটি কর্মকান্ডে তাঁর সহযোগী হিসেবে তাঁর পাশে থেকে তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে তিনি গড়ে ওঠেছেন।

পিতার উত্তরসূরী হিসেবে দায়িত্বগ্রহণের পর তিনি পিতার রেখে যাওয়া অসমাপ্ত কাজগুলো আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। তিনি মার্কাজে ইশা'আতে ইসলাম কমিটির এক মিটিং-এ বললেন– "আব্বা হুযূর (র.)-এর যে বিশাল দাওয়াতী পরিকল্পনা ছিলো তা পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করতে আমাদের কয়েক পুরুষ লেগে যেতে পারে। কিন্তু তাই বলে থেমে থাকলে হবে না। প্রাণপনে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।" একথা বলার সময় তাঁর চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছিলো।

সমগ্র বাংলাদেশে ও ভারতে ছড়িয়ে থাকা দরবারে ফুরফুরার প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়নের ব্যাপারে তিনি ব্যাপক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। পাকশী ও দারুস্ সালামে ব্যাপক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। দেশের আনাচে-

৪৪৭. আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৯
৪৪৮. ড. এনামুল হক, প্রগুক্ত, পৃ. ৭৮

কানাচে, শহরে-গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে ঘুরে তিনি ওয়ায মাহফিল করছেন। মানুষকে দীনের দাওয়াত দিচ্ছেন। নিজের আরামকে হারাম করে সারা বছর এভাবে হিদায়েতের কাজে সফর করে বেড়াচ্ছেন। সমাজে প্রচলিত শির্কী বিদ'আতী 'আকীদা বিশ্বাস ও কাজগুলোর অসারতা ও জঘন্যতা প্রমান করে মুসলমানদের এগুলো পরিত্যাগ করার আহবান জানাচ্ছেন।

ইন্টারনেট ও আধুনিক অনলাইন মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াতকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেবার লক্ষ্যে তিনি বিষেশ কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে ওয়েব সাইটের মাধ্যমে দাওয়াতী কার্যক্রম শুরু করেছেন। ওয়েব সাইটের ঠিকানা www.ffurfura.com ওয়েব সাইটটিতে AlQuarn, Al Hadis, Islamic Collection, Islamic Articles, Islamic lectures, Islamic Scholars, Islamic Books, Islamic Miracles, Islamic Songs, Islamic Games, Islamic Caliography, Histry of furfura, Dawah Activities, Our organizations, Print Media, Photo Gallary ইত্যাদি অসংখ্য বিষয়সহ আছে বেশ কিছু মূল্যবান ইসলামিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ। তাছাড়া নিয়মিত মাসিক নিদায়ে ইসলামের অনলাইন সংস্করণও প্রকাশিত হচ্ছে। নিয়মিত এই ওয়েব সাইটকে আপডেট করা হচ্ছে।[৪৪৯]

বর্তমান পীর সাহেব হুযূর তাঁর আব্বা-আম্মার প্রাণ খোলা দু'আ পেয়েছেন। তাঁর আব্বা মরহুম পীর সাহেব হযরত মাওলানা আবুল আনসার মুহাম্মদ আবদুল কাহ্হার সিদ্দিকী(র.) প্রায় মাহফিলেই ছেলের জন্য দু'আ করতেন, মানুষের কাছে দু'আ চাইতেন। তিনি কাঁদতেন আর বলতেন– "আল্লাহ্ তাঁর হায়াত কিসমত বড় করুন। আমি তাঁকে আল্লাহ্র কাছে সোপর্দ করলাম। আমি বাপ হয়েও বলছি, ও এমন একটা ছেলে জীবনে মিথ্যা বলেনি।" ছেলে সৌদি আরবে থাকাকালীন তিনি মাঝে মাঝেই কাঁদতেন আর ছেলের জন্য দু'আ করতেন। তিনি যখন ছেলের ওয়ায শুনতেন তখন আবেগ অতিশয্যে তাঁর চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়তো। হজ্জে গিয়ে তিনি ছেলেকে নিয়ে বায়তুল্লাহ্ শরীফে বিশেষভাবে দু'আ করেছেন।

মরহুম পীর সাহেব হুযূর বলতেন– 'মিশকাত ওর দাদার মতো হয়েছে।' যারা তাঁর দাদা শায়খুল ইসলাম মাওলানা আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.)-কে দেখেছেন তাঁরা সকলেই একথা স্বীকার করবেন যে, দেখতে-শুনতে, চাল-চলনে, কথা-বার্তায়, স্বভাব চরিত্রে সবদিক থেকেই বর্তমান হুযূর তাঁর দাদার মতো। পিতা তাঁর নামও রেখেছেন দাদার নামে 'আবদুল হাই' আর কুনিয়াত রেখেছেন পরদাদার নামে 'আবু বকর'। শুধু নামেই নয় কজেও তিনি দাদা ও পরদাদার মতোই হবেন ইনশাআল্লাহ্।

বর্তমান পীর সাহেবের হুসনে খুলুক বা সুন্দর আচরণ সত্যিই প্রশংসার দাবীদার। সমাজের সকলের সাথে উত্তম ও শোভনীয় আচরণ করা আল্লাহ্পাকের প্রিয়তম ইবাদাতসমূহের অন্যতম। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন– "কিয়ামতের দিন কর্মবিচারের পাল্লায় বান্দার সবচেয়ে ভারী ও মূল্যবান কর্ম হবে সুন্দর অমায়িক আচরণ এবং সুন্দর আচরণের অধিকারী মানুষ শুধু তার সুন্দর ব্যাবহারের বিনিময়েই নফল সালাত ও নফল সিয়াম করার সওয়াব অর্জন করবে।" হাদীসের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, হুসনে খুলুক বা সুন্দর আচরণের তিনটি দিক রয়েছে।

প্রথমত: কথা ও আচরণের ক্ষেত্রে বিনম্রতা, প্রফুল্ল চিত্ত, হাস্যোজ্জ্বল মুখ, সত্য পরায়ণতা, কম কথা বলা ও বেশি শ্রবণ করা।

দ্বিতীয়ত: কোনো কারণে ক্রোধান্বিত হলে গালিগালাজ, অভিশাপ ও সীমা লঙ্ঘন বর্জন করা।

তৃতীয়ত: ক্ষমা করা, বিশেষত প্রতিশোধ নেয়া বা প্রতিউত্তর দেয়ার ক্ষমতা থাকলে ক্ষমা করে দেয়া। এরূপ আচরণের অধিকারী কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সবচেয়ে নৈকট্যের মর্যাদায় সমাসীন হবেন। আর এর বিপরীত আচরণের অধিকারী সবচেয়ে দূরবর্তী অবস্থানে থাকবেন।

---

৪৪৯. আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২১

হুসনে খুলুক বা সুন্দর আচরণের সবগুলো দিক বাস্তবরূপ লাভ করেছে বর্তমান পীর সাহেবের চরিত্রের মধ্যে। বাল্যকাল থেকেই তিনি অত্যন্ত নম্র ও বিনয়ী। যদি একবার কেউ তাঁর সাথে আলাপ করে তবে সে মুগ্ধ না হয়ে পারে না। সমাজের যে কোনো শ্রেণীর মানুষ হোক না কেনো সকলের সাথে তিনি হাসিমুখে কথা বলেন। তাঁর সুন্দর মিষ্টি ব্যবহারে শত্রু-মিত্র সকলেই সন্তুষ্ট হতে বাধ্য হন। তিনি জীবনের সকল ক্ষেত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খানুরূপে সুন্নতে রাসূল (স.)-এর অনুকরণ-অনুসরণ করে চলেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে দীনের অনুশাসন মেনে চলতে চেষ্টা করেন।

তিনি শরীয়তের হুকুম-আহ্কামের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর। কেউ শরীয়েতের খিলাফ কাজকর্ম প্রকাশ্যে করলে তিনি তার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। নিজের নিকটাত্মীয়দের মধ্যেও যদি কাউকে দীনের খিলাফ কাজ করতে দেখেন তাকে বুঝিয়ে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী সকলের হক তিনি যথাযথভাবে আদায় করেছেন এবং এখনও করছেন। সব্র ও শোক্রের যেনো তিনি এক মূর্ত প্রতীক। তাঁর দয়া ও ক্ষমাগুণ অতুলনীয়। কেউ মস্তবড় অপরাধ করেও যদি তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়, তিনি সাথে সাথে তাকে ক্ষমা করে দেন। কেউ তাঁর সাথে শত্রুতা করলেও তিনি তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করেন। কর্মচারী, খাদিম ও বাড়ির লোকদের সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি পুরোপুরি সুন্নতে রাসূল (স.)-এর অনুসরণ করে চলেন। তিনি কখনও তাদেরকে এমন কোনো কাজের নির্দেশ করেন না, যা করা তাদের জন্য কষ্টকর। কখনো নিজেই তাদের কাজে সহযোগিতা করেন। তাদের সুবিধা-অসুবিধার খোঁজ-খবর নেন। তিনি তাঁর ওস্তাদদের প্রতিও যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে চলেন।

মেয়েদের পর্দার ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত কঠোর। ফুরফুরা দরবারে বেপর্দা মেয়েদের আসা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। দারুস্ সালাম ও পাকশী মাহফিলেও মহিলাদের আসতে তিনি নিষেধ করে দিয়েছেন–পর্দার খিলাফ হবার ভয়ে। যেসব মহিলা মুরীদ হতে চান তিনি তাদেরকে স্বামী, ভাই, বাপ, ছেলে বা অন্য কোনো মাহরাম পুরুষের মাধ্যমে মুরীদ হতে উপদেশ দেন।

বর্তমান পীর সাহেব হুযূর শিশুকাল হতে আজ পর্যন্ত দারুস্ সালামে অবস্থান করছেন। তাঁর শৈশব, কৈশর আর যৌবনের সোনালী দিনগুলো এখানেই কেটেছে। এ সুদীর্ঘ সময়ে মাদ্রাসার হাজার হাজার ছাত্র-শিক্ষক, কর্মচারী, দরবারের মুরীদ-মুহিব্বীন, খাদিম, ভাড়াটিয়া, প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন। কিন্তু তিনি এদের কারো সাথে কোনোদিন খারাপ ব্যবহার করেছেন, কটু কথা বলেছেন বা কারো কোনো হক তাঁর দ্বারা নষ্ট হয়েছে বলে জানা যায়নি, শোনাও যায়নি।

বর্তমান পীর সাহেব হুযূর দাম্পত্য জীবন শুরু করেন ২০০১ সনে। সৌদি আরবের রিয়াদ প্রবাসী বিশিষ্ট 'আলিম মরহুম মাওলানা রাকীবুদ্দিন আহমাদ (র.)-এর দ্বিতীয়া কন্যা হাফেজা শাইমা হোসাইনের সাথে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বর্তমানে তিনি দু'কন্যা ও এক পুত্র সন্তানের জনক।[৪৫০]

৪৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৩

ষষ্ঠ অধ্যায়
ফুরফুরার আলিমগণ

ফুরফুরা থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অথবা ফুরফুরা সিলসিলার সাথে সম্পৃক্ত 'উলামায়ে কিরাম যাঁরা দীন-ইসলামের প্রচার ও প্রসারে নিজেদেকে ব্যস্ত রেখেছিলেন–

১. আল্লামা মুফতী আবু জাফর সিদ্দিকী,
২. মাওলানা অবদুল কাদের সিদ্দিকী,
৩. মাওলানা নাজমুস সায়াদাত সিদ্দিকী,
৪. হযরত জুলফিকার আলী সিদ্দিকী,
৫. হযরত সূফী তাজাম্মল হোসেন সিদ্দিকী,
৬. শামসুল ওলামা খোন্দকার আবদুল হাই,
৭. হযরত মাওলানা হাজী ইসহাক সিদ্দিকী,
৮. উস্তাজুল হুফফাজ আবদুল লতিফ সিদ্দিকী,
৯. হযরত সূফী আবদুল জব্বার সিদ্দিকী,
১০.মাওলানা আবু আলী মুহাম্মদ আবদুল আলী,
১১. হযরত মাওলানা আবদুল মাবুদ মেদেনীপুরী,
১২. হযরত মাওলানা আহমদ আলী এনায়েতপুরী,
১৩. হযরত সূফী সফিউদ্দীন,
১৪. হযরত সূফী খলীলুল্লাহ খান,
১৫. হযরত মাওলানা সৈয়দ আহমাদুল্লাহ,
১৬. হযরত আবদুর রহমান গজনভী,
১৭. হযরত মাওলানা ওমর বোখারী,
১৮. আল্লামা কাজী মুহাম্মদ নূর আলী,
১৯. কাজী মুহাম্মদ মোস্তফা,
২০. হযরত মাওলানা আশরাফ উদ্দীন,
২১. হযরত মাওলানা আবদুল গনি,
২২. হযরত আবদুল্লাহ আবদাল,
২৩. হযরত শাহ নূরুদ্দন মুকতাদা,
২৪. হযরত খোন্দকার সাবরুল্লাহ,
২৫. হযরত মাওলানা বদরে ইসহাক,
২৬. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ শু'আইব,
২৭. হযরত খোন্দকার গোলাম মোস্তফা,
২৮. শামসুল ওলামা হযরত গোলাম সালমানী আব্বাসী,
২৯. হযরত সূফী মুফতী আরিফুল হক,
৩০. খোন্দকার জহিরুদ্দীন,
৩১. হযরত মাওলানা আবদুল আলীম,
৩২. হযরত মাওলানা কাজী যুবাইর,
৩৩. হযরত মাওলানা আবদুর রাজ্জাক,
৩৪. আল্লামা রাশেদ সিদ্দিকী,
৩৫. আল্লামা সৈয়দ দেলাওয়ার হোসেন,
৩৬. হযরত মাওলানা হেদায়েত উল্লাহ,
৩৭.হযরত মাওলানা শাহ জহির অলা,
৩৮. হযরত মাওলানা ফজলে হক,
৩৯. হযরত মোল্লা শাহ গোলাম কাদের,

৪০. হযরত জাহাব উদ্দীন মোহাম্মদ,
৪১.হযরত মুন্শী গনিমত উল্লাহ,
৪২. হযরত হাকিম মুন্শী সাদাকাতুল্লাহ,
৪৩. হযরত মাওলানা আবদুল কাদের,
৪৪. হযরত শাহ্ মনির,
৪৫. হযরত আনোয়ার শাহ্ হালব্বী,
৪৬. হযরত শাহ্ পাহলোয়ান,
৪৭. হযরত জাহাবুদ্দীন কলন্দরী,
৪৮. হযরত জেরকামুদ্দীন শাহ্ জালালী,
৪৯. হযরত হাদী ওরফে শাহ্ ভীক,
৫০. হযরত শাহ্ মোল্লাহ মুহাম্মদ সাঈদ,
৫১.হযরত ত্বহা ওরফে মুহাম্মদ তাহের,
৫২. শাহ্ সূফি মোহাম্মদ ইয়াকুব,

‘আল্লামা মুফতী আবু জাফর সিদ্দিকী

হযরত ‘আল্লামা আবু জাফর মুহাম্মদ অজিহদ্দীন সিদ্দিকী (র.) ছিলেন মুজাদ্দিদে জামান (র.)-এর দ্বিতীয় সাহেবজাদা। তিনি ৪ঠা জানুয়ারী’ ১৯০৫ সালে ফুরফুরায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ‘মেজ হুযূর’ নামে সমধিক খ্যাত। তিনি ফুরফুরা ফাতেহিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা থেকে জুনিয়র পাস করে উচ্চ শিক্ষার জন্য কলকাতা মাদ্রাসা আলীয়ায় অধ্যায়ন করেন। মাদ্রাসা আলীয়ায় জামাতে ‘উলা পাঁচ বছর এবং টাইটেল তিন বছরের কোর্স অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সমাপ্ত করে ইংরেজী ১৯২৭ সালে কৃতিত্বের সাথে ফারেগ হন। সে সময়ের বিখ্যাত বুজুর্গ ‘আল্লামা সফিউল্লাহ (র.) মাদ্রাসা আলীয়ার হেড মাওলানা ছিলেন। শামসুল ওলামা ‘আল্লামা গোলাম সালমানী আব্বাসী)র.)-এর পুত্র হযরত মাওলানা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ গোলাম মহিউদ্দীন (র.) ছিলেন তাঁর সহপাঠি।

ছাত্র জীবনে তিনি ফার্সী ও উর্দু ভাষায় ভাল মাদমুন, শে‘র, আশ‘আর ও না‘ত লিখতেন। বাংলা, উর্দু বিভিন্ন পুস্তকে তাঁর শে‘র ও না‘ত দেখতে পাওয়া যেত। আরবী ও ফার্সী ভাষায় তিনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ ছিলেন। মুজাদ্দিদে যামান (র.) তাঁকে বলতেন, “বাবা! কিতাব বিনি (গভীর অধ্যয়ন) করো, ‘ইল্ম আলমারিতে আছে। আমার কাছ থেকে কিতাবের সনদ নাও।” এরপর থেকে তিনি মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর লইব্রেরীতে সংগৃহ কিতাব মুতালা‘আ করতে থাকেন এবং তাঁর কাছ থেকে প্রায় ২০/২১ খানা কিতাবের ‘সনদ’ লাভ করেন। চৌদ্দ বছরে মাদ্রাসার শিক্ষা সমাপ্ত করে দীর্ঘ ৫/৬ বছর বিভিন্ন কিতাব বিনি অর্থাৎ গভীর অধ্যয়ন করতে থাকেন।

মুজাদ্দিদে যামান (র.) মেজ হুযূরকে ‘জমিয়তে ওলামা বাংলা ও আসামের’ মুফতী নিযুক্ত করেন। ৪ঠা জিলকদ’ ১৩৫১ হিজরী বুধবার কলকাতা থেকে জাহাজে হজ্জে রওয়ানা দেয়ার প্রাক্কালে তিনি ঘোষণা করেন, “আমি ইসলামের জাহাজকে (মেজ হুযূরকে) দরিয়ায় ভাসিয়ে দিলাম।

মেজ হুযূর স্বীয় আব্বা, পীর ও মুর্শিদের খিদমতে সুদীর্ঘ ১৪/১৫ বছর তা‘লীম গ্রহণ করে খিলাফতপ্রাপ্ত হন। সকাল-সন্ধ্যা মুরাকাবা-মুশাহাদা করা ও লোকদের করানো তাঁর নিত্য নিয়ম ছিল। তাঁর ওযিফা জীবনে বাদ পড়েছে বলে জানা নেই। তাবাকাতুল ইজাম (উর্দু), মিন্নাতুল মোগিস (উর্দু), আল মৌজুয়াত(উর্দু), নসিহাতুন্নবী, তাহকীকুল মাসায়েল প্রভৃতিসহ অর্ধ শতাধিক বই-পুস্তকের তিনি প্রণেতা এবং উক্ত বইগুলো তাঁরই আদেশ ও তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়।
তিনি ওয়ায-নছীহতে বাংলা-আসামে অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর হাজার হাজার মুরীদদের মধ্যে আলেম-ফাজিলের সংখ্যা অনেক। ইন্তিকালের পর তাঁকে ফুরফুরাতেই দাফন করা হয়।[৪৫১]

মাওলানা অবদুল কাদের সিদ্দিকী

---

৪৫১. মুফতী আবু জাফর সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

মুজাহিদে মিল্লাত, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল কাদের সিদ্দিকী (সেজ হুযূর) মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর তৃতীয় সাহেবজাদা। তিনি বাংলা ১৩১৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকে তীক্ষ্ণ মেধাবী ও তেজস্বীরূপে খ্যাত ছিলেন।

প্রাথমিক শিক্ষা শেষে তিনি কলকাতার তৎকালীন নামকরা দীনি প্রতিষ্ঠান 'মাদ্রাসা রমজানীয়া' থেকে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে ফারেগ হন। অতঃপর তিনি মুজাদ্দিদে জামান (র.)-এর খিদমতে থেকে যথারীতি তা'লীম পেতে থাকেন এবং খিলাফত হাসিল করেন। মুজাদ্দিদে যামানের সাথে সর্বদা ছায়ার মত থাকতেন। তিনি তেজস্বী 'আলিম ও বক্তা ছিলেন।

তিনি 'জমিয়তে ওলামা বাংলা ও আসামের' সেক্রেটারীরূপে কৃতিত্বের ছাপ রেখে গেছেন। পত্র-পত্রিকায় সুন্দর প্রবন্ধ লিখতেন। রাজনৈতিক পটভূমিকায় সমাজে তাঁর মতামতের যথেষ্ঠ গুরুত্ব ছিল। এমনকি জটিল সমস্যা সমাধানে তাঁর মতামতের প্রতি সমাজ তাকিয়ে থাকতো। তৎপ্রণীত কিতাবের মধ্যে ওযিফা ও মুরাকাবা, পাক-নাপাকের মাসআলা, বিবি ও শওহরের নছীহত, মহররাম কাহিনী, শেরখানীর ফতওয়া প্রভৃতি খ্যাতি অর্জন করে। তিনি মুজাদ্দিদে যামানের দ্বিতীয় বাড়ি সীতাপুরে অবস্থান করতেন এবং পিতার খিদমতে সর্বদা নিবেদিত থাকতেন। এমনকি নতুন বিয়ে করে ঘর-সংসারে তাঁর আদৌ আগ্রহ ছিলো না। এক সময় মুজাদ্দিদে যামান সেজ হুযূরকে সফর থেকে ঘরে কয়েকদিন থাকার জন্য পাঠিয়ে দেন; ১/২ দিন যেতে না যেতেই তিনি আবার হুযূরের খিদমতে গিয়ে হাজির হয়ে যান। মুজাদ্দিদে যামান (র.) একটু রাগান্বিত হয়ে বললেন, "তোমাকে না আমি বাড়িতে থাকতে বলেছি, এতো সত্বর এলে কেনো?" অশ্রুসিক্ত অবস্থায় তিনি নিবেদন করে বললেন, "হুযূর! আপনি যে আমার আব্বা ও পীর, আপনাকে না দেখে থাকতে পারি না।" হুযূর সন্তুষ্ট হয়ে আর কিছু বলেননি।

তিনি জবরদস্ত কাশ্‌ফ শক্তিসম্পন্ন ওলী ছিলেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে খুবই খ্যাতি অর্জন করেন। হযরত নবী করীম (স.)-কে তিনি বহুবার স্বপ্নে দেখেছেন। অধিকাংশ সময় ভালো স্বপ্ন দেখতেন। মুজাদ্দিদে যামান (র.) বলতেন, "তাঁর রূ'ইয়ায়ে সাদকার' মাকাম খুলে গেছে।"

ছড়ি হাতে ওয়ায করা তাঁর 'আদাত ছিল। মিল্লাতের খিদমতে জীবন পার করে গেছেন। তিনি দয়ালু ও কোমল হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। লোকজন সবসময় তাঁর সাথে থাকতো, তিনি তাদের সকলের সংসারের অভাব-অভিযোগ দেখতেন। গরীব-দুঃখীদের চেহারা দেখে তিনি তাদের ব্যাথা-বেদনা, অভাব-অভিযোগ বুঝতে পেরে আপ্রাণ সাহায্য ও সহানুভূতি করতেন। অথচ নিজের সংসার সম্বন্ধে তাঁর অনীহা ছিল। মাগুরার বিখ্যাত সূফী হাজি আবদুল হামিদ বলেন, আমি একদিন ফুরফুরায় আমার পীর ও মুর্শিদ হুযূরের দরবারে এসে শুনলাম, তিনি সীতাপুরের বাড়িতে আছেন। আমি সীতাপুর গেলাম, পরদিন সকালে হুযূরের কাছে বসে আছি, সে সময় একজন মিস্ত্রি সেজ ভাই সাহেবের খোঁজ করতে থাকেন। কিন্তু ভাই সাহেব তখন বাড়িতে ছিলেন না। হুযুর জিজ্ঞাসায় জানতে পারলেন, মিস্ত্রি মজুরী পাবে। হুযুর আমাদের লক্ষ্য করে বললেন, "এ এক ছেলে! সংসারের দিকে খেয়াল নেই। মিস্ত্রি টাকা পাবে, কিন্তু ও দেবে কোথা থেকে? আমাকেই দিতে হবে।"[৪৫২]

বাড়ির সামনে বিরাট নবাবী মস্‌জিদ। মস্‌জিদের তুলনায় নামাজী কম, সে চিন্তায় তিনি বিভোর। জামা-কাপড়ের অসুবিধা জানাতে পারলেই তিনি মানুষকে লুঙ্গী, জামা, টুপিসহ সব কিনে দিতেন, নামাজী বাড়ানো চাই। তিনি ঘোষণা করতেন, "কাজের অজুহাতে জুমার নামাজ পড়া যার অসুবিধা, তারা নামাজে আসলেই পুরা রোজের দাম পেয়ে যাবে। তোমরা মস্‌জিদে এসে আমাকে চেহারা দেখিয়ে টাকা নিয়ে যাবে।" তিনি হলেন এমন দয়ালু।

তিনি আবার জালালী মেজাজের ওলী ছিলেন। একদিন সকালে জনাব মকবুল মিয়াকে সীতাপুর বাজারের জনৈক মিষ্টির দোকান থেকে গজা মিঠাই আনতে বলেন। বেচারা মকবুল মিয়া চৌকা গজা না এনে জিবে গজা কিনে আনেন। সেজ হুযূও বলেন, যাও ফেরৎ দিয়ে চৌকা (চারকোনা) গজা নিয়ে এসো। মকবুল মিয়া দোকানদারকে ফেরৎ নিতে বলায় দোকানদার বলেন, 'ওতো ফেরৎ নেবো না, ছুৎ হয়ে গেছে।' তৎশ্রবণে তিনি আক্ষেপ করে

৪৫২. ফজলুর রহমান মুন্সী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

বলতে থাকেন, "হ্যাঁ মানুষ, মানুষকে এতো ঘৃণা করে। সৃষ্টির সেরা মানুষের এ চরম অপমান!" তখন তাঁর মধ্যে জালালিয়াত এসে গেছে। তিনি মিঠাইয়ের দোকানে চলে গেলেন। গজাগুলো মিঠাইয়ের দোকানদারের মুখের ওপর নিক্ষেপ করে বলেন– 'মানুষ আবার ছুৎ, যাও বাড়িতে গিয়ে দেখ, ছুৎ কাকে বলে।' দোকানদার খবর পেলেন যে, ধানের গদায় আগুন লেগেছে এবং একটি ছেলের পেশাব বন্ধ হয়ে গেছে। তখন দোকানদার দৌড়াদৌড়ি করে সেজ হুযূরের খিদমতে এসে কাঁন্নকাটি করে মাফ চাইতে থাকে। তিনি দু'আ করে বললেন, 'ইনশাআল্লাহ সুস্থ হয়ে যাবে। কিন্তু ধানের গাদা শেষ হয়ে যাবে।' সত্যিই আল্লাহর রহমতে দোকানদারের ছেলে সুস্থ হয়ে গেলো, কিন্তু ধানের গাদা আগুনে পুড়ে গেলো।

মুজাহিদে মিল্লাত মাওলানা আবদুল কাদের সিদ্দিকী (র.) তাঁর সীতাপুরের বাড়িতে ২রা অগ্রহায়ণ' ১৩৩৭ বাংলা, শনিবার রাতে এক মুবারক খোয়াব দেখেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমি রাত্রে স্বপ্নে দেখি যে, আমার বাড়িতে এক শানদার জলসা হচ্ছে। যথারীতি বাহিরে ওয়ায চলছে, আমি বাড়ির মধ্যে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে না হতেই একজন এসে খবর দিলো যে, হযরত নবী করীম (স.) তাশরীফ এনেছেন। তৎশ্রবণে আমি অতি তাড়াতাড়ি পাক কাপড় পরিধান করে খুশবু লাগিয়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ করলাম। একটু পরে দেখলাম সুসজ্জিত অত্যুজ্জ্বল চৌদলা (পাল্কীর ন্যায়) বাড়ির উঠানের ঠিক মাঝখানে অবতরণ করে। তার মধ্য হতে একজন স্ত্রীলোক বের হন। অনেকেই বলছেন ইনি নবী করীম (স.)। আমি আরজ করলাম, নবী করীম (স.) তো আওরাত নন। কেউ আমাকে হাদীস শরীফ শুনিয়ে দিলো যে, "মান র'আনী ফাক্বদ হাক্ক।" তৎশ্রবণে আমি বললাম, হাদীস শরীফ সহীহ বা হক, কিন্তু নবী করীম (স.) তো স্ত্রীলোক নন। তখন উক্ত স্ত্রীলোকটি তাড়াতাড়ি বললেন, "আমি নবী করীম (স.)-এর মেয়ে ফাতিমা।"[৪৫৩]

উক্ত চৌদলা একটু সরে গেলো। ফের ওপর দিকে দেখলাম অন্য একটি চৌদলা বহুলোক পরিবেষ্ঠিত। ক্ষণকাল পরেই দ্বিতীয় চৌদলা প্রথম চৌদলার অবতরণ স্থলেই নামলো এবং তার দরওয়াজা খুলে গেলো। আমি প্রত্যক্ষ করলাম তাতে চারদিকে চারজন ও মধ্যখানে একজন মহাত্মন রয়েছেন। এ চারজন থেকে একজন বাহিরে এলেন এবং আমাকে বললেন, 'তুমি নবী করীম (স.) কে ঠিক চিনো?' আমি আরজ করলাম, আমি কখনও দেখি নাই, কিন্তু খোয়াবে তাঁকে দেখেছি। তিনি বললেন, নবী করীম (স.) মধ্যখানে বসে আছেন, উনি কি ঠিক? আমি বললাম, জী হ্যাঁ। আমি আরও জিজ্ঞাসা করলাম, ঐ তিন ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, প্রথম ব্যক্তি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) যাঁর খান্দানে তুমি, দ্বিতীয় ব্যক্তি হযরত ওসমান গণি (রা.) ও তৃতীয় ব্যক্তি হযরত ওমর ফারুক (রা.)। অতঃপর তিনি প্রশ্ন করেন, আমি কে? আমি বললাম, আপনি হযরত আলী (রা.)। তখন তিনি বললেন, প্রথম চৌদলায় যে স্ত্রীলোক এসেছিলেন, তিনি নবী করীম (স.)-এর শাহজাদী, আমি তাঁর স্বামী এবং নবী করীম (স.)-এর জামাতা। তখন হযরত নবী করীম (স.) চৌদলা থেকে বের হয়ে আমার হাত ধরে ইরশাদ করেন, তুমি ঠিক চিনতে পেরেছ নবী করীম (স.) কে। আচ্ছা তোমার ওয়ালেদ সাহেবের নাম কি? আমি বললাম, জনাব হাজি আবু বকর সাহেব। তখন তিনি ইরশাদ করেন, আরও একটি নাম কি? বললাম, হুযূর! আমি একটু পরে বলবো (হুযুরের নামে নামকরণ থাকায় সংকোচ বোধ করছিলাম)। নবী করীম (স.) তিনবার জিজ্ঞাসা করায় তখন আমি বললাম, "আবদুল্লাহ।" তখন নবী করীম (স.) ইরশাদ করেন, তুমি কি চাও? আমি আরয করলাম, হুযুর আমি কি চাইব আপনার কাছে, আপনি যা দেবেন। তৎশ্রবণে নবী করীম (স.) তাঁর হস্ত মুবারক আমার সিনার ওপর রেখে বললেন, যাও। তখন আমি একটু ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু হযরত আলী বললেন, 'ছেলে ভয় করো না, চলে যাও।'

অতঃপর হযরত নবী করীম (স.) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) কে জিজ্ঞেস করলেন, এ ছেলেকে চিনতে পারেন? তিনি বললেন, না। হুযুর বলেন, ঠিক করে দেখুন। তিনি বলেন, না। তখন তৃতীয়বার নবী করীম (স.) বলেন, ওর চেহারা (কপাল) দেখুন। তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন, হ্যাঁ এবার চিনতে পেরেছি। নবী করীম (স.) তাঁকে বলেন, এ আপনার বংশধর। তখন নবী করীম (স.) আমাকে বলেন, তোমার ওয়ালেদ সাহেব পয়গম্বরী দরজা (নায়েবে-নবীর দরজা) প্রাপ্ত হয়েছেন। তোমার ওয়ালেদ সাহেবকে ডাকো। তখন আমি আব্বাজানকে সাথে নিয়ে ঘরের দরওয়াজা পর্যন্ত আসতেই আমার নিদ্রা ভঙ্গ হয়।[৪৫৪]

৪৫৩. মুফতী আবু জাফর সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫
৪৫৪.আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১

মাত্র ৩০/৩১ বছর বয়সে মাওলানা আবদুল কাদের সিদ্দিকী বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়ে সীতাপুরে ২২ ফাল্গুন' ১৩৪৭ সালে বেলা সাড়ে নয়টায় ইসালে সওয়াবের দ্বিতীয় দিনে ইন্তিকাল করেন। ফুরফুরায় জানাযা ও দাফন হয়। তাঁর কবর পিতার কবরের উত্তর দিকে নারিকেল গাছের পাশে বিদ্যমান রয়েছে। তাঁর প্রথমা স্ত্রী মোসাম্মৎ মোফাজ্জল খাতুনের গর্ভে একমাত্র পুত্র পীরজাদা আবুল ফারাহ মুহাম্মাদ আবদুল আহাদ সিদ্দিকী জন্মগ্রহণ করেন। পিতার ইন্তিকালের সময় তার বয়স ছিল মাত্র ছয় বছর।

মাওলানা নাজমুস সায়াদাত সিদ্দিকী

হযরত মাওলানা নাজমুস সায়াদাত সিদ্দিকী (র.) হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (র.)-এর চতুর্থ সাহেবজাদা। তিনি ন'হুযূর নামে প্রসিদ্ধ। ন'হুযূর ১৩৩৩ সনের রবিউল আউয়াল মাসে জন্মগ্রহণ করেন।

পীরজাদা মাওলানা বাকীবিল্লাহ সিদ্দিকী বলেন যে, আমার আব্বা হুযূরের বিলাদাতের সময় দাদীজী তিনবার অত্যধিক প্রসব বেদনায় কাতর হয়ে ফজরের সময় পুত্র সন্তান প্রসব করেন। সন্তান হওয়ার পর স্বাভাবিক নড়াচড়া বা কান্নার শব্দ না পেয়ে সকলের ধারণা হয় মৃত সন্তান হয়েছে। সে ধারণায় শিশু ন'হুযূরকে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। সকলের তুলনায় দাদীজী অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। কিন্তু দাদাজান কিছুমাত্র বিচলিত হননি। বেলা বাড়ার সাথে সাথে সকালে মাইয়েতের দাফন-কাফনের ব্যবস্থার জন্য মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর অনুমতি প্রার্থনা করাতে তিনি বলেন- "আসর বাদ করা যাবে।"

আল্লাহ্জাল্লা শা'নুহুর মহান ইচ্ছা! আসরের সময় হঠাৎ কাপড়ে ঢাকা শিশুর 'তিনবার' অস্পষ্ট শব্দে সবাই চমকে ওঠলেন। অতঃপর কান্নার আওয়াজ শোনা গেলো। লোকেরা ইতস্তত করছেন কি ব্যাপার, বোঝার আগেই ইতিপূর্বে ঘোষিত মৃত শিশু কাপড়ের ভেতর নড়ে ওঠলেন। তখন কাপড় সরিয়ে লোকজন কোলে তুলে নিলো। পরে তাঁর আম্মা তাঁকে কোলে নেন। সকলে বলতে থাকে, 'আল্লাহ্ তোহ্ফা দিয়েছেন।'

ন'হুযূর খানদানী রেওয়াজ মুতাবিক গৃহশিক্ষকের কাছে ইবতেদায়ী তা'লীম হাসিল করেন। অতঃপর তিনি কলকাতা মাদ্রাসা আলীয়ায় অধ্যয়ন করেন। প্রখর মেধা ও স্মৃতিধর ন'হুযূর মাদ্রাসা আলীয়ায় অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে পড়াশুনা সমাপ্ত করেন। ফারিগ হওয়ার পর তিনি মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর আদেশে ৪/৫মাস চাকরি (ম্যারেজ রেজিষ্টার) করেন। চাকরি ত্যাগ করার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলতেন, 'কেবল নবী করীম (স.)-এর সুন্নত আদায় করার উদ্দেশ্যেই চাকরি করা।' নায়েবে নবীর সার্থক উত্তরাধিকারী ন'হুযূর।

যৌবন বয়সে তিনি ঘোড়-সওয়ার, কুস্তি, লাঠিখেলা প্রভৃতি পছন্দ করতেন। এমন কি তিনি চাষের কাজে অংশ নিয়েছেন। সেলাইয়ের মেশিন কিনে সেলাই করেছেন, সুন্নত নিয়তে খেজুরের পাতার চাটাইতে নিদ্রা গিয়েছেন। প্রসঙ্গত তিনি বলতেন, "এ সব করেছি কেবল নবীপাকের সুন্নত নিয়তে, চাটাইতে শুইলেই কি সুন্নত আদায় করা হবে? কখনই না। তাহলে তো সাওতালরাও চাটাইয়ে শুয়ে থাকে। বাবা! 'আমল আর নিয়ত এক হওয়া চাই।"[৪৫৫]

ওয়ায-নছীহতে দাওয়াতের রাস্তা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়া প্রসঙ্গে তিনি একদিন বলেন, এক হাজি সাহেব দাওয়াত করে নিয়ে গিয়েছেন। হাজি সাহেবের বাড়িতে গিয়ে বুঝতে পারলাম, খুবই গড়বড়, খাওয়া যাবে না। জলসার জায়গা দূরে। আমি হিকমত করে বললাম, আমার 'আদাত জলসার জায়গায় থাকবো, সেখানে খাবো। হাজি সাহেব নাস্তা আনলে আমি খেতে অস্বীকার করলাম। হাজি সাহেব পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। হুযূর কেনো খাবেন না?

লোকেরা বুঝতে পেরেছে, হাজি সাহেব পাল্লায় পড়ে গেছেন। আমি এতো লোকের মাঝে না বলে, হাজি সাহেবকে ঘরের মধ্যে ডেকে বললাম: 'কি হাজি সাহেব, এক মণ দিয়ে দেড় মণ নেন কি না?' হাজি সাহেব বললেন, হ্যাঁ হুযূর! আলেমরা তো কিছু বলে না। আমি তাওবা করছি। আমি বললাম- 'তাওবা করুন, কিন্তু খাওয়া যাবে না! এমন খাদ্য খেয়ে আল্লাহ্ পাওয়া যাবে কি?'

---

৪৫৫. সৈয়দ আশরাফ হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

তিনি আরও বলেন: 'আমার আর ভাইয়েরা দাওয়াতে যাচ্ছেন। হিদায়াতের রাস্তায় লোকদের ডাকছেন, আমি যাই না। আমার আম্মা একদিন আব্বা হুযূরকে বলেন: 'আমার কচির (তাঁর ডাক নাম) উপায় কি হবে?' হুযূর বলেন: 'ওকে যেতে বলি, রাযি হয় না।' আম্মা বলেন: 'ওর চলবে কি করে? হুযূর দোয়া করুন।' আব্বাজান (মুজাদ্দিদে যামান) বলেন: "আমি ওকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় হাওলা করে দিয়েছি।" অন্য সময় তিনি বলেন: "এ ছেলে আমার আখিরী জামানার পুঁজি।"

অতঃপর ন'হুযূর বলেন: "আমার পীরের কারামত বাবা! আমি কানে শুনেছি, দিলে বিশ্বাস করেছি, আর চোখে দেখেছি। তিনি অত্যন্ত যোশের সাথে ক্ষেদ করে বলেন: "বান্দা না আমার বাদর? ইসালে সওয়াবে মানুষ দেখতে পাচ্ছি না। হারাম-হালাল চিন্তা আগে। ৬০ বছর মেহনত করে যা পেলে, হারাম খেয়ে নষ্ট করলে? একটি মুসলমানের কত শক্তি জানো? সারা দুনিয়ার মানুষ যদি তাঁর বিরুদ্ধে যায়, তবুও পারবে না। যদি তোমার ইমান থাকে, একটা পশমও কেউ হেলাতে পারবে না।" আখিরী যামানার উম্মতের দরজা কি জানো? নবীপাক (স.) বলে গেছেন– "আমার ও তোমাদের মধ্যে কেবল একটি দরজা তফাত হবে।"

প্রসঙ্গত তিনি আরও বলেন: জুলমতি হাওয়া বেশি, না রহমতি হাওয়া? দুনিয়া দুনিয়া করো, আর বলো নামাজে মন বসে না। বিজ্ঞান সব চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, বিদ্যুৎ বাতির সুইচ টিপলে বাতি জ্বলবে। কিন্তু আপনার জ্বললো না, অন্যের জ্বলছে! মিস্ত্রীকে ডেকে দেখালেন, সব ঠিক আছে, কিন্তু বাল্‌ব ফিউজ। তখন ভালো বাল্‌ব দিলেই জ্বলবে। আল্লাহ্‌পাক সবসময় বান্দার নজদিকে মওজুদ আছেন। তোমার কল্‌ব (বাল্‌ব) খারাপ হয়ে গেছে। নিজের কল্‌ব নিজে ক্ষতি করেছেন। আল্লাহ্‌পাক মেরামত করার ব্যবস্থা দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন: "বান্দা তোমরা নাউমিদ হয়ো না।" কালিমার যিক্‌র করতে করতে দিল সাফ হয়ে যাবে।
এ মহান ব্যক্তিত্ব ৭ জানুয়ারী' ১৯৮২ সাল, বৃহস্পতিবার ২টা ৩০ মিনিটে ইন্তিকাল করেন।[৪৫৬]

হযরত জুলফিকার আলী সিদ্দিকী

হযরত মাওলানা আবুল বাসার মুহাম্মদ জুলফিকার আলী সিদ্দিকী (র.) মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর কনিষ্ঠ সাহেবজাদা। মুজাদ্দিদে যামান যখন ইন্তিকাল করেন, তখন তাঁর বয়স ১৯/২০ বছর। তিনি 'ছোট হুযূর' নামে সমধিক পরিচিত।

ছোট হুযূর বলেন, 'মিয়া সহেব মহল্লার (মাদানী মস্‌জিদ) মস্‌জিদে কাটাতাম, 'ইল্‌ম শিখতাম।' ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পিতা মুজাদ্দিদে যামান (র.) ছোট ছেলের জন্য কলিজা নিংড়ানো দোয়া করতেন। একসময় নিজের জীবনের আগামী দিনের কথা চিন্তা করে মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর কদমে খুব কাঁদতে থাকেন। মুজাদ্দিদে যামান তাঁকে সান্তনা দিয়ে দু'আ করে বলেন: "বাবা তুমি দরবেশীতে মগ্ন থেকো, আল্লাহ্ তোমার দরজার পাল্কী বাঁধা রাখবে।"

১৯২০ সালে তিনি ফুরফুরায় জন্মগ্রহণ করেন। খারেজীভাবে তিনি দীনি তা'লীম হাসিল করেন এবং স্বীয় ওয়ালেদ সাহেবের কাছে বাতেনি তা'লীম পান। ছোট হুযূরের জিন্দিগী বস্তুত মুজাদ্দিদে যামানের দোয়ার বাস্তব ফলস্বরূপ। দাওয়াতে এত ব্যস্ত মানুষ খুব কম দেখা যেত। সারা বছর তিনি দাওয়াতে ওয়ায মাহফিল করে চলেছেন। এমনকি মুহিব্বীনদের অনুরোধে অধিকাংশ দিন একই দিনে ২/৩ টি স্থানে জলসায় তাকে যোগদান করতে হত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই দিনে ৩/৫ স্থানেও তাঁকে উপস্থিত হতে হত। তাঁর জবানের ওয়ায-নছীহত শোনা ও দোয়া পাওয়ার আশায় মানুষ চাতকের মত চেয়ে থাকতো।

আশেকে রাসূল ছোট হুযূর (র.)-এর ওয়াযে পাষাণ হৃদয়ও উদ্বেলিত হয়ে উঠতো। মস্‌জিদ বানানো, কাঁচা মস্‌জিদ পাকা করা, কবরস্থান প্রাচীর দিয়ে ঘিরে হিফাযত করা, মাদ্রাসা ও কুরআনীয়া মক্তব প্রতিষ্ঠা করা তাঁর কর্মময় জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মাদ্রাসা মক্তবের জন্য ইসালে সওয়াবে চাঁদা তোলায় তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন।

তাকওয়া-পরহেজগারীতে তিনি অনন্য ছিলেন। একটি ঘটনা তাঁর অনুপম দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশ থেকে কত শত লোকের আকুল আবেদন, হাজার হাজার বাংলাদেশী ভক্ত মুরীদান এক নযর তাঁকে পেতে চান। কিন্তু ছোট হুযূর

---

৪৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

মুস্তাহাব সফরের জন্য ফটো তুলে পাসপোর্ট করে বাংলাদেশে যেতে নারায। সুন্নতে নববীর তিনি পূর্ণ পাবন্দ ছিলেন।

হযরত সূফী তাজাম্মল হোসেন সিদ্দিকী

হযরত মৌলভী তাজাম্মল হোসেন সিদ্দিকী (র.) নদীয়া জেলার শান্তিপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুজাদ্দিদে যামান হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (র.)-এর অন্যতম প্রধান খলীফা এবং একই বংশের ছিলেন। তিনি কলকাতা হাইকোর্টের কর্মচারী ছিলেন। খুব উচ্চ দরজার বুজুর্গ ও কাশ্‌ফ শক্তিসম্পন্ন ওলি ছিলেন। মৌলভী আবদুস সাত্তার সাহেব তাঁর জীবন চরিত পুস্তকে লিখেছেন– 'পীর সাহেব দূর দেশের সফরে গেলে হযরত সূফী তাজাম্মল হোসেন সিদ্দিকী সাহেবকে কায়িম মাকাম করে যেতেন প্রাণপ্রিয় মুরীদদের তা'লীম দেয়ার জন্য। বস্তুত পীর সাহেবের এমন মুরীদ খুব কমই আছেন যে, সূফী সাহেব থেকে তা'লীম গ্রহণ না করেছেন।' এ থেকে তাঁর কামালিয়াত ও বুজুর্গীর সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর সাথে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক ছিল।[৪৫৭]

শামসুল ওলামা খোন্দকার আবদুল হাই

তিনি হযরত মাওলানা আবদুল হাই লাখনুবী (র.)-এর সমসাময়িক ছিলেন। জবরদস্ত 'আলিম, আবিদ ও জাহিদ ছিলেন। তিনি বাঁদপুর গ্রামে জন্মগহণ করেন এবং কলকাতায় বসবাস এখতিয়ার করেন। যোগ্যতার সাথে কলকাতা মাদ্রাসা আলীয়া থেকে সনদ লাভ করেন। কলকাতায় তাঁর কয়েকটি বাড়ি ছিল। তিনি ৭ নং আগা মেহেদী স্ট্রিটের নিজস্ব বাড়িতে থাকতেন। জীবনে কয়েকবার হজ্জ আদায় করেন। হযরত মাওলানা ইবনে হাজার আসকালানী (র.)-এর 'আল-ইসাবা' নামক গুরুত্বপূর্ণ কিতাবটি তিনি সম্পাদনা করেন। তিনি ১৮৭৫ থেকে ১৮৯১ সাল পর্যন্ত কলকাতা মাদ্রাসা আলীয়ার হেড মাওলানার দায়িত্ব যোগ্যতার সাথে সম্পাদন করেন।

১৮৭০ সালে 'কিতাবুল ইসাবা ফি তামিজিস সাহাবাহ' পুস্তকটি সম্পাদনা করেন। উক্ত পুস্তকটি 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' ১৮৭০ থেকে ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত মোট সতের খন্ডে প্রকাশ করে। তাঁর পূর্বপুরুষ হযরত শাহ্ গিয়াস উদ্দীন সোহরাওয়ার্দী ইরাকের বসরা শহর থেকে ১৪৯৪ সালে এদেশে আসেন। তখন আলাউদ্দীন হোসেন শাহ গৌড়ের শাসনকর্তা। তাঁর ইসলামী খিদমতে খুশি হয়ে ভরসুট পরগণা জায়গীর প্রদান করেন। তিনি ১৯০১ সালে বাঁদপুর গ্রামে ইন্তিকাল করেন, তথায় পারিবারিক গোরস্থানে তাঁকে কবরস্থ করা হয়।

হযরত মাওলানা হাজি ইসহাক সিদ্দিকী

হযরত মাওলানা পীর ইসা ওরফে ইসহাক সিদ্দিকী ফুরফুরায় জন্মগ্রহণ করেন। ফুরফুরার অনতিদূরে 'ধসা' গ্রামের বিখ্যাত পীর হযরত মাওলানা গোলাম কাদের (র.)-এর অন্যতম মুরীদ ছিলেন। তিনি মুজাদ্দিদে যামান হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (র.)-এর চাচাতো ভাই।

তাঁর পিতার নাম আবদুল মুয়ীদ। ছাত্র জীবনেই তিনি পিতাকে হারান। তিনি মাত্র সাত/আট বছর বয়সে ধসা গ্রামের বিখ্যাত পীর সূফী গোলাম (র.)-এর সুযোগ্য জামাতা উদং নিবাসী জনাব সূফী আবদুল করীম (র.)-এর কাছে দীনি তা'লীম পেতে থাকেন। তারপর তিসি সূফী গোলাম কাদের (র.)-এর খিদমতে অবস্থান করে রূহানী তা'লীম লাভ করে খলীফাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান স্থান প্রাপ্ত হন।[৪৫৮]

তাঁর হিদায়েতের ধরন ছিলো স্বতন্ত্র। তাড়ীখোর, মদখোর, জুয়াড়ীদের বাড়িতে স্বশরীরে হাযির হয়ে ডাকতেন, বসিয়ে বুঝাতেন, নছীহত করতেন, প্রয়োজনে ২/১ দিন তথায় নিজ দায়িত্বে থেকে যেতেন। এমনিভাবে কোনো কোনো গ্রামে তিনি ২/১ সপ্তাহব্যাপী অবস্থান করে ইশা'আতে ইসলামে আত্মনিয়োগ করেন। কু-পথগামী হাজার হাজার মানুষ তাঁর মহৎ প্রচেষ্টায় দীনের পথের পথিক হয়েছেন। হাওড়া জেলার কল্যাণপুর, খাজুট্টি প্রভৃতি গ্রামের পর গ্রাম তিনি এমনিভাবে দীন প্রচার করেন।

---

৪৫৭. রশিদুল ইসলাম, প্রগুক্ত, পৃ. ৬০
৪৫৮. মাওলানা আবুল বাশার জিহাদী, প্রাগুক্ত, প. ৫৪

তাঁর লেবাস-পোষাক ছিলো মামুলী এবং চাল-চলন সাদাসিধে ধরনের। গরীব-অনাথ, মিসকিনেরা ছিলো তাঁর আপনজন। তিনি সারাজীবন অকৃতদার থেকেছেন, সংসারে তাঁর নিজের বলতে কিছুই ছিলো না। তিনি জীবনের সমস্ত সঞ্চয় অকাতরে নিঃস্বার্থভাবে পরহিতার্থে ব্যয় করে গেছেন। তিনি ছিলেন পরোপকারির অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টন্ত। তিনি ছিলেন প্রচার বিমুখ, আত্মপ্রচার তাঁর স্বভাব বিরোধী। ফলে তাঁর জীবনের বহু ঘটনা অজানা রয়ে গেছে, অনেক ঘটনা কিংবদন্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

শ্রীরামপুরের জনাব আজিমুদ্দীন সাহেবের ইন্তিকালে তাঁর স্ত্রী ও কয়েকটি বাচ্চা অসহায় অবস্থায় পড়েন। তিনি তাদের উপকারার্থে নিজ ব্যয়ে একটি 'পান বরজ' তৈরি করে দেন। বরজের আয়ে ঐ সহায়-সম্বলহীন পরিবার চলতে থাকে। এমতাবস্থায় জনাব আজিমুদ্দীনের সহোদর সফিউদ্দীন ঈর্ষান্বিত হয়ে বরজের পান গাছের গোড়া কেটে ক্ষতি সাধন করতে থাকে। এ ঘটনা বেশ কিছুদিন পর হাজি সাহেবকে জ্ঞাত করান হয়। তিনি সফিউদ্দীনকে উক্ত ঘটনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। সফিউদ্দীন ও তার দলের লোকেরা সকলে বিষয়টি অস্বীকার করে। জনাব হাজি সাহেব তখন বলেন– "যে বরজের পান গাছ কেটেছে, আল্লাহ্ যেনো তার হাত কেটে দেন।" এ ঘটনার পর আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছায় সফিউদ্দীনের হাতে কুষ্ঠ ব্যাধি আক্রমণ করে এবং ধীরে ধীরে পা পর্যন্ত সংক্রমিত হয়ে পড়ে। তখন সফিউদ্দীন নিরুপায় হয়ে হুযূরের খিদমতে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে আরোগ্যলাভের জন্য দু'আ প্রার্থী হন। জনাব হাজি সাহেব স্পষ্ট জবাব দেন– "আমার আর কিছুই করার নেই, মহান আল্লাহ্‌র কাছে এটি কবূল হয়ে গিয়েছে।" অনেক কাকুতি-মিনতি করার পর হুযূর রোগবৃদ্ধি না হওয়ার জন্য দু'আ করেন। সফিউদ্দীন অবশ্য খোঁড়া অবস্থাতেই ইন্তিকাল করেন।

হাজি সাহেব হাওড়া জেলার চালতেবেড়িয়া গ্রামে ১৫ই জ্যৈষ্ঠ অবস্থান করছিলেন। সে সময় দেশে প্রচন্ড খরা চলছে। বৃষ্টির অভাবে ফসল-পাতি নষ্ট, পুকুর-পুষ্করিণী শুষ্ক-ফাঁটা সর্বত্র পানির হাহাকার। মানুষেরা তাঁর খিদমতে হাজির হয়ে পানির জন্য দু'আ করতে আরয জানাতে থাকে। হাজি সাহেব কিছু সময় নীরব থেকে নিজের চাদরটি ধোয়ার জন্য দেন। চাদর ধুয়ে যথারীতি শুকাতে দেয়া হলো। কাঠ-ফাটা রৌদ্র, আকাশে মেঘের ছিটোফোটা ছিলো না, হঠাৎ আকাশে মেঘ দেখা দিলো, চাদর আধা শুকনো হতে না হতেই মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে যায়। হাজি সাহেবের চাদর ভিজে গেলো। তিনি বলতে থাকেন– 'দেখো না, আল্লাহ্ আমার চাদরটা শুকাতে দিলো না।'

হাজি সাহেবের আগমন বার্তায় প্রচুর লোকের সমাগম। কিন্তু বাড়িওয়ালার আয়োজন সামান্য। ১০ সের চাল ও ১৫ সের গোস্ত মাত্র। এখন যোগাড় করার কোনো উপায়ও নেই, মেজবান খুবই চিন্তিত। হাজি সাহেব উপস্থিত সকলকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে বলেন, "চিন্তার কি আছে, আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করে দিতে থাকো, ইনশাআল্লাহ্ হয়ে যাবে।" খাওয়ানো শুরু হলো, শেষে দেখা গেলো উক্ত সামান্য আয়োজনে প্রায় তিন হাজার লোকের ভালোভাবে খাওয়া হয়ে গেছে।

তিনি নবী করীম (স.)-এর রওযা মুবারকে যিয়ারতে গেলে নবী করীম (স.) বলেন– "ফুরফুরার পীর সাহেবকে বলবেন, তিনি যে হিদায়েতী কাজে লিপ্ত আছেন, সে কাজে যেন লিপ্ত থাকেন।"[৪৫৯]

প্রায় শত বছর বয়সে ১১ আগষ্ট' ১৯৩৬ সালে রাত ১ টা ১৫মিনিটে তিনি ইন্তিকাল করেন। উলুবেড়িয়ার সিজবেড়িয়া মস্‌জিদের কাছে তাঁকে দাফন করা হয়।

উস্তাজুল হুফ্‌ফাজ আবদুল লতিফ সিদ্দিকী

পশ্চিমবঙ্গে কুরআনী খিদমতের অগ্রদূত উস্তাজুল হুফ্‌ফাজ হযরত আবদুল লতিফ (র.) হুগলী জেলার অন্তর্গত ফুরফুরার পরমানন্দপুর মহল্লায় বাংলা ১২৮৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'বড় হাফিয সাহেব' নামে সুপরিচিত। খাতুন বা পরমানন্দপুরের মল্লিক পরিবার এবং মল্লিক উল হাউস বর্তমানে খুবই পরিচিত, কিন্তু শত বছর পূর্বে ততখানি বিত্তশালী না হলেও ব্যবসায়ী ও খান্দানী রীতিনীতি ও দীনদারীতে মল্লিক বংশের যথেষ্ঠ খ্যাতি ছিলো। তাঁর পিতার নাম মুহাম্মদ মহরুদ্দীন। তিনি অত্যন্ত নেককার 'আবিদ ও 'সওমুদ্দাহ্‌র' ছিলেন। তাঁর ওয়ালেদা মেহেরজান বিবি সুশিক্ষিতা, গুণবতী, স্নেহময়ী, বিদূষী, সাধ্বী রমনী ছিলেন।

৪৫৯. আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ.২২৪

বাল্যকালে দারিদ্রের মধ্যে কালাতিপাত করলেও সরল, সৎ, উদ্যোগী কর্মীরূপে তাঁর খ্যাতি ছিলো। তীক্ষ্ণ মেধা ও প্রখর ধীশক্তির অধিকারী বড় হাফিজ সাহেব অতি অল্প সময়ে পড়াশুনায় যথেষ্ঠ উন্নতি লাভ করেন। উর্দু, ফার্সী ভাষায় যথেষ্ঠ বুৎপত্তি লাভ করার পর তিনি বিহার প্রদেশের মতিহার জেলার 'সিমরা' নামক মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করেন। তিনি 'সিমরা' মাদ্রাসায় কুর'আন শরীফ হিফ্জ করা শুরু করেন। তাঁর ওস্তাদ হাফিয ক্বারী বাদশাহ (র.) বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর কাছে বাগদাদ, মিসর ও সৌদি আরব থেকে ছাত্ররা হিফ্জ শুনাবার জন্য আসতেন। আবদুল লতিফ সাহেব মাত্র দু'বছরে সম্পূর্ণ কুর'আন শরীফ হিফ্জ শেষ করেন এবং একবার শুনিয়ে দেন। অতঃপর তিনি জৈনপুর মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করেন। ছাত্র জীবন থেকেই তিনি তাকওয়া পরহিজগারী ও সাধাসিধে জীবন যাপন করতেন। একজন পেশওয়ারী 'আলিমের কাছে তিনি হাদীস ও তাফসীর অধ্যয়ন করেন।

বড় হাফিয সাহেব কর্মময় জীবনে প্রথম হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া থানার 'খন্নান' গ্রামের মস্জিদে ইমামতির দায়িত্ব পালন করতেন এবং তথায় একটি পাঠশালা কায়েম করেন। তিনি অত্যধিক পরিশ্রমী ছিলেন, ফলে ঐ সময় তিনি পাণ্ডুয়ায় ট্রেনিং গ্রহণ করেন। গণ্ডগ্রাম খন্নান তাঁর আদর্শ শিক্ষায় বর্তমানে সুশিক্ষিত ও আদর্শ গ্রামরূপে প্রতিষ্ঠিত। তিনি বেতনভুক্ত চাকরি ত্যাগ করে আল্লাহ্পাকের প্রতি ভরসা করে নিজ বাড়িতে পীরের নামে "দারুল কুরআন মাদ্রাসায়ে সিদ্দিকীয়া" কয়েম করেন। ১৩২১ সালে তাঁর প্রতিষ্ঠিত হফিজী মাদ্রাসায় মুজাদ্দিদে যামান (র.) তাশরীফ রাখেন এবং এরশাদ করেন–"বাবা হাফিজ সাহেব, ফুরফুরায় হাফিজী মাদ্রাসা নেই, আপনি এখানে হাফিযী মাদ্রাসা কায়েম করুন।" বড় হাফিজ সাহেব আদেশ মুতাবিক নিজ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত মাদ্রাসায় আজীবন কুরআনের খিদমত করে গিয়েছেন। অদ্যাবধি পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িশ্যা, উত্তর প্রদেশ, বাংলাদেশ, নেপাল প্রভৃতি প্রদেশের প্রায় দ্বিসহস্রাধিক ছাত্র তাঁর মাদ্রাসা থেকে হাফিজ হয়ে গেছেন।

মুজাদ্দিদে যামান হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (র.)-এর স্নেহধন্য বড় হাফিজ সাহেব কঠিন মেহনত ও রিয়াজতে কামালিয়াত হাসিল করেন এবং খিলাফতপ্রাপ্ত হন। হাজার প্রলোভনে পীরের মত ও পথ থেকে এক চুলও কেউ তাঁকে নাড়াতে পারেনি। পীরের সন্তান-সন্ততিদের অত্যধিক সম্মান করতেন। তিনি বিশিষ্ট কারামত সম্পন্ন ওলী ছিলেন। এ যুগে তাঁর মত পরহিজগার নির্লোভ মানুষ বিরল। নিজ মাদ্রাসা ব্যতিত পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে হাফিজী মাদ্রাসা কায়েম করে তিনি কুরআনের অপূর্ব খেদমত করে গিয়েছেন। তাঁর আচার-ব্যবহার ছিলো অত্যন্ত অমায়িক। তাঁর সংস্পর্শে যিনি একবার এসেছেন, তার জীবনের পট পরিবর্তন হয়ে গেছে।

বাংলা ১৩৮৩ সনের ৮ শ্রাবণ শনিবার বেলা ৩ টা ১০ মিনিটে তিনি ইন্তিকাল করেন। খাতোন-ফুরফুরা পাকা সড়কের কাছে তাঁর কবর আস্থিত।

হযরত সূফী আবদুল জব্বার সিদ্দিকী

হযরত সূফী আবদুল জব্বার সিদ্দিকী ফুরফুরার সিদ্দিকী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জনাব মাওলানা আবদুস সাত্তার সিদ্দিকী। তাঁর একমাত্র বোন হযরত নেজিরা সিদ্দিকা খাতুন, মুজাদ্দিদে জামান আবু বকর সিদ্দিকী (র.)-এর সহধর্মিণী এবং বড় হুযূর ও ন'হুযূর (র.)-এর পূণ্যময়ী জননী।

তিনি বাংলা ও আসামে 'মামুজী হুযূর' নামে খ্যাত। মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর সাথে ছায়ার ন্যায় ওয়ায মাহফিলে থাকতেন। তিনি হকপন্থী ও মুত্তাকী ছিলেন। তাঁর ভিতর-বাহির এক ছিলো। তিনি মুজাদ্দিদে জামান (র.)-এর খুবই খিদমত করতেন। এমনকি তাঁর ইন্তিকালের চরম মুহূর্তে শয্যাপাশে উপস্থিত ছিলেন। বড় হুযূরের সাথে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাটিয়ে গেছেন। ফুরফুরার পীর সাহেব হুযূর কেবলাগণ তাঁকে মুরুব্বীর ন্যায় সম্মান দিতেন। দয়ালু দাতা ও গরীবদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর খলীফা ছিলেন। সূফী সাহেব বৃদ্ধ বয়সেও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে গেছেন।[৪৬০]

৪৬০. আল্লামা ইব্রাহীম হোসেন তর্কবাগীশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

মাওলানা আবু আলী মুহাম্মদ আবদুল আলী

হযরত মাওলানা সূফী আবু আলী মুহাম্মদ আবদুল আলী সাহেব বাংলা ১২৯৪ সালেন অগ্রহায়ণ মাসে হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া থানার চাঁদপোতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আব্বা মৌলভী সিতাব উদ্দীন আহমদ ধর্মভীরু ব্যক্তি ছিলেন এবং আম্মা মোসাম্মত কুলসুম খাতুন 'আবিদা ছিলেন।

তিনি আকড়া সিনিয়র মাদ্রাসা হতে ফাজিল পাস করেন এবং কলকাতা মাদ্রাসা আলীয়া থেকে ১৩২৬ সালে কৃতিত্বের সাথে টাইটেল (এম.এ) পাস করে ইশা'আতে ইসলামে আত্মনিয়োগ করেন। উলুবেড়িয়া-সিজবেড়িয়া জামে মস্‌জিদের ইমাম এবং মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ছিলেন।

তিনি মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর কাছে বায়াত গ্রহণ করে তা'লীম পেতে থাকেন এবং যথাসময়ে খিলাফতপ্রাপ্ত হন। মুজাদ্দিদে যামান (র.) উলুবেড়িয়া এলাকার লোকদের ফাতওয়া-ফারায়েয মাওলানা আবদুল আলী সাহেবের কাছ থেকে গ্রহণ করতে বলতেন। বাংলা ১৩৫৭ সালের ৫ অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার দিবাগত রাত পৌনে আট ঘটিকায় চাঁদপোতা গ্রামে ইন্তিকাল করেন। তাঁকে সিজবেড়িয়া মস্‌জিদের প্রবেশ পথের উত্তরধারে সমাহিত করা হয়।

হযরত মাওলানা হাজি ইসহাক (র.)-এর সাথে তাঁর খুবই হৃদ্যতা ছিলো। হাজি সাহেবের শেষ জীবন অবধি সাহচর্য হাসিল করেন। বহু দরগা তিনি ভেঙ্গেছেন, ফিতনাবাজ আলিমদের তিনি বজ্রসংহারক ছিলেন। তাঁর ওয়ায-নসীহত মুদাল্লাল ও যুক্তিপূর্ণ ছিলো।

হযরত মাওলানা আবদুল মাবুদ মেদেনীপুরী

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর নিবাসী হযরত মাওলানা আবদুল মা'বুদ (র.) মুজাদ্দিদে যামান আবু বকর সিদ্দিকী (র.)-এর প্রধান খলীফা ছিলেন। তিনি জবরদস্ত কাশ্‌ফ শক্তিসম্পন্ন ওলী এবং উচ্চাঙ্গের লিখক ছিলেন। 'সওয়ানেহে উমরী গওসে সামদানী পীরে ফুরফুরা' নামে তাঁর পীর মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর জীবদ্দশাতেই তাঁর জীবনী রচনা করেন। তিনি বলতেন, 'আমি দেখি, অল্লাহ্‌পাক ফেরেশতাদের সাথে ফুরফুরা সম্পর্কে কথাবার্তা বলছেন।' তিনি আরও বলতেন, 'আমি দেখি, যারা ফুরফুরায় আসে তাদের গুনাহকে আল্লাহ্‌পাক মাফ করে দেন।' হযরত মাওলানা আবদুল মা'বুদ মেদিনীপুরী বলেন, এক সময় আমি স্বপ্নে দেখি যে, লোকেরা দলে দলে চলছে। তাদের মধ্যে একজন শুভ্রবস্ত্র পরিহিত জ্যোতির্ময় চেহারাধারী দীর্ঘাকৃতি ক্ষীণকায় দুর্বল মানুষ বলছেন, 'তোমরা কি বড় জামায়াতের মজলিশে গমন করবে না?' আমি আরজ করলাম, আপনি কোন মহাত্মন? এমতাস্থায় দেখতে পেলাম, আমার মখদুমজাদা হযরত মাওলানা পীর আবু বকর আবদুল হাই সিদ্দিকী, হযরত মাওলানা পীর আবু জাফর সিদ্দিকী, হযরত মাওলানা পীর আবুন্নাজাত নজমুস সায়াদাত সিদ্দিকী এ তিনজন তাঁর কদমবুচি করলেন। তিনি সকলকে দু'আ দিতে লাগলেন। কিন্তু নজমুস সায়াদাতকে বুকে ধরে বললেন, 'ইনি ওলিয়ে মাদারজাদ' (আজন্ম ওলি)। আমি তাঁর সাথে যেতে যেতে দেখলাম যে, ইসালে সওয়াবের পাক খানকাহ্‌র পশ্চিমদিকে মিম্বর স্থানে নবী করীম (স.)-এর তক্ত স্থাপন করা হয়েছে। সাহাবাগণ চক্রাকারে তাশরীফ রেখেছেন। এমতাবস্থায় হযরত রাসূলে খোদা (স.) দন্ডায়মান হয়ে ইরশাদ করলেন, বড় জামাতের নেতাকে আমার সম্মুখে আনয়ন করো।

হযরত দাদা পীর কুতুবুল ইরশাদ সূফী ফতেহ আলী ওয়সী মুজাদ্দিদে যামান ফুরফুরার পীর সাহেবকে হুযূরের মস্তকে সবুজ রংয়ের পাগড়ী বেঁধে দিয়ে বলতে লাগলেন– "বড় জামাতের নেতৃত্ব মুবারক হউক, মুবারক হউক।"[৪৬১] তৎপর হুযূরের সাথে ওলীগণ ও সাহাবাগণ হাত তুলে দু'আ প্রার্থনা ও মুবারকবাদ দিয়ে চলে গেলেন। ফুরফুরার পীর সাহেব মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর মুরীদ সংখ্যা পাক-ভারতে প্রায় কোটিরও অধিক। তন্মধ্যে প্রায় লক্ষাধিক ওলামায়েদীন হবেন। সুতরাং এ থেকেই বোঝা যায়, উপরোক্ত স্বপ্ন অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে।[৪৬২]

---

৪৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২
৪৬২. রূহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮

হযরত মাওলানা আহমদ আলী এনায়েতপুরী

যশোরের এনায়েতপুর। নিকটেই সাজীয়ালী হাট। হাটের দিন এক কাধি কলা নিয়ে একটি ছোট্ট ছেলে কলা বিক্রি করতে এলো। মায়ের নির্দেশ ছিল– 'পয়সায় ৭/৮টি কলা বিক্রি করবে।' ঘটনাক্রমে সেদিন হাটে কলা বিক্রি হচ্ছিল প্রতি পয়সায় ৫/৬টি করে। কিন্তু উক্ত বালক কলা বিক্রি করছিলো পয়সায় ৭/৮টি করে। উপস্থিত অনেকেই ছোট্ট ছেলেটির ক্ষতি হচ্ছে দেখে পরামর্শ দিয়ে বললো, 'বাবা! আজ কলার দর চলছে পয়সায় ৫/৬টি। তুমিও এ দামেই বিক্রি করো। তাহোলে লাভ বেশি হবে।' ছেলেটি জবাব দিলো, 'আমাকে আমার মা নির্দেশ দিয়েছেন পয়সায় ৭/৮টি করে বিক্রি করতে। আমি কিছুতেই মায়ের আদেশ অমান্য করে পয়সায় ৫/৬টি করে বিক্রি করতে পারবো না।'

সকলেই ছেলেটির সরলতা ও অপূর্ব মাতৃভক্তির পরিচয় পেয়ে অবাক বিস্ময়ে তার দিকে তাঁকিয়ে রইলো। উপস্থিত এ ছেলেটি পরিণত বয়সে বাংলার ধর্মাকাশের উজ্জল নক্ষত্র যুগ নকীব বৃটিশ বাংলার আইন সভার সদস্য খান বাহাদুর মাওলানা আহমদ আলী এনায়েতপুরীতে পরিণত হয়। তিনি ছিলেন হযরত আবেদ আলী এনায়েতপুরী (র.)-এর সাহেবজাদা এবং মুজাদ্দিদে যামান হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (র.)-এর বিশিষ্ট খলীফাদের একজন। একাধারে অসাধারণ অলেম, অনলবর্ষী বক্তা, অদ্বিতীয় রাজনীতিক এবং সাহিত্যিক হিসেবে তিনি সারা বাংলা ও আসামে সুপরিচিত ছিলেন।

একদিনের ঘটনা। কলকাতা টিকাটুলী মসজিদে মুজাদ্দিদে যামান (র.) আহমদ আলী এনায়েতপুরীকে বুখারী শরীফের প্রথম হাদীস 'ইন্নামাল আ'মালু বিন নিয়্যাত'- এ হাদীসটি পড়িয়ে কিতাবের ওপর হাত রেখে বললেন, 'যাও তোমার হদীস শিখা হয়ে গেলো।' আহমদ আলী (র.) বলেন, 'এরপর হতে আমার মনে হতো সিহাহ সিত্তার সমস্ত হাদীস পূর্ব হতেই আমার পড়া আছে।' এ সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৭/১৮ বছর।

তিনি বলতেন, 'স্বীয় পীর এবং পিতা-মাতার দোয়ায় কি না হয়? কারো যদি বিশ্বাস না হয়, তাকিয়ে দেখ আমি আহমদ আলীর দিকে। তাঁদের দোয়ার বাস্তব নমুনা আমি এবং আমার সারাটি জীবন। আরবী শেখার জন্য কোনদিন কোনো মাদ্রাসার দরজায় গিয়ে দাঁড়াবার সুযোগও হয়নি। অথচ বাংলা-ভারত-আসামের আমি একজন শ্রেষ্ঠতম 'আলিম। আমাকে বলা হয়েছিল 'শামসুল ওলামা।' ইবনে সাউদের ভোজসভায়, মাদ্রাসায়ে সওলাতিয়ায় এবং আরবের আরও বহু স্থানে আরবীতে বক্তৃতা দিয়েছি ঘন্টার পর ঘন্টা। ইংরেজি শিক্ষা আমার অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। অথচ বৃটিশ বাংলার আইন সভায় ও বিভিন্ন স্থানে ইংরেজি বক্তৃতা দিয়েছি অনর্গল। এর সবটুকুই সম্ভব হয়েছে আমার পীর এবং পিতা-মাতার দোয়ার বরকতে।'

হযরত সূফী সফিউদ্দীন

কাশ্‌ফ শক্তি সম্পন্ন জবরদস্ত ওলী আলহাজ সূফী সফিউদ্দীন (র.) ছিলেন মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর একজন খাছ খাদিম এবং খলীফা। তিনি কলকাতার অধিবাসী ছিলেন। কলকাতায় তাঁর তিনটি বাড়ি ছিল।

৮নং কলকাতা তফসিয়া, কলকাতা-৩৯ এ সফিউদ্দীন (র.)-এর একটি আম বাগান ছিলো। বাগানটির আয়তন ছিলো প্রায় চার বিঘা। ইংরেজি ১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে মুজাদ্দিদে জামান (র.) এ আম বাগানে তাশরীফ আনলেন। সফিউদ্দীন (র.) পীরের খিদমতে আত্মনিয়োগ করলেন। হঠাৎ পীর তাঁর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাবা! আম গাছে কি আম আছে?' তখন বাংলা আশ্বিন মাস চলছিলো। গাছে আম ধরার প্রশ্নই উঠে না। তার মধ্যে জামানার মুজাদ্দিদ কিনা আমের কথা জিজ্ঞেস করছেন! সফিউদ্দীন (র.) যখন এরূপ চিন্তাভাবনা করছিলেন, তখন মুজাদ্দিদে যামান (র.) বাগানের উত্তর দিকে ইশারা করে বললেন, দেখো না বাবা! গাছে আম আছে কিনা?

সফিউদ্দীন (র.) পীরের নির্দেশ পেয়ে আমের খোঁজে গেলেন। কিন্তু আম না পেয়ে ফিরে এলেন। মুজাদ্দিদে যামান (র.) তাঁকে দেখেই বললেন, 'কি বাবা! পাওনি? ভালো করে দেখ না!' পীরের এ কথা শুনে তিনি আবার আম গাছটির নীচে গিয়ে আম খুঁজতে লাগলেন। হঠাৎ তাকাতেই দেখেন– গাছে ৮থেকে ১০টি আম ঝুলছে। তিনি খুশিতে বাগ বাগ হয়ে গাছে চড়ে আমগুলো পেড়ে নিয়ে হুযূরের খিদমতে উপস্থিত হলেন। হুযূর আম দেখে বললেন, 'দেখি কি আম?' তারপর কাছে ছুরি না থাকায় তিনি কায়দামত আম ছিলে মুখে দিয়ে বলে

উঠলেন, 'আরে কাচা আম মিঠে!' সফিউদ্দীন (র.) ঐ আম খেয়ে দেখলেন যে, কাঁচা হওয়া সত্ত্বেও এ অসময়ের আমগুলো চিনির মত মিষ্টি।

১৯৩৮ সালের ঘটনা। একদিন সফিউদ্দীন (র.) মুজাদ্দিদে যামান (র.)-কে পাখা দিয়ে বাতাস করছিলেন। এমন সময় মুজাদ্দিদে যামান বললেন, 'বাবা! তোমার ওপর মসিবত আসলে যদি দরকার হয় ঘর বিক্রি করে দিও, বসতবাড়ি বিক্রি করতে হয় করে দিও, কিন্তু বাগানটি বিক্রি করো না; ঐ বাগান থেকেই ইনশাআল্লাহ্ তোমার এবং তোমার ছেলের জিন্দেগী ভালোভাবে চলে যাবে।' সফিউদ্দীন (র.) মুখে 'আচ্ছা হুযূর' বললেন, কিন্তু মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন, 'হুযূর বাগানটি রাখতে বললেন আর তিন তিনটে বাড়ি, এমনকি বসতবাড়িও বিক্রি করে দিতে বললেন!' এরূপ চিন্তাভাবনা করে তিনি কোনো কুল কিনারা ঠিক করতে পারলেন না। অল্প দিনের মধ্যেই সফিউদ্দীন (র.) কঠিন বিপদের সম্মুখীন হলেন। সমস্ত সম্পত্তি, দোকানপাট, ঘর-বাড়ি এমনকি বসতবাড়ি পর্যন্ত বিক্রি করতে হলো। কিন্তু সফিউদ্দীন (র.) পীরের নির্দেশ মুতাবেক শুধুমাত্র বাগানটি বিক্রি করলেন না। কয়েক বছর পরে উক্ত বাগানটি প্রায় বারো লক্ষ টাকায় বিক্রি হলো। তিনি উক্ত টাকা দিয়ে রাবার কারখানা করলেন। তাঁর বাকি জিন্দেগী স্বচ্ছলতার সাথে কেটে গেলো। এমনকি বর্তমানে তাঁর সন্তানরাও শান্তিতে জিন্দেগী কাটাচ্ছেন।

একবার তিনি দিল্লী ও আজমীর শরীফ যিয়ারত করতে যান। দিল্লীতে হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া (র.)-এর মাযার যিয়ারত করতে গেলে মুরাকাবার হালতে রূহানীভাবে নিজামুদ্দীন আউলিয়া (র.) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার পীরের নাম কি?' তিনি সাদামাটাভাবে জবাব দিলেন 'আবু বকর সিদ্দিকী।' সাথে সাথে নিজামুদ্দীন (র.) ধমক দিয়ে বললেন, পীরের নামকি এভাবে বলতে আছে? পীরের নাম আদবের সাথে বলতে পারো না। ফুরফুরার হযরত মুজাদ্দিদে যামান।'[৪৬৩]

হযরত সূফী খলিলুল্লাহ খান মেদেনীপুরী (র.)

হযরত সূফী খলিলুল্লাহ খান মেদেনীপুরী (র.) ছিলেন মুজাদ্দিদে যামান আবু বকর সিদ্দিকী (র.)-এর একজন খাছ খলীফা। 'মেদেনীপুরের মস্তানজী' নামেই তিনি অধিক পরিচিত ছিলেন। মেদেনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার খাগড়াবানি গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হযরত খালেদ সাইফুল্লাহ (র.)-এর বংশধর ছিলেন। সতেরশত বিঘা জমির মালিক পিতার আদরের দুলাল হয়েও তিনি অত্যন্ত সাধাসিধে জীবন-যাপন করতেন। জীবনে কখনও তিনি কোনো স্কুল, কলেজ বা মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেন নি। কিন্তু তিনি ছিলেন ইলমে লাদুনীর সাগর। ঘন্টার পর ঘন্টা তিনি কুরআনুল কারীমের তাফসীর বয়ান করতে পারতেন। এমনকি একবার পীরের হুকুমে শুধুমাত্র 'তাকওয়া' শব্দটিকে কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিন ঘন্টা বয়ান করলেন। তারপর বললেন, 'আমিতো একজন মূর্খ মানুষ, কিছুইতো জানি না! মাদ্রাসার দরজায় কোনো দিন পা রাখিনি। আমার কি 'ইল্ম থাকতে পারে? পীরের হুকুম! তাই হুকুম মানার জন্য এতগুলো কথা বলতে হলো। ভুলচুল বা বেয়াদবী হয়ে থাকলে দয়া করে মাফ করে দিবেন।'

তিনি উচ্চস্তরের কাশ্ফ শক্তিসম্পন্ন জবরদস্ত আল্লাহ্র ওলী ছিলেন। মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি তরীকতপন্থী হন। প্রথমে তিনি হাফিয আবদুর রহমান (র.)-এর মুরীদ হন, যিনি একজন আবদাল ছিলেন। তাঁর ইন্তিকালের পর হক্কানী পীরের সন্ধানে তিনি পাঞ্জাব থেকে বার্মা পর্যন্ত সফর করেন। কিন্তু মনের মত পীর কোথাও খুঁজে পেলেন না। অবশেষে ক্লান্ত হৃদয়ে কয়েক বছর সফরের পর কলকাতায় ফিরে আসেন। এমনি সময় একদিন তিনি ফুরফুরার মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর কথা লোকমুখে শুনলেন। দীর্ঘ সফরের ক্লান্তিকে ভুলে গিয়ে নাওয়া-খাওয়া পরিত্যাগ করে কামিল পীরের সন্ধানে তখনই তিনি ফুরফুরার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। কলকাতা থেকে প্রায় ৪০/৫০ কিলোমিটার হেটে ফুরফুরা হাজির হলেন।

মুজাদ্দিদে যামান (র.) তখন দরবারে বসে ছিলেন। হযরত খলিলুল্লাহ খান (র.) তাঁর সামনে ডান হাত পেতে দাঁড়ালেন। মুজাদ্দিদে জামান তাঁর হাতে একটা আধুলী দিলেন। তিনি আধুলীটি ছুড়ে ফেলে দিয়ে মনে মনে বলতে লাগলেন, 'পিতার বিরাট জমিদারী ফেলে আপনার কাছে এসেছি কি আট আনা পয়সা নেবার জন্যে?

৪৬৩. মাওলানা আবুল বাসার জিহাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

আমি দুনিয়ার জন্যে হাত পাতিনি। যার জন্যে হাত পেতেছি সেটাই আমি চাই। পয়সা দিয়ে আমাকে ভুলাবার চেষ্টা করছেন কেনো?' মস্তানজীর মনের কথাগুলো যেনো যামানার মুজাদ্দিদ বুঝতে পারলেন। তিনি তাঁকে বসতে বললেন। মস্তানজী চুপচাপ এক কোনে বসে পড়লেন।

এরপর পনের দিন কেটে গেলো। কারো সঙ্গে কোনো কথা হলো না। পনের দিন পরে একদিন মুজাদ্দিদে যামান (র.) সফরে যাচ্ছিলেন। তিনি মস্তানজীকে একটি লুঙ্গি ও একটি কম্বল দিয়ে ওগুলো পরতে এবং পরনের চটগুলো খুলে ফেলতে বললেন। অতঃপর গাড়িতে মস্তানজীকে নিজের পাশের ছিটে বসিয়ে সফরে রওয়ানা হলেন। গাড়িতে থাকাকালীন হুযূর এক সময়ে মস্তানজীকে বললেন, 'তুমি দরূদ শরীফের 'আমল করতে থাকো।' মস্তানজী তখন বললেন, 'হুযূর! আমাকে দিয়ে এখন আর কোনো 'আমল হবে না। আপনি আমার জন্য দু'আ করুন।' মস্তানজীর এ আবদার শুনে মুজাদ্দিদে জামান (র.) তাঁর জন্য হাত উঠিয়ে দু'আ করলেন এবং বললেন, 'যাও, তোমাকে আমার কল্ব দিয়ে দিলাম। আল্লাহ্পাক তোমাকে হায়াত দান করুন।' এরপর তিনি পীরের নির্দেশে তাঁর অন্যতম প্রধান খলীফা পিয়ার ডাঙ্গার মাওলানা আবদুল মা'বুদ (র.)-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন। সেখানে কিছুদিন তা'লীম লাভ করার পরে পীরের নির্দেশে তিনি আজমীর শরীফ চলে যান এবং সেখানে ছয় বছর অবস্থান করেন।

আজমীরে থাকাকালীন একবার প্লেগ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়লো। প্রতিদিন বহুলোক মারা যেতে লাগলো। কেউ একবার প্লেগে আক্রান্ত হলে ২/১ দিনের মধ্যেই তার অবধারিত ছিলো। মস্তানজীও প্লেগে আক্রান্ত হলেন। কিন্তু আল্লাহ্র রহমতে অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর প্লেগ একবারে সেরে গেলো। পীরের নির্দেশ পেয়ে তিনি আজমীর শরীফ থেকে দিল্লী হয়ে দেশে ফিরছিলেন। পথে দিল্লীর কুতুব তাঁকে খানা খেতে অনুরোধ জানায়। দশ থেকে পনের দিন অভুক্ত থাকা সত্বেও দিল্লীতে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়ায় তিনি সেখানে যেতে রাজী হলেন না। পরে পথে এক ব্যক্তির দাওয়াত কবুল করলেন। লোকটির বার বার অনুরোধে তিনি খানা খেতে বসলেন। খেতে খেতে তিনি প্রায় আধামণ গোশ্ত খেয়ে ফেললেন। মেজবান তাঁর এ কারামত দেখে অবাক বিস্ময়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন। পথে এক কুকুর তাঁকে কামড় দিলো। কিন্তু তিনি আল্লাহ্র রহমতে কোনো ঔষধ পত্র ছাড়াই একেবারে সুস্থ হয়ে উঠলো।

কিছুদিন পর পীরের নির্দেশ পেয়ে তিনি সেরহিন্দে গমন করলেন। সেখানে ছয় বছর অবস্থান করার পর পীরের তরফ থেকে পিয়ারডাঙ্গায় ফিরে আসার নির্দেশ পৌঁছলো। পীরের নির্দেশ পেয়ে তিনি পিয়ারডাঙ্গায় ফিরে এসে দেখেন তাঁর তা'লীমী ওস্তাদ আবদুল মা'বুদ (র.) ইন্তিকাল করেছেন। এরপর থেকে পীরের নির্দেশে তিনি পিয়ারডাঙ্গায় তাঁর স্নেহের জামাতা হযরত মাওলানা আবদুদ্দাইন সাহেবের খেদমতে অবস্থান করতে থাকেন। মাওলানা আবদুদ্দাইন মস্তানজীর কোলে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এরপর পীরের হুকুমে তাঁর বিধবা কন্যা ও তাঁর আওলাদদের দেখাশুনার আমনতদারী মস্তানজীর ওপরই পড়লো। পীরের এ নির্দেশ তিনি অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেন। আজীবন পিয়ারডাঙ্গায় থাকার জন্যে মুজাদ্দিদে যামান তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাই তিনি সব সময় পিয়ারডাঙ্গাতেই ইন্তিকালের ইচ্ছা পোষণ করতেন। আল্লাহ্পাক তাঁর এ ইচ্ছা পূরণ করেন। পিয়ারডাঙ্গাতেই তাঁর ইন্তিকাল হয় এবং সেখানেই তাঁর দাফন কাজ সম্পন্ন হয়।

তিনি পীরগতপ্রাণ ছিলেন। পীরকে না দেখে তিনি এক মুহূর্তও থাকতে পারতেন না। একবার পীর তাঁকে এক সফরে পাঠালেন। আধাপথ গিয়ে পীরের মুহাব্বতের টানে থাকতে না পেরে রাস্তা থেকেই ফিরে এলেন। তাঁকে দেখে মুজাদ্দিদে যামান (র.) বললেন, 'তোমাকে আমি সফরে পাঠালাম, তুমি ফিরে এলে কেনো?' একথা বলেই লাঠি দিয়ে তিনি মস্তানজীর পিঠের ওপরে তিনটি বারি দিলেন। বারি খেয়ে তিনি আবার সফরের পথ ধরলেন। এ বারিগুলো সম্পর্কে তিনি পরে বলেছিলেন, 'পীরের লাঠির বারি খেতে আমার খুব ভালো লাগছিলো!'[৪৬৪]

ধনীর দুলাল খলিলুল্লাহ খান (র.) পীরের বাড়িতে কাঠ ফাঁড়া, বেড়া বাঁধা, মাটি কাটা থেকে শুরু করে সফরের সময় পীরের সামানাদি মাথায় করে পর্যন্ত বইতেন। একদিন পীর তাঁকে বলে গেলেন, আমি সাত দিনের সফরে যাচ্ছি, তুমি কাঠ ফাঁড়িয়ে রাখবে।' অতঃপর একটা বিরাট গর্ত দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'এ গর্ত ভরাট করার

৪৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

ব্যবস্থা করবে, পয়সা কড়ি যা লাগে বাড়ি থেকে চেয়ে নিবে।' বহু খোঁজাখুঁজির পরও কাজগুলো করানোর জন্য কোনো লোক মস্তানজী খুঁজে পেলেন না। অগত্যা পীরের সন্তুষ্টির জন্যে তিনি নিজেই খড়ি ফাঁড়া শুরু করলেন। ঝুড়ি কিনে সারারাত জেগে মাটি কেটে গর্ত ভরতে লাগলেন। এভাবে রাতদিন পরিশ্রম করে পীরের আগমনের পূর্বেই তিনি সব কাজ শেষ করে ফেললেন। বিভিন্ন সফরে তিনি পীরের জুতা মাথায় নিয়ে বেড়াতেন। পীরের আওলাদদের প্রতিও তিনি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা রাখতেন। পীরের কোনো আওলাদ যে কম্বলের ওপর বসতেন, তিনি কখনও ঐ কম্বলের ওপর বসতে রাজী হতেন না।

তিনি সাধারণত নিজে বায়াত করতেন না। যারা মুরীদ হতে আসতো, তিনি তাদের ফুরফুরায় পাঠিয়ে দিতেন। তবে পীরের হুকুমে একবার তিনি কিছু সংখ্যক লোককে মুরীদ করেছিলেন। মুজাদ্দিদে জামান (র.)-এর ইন্তিকলের পর তিনি শায়খুল ইসলাম আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.)-এর হাতে বায়াত হন। এরপর তিনি প্রায়ই বলতেন, "আমার পীর পরতাপে কাইয়ুম হচ্ছেন। তাঁর দোয়া আল্লাহ্পাকের দরবার থেকে ফিরে আসে না। তোমরা তাঁর হাতে বায়াত হয়ে থেকো। হুযূরকে ছাড়বে না, তাঁর নেক নযর তোমাদেরকে আল্লাহ্পাক পর্যন্ত পৌঁছে দেবে।" ফুরফুরার এ মহান বুজুর্গ ১৯৬৯ ইং সনের ৬ই রমাদান ইন্তিকাল করেন। তাঁর কবর পিয়ারডাঙ্গাতে অবস্থিত।

হযরত মাওলানা সৈয়দ আহমাদুল্লাহ

মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর অন্যতম খলীফা, তাঁর খাছ দোয়া প্রাপ্ত নাত্নী জামাতা ও হক্কানী 'আলিম, মেদেনীপুর জেলার মোস্তফা ডাঙ্গার অধিবাসী এবং শ্বশুরালয় পিয়ারডাঙ্গার পীর সাহেব বলে খ্যাত হযরত মাওলানা সৈয়দ আহমাদুল্লাহ (র.) ছিলেন কাশ্ফশক্তি সম্পন্ন জবরদস্ত আল্লাহ্র ওলী। তিনি ফুরফুরা মাদ্রাসার ছাত্র ছিলেন। পাঠ্য জীবনেই মুজাদ্দিদে যামান (র.) এর নেক নজরে পড়েন। তিনি পছন্দ করেই তাঁর পীয়ারডাঙ্গার মরহুম জামাতা ও খলীফা হযরত মাওলানা আবদু দাইয়ান সাহেব (র.)-এর একমাত্র পিতৃহারা কন্যা নিজ নাতনীর সাথে মাওলানা সৈয়দ আহমাদুল্লাহ (র.)-এর বিবাহ দেন। পরে পিয়ারডাঙ্গার বহু ওলী আল্লাহ্ অধ্যুষিত স্থানে, আউলিয়া কেরামের, বিশেষ করে তাঁর সুযোগ্য জামাতা এবং তাঁর ভ্রাতা মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর খলীফা আবদুল মা'বুদ (র.)-এর এবং তাঁর আগের ইসলামী ঐতিহাসিক ঘটনা বহুল স্থান ও হযরত শাহ্ ইসা (র.)-এর এ দরবারে তাঁর বিধবা জেষ্ঠা কন্যার তত্ত্বাবধানে ও নাতনী জামাতাকে স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন। মাওলানা আহমাদুল্লাহ (র.) অতি অল্প বয়সেই খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর সুমিষ্টি ব্যবহারে ও সুমধুর ওয়াযে প্রথম সাক্ষাতেই সকলে মুগ্ধ হতেন।

তিনি জীবনে দু'বার হজ্জ করেছিলেন। আজীবন ইশা'আতে ইসলাম তথা ইসলাম প্রচারের কাজে রত ছিলেন। বহুদিন যাবত খিদিরপুর বড় মস্জিদের ইমামতির পদেও নিযুক্ত ছিলেন। সে সময় তিনি সামাজিক দুর্ণীতির বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন, তার মধ্যে পণপ্রথা অন্যতম। এছাড়া হিযবুল্লাহ্ ও জমিয়তে ওলামায়ে হানাফিয়ায় সহ-সভাপতি হিসেবে তিনি ইসলামী সমাজব্যবস্থায় খাঁটি শরীয়ত সমর্থিত মত ও পথ অনুকরণে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সারা জীবন আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। পুত্র-কন্যাদেরর সুশিক্ষায় সুশিক্ষিত করে গিয়েছেন।

ফুরফুরার সকল হুযূরদের নিকট অতি প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। নিদায়ে ইসলামের লেখক ও শুভাকাঙ্খী, কলকাতা মাদ্রাসার প্রাক্তন ছাত্র সংসদের সভাপতি, বহু দীনি মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা, আমপারার তাফসীর, এক তালাক, তিন তালাক প্রভৃতি পুস্তকের লিখক, পশ্চিমবঙ্গ সমাজ উন্নয়ন, শরীয়ত সংরক্ষণ প্রভৃতি সংস্থার স্থাপক, সম্পাদক ও সভাপতি, তেজস্বী বক্তা এবং অনলসকর্মী । মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি তাঁর দরদ ছিল অপরিসীম।[৪৬৫]

৪ কার্তিক'১৩৯৬, ২১ অক্টোবর'১৯৮৯, ২০ রবিউল আউয়াল'১৪১০ শনিবার সকাল ৭ টায় মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়ার নিকট বোম্বে রোডের ওপর মদনপুরের সন্নিকটে এক মোটর দুর্ঘটনায় তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

হযরত আবদুর রহমান গজনভী

৪৬৫. মুফতী আহমদ ইয়ার খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

গজনী নিবাসী হযরত আবদুর রহমান (র.) ছিলেন মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর একজন বিশিষ্ট মুরীদ। মাত্র সতেরো বছর বয়সে তাঁর পীর তাঁকে আফ্রিকার গভীর অরণ্যে গিয়ে কঠোর রিয়াজতে মগ্ন হতে আদেশ করেন। পীরের আদেশ পেয়ে তিনি আফ্রিকার গহীন অরণ্যে চলে যান। তখন থেকে একাধারে প্রায় অর্ধশতাব্দী যাবত তিনি সেখানে এক অর্জন বৃক্ষের নিচে লতাগুল্মের জায়নামাজে বসে জনমানবহীন একাকী অবস্থায় আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগুল ছিলেন।

তিনি উচ্চস্তরের বুজুর্গ ছিলেন। মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর খলীফা সাইয়েদুল আবদাল শাহ্ সূফী আবদুল মোমেন (র.) যখন সুদীর্ঘ ২৫ বছর যাবৎ বিশ্ব ভ্রমণ করেছিলেন, তখন আফ্রিকার গভীর অরণ্যে ভ্রমণ করার সময় তাঁর সাথে আবদুর রহমান (র.)-এর কামালিয়াত সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণা লাভ করা যাবে।

বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করতে করতে আবদুল মোমেন (র.) আফ্রিকার গহীন জঙ্গলে গিয়ে উপস্থিত হলেন। পথ চলতে চলতে একদিন হঠাৎ তিনি সদ্য প্রস্ফুটিত বেল ফুলের সৌরভ পেয়ে মন তাঁর পাগল পারা হয়ে ওঠে। সুগন্ধ অনুসরণ করে তিনি আরও গভীর জঙ্গলের দিকে চলতে লাগলেন। ১৭ দিন পথ চলার পর সুন্দর মনোহর জঙ্গলের এক অর্জুন গাছের নিচে জনৈক বুজুর্গ ব্যক্তিকে নামাজ পাঠরত দেখতে পেলেন। নিরীক্ষণ করে বুঝলেন যে, এ বুজুর্গ মহাত্মনের গায়ের সুগন্ধ ১৭ দিনের পথ অতিক্রম করে গিয়েছিলো।

যোহরের ওয়াক্তে যোহর নামাজ আদায় করে আবদুল মোমেন (র.) তাঁকে সালাম করলেন। দরবেশ ইশারায় তাঁকে বসতে বলে নফল নামাজে দাঁড়িয়ে পড়লেন। প্রত্যেক দু'রাকাত নামাজ তিনি প্রায় দু'ঘন্টা সময় লাগিয়ে পড়ছিলেন। এমতাবস্থায় আছরের সময় হলে দরবেশ সাহেব আছরের নামাজ শেষ করে মুরাকাবায় বসে গেলেন। মাগরিবের ওয়াক্ত হলে মুরাকাবা ভেঙ্গে নামাজ সমাধা করে নফল নামাজ পড়তে আরম্ভ করলেন। ছয় রাকাত আউয়াবীন নামাজ শেষ করতে করতেই এশার ওয়াক্ত এসে গেলো। এশার নামাজ পড়ে আবার উভয়ে মুরাকাবায় নিমগ্ন হলেন। দ্বিপ্রহর রাতে আবদুল মোমেন (র.)-এর সাথে দরবেশ সাহেবের আলাপ হলো। এ দরবেশ সাহেবই ছিলেন সূফী আবদুর রহমান (র.)।

তিনি জানালেন যে, ১৭ বছর বয়স হতে তিনি তাঁর পীর ফুরফুরার মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর হুকুমে জঙ্গলবাসী হয়ে আজ পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত প্রায় ৩৮ বছর যাবৎ একইভাবে নামায, রোযা, মুরাকাবা, মুশাহাদায় রত আছেন। এ সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে অন্য কোনো মানুষের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়নি। তিনি যখন জানালেন যে, আবদুল মোমেন (র.) মুজাদ্দিদে যামান ফুরফুরাভী (র.)-এর খাদিম, তখন খুব খুশি হলেন এবং ব্যস্তভাবে তৃণলতায় নির্মিত তাঁর সে জায়নামাজের ওপর আবদুল মোমেন (র.)-কে তুলে নিয়ে গভীর আগ্রহে তাঁর হাত ধরে মুদিত নয়নে তন্ময়তার ঘোরে কিছু সময় অতিবাহিত করলেন।

তারপর কিছু সময় আলোচনার পর শুকনো তৃণলতায় তৈরি জায়নামাজের এক কোণ উঁচু করে তথা হতে সদ্য তৈরি তিনখানা গরম রুটি বের করে একখানা আবদুল মোমেন (র.)-কে দিলেন, দ্বিতীয়খানা নিজে নিলেন ও তৃতীয়খানা পূর্ব স্থানে রেখে দিলেন। আবদুল মোমেন (র.) আশ্চার্যজনকভাবে রুটি পাওয়ার রহস্য জানতে চাইলে আবদুর রহমান (র.) কুর'আন শরীফের আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত যাকারিয়া ও বিবি মরিয়মের আবদ্ধ মস্‌জিদের মেহরাবের মধ্যে থেকে খাদ্যদ্রব্য প্রাপ্তির প্রতি ইঙ্গিত করলেন। অতঃপর বললেন– "আল্লাহ্‌পাক এরূপেই প্রত্যহ আমাকে রিয্‌ক দান করে আসছেন। প্রত্যেকদিন ইশার নামাজ শেষে জায়নামাজের উক্ত স্থান হতে আমি অনুরূপ দু'খানা রুটি প্রাপ্ত হই। একখানি আহার করি অপরটি রেখে দেই যথাস্থানে। এরূপে সুদীর্ঘ ৩৮ বছর হতে পেয়ে আসছি, ব্যতিক্রম শুধু আজ। আল্লাহ্‌পাক অতি মেহেরবানী করে মেহমানদারীর জন্য অতিরিক্ত একটি পাঠিয়ে দিলেন।" এরপর আবদুর রহমান (র.) বললেন, "হুযূরের দরবার হতে বিদায় গ্রহণকালে আরজ করেছিলাম, হুযূর! আমার স্থান নির্ধারণ করেছেন জনমানবহীন হিংস্র প্রাণীর স্থায়ী নিবাস সুদূর আফ্রিকার গভীর অরণ্য। হুজুর! সেখানে আমার আহার্যের ব্যবস্থা কি হবে?" উত্তরে মৃদু হেসে গম্ভীরভাবে মুজাদ্দিদে জামান (র.) বলেছিলেন, 'বাবা আবদুর রহমান! যে আল্লাহ্‌পাক বৃক্ষ কোটরে অন্ধ গোখরের রুজী পৌঁছে দেন নিরিহ পক্ষীকুল দ্বারা সে আল্লাহ্‌র প্রতি তাওয়াক্কুল রাখবে। তোমার আহার্য্যের দায়িত্ব সে আল্লাহ্ জাত পাকের।' আর সে থেকে আমার পীর কামেলের দু'আয় অদ্যাবধি রুটি পেয়ে অসছি। এরপর আরও বহু বিষয়ে আবদুল মোমেন (র.)-এর সাথে তাঁর আলোচনা হলো। অতঃপর আবদুর রহমান (র.) তাহজ্জুদ নমাজ শুরু করলেন। তা শেষ হতে না হতেই ফজরের ওয়াক্ত হয়ে গেলো। ফজরের নামাজ বাদে

মুরাকাবায় বসলেন। মাঝে দু'বার মুরাকাবা ভেঙ্গে ইশরাক ও চাশ্তের নামাজ আদায় করে নিলেন। অতঃপর মুরাকাবায় বসার আগে আবদুল মোমেন (র.)-কে বিদায় দিলেন।[৪৬৬]

হযরত মাওলানা ওমর বোখারী

তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়ার বোখারা নিবাসী বিখ্যাত 'আলিম হযরত মাওলানা ওমর বোখারী (র.) মুজাদ্দিদে যামান আবু বকর সিদ্দিকী (র.)-এর একজন অন্যতম বিশিষ্ট খলীফা ছিলেন। তাঁর ফুরফুরার পীর সাহেবের কাছে আসার ঘটনা অত্যন্ত চমকপ্রদ। একদিন তিনি কলকাতা চাঁদনী টিকাটুলী মসজিদে এসে মুজাদ্দিদে যামান (র.)-কে দেখে মোহাব্বাতে কাঁদতে শুরু করলেন। পরে তনি বলতে লাগলেন–

"হুযূর! আমার পীর সাহেব ইন্তিকাল করলে আমি বিশেষ বিব্রত হয়ে পড়ি। শোকে অভিভূত হয়ে পর্যটনে বের হয়ে বিভিন্ন বুজুর্গানে দীনের মাজার জিয়ারত করতে থাকি এবং আল্লাহ্‌র কাছে আরজ করি যে, কোথায় গেলে আমি কামেল মুর্শিদ পাবো, আল্লাহ্ আমাকে পথ দেখান। এক পর্যায়ে আমি মদীনা শরীফ চলে যাই। সেখানে একদিন স্বপ্নযোগে দেখি যে, হযরত আদম বেনুরী (র.) আমার হাত ধরে কলকাতায় নিয়ে এসে এ মস্‌জিদে হুযূরের হাতে আমাকে সমর্পণ করে যান। নিদ্রাভঙ্গের পর কাল বিলম্ব না করে আমি কলকাতায় চলে আসি। প্রথমে বড় মস্‌জিদে যাই। সেখানে গিয়ে হুযূরের আকৃতির বর্ণনা অনেকের কাছে করেছি, কিন্তু কেউ সঠিক সংবাদ দিতে না পারায় আমি এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করি। আজ এ মস্‌জিদ দেখে এটিকে স্বপ্নোদর্শিত মস্‌জিদ বলে সনাক্ত করলাম। মস্‌জিদে এসে হুযূরকে দেখে আমার সংশয় দূর হলো। আমার স্বপ্ন হুবহু মিলে গেছে।" একথা বলে কাঁদতে কাঁদতে হুযূরের হাত দু'টি ধরে চুম্বন করতে লাগলেন।

মুজাদ্দিদে যামান (র.) তাঁকে স্নেহ সম্ভাষনে সান্তনা বাক্য প্রদান করে কিছুদিন তাঁর খেদমতে থাকতে আদেশ করলেন। উক্ত মাওলানা সাহেব সেখানে কিছুদিন অবস্থান করলে মুজাদ্দিদে যামান (র.) তাঁকে নিয়মিতভাবে তাসাউফ শিক্ষা প্রদান করতঃ মাঞ্জিলে মাকসুদে পৌঁছে দিয়ে তাঁকে খেলাফত প্রদান করে বিদায় দেন। তিনি বোখারা প্রত্যাবর্তন করে বহু লোককে হিদায়েত করেছিলেন। সেখানে আজও তাঁর অসংখ্য অনুসারী বিদ্যমান।[৪৬৭]

আল্লামা কাজী মুহাম্মদ নূর আলী

হুগলী জেলার চন্ডীতলা থানার সুপ্রসিদ্ধ গ্রাম বাঁধপুর বাংলা ১৩০১ সালে কাজী মুহাম্মদ নূর আলী (র.) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাজী মুহাম্মদ আলী মরহুম। তিনি চার বছর বয়সে পিতৃহারা হন এবং পাঁচ বছর বয়সে মাতৃহারা হন। রূঢ় বাস্তবের ঘাত প্রতিঘাতে চাচাজানের সংসারে প্রতিপালিত হতে থাকেন। কিশোর বয়সে মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর ওয়াযে আকৃষ্ট হয়ে ফুরফুরা ফাতেহিয়া মাদ্রাসায় পড়াশুনা আরম্ভ করেন। তখন থেকে মুজাদ্দিদে জামান তাঁর একমাত্র অভিভাবক। ফুরফুরা মাদ্রাসায় পাঠ্য জীবন সমাপ্ত করে কলকাতা মাদ্রাসা রমজানীয়ায় চার বছর ধরে হাদীস, তাফসীর, ফিক্‌হ, উসূল ও মানতেক শাস্ত্রে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন। পরে ফুরফুরা মাদ্রাসা হতে দাওরায়ে হাদীস পাস করে 'মুহাদ্দিস' উপাধি লাভ করেন।

তাঁর প্রতি মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর নির্দেশ ছিলো, "বাবা তুমি চাকরী করতে পারবে না, তোমাকে আমার কাজ করতে হবে।" ফলে তৎকালীন মাসিক তিনশত টাকা বেতনের অধ্যাপনার চাকরী গ্রহণ না করে পীরের অভিলাষ অনুযায়ী বঙ্গ-আসাম ও বিহার প্রদেশে দীনি প্রচারে রত ছিলেন। মুজাদ্দিদে যামান (র.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জমিয়তে ওলামায়ে বাংলা ও আসামের এক্সিকিউটিভ মেম্বার ও 'আঞ্জুমানে ওয়ায়িযীন বাংলার' নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। মাস'আলা মাসায়েল বিশ্লেষণ ও ওয়ায নসীহতে তিনি অনন্য ছিলেন। মুজাদ্দিদে যামান তাঁকে 'ফকিহ' আখ্যায় অভিহিত করতেন।

ওয়ায নছীহতের প্রারম্ভে তিনি সূর সহযোগে কোনরূপ হামদ, না'ত পড়তেন না। এটা কতখানি ক্ষতিকর ও দূষিত 'ইলমে 'আকাঈদ কিতাবে তিনি সে বিষয়ে মূল্যবান উদ্ধৃতিসহ আলোচনা করেছেন। নির্ভীক স্পষ্টবাদী ও

৪৬৬. আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭
৪৬৭.মাওলানা ইব্রাহিম তর্কবাগীশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

স্বাধীন সত্তার অধিকারী এবং বিনয় নম্রতায় ছিলেন তিনি সুন্নতের পূর্ণাঙ্গ প্রতিচ্ছবি। নবী (স.)-এর রওযা মুবারকের ছবি আঁকা মুসল্লায় জীবনে কখনও নামাজের জন্য দাঁড়াতেন না। চিঠিপত্রে বেয়াদবী ও যত্রতত্র ফেলার আশংকায় 'আল্লাহ্' শব্দটি কখনও লিখতেন না। কারও খিদমত লওয়া তিনি মোটেও পছন্দ করতেন না। ফুরফুরার পূণ্যভূমিতে জুতা পায়ে চলতেন না। "যেমন কিবলার দিকে মুখ করে থুথু ফেলতে নেই, তেমনি পীরের গৃহের দিকে মুখ করেও থুথু ফেলতে নেই" এ নির্দেশ তিনি নিষ্ঠা সহকারে পালন করতেন এবং সকলকে উপদেশ দিতেন। তিনি পীরগত প্রাণ ছিলেন। সারাটি রাত জেগে পীর সাহেবকে বাতাস করে কাটিয়েছেন। তিনি বলতেন, 'আদব না করলে কিছুতেই মুক্তি ও উন্নতি নেই।'

মুজাদ্দিদে যামান (র.) তাঁর সম্বন্ধে বহুবার বলেছেন– "আমার অগণিত মুরীদ ও বহু খলীফা রয়েছে, কিন্তু দু'জনের সাথে কারো খাপ খায় না। একজন হলেন মোল্লা সিমলার মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ ফারুকী, অপরজন হলেন বাঁদপুরের মাওলানা নূর আলী।"[৪৬৮]

'ইলমে 'আকাঈদ পুস্তক তাঁর অক্ষয়কীর্তি। মাগরিবের নামাজ থেকে ইশার ওয়াক্ত পর্যন্ত তিনি মুরাকাবা-মুশাহাদায় কাটাতেন, কোন রকম কথাবার্তা বলতেন না। মাসাধিককাল ধরে তিনি ২৪ পরগণার ইসলামপুর গ্রামে কাটাতেন। এমনি কঠিন রিয়াযতে তিনি নিমগ্ন থাকতেন। ইশাবাদ ওয়ায-নছীহত করতেন। ইমান, 'আকায়েদ ও আদব সম্বন্ধে তিনি অত্যধিক জোর দিয়ে যুক্তিপূর্ণ ওয়াজ করতেন। কুরআনের তিনি এমন আশিক ছিলেন যে রাতে অন্য ঘরে যখন কেউ কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন, তিনি রাতের অন্ধকারে চুপি চুপি যেয়ে দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতেন।

এক সময় হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) কলকাতায় তাশরীফ আনেন। বহুলোক তাঁর সাক্ষাৎ প্রার্থী হলেও তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে দেখা করেন নি। মুজাদ্দিদে জামান জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, 'আমার পীর ছাড়া দুনিয়ায় আর কাউকে শ্রেষ্ঠ জানি না। আমি চাই না আমার অন্তরে তদপেক্ষা আর কাউকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করি। কাজেই তাঁর শান ও জনপ্রিয়তা দেখে যদি মনে সামান্য খেয়াল পয়দা হয়।'
তিনি সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে বাংলা ১৩৭২ সালের ৬ পৌষ, ২২ ডিসেম্বর ১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দে বুধবার বিকাল ৩টা ৪৫মিনিটে ইন্তিকাল করেন।

কাজী মুহাম্মদ মোস্তফা

কাজী মুহাম্মদ নূর আলী (র.)-এর জেষ্ঠ্যপুত্র মাওলানা কাজী মুহাম্মদ মোস্তফা (র.) 'আলিমে দীন, সুলিখক, সুসাহিত্যিক, মহাপন্ডিত ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ছিলেন। তিনি বাঁদপুরে ইংরেজী ১৯৩৪ সালের মার্চে জন্মগ্রহণ করেন। চকজিয়ারা জুনিয়র মাদ্রাসা, ফুরফুরা ফাতেহিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা থেকে পাস করে কলকাতা আলীয় মাদ্রাসা থেকে এম.এ (টাইটেল) পাস করেন। পাস করার সাথে সাথেই মাদ্রাসা আলীয়ার অধ্যক্ষ বিখ্যাত শিক্ষাবিদ হযরত মাওলানা সাঈদ আহমেদ আকবরাবাদী সাহেবের ব্যবস্থাপনায় মেদেনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম হাইস্কুলে চাকরী গ্রহণ করেন। অতঃপর চব্বিশ পরগণা জেলার হাড়োয়া পীর গোরাচাঁদ হাই স্কুলে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অত্যন্ত যোগ্যতা ও সুনামের সাথে শিক্ষকতা করেন। তিনি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আদিব-ই কামিল' ছিলেন।

দীর্ঘ দিন রোগ ভোগের পর ১৯৮০ সালের ৬ সেপ্টেম্বর তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর অনেকগুলি মূল্যবান বইয়ের মধ্যে নূর পাবলিশিং হাউস বাঁদপুর থেকে প্রকাশিত অমর গ্রন্থ 'জিয়ইয়া প্রসঙ্গ' নামক পুস্তকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৪৬৯]

হযরত মাওলানা আশরাফ উদ্দীন ও
হযরত মাওলানা আবদুল গনি

---

৪৬৮. হাফিজুল হাদীস আল্লামা রুহুল আমীন (র.), *ফুরফুরা শরীফের পীর* (ঢাকা: ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, ১৯৯৫ খ্রী.), পৃ. ১০৯
৪৬৯. মাওলানা সুলতান আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

হযরত মাওলানা আশরাফ উদ্দীন (র.) ও হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুল গনি (র.) ইনারা দু'জনই হযরত মাওলানা মোস্তফা মাদানী (র.)-এর সহোদর ভ্রাতা। তাঁদের মধ্যে মাওলানা আশরাফ উদ্দীন (র.) জ্যেষ্ঠ এবং মাওলানা আবদুল গনি (র.) কনিষ্ঠ। তাঁদের পিতার নাম মাওলানা খিজির (র.)। তাঁরা উভয়েই প্রসিদ্ধ আলেম ও ওলী আল্লাহ্ ছিলেন। তাঁরা ইসলাম প্রচারার্থে মুর্শিদাবাদ জিলার ফয়জুল্লাহ্পুরে গমন করেন। তৎকালে উক্ত ফয়জুল্লাহ্পুর গ্রামে মুর্শিদাবাদ নবাব দরবারের মুফতি মাওলানা শাহ্ আবদুল গফুর সাহেব বাস করতেন। তাঁরা উক্ত মুফতি সাহেবের সাথে পরিচয় অন্তে ফয়জুল্লাহপুরে বসবাসের জন্য মনস্থ করেন। তদনুযায়ী মাওলানা আবদুল গনি ফয়জুল্লাহপুরে বসবাস এখতিয়ার করেন এবং মাওলানা আশরাফ উদ্দীন ফয়জুল্লাহপুর হতে ৮/৯ মাইল দূরবর্তী মলামাদি তেঘড়ি গ্রামে বাস করেন। মাওলানা আশরাফ উদ্দীনের বংশাবলীর মধ্যে সপ্তম পুরুষ পরে বর্তমানে একমাত্র কন্যা ব্যতীত আর কেউ নেই।

হযরত মাওলানা আবদুল গনি (র.) ইসলামের নিগুঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যায় ছিলেন অদ্বিতীয়। তাঁর মনোমুগ্ধকর ব্যাখ্যা শ্রবণে মানুষ মুগ্ধ হয়ে পড়ে। তাঁর বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয়ে নবাব দরবারে উক্ত মুফতি সাহেব তাঁর সাথে তর্ক-বাহাসের ইচ্ছে পোষণ করেন। ফলে কোনো বিশেষ বিষয় নিয়ে কুড়ি দিন যাবত তর্কের পর মুফতি সাহেব পরাস্ত হয়ে তাঁর ভক্ত হন এবং মুফতি সাহেব তাঁর সাথে আত্মীয়তা করার মানসে স্বীয় পুতিনী, মৌলভী মফিজুদ্দীন সাহেবের কন্যা মোসাম্মৎ সুফিয়া খাতুনের সাথে বিবাহ দেন। বিবাহের যৌতুক স্বরূপ শান্তিপুর, রাওতাড়া, মোহনপুর, ছোট আটাকি, বড় আটাকি এ পাঁচখানি গ্রাম দেন। এ শুভ কার্যের পর গ্রামের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তাঁর বসতবাড়ি নির্মাণ করে দেন। কিছুকাল পরে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর একমাত্র পুত্র মাওলানা শাহ এনায়েতুল্লাহকে 'ইলমে জাহিরী ও বাতিনী শিক্ষায় শিক্ষিত করেন। তাঁর বংশাবলীর মধ্যে বিখ্যাত ওলী-আল্লাহ জন্মেছিলেন। তাঁর নিম্নতম বংশধরের মধ্যে মুজাদ্দিদে যামান আবু বকর সিদ্দিকী (র.)-এর প্রধান খলীফা বিখ্যাত ওলী মৌলভী তাজাম্মল হোসেন সিদ্দিকী (র.) ছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ আবদাল

হযরত মাওলানা আবদুল্লাহ আবদাল (র.) ছিলেন হযরত মোস্তফা মাদানী (র.)-এর চাচাত ভাই ও সহপাঠী। তাঁর আসল নাম মাওলানা আবদুল্লাহ। হযরত মাসুম রব্বানী (র.) তাঁকে 'আবদাল' খেতাবে এবং তদীয় পীর মুর্শিদ ফুলওয়ারী শরীফের হযরত তাঁকে 'কুতুব' খেতাবে ভূষিত করেন। তিনি অতি উচ্চশ্রেণীর 'আলিম, 'আরিফে কামিল ছিলেন। ফুরফুরা থেকে ৮/৯ কিলেঅমিটার দূরে সীতাপুরের পশ্চিমে অবস্থিত 'কুতুবপুর' (অধুনা কোতলপুর) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নামানুসারে জন্মভূমির নাম কুতুবপুর রাখা হয়। এ অঞ্চল তিনি 'দেওয়ান সাহেব' বা 'আবদাল সাহেব' নামে বিশেষ পরিচিত। তিনি হযরত খাজা মাসুম রব্বানী (র.)-এর পত্রসহ ফুলওয়ারী শরীফে উপস্থিত হন। ফুলওয়ারী শরীফের হযরত শাহ্ সাহেব (র.) তাঁকে মুরীদ করে নিজ খিদমতের উদ্দেশ্যে একটি ফুল বাগানে পানি দেয়ার দায়িত্ব অর্পণ করেন। অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করার সাথে সাথে ও ইসলাহে বাতিনে প্রভূত উন্নতি লাভ করেন। তদীয় পীর তাঁর যোগ্যতায় মুগ্ধ হয়ে 'কুতুব' খেতাব প্রদান করেন।

দীর্ঘদিন প্রবাসে কাটিয়ে তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করে দেখেন, তাঁর ওয়ালেদ হযরত মোহাম্মদ হোসায়েন অতি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। কুতুবপুর গ্রামবাসীরা তাঁকে বিবাহ করে সংসার করার পরামর্শ দিতে থাকেন। কিন্তু তিনি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বৃদ্ধ পিতার খিদমতের কথা চিন্তা করে তাকে (পিতাকে) শাদী করাতে উদ্যোগী হন। একথা শুনে গ্রামবাসীরা বলতে থাকেন, এ বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে কে কন্যা সম্প্রদান করবে? তদুত্তরে তিনি বলেন, আচ্ছা স্থির হোক, আমিই শাদির ব্যবস্থা করছি। আল্লাহ্ পাকের অসীম কুদরত! ইতোমধ্যে উক্ত গ্রামের একজন শ্বেত রোগাক্রান্ত স্ত্রীলোক, বহু চিকিৎসায় বিফল হয়ে রোগে ভুগতে থাকেন। কতিপয় ব্যক্তি হযরত আবদাল সাহেবের কাছে তদবীর করার সময় উক্ত রুগিনীর অবস্থা বর্ণনা করে আরোগ্যের জন্য দোয়াপ্রার্থী হন। তিনি বলেন, আমি দোয়া করছি, আল্লাহ্র ফজলে উক্ত রুগিনী নিরাময় হলে আমার ওয়ালেদের সাথে শাদী দিতে হবে। অতঃপর তিনি দোয়া করেন। তাঁর দোয়ার বরকতে উক্ত স্ত্রীলোক আরোগ্য লাভ করেন এবং তাঁর ওয়ালেদ সাহেবের সাথে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। যথাসময়ে তাঁর গর্ভে দুটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম

পুত্রের নাম হযরত আবদুল মান্নান (র.) এবং দ্বিতীয় পুত্রের নাম হযরত আবদুল হান্নান (র.)। তাঁদের বংশধর এখনও বর্তমান আছেন। হযরত আবদুল্লাহ আবদাল (র.)-এর কবর কুতুবপুরে আজও বিদ্যমান।[৪৭০]

হযরত শাহ নূরুদ্দীন মুকতাদা

হযরত নূরুদ্দীন মুকতাদা (র.) 'ছোট হযরতজী' নামে সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি হযরত মাওলানা হাজী মোস্তফা মাদানী (র.)-এর কনিষ্ঠ সাহেবজাদা । তিনি ফুরফুরায় মিয়া সাহেব মহল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সে তাঁর অনেক কারামত প্রকাশিত হয়। উক্ত ঘটনাবলী অত্যাশ্চর্য হলেও মশহুর। এখানে তাঁর অতি প্রসিদ্ধ একটি ঘটনা বর্ণনা করা হলো।

প্রসিদ্ধি আছে যে, তাঁর ওয়ালেদ সাহেব পায়খানায় যাওয়ার পথের ধারে একটি শসা গাছ লাগিয়েছিলেন এবং সময়মত পানি দিতেন, যত্ন করতেন। যথা সময়ে গাছে একটি শসা ফলে। উক্ত শসা ছোট হযরতজী আব্বার সাক্ষাতে তুলে খেয়ে ফেলেন। তাঁর ওয়ালেদ শসা খাওয়ার ইরাদায় গাছের কাছে যেয়ে দেখেন যে, গাছে শসা নেই। ছোট হযরতজী তখন বলেন, 'আব্বা! শসা তো গাছেই আছে।' সত্য সত্যই তিনি যেয়ে দেখেন যে, পূর্বের ন্যায় শসা গাছে ঝুলছে। একদিন হযরত মাওলানা মোস্তফা মাদানী (র.) ছেলেকে বললেন, 'যাও বাবা মস্‌জিদে গিয়ে শয়ন করো।' (বেটা! তুম মস্‌জিদ মে যা কর শো যাও)। ছোট হযরতজী আদেশ মত মস্‌জিদে গিয়ে শয়ন করেন। আল্লাহ্‌ পাকের ইচ্ছা, এ অবস্থাতেই তাঁর ইন্তিকাল হয়। মিয়া সাহেব মহল্লার গোরস্থানে তাঁকে দাফনের ব্যবস্থা করা হয়।

হযরত খোন্দকার সাবরুল্লাহ

হযরত খোন্দকার সাবরুল্লাহ (র.)-এর পিতার নাম হযরত খোন্দকার শাহ পিয়ার বাগদাদী (র.)। তিনি হযরত মোস্তফা মাদানী (র.)-এর চাচাত ভাই এবং তাঁর বিশিষ্ট খলীফা ছিলেন। শরীয়তপন্থী বিজ্ঞ 'আলিম ও উচ্চ দরজার ওলী ছিলেন। তিনি 'খোন্দকার সাহেব' নামেই বিখ্যাত। তাঁর চার পুত্র–
১. মোল্লা শাহ তায়েবুল্লাহ (র.),
২. মোল্লা কলিমুল্লাহ (র.),
৩. কাজী মহিবুল্লাহ (র.),
৪. খোন্দকার হাবিবুল্লাহ (র.)।
প্রকাশ থাকে যে, ছেলেদের কাজের জন্য বিভিন্ন নবাবী টাইটেল প্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁর চার পুত্র সম্বন্ধে প্রচলিত আছে–
হাবিবুল্লহ হুব্বে কামেলবুদ, কলিমুল্লাহ কামালে সাচ দিল।
মহিবুল্লাহ কাজী আওর দানা, তয়েবুল্লাহ জারী মূলকে নিশানা।
মোল্লা কলিমুল্লাহ (র.)-এর মাজার সাদপুরে, বাকী তিনজনের মাযার পিতার মাজারের কাছেই বিদ্যমান। তাঁর বংশধরগণ আকুনী ও সাদপুর গ্রামে এখনও রয়েছে। তাঁর কবর আকুনী গ্রামের পাকা রাস্তার পাশে প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে বিদ্যমান।[৪৭১]

হযরত মাওলানা বদরে ইসহাক

হযরত মাওলানা বদরে ইসহাক (র.) বেলপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হযরত মাওলানা ইব্রাহীম সিদ্দিকী (র.), হযরত মোস্তফা মাদানী (র.)-এর চাচাতো ভাই হতেন। তিনি উচ্চ দরজার বুজুর্গ ও আলেমে হক্কানী ছিলেন। বেলপাড়ায় কালু খোন্দকার (র.)-এর আস্তানার পশ্চিম পাশে একটি মাদ্রাসা গৃহ নির্মাণ করে বহু ছত্রকে যত্নের সাথে 'ইল্‌মে দীন শিক্ষা দিতেন এবং জায়গীরের সুব্যবস্থা করে দিতেন। তিনি জনকল্যাণমুখী বহু জনহিতকর কাজ করেছিলেন। তন্মধ্যে উক্ত মহল্লার সুবৃহৎ 'দর্‌স পুকুর' অদ্যাপি বিদ্যমান।
তাঁর কবর তালতলা হাটের পশ্চিম দিকে বেলপাড়ায় হযরত কালু খোন্দকার (র.)-এর মাযারের উত্তর পাশের তিনটি কবরের পশ্চিমের প্রথমটি।

---

৪৭০. এ. কে. এম. আমজাদ আলী এনায়েতপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১
৪৭১. মুফতী আবু জাফর সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ শু'আইব

হযরত মাওলানা হাফিয মুহাম্মদ শু'আইব (র.) বেলপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতা হযরত মাওলানা বদরে ইসহাক (র.)-এর নিকট 'ইল্মে দীন শিক্ষা গ্রহণ করতেন; কিন্তু তাঁর স্মরণশক্তি ও বুদ্ধি কম থাকায় ঠিকমত পড়া আয়ত্ত করতে পারতেন না। তাঁর পিতা রাগান্বিত হয়ে শাস্তি নির্ধারিত করেন যে, প্রত্যহ তালেবুল 'ইল্মদের জুতো ঘুরিয়ে সাজিয়ে রাখতে হবে। এমন শাস্তি ভোগ করায় তাঁর অন্তঃকরণে ঘৃণার উদ্রেক হয় এবং একদিন রাত বরোটার দিকে তাঁর পিতার খননকৃত 'দরস পুকুরে' তিনি ডুবে মরার ইরাদা করেন। যখন তিনি পানি-মগ্ন হওয়ার উপক্রম হন তখন অকস্মাৎ জনৈক ব্যক্তি সেখানে আবির্ভূত হয়ে তাঁর জিহ্বায় তাঁর নিজের জিহ্বার 'লালা' লেপন করে দেন। ফলে তাঁর স্মরণশক্তি ও জ্ঞান অত্যন্ত প্রখর হয়। তারপর তিনি তাঁর পিতার নিকট অধ্যয়ন করে অতি অল্পদিনে হাফিজে কুর'আন এবং মহাবিদ্বান হয়ে ওঠেন।

একদিন তাঁর ওয়ালেদ শিক্ষদান কাজে রত আছেন। এমন সময় তিনি পশ্চাৎদিক থেকে তাঁকে একটি জটিল প্রশ্ন করেন। হযরত মাওলানা বদরে ইসহাক (র.) ছেলের 'ইলমী লিয়াকত' অবগত হয়ে বলেন, "হে আমার প্রিয় বৎস! তুমি আজ হতে আমার স্থানে উপবেশন করে শিক্ষাদান কার্যে মনোনিবেশ করো।" অনন্তর তিনি পিতৃ আদেশ শিরোধার্য করেন।
তাঁর কবর হযরত মাওলানা বদরে ইসহাক (র.)-এর কবরের পূর্ব দিকের শেষটি।[৪৭২]

হযরত খোন্দকার গোলাম মোস্তফা

খোন্দকার গোলাম মোস্তফা (র.) কালু খোন্দকার নাতে খ্যাত। তিনি ফুরফুরার বেলপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হাফিয মুহাম্মদ শু'আইব। তিনি একজন উচ্চশ্রেণীর কামিল ওলী ছিলেন এবং অধিকাংশ সময়ই আল্লাহ্ প্রেমে মশগুল থাকতেন। তাঁর বহু কারামত প্রকাশিত হয়েছিলো।

এক সময় ফুরফুরা এলাকার গ্রাম সমূহে অনাবৃষ্টিবশত ফসলের চরম ক্ষতি, এমনকি পুকুরগুলো পানিশুন্য হয়ে পড়ে। ফলে চারদিকে হাহাকার পড়ে যায়। এমতাবস্থায় গ্রামের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি একত্র হয়ে উক্ত ওলী-আল্লাহ্র কাছে উপস্থিত হয়ে পানির জন্য দু'আ করতে আবেদন করেন। গ্রামবাসীদের অনুরোধে তিনি ময়দানে গমন করে আল্লাহ্পাকের দরবারে মুনাজাত করা মাত্রই মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয়।

ফুরফুরা থেকে ১০/১২ মাইল ব্যবধানে তেঁতুলবেড়িয়া গ্রামের একটি তেঁতুলগাছ শুষ্ক অবস্থায় পতিত ছিলো। ঘটনাবশত কালু খোন্দকার (র.) উক্ত স্থানে উপস্থিত হয়ে ঐ শুষ্ক তেঁতুল গাছে হস্ত স্পর্শ করার ফলে সজীব হয়ে উঠতে থাকে। তদবধি বহুদিন ঐ গাছটি জীবিত ছিলো। প্রবাদ আছে যে, উক্ত ঘটনা হতে উক্ত গ্রামের নামকরণ তেঁতুলবেড়িয়া হয়েছে।
তাঁর কবর বেলপাড়া মহল্লার এক গম্বুজবিশিষ্ট মস্জিদের পূর্ব পাশে বিদ্যমান।[৪৭৩]

শামসুল ওলামা হযরত গোলাম সালমানী আব্বাসী

শামসুল ওলামা হযরত মাওলানা গোলাম সালমানী (র.) ফুরফুরায় আব্বাসী খান্দানে ইংরেজী ১৮৫৪ সালের ১লা জুলাই মুতাবিক বাংলা ১২৬১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ওয়ালেদ মাওলানা মাখদুম গোলাম রব্বানী (র.)-এর হযরত শাহ্ মোল্লা গোলাম ফরিদ নামে একজন কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। তাঁদের পৈত্রিক সম্পত্তি খুবই কম থাকায় একদিন হযরত মাওলানা গোলাম রব্বানী (র.) তাঁর ছোট ভাইকে ডেকে বললেন, 'এত অল্প সম্পত্তিতে আমাদের উভয়ের সংসার-যাত্রা নির্বাহ হবে না, কাজেই চল আমরা সম্পত্তি বিক্রি করে বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্যে যাই।' দু'ভাই পরামর্শক্রমে কিছু সম্পত্তি বিক্রি করে লেখাপড়া শেখার উদ্দেশ্যে বিদেশ গমন করেন। হযরত মাওলানা গোলাম রব্বানী (র.) আরবি-ফার্সী ভাষায় বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন এবং তৎকালে কমিটি থেকে 'সনদ' প্রাপ্ত হয়ে মুন্সেফ পদে নিযুক্ত হন। তিনি বাংলা ১২৬৮ সালের ২১ শে পৌষ একমাত্র ছেলে সন্তান রেখে ইন্তিকাল করেন। উক্ত ছেলেই হযরত গোলাম সালমানী (র.)।

৪৭২. মুফতী আহমদ ইয়ার খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯
৪৭৩. মোঃ আতাউর রহমান কালামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

তিনি হুগলী মোহসেনীয়া মাদ্রাসা থেকে শেষ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসা থেকে 'সনদ' লাভ করেন। তিনি সূফী ফতেহ আলী ওয়সী (র.)-এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করে তা'লীম পেতে থাকেন। রিয়াজত ও মেহনতের ফলে তিনি অল্পদিনের মধ্যে সূফী ফতেহ আলী (র.)-এর খলীফাদের মধ্যে অন্যতম প্রধানরূপে পরিগণিত হন। তিনি 'বড় মাওলানা' সাহেব নামে বিখ্যাত।

'ইল্‌মে জাহিরী ও 'ইল্‌মে বাতিনীতে তিনি এতখানি বুৎপত্তি লাভ করেছিলেন যে, তৎকালীন বিদগ্ধ জ্ঞানী সমাজে তাঁর বেশেষ সমাদর ছিলো। আরবী-ফার্সী ভাষায় বিশেষ করে ইসলামের ইতিহাসে সুদক্ষ পন্ডিত ছিলেন। তিনি কিছুদিন হুগলী মোহসেনীয়া মাদ্রাসায় অধ্যাপনা করেন, অতঃপর বদলী হয়ে কলকাতা আলীয়ায় অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। অধ্যাপনায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। এমন কি বিখ্যাত অধ্যাপক মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরী থেকেও তিনি যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন। ১৯১০ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী হুগলী মোহসেনীয়া মাদ্রাসার নায়েব এ্যাসিস্টেন্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদ পেয়ে কলকাতা ত্যাগ করেন। মক্কা শরীফের আলেমরা তাঁকে 'শায়খুল হিন্দ' খেতাব প্রদানে বিভূষিত করেন। ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর সম্রাট জর্জ দিল্লীতে আগমন করেন এবং সেখান থেকে কলকাতায় আসেন। এ সময় তিনি হুগলী মাদ্রাসার দায়িত্ব পালন করতেন। বিশেষ কৃতিত্বের সাথে কাজ করায় গভর্নর বাহাদুর অতিশয় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে 'শামসুল ওলামা' খেতাবে ভূষিত করেন। তৎসহ একটি পদক, আমামা এবং সনদ প্রদান করেন।[৪৭৪]

তিনি কোনো মাসআলা-মাসায়েল তাহকীক না করে বলতেন না। প্রতিটি পদক্ষেপ অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে ফেলতেন, নিজের মুরীদদের লিখিত কিতাবেও চট্ করে নিজ মন্তব্য দিতেন না। মাওলানা আলিমুদ্দীন মহেশপুরী (বগুড়া) স্বীয় 'আনিসুল আশেকীন' কিতাবের ভূমিকায় লিখেছেন যে, 'আনিসুল আশেকীন' কিতাবখানা ছাপার সময় প্রতি ফরমা তাঁকে পড়ে শুনানো হতো, ২২ ফরমা পর্যন্ত তিনি শুনে সন্তুষ্ট হয়ে স্বাক্ষর করেন এবং তিনটি ভুল সংশোধন করেন। উক্ত আনিসুল আশেকীন কিতাবে এবং মাওলানা আবদুল্লাহ সিলেটি কৃত 'মিরআতুস-সুলূক' কিতাবে তাঁর বহু গুণের আলোচনা করা হয়েছে।

শিয়ালখালা রেল স্টেশন থেকে তিনি ফুরফুরায় বাড়ীতে পাল্কিযোগে আসছিলেন। পথিমধ্যে কয়েকজন দস্যু তাঁকে হত্যা করে সর্বস্ব লুণ্ঠন করার উদ্দেশ্যে লাঠি উঠায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, দস্যুরা লাঠি হতে কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকে। দস্যুরা তাঁর কাছে বারবার ক্ষমা চাওয়ায় তিনি ক্ষমা করে দেন। তখন তারা স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পায়।

তিনি একদিন হুগলী হতে বাড়ী ফেরার সময় 'হাওড়াঘাট' রেল স্টেশনে উপস্থিত হন। অতঃপর নামাজের ওয়াক্ত হওয়ায় নামাজ পড়ার উদ্যোগ নেন। তাঁর সাথী মুরীদ বলেন, হুযূর! এখনই গাড়ি ছাড়বে, নামাজ পড়ার সময় নেই। তিনি উক্ত কথায় কর্ণপাত না করে নামাজ পড়া আরম্ভ করেন। যথাসময়ে গাড়ি ছাড়লো, কিন্তু একটুকুও অগ্রসর হলো না। অনন্তর তিনি যথারীতি নামাজ পড়ে গাড়িতে চড়া মাত্রই গাড়ি চলতে থাকে।

মহেশপুর গ্রামের পরনা মন্ডল নামে এক ব্যক্তির বাড়ীতে জ্বিনের আছর হয় এবং তার গৃহাদি কয়েকবার জ্বলে যায়। কোনরূপে তার প্রতিকার না পেয়ে সে ব্যক্তি হযরতের খেদমতে যেয়ে খুব কাঁদাকাটা করায় তিনি দু'আ করেন, সেদিন থেকেই তার বাড়ীর জ্বিনের আছর দূর হয়ে যায়।
১৯১২ সালেন ১ জুলাই তিনি ইন্তিকাল করেন।[৪৭৫]

হযরত সূফী মুফতী আরিফুল হক

হযরত সূফী মুফতি আরিফুল হক (র.) অত্যন্ত মেহনতী ও পরহেজগার ছিলেন। তিনি শামসুল ওলামা হযরত আল্লামা গোলাম সালমানী (র.)-এর খলীফা এবং 'আমালিয়াতে কামিল ছিলেন। চকরী জীবনেও তিনি সর্বদা ইসলামী লেবাস-পোশাক ব্যবহার করতেন। এমনকি নামাজের অসুবিধার জন্য চাকরী ত্যাগ করেন। চাকরী

৪৭৪. মাওলানা সুলতান আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭
৪৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

পরিত্যাগের ব্যাপারে আর্থিক প্রসঙ্গ তুললে তিনি বলতেন, 'ক্যায়া হোগা? জো মনজুরে খোদা হ্যায়, ওহী হোগা।' তাকওয়া-পরহেজগারীতে তিনি অনন্য ছিলেন।

খোন্দকার জহিরুদ্দীন

হযরত খোন্দকার জহিরুদ্দীন (র.) হযরত 'আল্লামা গোলাম সালমানী (র.)-এর সহপাঠী ছিলেন। তিনি ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে ইন্সপেক্টর ছিলেন। তিনি সহপাঠী হিসেবে 'আল্লামা গোলাম সালমানী (র.)-এর সাথে অনেক হাসি-মশকারা করতেন। একবার 'আল্লামা গোলাম সালমানী আব্বাসী (র.)-এর কলকাতা অবস্থানকালে রাতের বেলায় তিনি দেখতে পান, হযরত সালমানী ঘরে শুয়ে অছেন আর ঘর আলোকময় হয়ে আছে। এ আশ্চর্য দৃশ্য তাঁর মনের অবস্থার পরিবর্তন করে দেয়। অতঃপর সকালে অনুতপ্ত হৃদয়ে হযরত সালমানী (র.)-এর খেদমতে হাজির হয়ে তওবা করেন এবং তাঁর কাছে মুরীদ হন। পরে চাকরী পরিত্যাগ করেন। প্রায় পনের দিন পর তাঁর পীর এ খবর জানতে পারেন এবং হুগলী মাদ্রাসায় চকরীর ব্যবস্থা করে দেন।

অধ্যাপনাকালে তিনি কোনদিন ক্লাসে চেয়ারে বসে পড়াতেন না। সর্বদা তসবীহ হাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লাসে ছাত্রদোর পড়িয়ে চলে আসতেন। তরকে দুনিয়া, তাকওয়া-পরহজগারীতে তিনি তুলনাহীন ছিলেন। এমনকি তিনি দাদার সম্পত্তি পর্যন্ত সন্দেহের অযুহাতে গ্রহণ করেন নি।
চকজিয়াড়া মসজিদের পশ্চিম পাশে রাস্তার ধারে 'করেঙ্গা গাছের' নীচে হযরত জহিরুদ্দীন (র.)-এর বিদ্যমান। শামসুল ওলামা হযরত মাওলানা সফিউল্লাহ (র.) তাঁর বেয়াই হতেন।

হযরত মাওলানা আবদুল আলীম

হযরত মাওলানা আবদুল আলীম (র.) ফুরফুরায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হযরত মাওলানা গোলাম সামদানী (র.)। তিনি একজন শরীয়তপন্থী আলিম এবং আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় ওলী ছিলেন। তিনি পিতার নিকট 'ইল্‌মে মা'রেফতে কামালিয়াত হাসিল করেন। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি ইসলাম প্রচারে কাটান। রাজশাহী, পাবনা এবং ঢকা প্রভৃতি জেলায় তাঁর বহু মুরীদ ছিল। পাবনা জিলার অন্তর্গত শাহাজাদপুরে মুরীদ পরম্পরায় বিদ্যমান আছে।

ইসলাম প্রচারকালে ঢাকা জেলার এলাচীপুর মৌজায় তিনি ইন্তিকাল করেন এবং তথায় দাফন করা হয়। তাঁর কবর বর্তমানে পদ্মাগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। জনশ্রুতি আছে যে, উক্ত কবর পদ্মাগর্ভে পতিত হবার সময় তা থেকে একটি 'নূর' আসমানের দিকে উত্থিত হয়েছিল। প্রকাশ থাকে যে, তৎকালে কয়েকজন মৎসজীবী তথায় উপস্থিত ছিল।[৪৭৬]

হযরত মাওলানা কাজী যুবাইর

হযরত মাওলানা কাজী যুবাইর (র.) ফুরফুরায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন অতি উচ্চশ্রেণীর শরীয়তপন্থী আলেম এবং ওলিয়ে কামেল ছিলেন। তিনি প্রথমে অন্যত্র মুরীদ হয়েছিলেন। তথায় কোনরূপ উন্নতি না হওয়ায় তাঁর নির্দেশে লাখনৌতে মাওলানা কাজী আয়াজ (র.)-এর নিকট তা'লীম প্রাপ্ত হন। তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় দীনের প্রচারকর্যে রত থাকতেন। উপযুক্ত হাদীর অভাবে তখন ফুরফুরা গোমরাহীর পথে ধাবিত হতে থাকে। সে সময় আল্লাহ্‌র ফযলে হযরত মাওলানা কাজী যুবাইর (র.) দীনের উন্নতি সাধনে রত হন। তখন নিকাহ সানীর (বিধবা বিবাহের) প্রচলন ছিল না। তিনি অত্যন্ত মেহনত ও কষ্ট স্বীকার করে উক্ত কুপ্রথা উঠিয়ে দেন। ফলে কতিপয় স্বার্থান্বেষী তাঁর প্রতি খড়গহস্ত হন। তবুও তিনি ইসলামের খেদমতে ভগ্নোৎসাহ বা ভীত হননি।

প্রকাশ থাকে যে, ইতোপূর্বে তিনি ফুরফুরার পূর্ব প্রান্তে বর্তমান 'মড়িপুকুর' নামে পুষ্করিণীর ধারে এক হুযরা নির্মাণ করে ইবাদত-বন্দেগী করতেন। ঘটনাক্রমে একদিন এক সিপাহী তাঁর দরবারে কোনো প্রয়োজনে আগমন করেন। তখন তিনি মুরাকাবায় বসেছিলেন। আগন্তুক ব্যক্তি তথায় অপেক্ষা করতে থাকেন। এমন সময় এক রাখালের গরু এসে হুযূরের হুযরা ঘরের বিচালী বা খড়ের ছাউনি নষ্ট করতে থাকে। তিনি ঐ অবস্থায় আঙুলি

৪৭৬. হাফিযুল হাদীস আল্লামা রুহুল আমীন (র.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১

হেলিয়ে ইশারা করেন। ঠিক সে সময় গরুর রাখালও দৌড়ে তথায় এসে পড়ে। সিপাহী আঙুলি হেলনের ভুল ব্যাখ্যা বুঝে নিজের তরবারীর আঘাতে রাখাল বালককে হত্যা করে। এ সুযোগে উক্ত স্বার্থান্বেসী ব্যক্তিরা ষড়যন্ত্র করে তাঁর বিরুদ্ধে কোর্টে হত্যা মামলা দায়ের করেন। তিনি পুলিশ কর্তৃক ধৃত হয়ে কোর্টে সোপর্দ হন। যখন তিনি বিচারালয়ে পদার্পন করেন তখন বিচারক ও তাঁর অমাত্যবর্গ আলোচনা করছিলেন যে, 'কে লবঙ্গের গাছ দেখেছেন?' এ কথা শোনা মাত্রই তিনি পশ্চাৎ দিক থেকে হস্ত প্রসারিত করে বললেন, 'এই দেখুন একটি লবঙ্গ তরু।' বিচারপতি ও উপস্থিত জনমন্ডলী এ ব্যাপারে অতিশয় আশ্চার্যান্বিত হন এবং বিচারপতি বিবাদীদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেন, 'তোমরা কার বিরুদ্ধে মোকাদ্দমা করেছ, ইরি যে একজন ওলী-আল্লাহ্।' তারপর মোকাদ্দমা অগ্রাহ্য হয়।

তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করে তথা হতে গঙ্গা নদী তীরে 'পলতা' নামক স্থানে অবস্থান করতে থাকেন। পলতার হাটে তিনি যখন যেতেন তখন সকলেরই ইচ্ছা করতো যে, হুযূর আমার দোকান থেকে কিছু গ্রহণ করুন। তিনি যে দোকানের জিনিস স্পর্শ করতেন আল্লাহ্‌র রহমতে তার সেদিন প্রচুর লাভ হতো। পলতাতেই তাঁর ইন্তিকাল ও কবর হয়।

হযরত মাওলানা আবদুর রাজ্জাক

হযরত মাওলানা আবদুর রাজ্জাক (র.) ফুরফুরার পশ্চিম বেলপাড়া মহল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় শ্বশুরালয়ে অবস্থান করতেন। ইনি একজন উচ্চশ্রেণীর আলিম, বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক ছিলেন। হুগলী মাদ্রাসা মোহসেনীয়ায় বহুদিন পর্যন্ত প্রধান মুদাররিসের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর নিকট হিন্দুস্থান ও বঙ্গদেশের বহু তালিব-উল-'ইলম শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছিল। বাংলা ১৩২০ সালের কার্তিক মাসে হুগলী শহরে ইন্তিকাল করেন এবং উক্ত শহরের জোড়াঘাটের সন্নিকটে তাঁর কবর বিদ্যমান।[৪৭৭]

আল্লামা রাশেদ সিদ্দিকী

হযরত আল্লামা রাশেদ সিদ্দিকী (র.) ফুরফুরার অন্তর্গত বেলপাড়া মহল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। হযরত মাওলানা বদরে ইসহাক (র.), হাফিয শু'আইব (র.) প্রমুখ একই বংশের খ্যাতিমান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সুন্দর ও সুপুরুষ ছিলেন। আরবী সাহিত্য, তাফসীর, হাদীস, ফিক্হ, ফার্সী, গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ মাসউদী পাহাড়পুরী (র.)-এর কাছে 'ইলমে মা'রিফাত' শিক্ষালাভ করেন। পাহাড়পুর ফুরফুরার পশ্চিম দিকে প্রায় আট মাইল ব্যবধানে অবস্থিত।

সূফী ফতহে আলী ওয়সী (র.) ও হযরত হাজী আবদুল মুক্তাদির (র.) একই সঙ্গে কিছুদিন কলকাতা গোরাবাজারে দমদম মোকামে অবস্থান করতেন। তথায় তাঁদের সঙ্গে হযরত খিজির (আ.)-এর যিয়ারত নসীব হয়। উক্ত বুজুর্গদ্বয়সহ তাঁর ফুরফুরার মস্জিদে দ্বিতীয়বার হযরত খিজির (আ.)-এর যিয়ারত নসীব হয়।

নব্বই বছর বয়সে তিনি লোকের সাহায্য ব্যতীত দাঁড়াতে পারতেন না। আল্লাহ্ পাকের অপার অনুগ্রহে নামাজে তাঁকে তুলে দাঁড় করে দিলে রুকু, সিজ্দাহ প্রভৃতি নিজে সুসম্পন্ন করতেন। সুতরাং তাঁকে বৃদ্ধ বয়সেও বসে বসে নামাজ পড়তে হয়নি।

তিনি সর্বপ্রথম টালিগঞ্জে 'মাদ্রাসায়ে দাওলাত মাইসুরীয়া'য় প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। অতঃপর হুগলীর 'মাদ্রাসায়ে মোহসেনীয়া'য় প্রধান হেড মাওলানার পদে বহুদিন পর্যন্ত সুখ্যাতির সাথে দায়িত্ব পালন করেন। অধিকাংশ জীবন তিনি অধ্যাপনায় অতিবাহিত করেছেন। তিনি এমন জবরদস্থ আলিম ছিলেন যে, 'হিদায়া' ও 'মোসাল্লামুস সবুত' কিতাবদ্বয় ছাত্রগণকে কণ্ঠস্থ শিক্ষা প্রদান করতেন। বঙ্গ ভারতের অসংখ্য ছাত্র তাঁর থেকে 'ইল্ম হাসিল করেছেন।

তিনি প্রায় নব্বই বছর বয়সে বাংলা ১৩০৪ সালের ৯ই বৈশাখ, ইংরেজী ১৮৯৭ সালের ২১ শে এপ্রিল, রোজ সোমবার বেলা ১০ ঘটিকায় দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। বেলপাড়ায় তাঁর কবর বিদ্যমান আছে।[৪৭৮]

---

৪৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯

৪৭৮. আল্লামা সাইফুদ্দিন সিদ্দিকী, *তালিমে তরিকত ও বাতেনী শিক্ষা* (হুগলী: হেদায়াতুল মুসলিমীন লাইব্রেরী, ১৯৮৪ খ্রী.), পৃ. ৪২

আল্লামা সৈয়দ দেলাওয়ার হোসেন

হযরত মাওলানা হাজী দেলাওয়ার হোসেন (র.) ফুরফুরায় সৈয়দ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উচ্চশ্রেণীর ‘আল্লামা ছিলেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি হুগলী মোহসেনীয়া মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। হিন্দুস্তান ও বাংলার বহু ছাত্র তাঁর কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। মা'রিফত বিদ্যা হযরত মাওলানা আমানতুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী (র.)-এর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। ইতিপূর্বে হযরত মাওলানা ইয়াকুব দেহলভী (র.)-এর নিকট শরীয়ত ও মা'রিফত উভয় শিক্ষা লাভ করেন।
১৪ই ফাল্গুন'১২৯৬ সালে বেলা ১০ টার সময় ৮৫ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর কবর ফুরফুরায় বিদ্যমান।

হযরত মাওলানা হিদায়েত উল্লাহ

হযরত মাওলানা হেদায়েত উল্লাহ (র.) ফুরফুরায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন ওলী-আল্লাহ্, ফকিহ, পরহেজগার ও আশেকে রাসূল ছিলেন। যখন তিনি পথে চলতেন, তখন ইতস্তত দৃষ্টিপাত না করে মস্তক বস্ত্রাবৃত করে চলার পথে দৃষ্টি রেখে চলতেন। একদিন একজন সুদখোর তাঁর পরহেজগারী পরীক্ষার্থে এক ‘রেকাবী’ সুদের টাকা হাদিয়া দেয়ার অভিলাষে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি উক্ত সুদখোরকে দেখতে পেয়ে বলেন, “হে সুদখোর! তোমার সুদের টাকা ফিরিয়ে নিয়ে যাও। তুমি সুদের টাকা আমাকে হাদিয়া দেয়ার জন্য এনেছ।” তখন আর সুদখোরের লজ্জার সীমা থাকল না।

প্রবাদ আছে যে, তিনি যে হুযরায় বসে ইবাদাত করতেন, তার শীর্ষভাগ হতে আসমান পর্যন্ত একটি নূর প্রজ্জ্বলিত হত। যারা তা দেখতেন তারাই আশ্চার্যান্বিত হতেন। উক্ত হুযরা আজও ফুরফুরায় বিদ্যমান। তিনি ‘নূরুল হিদায়াত’ নামক একখানা কিতাব প্রণয়ন করেন। তানবীরুল জানান, শরহে তরীকায়ে মুহাম্মদী, শরহে ফিক্‌হ আকবর, লি-মোল্লা আলীকারী, মালাবুদ্দা মিনহু, ফাতওয়ায়ে আলমগীরী, তাকমিলুল ইমান, মাদেনোল জাওয়াহের, তাম্বিহুল গাফিলীন, ফাতওয়ায়ে হিন্দী, মাসায়েলে আরবায়ীন, কাওলুল জামীল, মিনহাজুল আবেদীন, তাফসীরে ফতহুল আযীয, তাফসীরে হোসাইনী, তাফসীরে মাওলানা ইয়াকুব চারখী, মিশকাত শরীফ প্রভৃতি কিতাবসমূহের সাহায্যে তিনি উক্ত কিতাব প্রণয়ন করেছিলেন। উক্ত কিতাবে শির্‌ক ও যে যে শব্দ ব্যবহার করায় ইমান প্রভৃতি বিনষ্ট হয়, সে বিষয়ে বিস্তারিত লিপিবদ্ধ আছে।

তিনি বিদ্যার সাগর হয়েও অত্যন্ত সাধারণভাবে জীবন যাপন করতেন। আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস তাঁকে কোনদিন স্পর্শ করতে পারেনি। মাটির পাত্রে খাওয়া, খেজুর পাতার চাটাইয়ে শোয়া তাঁর চিরদিনের অভ্যাস ছিলো। কলকাতা শহরে একশত টাকার চাকরী গ্রহণ না করে মুনশির হাটে দশ টাকা মাইনের মাদ্রাসার চাকরী গ্রহণ করেন। মানুষের জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি বলতেন, ‘দশ টাকায় আমার বেশ চলে যায়, একশত টাকা উপায় করে কৈফিয়ত দেবো কি করে?

সে যুগে ওলামায়ে কেরামের কেমন আখলাক, ইত্তিফাক ছিলো নিম্নের ঘটনা তার আদনা নমুনা। কোনো ব্যক্তি যদি মাসআলা মাসায়েল নিয়ে মাওলানা রাশেদ মরহুমের কাছে যেতেন, তখন তিনি জবাব দিয়ে বলতেন, একটু মাওলানা হেদায়েত উল্লাহ সাহেবকে জিজ্ঞসা করে নেবেন। মাওলানা হেদায়েত উল্লাহ্‌র কাছে সে লোকটি জিজ্ঞাসা করলে, তিনিও যথাযোগ্য জবাব দিয়ে বলতেন, কাজী মাওলানা দেলওয়ার হোসেনকে একটু শুনিয়ে নেবেন, তাঁর লাইব্রেরীতে বহু কিতাব আছে। উক্ত ব্যক্তি কাজী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি যথাযথ উত্তর দিয়ে কিতাব খুলে দেখিয়ে দিতেন। অথচ তিনজনের উত্তর একইরকম পাওয়া যেত।

তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে বাংলা ১২৯১ সালের ৮ই ফাল্গুন সকালে ৮০ বছর বয়সে ফুরফুরায় ইন্তিকাল করেন। তিনি এতদূর পরহেজগার ছিলেন যে, বসন্ত রোগে ভয়ঙ্কররূপে আক্রান্ত হওয়া সত্বেও জানুর উর্ধ্বদেশে কাপড় উঠাননি। তাঁর জানাযা পড়ার সময় ইমামতি করার জন্য মাওলানা রাশেদকে বলায় তিনি বলেন, ‘এত বড় আল্লাহ্‌ভীরু বুজুর্গ আলিমের জানাযা পড়ানো আমার দ্বারা হবে না।’ কাজী দেলওয়ার হোসেন বলেন, আমি সরকারী চাকুরে, আমার পক্ষে এ গুরু দায়িত্ব পালন করা অসম্ভব।’ তারপর ওদং ফতেপুরের সূফী নূর মুহাম্মদ

জানাযা সম্পন্ন করেন। তাঁর কবর ফুরফুরার দক্ষিণ প্রান্তে তালতলা হাটের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে রাস্তার ধারে প্রাচীর বেষ্টিত আছে।[৪৭৯]

হযরত মাওলানা শাহ জহির আলা

হুগলী জেলার সীতাপুর গ্রামে শাহ্ জহির আলা (র.) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ওয়ালেদ সাহেবের নাম মৌলভী আসরাহ উদ্দীন। হযরত শাহ্ জহির আলা (র.) বিদ্যাশিক্ষার্থে দিল্লী গমন করেন এবং তথায় ২২ বছর কাল অবস্থান পূর্বক অধ্যয়ন সমাপ্ত করে ঘরে ফিরেন। কথিত আছে যে, দিল্লীতে অবস্থানকালে ঘর থেকে যত পত্র গিয়েছিলো, সব জমা রেখেছিলেন। এতদিন চিঠি পড়ার অবকাশ পাননি, ঘরে ফিরার সময় উক্ত চিঠিগুলো পড়েন। অধ্যয়নকালে তিনি জামে মস্‌জিদ, নিজের হুযরা ও মাদ্রাসা ছাড়া কোথাও যেতেন না। সব সময় পড়াশুনায় মশগুল থাকার ফলে পায়ের গাট ও কনুইতে শক্ত দাগ পড়ে গিয়েছিলো।

চিঠিগুলো পড়ার সময় তিনি কখনও হাসতেন কখনও কাঁদতেন। কেননা, চিঠিতি সুখ-দুঃখ উভয় প্রকার সংবাদই লিখা ছিলো। ঘরে ফিরার সময় একবার মাত্র দিল্লী শহর পরিদর্শন করেন, দেশের লোকেরা দিল্লী সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারেন চিন্তা করে। সীতাপুর ফিরে এসে কিছুদিন পরে ফুরফুরায় পাকা বাড়ী নির্মাণ করেন। তাঁর চিন্তাধারা পরিবর্তন হওয়ায় তিনি তাঁর ভায়রা জনাব হযরত মাওলানা ফজলে হক সাহেবকে সাথে নিয়ে মক্কা অভিমুখে হিযরত করেন। মক্কা শরীফে অবস্থানকালে খলীফাতুল মু'মিনীন, রোম সম্রাট এবং আরববাসীদের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। তাঁর অনেক কারামত প্রকাশিত হয়েছে। মৌলভী আবদুল বারী এবং মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহইয়া নামে তাঁর দুই পুত্র ছিলো।

কয়েকজন ইয়াহুদী মৌলভী শাহ্ জহির আলা সাহেবকে ব্যবসা করার প্রলোভন দেখিয়ে তায়েফ নিয়ে যান এবং তথায় নিদ্রিত অবস্থায় হত্যা করত মুতদেহ গুম করে। মরহুম মাওলানা জহির আলা সাহেবের বংশধর আজও জীবিত আছে।[৪৮০]

হযরত মাওলানা ফযলে হক

হযরত মাওলানা ফজলে হক (র.) সীতাপুর গ্রামে সিদ্দিকী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হযরত যয়নুদ্দীন (র.)-এর পুত্র এবং একজন উচ্চশ্রেণীর 'আলিম ও কারামতবিশিষ্ট বুযুর্গ ছিলেন। অধিকাংশ সময় তিনি আল্লাহ্‌প্রেমে নিমগ্ন থাকতেন। শেষ বয়সে হযরত মাওলানা জহির আলা (র.)-এর সাথে মক্কা শরীফ হিযরত করেন। এ সময় এক আশ্চার্য ঘটে। জনৈক আরববাসী হযরত নবী করীম (স.)-এর সশরীরে মিরাজ গমনাগমন সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং হযরত মাওলানা ফজলে হক সাহেবের কাছে উক্ত সন্দেহমনা ব্যক্তি সবিশেষ জ্ঞাত হওয়ার অভিলাষ ব্যক্ত করেন। তিনি রাগান্বিত হয়ে বলেন, 'আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতে সন্দিহান হচ্ছো কেনো?' অতঃপর তাকে এমনভাবে তা'লীম-তাওয়াজ্জুহ দেন যে, সে ব্যক্তির অন্তঃকরণে হযরত নবী করীম (স.)-এর মিরাজ সত্য সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে এবং তাঁর কাছে বারবার ক্ষমা চাইতে থাকে। হযরত মাওলানা ফজলে হক (র.) মক্কা শরীফে মৌলভী হামেদ-উল হক নামে এক নাবালেগ পুত্র রেখে ইন্তিকাল করেন। অনন্তর মৌলভী হামেদ-উল হক সাহেব মক্কা শরীফ থেকে ফিরে সীতাপুরে বসতী স্থাপন করেন। সীতাপুরে তাঁর বংশধরেরা আজও বিদ্যমান আছে।

হযরত মোল্লা শাহ গোলাম কাদের

হযরত মোল্লা শাহ্ গোলাম কদের (র.) সীতাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন উচ্চশ্রেণীর কামেল ওলী-আল্লাহ্ ছিলেন। যাহিরী ও বাতিনী 'ইল্‌ম হাসিল করার জন্য তিনি সমস্ত বাংলা ও আসাম পরিভ্রমণ করেন। রাত দিনের অধিকাংশ সময় তিনি হুযরারায় ইবাদাতে মশগুল থাকতেন। শোনা যায় যে, তিনি যখন হুযরায় রাত যাপন করতেন, সে সময় তাঁর বক্ষদেশ হতে এক জ্যোতি প্রকাশিত হয়ে হুযরাটি আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে যেতো। তিনি সীতাপুরে ইন্তিকাল করেন।

---

৪৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩
৪৮০. খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, রাহে বেলায়েত (ঝিনাইদহ: আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২০০৯ খ্রী.), পৃ. ১৫৫

তাঁর পাঁচ পুত্র ছিলেন। প্রথম পুত্র ইয়ার আলী নিঃসন্তান অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। দ্বিতীয় পুত্র রহিমউদ্দীন সাহেব উকীল ছিলেন। তৃতীয় পুত্র মৌলভী সাজেদউদ্দীন সাহেব তিনিও মহাজ্ঞানী ছিলেন এবং স্বীয় পিতার কাছে মুরীদ হন।

হযরত যাহাব উদ্দীন মোহাম্মদ

হযরত হাজী জাহাব উদ্দীন মোহাম্মদ (র.) হযরত মোল্লা গোলাম কাদের (র.)-এর চতুর্থ পুত্র। ইলমে মা'রিফাত পিতার কাছে শিক্ষালাভ করে একজন উচ্চশ্রেণীর ওলী-আল্লাহ্ হন। তিনি লোকজনের সংশ্রব পরিত্যাগ করে আল্লাহ্ পাকের ইবাদাত-বন্দেগীতে মশগুল থাকতেন। তিনি জনাব গোলাম মহিউদ্দীন সাহেবের পিতা জনাব হাজী মবিনউদ্দীন সাহেবের সাথে পায়ে হেঁটে পবিত্র হজ্জব্রত সমাধা করার উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। পিতা স্বীয় খাস হুযরা তাঁকে দান করেছিলেন। তিনি বলতেন, যদি কোনো দরবেশ নামাজ-রোযা প্রভৃতি শরীয়তের বিধানসমূহ পরিত্যাগ করে আগুনের ওপর দিয়ে চলে এবং হাওয়ায় উড়ে বেড়ায় তবুও সে শয়তান। তিনি প্রত্যহ তাহাজ্জুদ নামাজের অযুতে ফজর ও চাশতের নামাজ এবং ওযিফা শেষ করে কুর'আন শরীফ তিলাওয়াত করতেন। অতঃপর যারা তাঁর কাছে তদবীর করতে আসতেন, তাদের ব্যবস্থা করে দিতেন। যে জুমাবারে তিনি ইন্তিকাল করেন, সেদিন ওযিফাকালে একবার উপর দিকে নযর করে হাসতে থাকেন। এর কারণ কি, তাঁর মুরীদানেরা জিজ্ঞাসা করতে সাহসী হননি। অতঃপর তিনি অভ্যাসমত কুর'আন শরীফ তিলাওয়াত শেষ করে 'আল্লাহু আকবার' বলে সিজদায় গেলেন। তদবীরকারীরা আশায় অপেক্ষা করছিলেন, কিন্তু তাদের সে আশা মিটলো না, সিজ্‌দার সঙ্গে সঙ্গে দেহ পিঞ্জর থেকে রূহ বের হয়ে গেল।[৪৮১]

হযরত মুন্‌শী গনিমত উল্লাহ

হযরত মুন্‌শী গনিমতুল্লাহ (র.) ফুরফুরায় জন্মগ্রহণ করেন। ফার্সী ভাষায় তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। নিজ বাড়ীতে বহু ছাত্রকে উরফি, নেজামী, যাহিরী, খাকানী, গোলেস্তা, বোস্তা প্রভৃতি ফার্সী ভাষার কিতাবগুলো শিক্ষা প্রদান করতেন। তিনি হযরত মাওলানা শাহ্ হিদায়েত উল্লাহ (র.)-এর নিকট 'ইল্‌মে মা'রিফত তা'লীম পেতে থাকেন। কিন্তু তিনি ইন্তিকাল করায় সূফী ফতেহ আলী ওয়সী (র.)-এর নিকট সম্পূর্ণরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে একজন কামিল ওলী-আল্লাহ্ হন। কোনো কোনো সময় তিনি ইশা'আতে ইসলামের উদ্দেশ্যে ওয়ায-নসীহত করতেন। ১৩২১ সালের ২৮ শে ভাদ্র সোমবার বেলা ১২টার সময় তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর কবর তালতলা হাটের সন্নিকট বকুল গাছের নীচে বিদ্যমান।

হযরত হেকিম মুন্‌শী সাদাকাতুল্লাহ

হযরত হেকিম মুন্‌শী সাদাকাতুল্লাহ (র.) ফুরফুরায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুন্‌শী গনিমতুল্লাহ্‌র ভাই। ইনিও ফার্সী ভাষায় সুপন্ডিত ছিলেন। নিজ বৈঠকখানায় দেশ-বিদেশের ছাত্রবৃন্দকে ফার্সী ভাষায় রচিত খাকানী, উরফি, গোলেস্তা, বোস্তা প্রভৃতি গ্রন্থ শিক্ষা প্রদান করতেন। তিনি সূফী ফতেহ আলী ওয়সী (র.)-এর যোগ্যতম খলীফা ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি হেকিমী চিকিৎসায় প্রভূত সুখ্যাতি অর্জন করেন। প্রায় ১০৫ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। ফুরফুরায় মাদ্রাসা সংলগ্ন মসজিদের উত্তর পার্শে প্রাচীর বেষ্টিত গোরস্থানে বড় গাছের পাশে তাঁর কবর বিদ্যমান। হযরত পীর মাওলানা জুলফিকার আলী সিদ্দিকী (র.) (ছোট হুযূর) তাঁর নামে একটি হাফেজী মাদ্রাসা কায়েম করেছেন। হযরত মুন্‌শী গনিমতুল্লাহ ও হযরত মুন্‌শী সাদাকাতুল্লাহ দুই ভাই। ইনি ছোট হুযূরের নানাজান হতেন।

হযরত মাওলানা আবদুল কাদের

মাওলানা আবদুল কাদের ওরফে শাহ্ গোলাম কদের (র.) বাংলা ১২১৭ সালে ফুরফুরায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সূফী গোলাম কিরমানী (র.)।

ইনি একজন উচ্চশ্রেণীর 'আলিমে দীন ও ওলীয়ে কামিল ছিলেন। চট্টগ্রামের হযরত মাওলানা নূর মোহাম্মদ নিযামপুরী (র.)-এর কাছে মুরীদ হন এবং তাঁর খেদমতে থেকে 'ইল্‌মে মা'রিফতে কামালিয়াত হাসিল করেন।

---

৪৮১. মোঃ আতাউর রহমান কালামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫

সাইয়েদুল আবদাল সূফী আবদুল মোমেন (র.)-এর কাছে (আগে) মুরীদ হন এবং সূফী আবদুল মোমেনকে অনেকদিন পূর্বে সুদূর চট্টগ্রামের ইছাপুরে নিভৃত পল্লীতে বিখ্যাত বুযুর্গ শাহ্ আহমদুল্লাহ দরবেশ সাহেব যে কথা বলেছিলেন, তিনি দীর্ঘদিন পর তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, 'বাবা আবদুল মোমেন, দরবেশ সাহেবের কথা কি তোমার মনে নেই? আর বিলম্ব করো না, মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী ফুরফুরাবী সাহেবের খেদমতে হাযির হয়ে মুরীদ হও।' তিনি শিয়াদের প্রতিবাদে একখানি অকাট্য প্রমাণসহ গ্রন্থ লিখেছিলেন।

অবশেষে তিনি ফুরফুরা হতে শ্বশুরালয়ে 'ধসা' গ্রামে অবস্থান করত বাংলা ১৩১৩ সালের ২৯ শে কার্তিক বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১২ টায় ইন্তিকাল করেন। প্রকাশ থাকে যে, ধসা ফুরফুরার ৬ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। তাঁর ছেলে শাহ নূরুল আনোয়ার, নাতি শাহ্ নেয়ামতুল্লাহ এবং পর নাতি মাওলানা শাহ্ মাশরেকুল আনোয়ার সাহেব।[৪৮২]

হযরত শাহ মনির

হযরত শাহ্ মুমিন বান্দেখালাস ওরফে হযরত শাহ্ মনির (র.)। তাঁর পিতার নাম হযরত শাহ্ জামাল (র.)। হযরত শাহ্ মনির (র.) কিভাবে কোথা থেকে হুগলী জিলার অন্তর্গত দলপতিপুর কাঁনা দামোর নদীর তীরে এসেছিলেন, তাঁর সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। শোনা যায়, আনুমানিক ৪/৫ শত বছর পূর্বে কাঁনা দামোদরের তীরে তিনি অবস্থান করতেন। তখন কাঁনা দামোদর প্রবল খরস্রোতা নদী ছিলো এবং উক্ত এলাকা বিশাল বন-জঙ্গলে ঘেরা ছিলো।
মুজাদ্দিদে যামান (র.) এখানে ১৩৩৪ সালে ওয়ায মাহফিল ও ইসালে সওয়াব কায়িম করেন। প্রতি বছর ফাল্গুন মাসের ১৩/১৪/১৫ তারিখে তাঁর কবর সন্নিকটস্থ মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে ইসালে সওয়াব অনুষ্ঠিত হয়।

হযরত আনোয়ার শাহ হালব্বী

হযরত শাহ্ আনোয়ার কুলি হালব্বী (র.)-এর আসল নাম হযরত শাহ্ কবির (র.)। বালিয়া-বাসন্তী বিজয়ে অন্যান্যদের মধ্যে হযরত শাহ্ কবির (র.) ও হযরত শাহ্ কেরীমদ্দীন ওরফে হযরত মাওলানা একরামদ্দীন (র.) সাহেবও সামিল ছিলেন। তিনি সিদ্দিকী বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং হলব্ব (Aleppo-আলেপ্পো) থেকে বাঙ্গালায় আগমন করেন। তাঁর পক্ষ থেকে অনেক কারামত প্রকাশ পায়।

একবার এক নাপিত হযরতের কাছ কৃপা ভিক্ষা চান। হযরত নাপিতকে কিছুটা মাটির ঢেলা কুড়িয়ে আনতে বলেন। নাপিত গামছায় মুড়িয়ে কয়েকটি মাটির ঢেলা নিয়ে আসেন। হযরত উক্ত মাটির ঢেলায় 'দম' করে নাপিতকে দিয়ে বলেন, "যাও বাড়ী চলে যাও, খবরদার পথের কোথাও এগুলো খুলে দেখবে না।" হতভাগার খুঁতখুঁতে মন। পথিমধ্যে 'মাটির ঢেলা খামাখা বয়ে নিয়ে গিয়ে লাভ কি' মনে করে গামছার বাঁধ খুলে দেখেন ঢেলার অর্ধাংশ সোনায় পরিণত হয়ে গেছে, বাকী অর্ধাংশ এখনও মাটিই আছে। নাপিত অতিলোভে আরও অধিক পরিমাণ ঢেলা সংগ্রহ করে হযরতের দরবারে এসে কান্নাকাটি করলে হযরত বলেন, "বাবা তোমার কপাল মন্দ, আমার কথামত পথে না খুললে সবটাই আল্লাহ্‌র ফজলে সোনায় পরিণত হতো।"[৪৮৩]

হযরত শাহ্ কবির ওরফে হযরত শাহ্ আনোয়ার কুলি হালম্বী (র.) ১৩৭৫ খ্রীস্টব্দে ইন্তিকাল করেন। তাঁর কবর মোল্লা সিমলা গ্রামে বর্তমান আছে। উক্ত গ্রাম ফুরফুরা থেকে পূর্ব-উত্তর কোণে প্রায় ৯ মাইল দূরে অবস্থিত। হযরত হালব্বী (র.)-এর কবর সংলগ্ন পশ্চিমদিকে বিরাট এক গম্বুজ মসজিদ বিদ্যমান। এ মস্‌জিদের পূর্ব-উত্তরে অনতিদূরে একটি পুরান সুউচ্চ এক গম্বুজবিশিষ্ট মস্‌জিদ আছে। শোনা যায় যে, জনৈক সওদাগরের বানিজ্য তরী স্বরস্বতী নদীতে তুফানে আক্রান্ত হয়। তিনি আল্লাহ্‌পাকের মোহেরবানীতে উদ্ধার পেয়ে যান এবং ১৫৯২ খ্রীস্টাব্দে উক্ত মস্‌জিদ নির্মাণ করেন।

---

৪৮২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯
৪৮৩. আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান, প্রাগুক্ত,পৃ. ৮৪

হযরত শাহ পাহলোয়ান

ইনি হযরত শাহ্ কবির ওরফে আনোয়ার কুলি হালব্বী (র.)-এর খলীফা ও খাদেম ছিলেন। তাঁর কবর মোল্লা সিমলার অন্তর্গত পাহলোয়ানপুর গ্রামের ছায়াশীতল কুঞ্জবনে অবস্থিত। তিনি জালালী মেজাজের ওলী ছিলেন।

হযরত জাহাবুদ্দীন কলন্দরী

হযরত মাখদুম জাহাবুদ্দীন কলন্দরী (র.) সীতাপুরে অবস্থান করতেন। তিনি জালালী মেজাজের উচ্চ দরজার বুযুর্গ ছিলেন। সম্ভবত জনৈক কালন্দরী পীরের খলীফা ছিলেন। সে জন্য তিনি কালন্দরী হযরত নাতে খ্যাত। তাঁর কবর সীতাপুরের মাওলানা রফিক সাবের বংশধরদের বাড়ীর সীমায় অবস্থিত।[৪৮৪]

হযরত জেরকামুদ্দীন শাহ জালালী

হযরত জেরকামুদ্দীন শাহ্ জালালী (র.) অবিবাহিত মজজুব ছিলেন। কেউ তাঁকে হারাম খাদ্য ভক্ষণ করালে তিনি সেখানেই তৎক্ষণাত বমি করে দিতেন ও রেগে যেতেন। এক সময় তাঁর ভ্রাতুস্পুত্রের বিমারী হলে, তাঁর ভাবী সাহেবা ভাইকে খবর দিতে বলেন। তিনি রেগে গিয়ে ঘরের কামরা বন্ধ করে দিয়ে শুয়ে পড়েন। কিন্তু যথাসময়ে দেখা গেলো, তার ভাই সাহেব চাকরিস্থল থেকে বাড়ীতে এসে হাজির হয়ে গেছেন। কেমন করে তিনি খবর পেলেন জিজ্ঞাসা করায় তাঁর ভাই সাহেব বলেন, 'কেনো? জেরকান গিয়ে আমায় খবর দিয়ে এসেছে।' অথচ তখন পর্যন্ত তাঁর কামরার দরজা তেমনই বন্ধ ছিলো। তিনি অত্যন্ত জালালী মেজাজের ওলী ছিলেন। আকুনী গ্রামে শঙ্করা পুকুরের উত্তর-পশ্চিম কোণে তাঁর কবর। তাঁর কবর ঘিরে দিলে পরদিন তথায় ঘেরা আর পাওয়া যেতো না।[৪৮৫]

হযরত হাদী ওরফে শাহ ভীক

হযরত শাহ্ ভীক (র.) উচ্চ শ্রেণীর ওলী ছিলেন। তাঁর বহু কারামত শোনা যায়। সম্ভবত তিনি হোসেন বুখারী (র.)-এর সহচর হিসেবে ফুরফুরা বিজয়ে শামিল ছিলেন কিংবা সমসাময়িককালের বুযুর্গ ছিলেন। ফুরফুরার হযরত মুজাদ্দিদে জামান (র.) তাঁর কবর যিয়ারত করে বলেন, 'এ অঞ্চলের ওলীদের বাদশাহ।' তাঁর পাশে একজন স্ত্রীলোকের কবর আছে। কাজী মাওলানা নূর আলী (র.)-এর বাড়ীর পশ্চিমে পুকুরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে তাঁর কবর বিদ্যমান। হযরত শাহ্ আবদুল বাকী (র.) ও হযরত শাহ্ আবদুল বারী (র.) তাঁর বংশের উজ্জ্বল রত্ন।[৪৮৬]

হযরত শাহ মোল্লাহ মুহাম্মদ সাঈদ

হযরত শাহ মোল্লা মুহাম্মদ সাঈদ (র.) জবরদস্ত বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর অনেক কারামত শোনা যায়। এক সময় তাঁর ছেলের হাত থেকে কাক বিস্কুট নিয়ে যায়। তিনি ছেলের কান্নার ঘটনা জানতে পেরে বলেন, 'কাকের এত সাহস! আমার এলাকায় আর কাক আসতে পারবে না।' শোনা যায়, তাঁর জীবদ্দশায় কাক ঐ এলাকায় যেত না। সাদপুর পাকা রাস্তার পূর্বপাশে অতি পুরান এক গম্বুজ মস্‌জিদ। পাকা রাস্তার পশ্চিম দিকে চালতা তলায় দর্শনীয় বিরাট খেজুর গাছের নীচে হযরত মোল্লা মুহাম্মদ সাঈদ (র.)-এর কবর বিদ্যমান।[৪৮৭]

হযরত ত্বহা ওরফে মুহাম্মদ তাহের

হযরত খাজা শাহ্ ত্বহা (র.) মস্তবড় বুযুর্গ ও ওলী ছিলেন। তাঁর বুজুর্গীর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি খোন্দকার সাবরুল্লাহ (র.)-এর নেকটাত্মীয় ছিলেন। এলাকার ওলীদের তিনি ছিলেন নেতা। তাঁর কবর চক

৪৮৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫
৪৮৫. প্রাগুক্ত
৪৮৬. প্রাগুক্ত
৪৮৭. আতাউর রহমান কামালী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯

জিয়ারা মস্‌জিদের পূর্বপ্রাঙ্গণে মর্যাদার সাথে বিদ্যমান। তথায় পূর্বে গান-বাদ্য ও নানারূপ শরীয়তবিরোধী কার্যকলাপ হত। মুজাদ্দিদে যামান দাদা হুযূরের প্রচেষ্টায় সব বন্ধ হয়ে যায়।[৪৮৮]

শাহ সূফি মোহাম্মদ ইয়াকুব

হযরত সূফী মোহাম্মদ ইয়াকুব (র.) সিলেটের লোক। তিনি মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর মুরীদ ছিলেন। খোদাভীরু বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। কর্মজীবন তিনি চক জিয়ারা গ্রামে কাটান। ইশা'আতে ইসলামে রত অবস্থায় চক জিয়ারা গ্রামে ইন্তিকাল করেন। তাঁর কবর চক জিয়ারা মস্‌জিদের চাতানের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত।[৪৮৯]

৪৮৮. মুন্সী গোলাম হোসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১
৪৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

সপ্তম অধ্যায়
ফুরফুরা শরীফের স্বর্ণযুগ

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফুরফুরা শরীফের স্বর্ণ অধ্যায় সুচিত করেন মুজাদ্দিদে জামান (র.)। ফুরফুরা শরীফের নামের সার্থক রূপায়ণে তিনি সর্বাধিক অবদান রেখেছেন। বঙ্গ-ভারত তথা বিশ্বে ঐতিহাসিক ফুরফুরা শরীফের সুনাম, সুযশ মুখ্যত তাঁর অনলস খিদমতের ফল। ফুরফুরা শরীফের পরিচয়ে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

ফুরফুরা শরীফের 'পীর সাহেব' নামে সমধিক পরিচিত মুজাদ্দিদে যামান, দাওরান, আফতাবে শরীয়ত, মাহতাবে তরিকত, ইমামুলহুদা, শমসুল আরিফীন, আমিরুশ শরীয়ত, 'আল্লামা শাহ্-সূফী পীর আবদুল্লাহিল মা'রুফ মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী আল কোরায়শী (র.) দীনি শিক্ষা প্রচার ও প্রসারকল্পে নিজ তত্ত্বাবধানে ফুরফুরা শরীফে স্বীয় পীর ও মোর্শেদ, কুতুবুল ইরশাদ, গওসে সামদানী, মাহবুবে সোবহানী বিশ্ববরেণ্য ফার্সী কবি, রাসূল-নোমাপীর, হযরত শাহ্ সূফী ফতেহ্ আলী ওয়সী (র.)–এর নামানুসারে "মাদ্রাসায়ে ফতেহিয়া ফুরফুরা শরীফ" নামে দীনি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। পরবর্তী পর্যায়ে উক্ত প্রতিষ্ঠান পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়ে পরিশোভিত হয়। যথা ঃ

১. ফুরফুরা ফাতেহিয়া খারিজী (আবাসিক) মাদ্রাসা,
২. ফুরফুরা ফাতেহিয়া সিনিয়র (টাইটেল) মাদ্রাসা,
৩. ফুরফুরা হাই মাদ্রাসা,
৪. ফুরফুরা হাফিযিয়া মাদ্রাসা,
৫. ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিদ্দীকা গার্লস্ মাদ্রাসা।[৪৯০]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তখনকার দীনি শিক্ষা কেন্দ্রগুলি অধিকাংশ পরিচালিত হতো 'লাখেরাজ' সম্পত্তির আয় থেকে। কিন্তু ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে পলাশীর আম্রকাননে নবাব সিরাজ উদ্দৌলার ভাগ্য বিপর্যয়ের সাথে সাথে মুসলিমদের ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের কালোমেঘ দিন দিন ঘনায়মান হতে থাকে। সেদিনের বিপর্যয়ের করুন ও বেদনাদায়ক ইতিহাসের একটু পরিচয় জানতে পারলে, পরবর্তীকালে মুজাদ্দিদে যামান (র.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার অসীম গুরুত্ব অনুধাবন সহজ হবে। তাই আমি সংক্ষেপে একটু অতীতের ইতিহাস মন্থন করছি।

১৭৯৩ সালে কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুসলিম জমিদার সম্ভ্রান্ত মুসলিমগণ পরিণত হলো কৃষি-মজুরে। জনগণ জমির মালিকানা স্বত্ব হারালো, পুকুর কাটা, দালান তৈরী, গাছকাটা, (বৃক্ষ রোপন করতে পারবে, ছেদন করতে পারবে না) প্রভৃতির অধিকার থেকে হলো তারা একেবারেই বঞ্চিত। তথাকথিত ধুরন্ধর তহসিলদারদের হাতসাফাইতে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর বিশেষ অনুগ্রহে কতিপয় অমুসলিম 'জমিদার' বনে গেলেন।

এরপর ১৮২৮ খৃস্টাব্দে Law of Resumption এলো–পূর্ণ দখল আইন। এ আইন বলে উলামা-মাশায়েখ, ওলী-দরবেশগণের লাখেরাজ সম্পত্তিগুলো তলপীবাহক জমিদারের কুক্ষিগত করে দিলো ইংরেজ কোম্পানী। মুসলমানদের দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং রুহানী ইল্ম শিক্ষার খানকাহসমূহ পরিচালিত হতো উক্ত লা-খেরাজ সম্পত্তির আয় থেকে। 'পূর্ণ দখল আইন'- এর ফলে সব বন্ধ হয়ে গেলো।[৪৯১]

তবুও ইংরেজদের চক্রান্ত শেষ হলো না, বরং শুরু হলো নতুন চক্রান্ত। মিঃ উইলিয়াম হান্টার ১৮৭১ খৃস্টাব্দে The Indian Musalman's গ্রন্থে লিখেছেন– "ভারত সরকারের দেশরক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ বেইলি বলেছেন– আমরা যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করেছি, আমাদের বিবেচনায় যতো ভালো হোক না কেনো, মুসলিম সমাজ সাবধানে দূরে অবস্থান করছে। এতে আশ্চর্য হওয়ার হেতু নেই, কারণ এ শিক্ষাব্যবস্থা মুসলিমদের শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং মানসিকতার সম্পূর্ণ বিপরীত। এ শিক্ষা দ্বারা তাদের নীতি নৈতিকতা ও ধর্মীয় ভাবের মান রক্ষা হতে পারে না।"[৪৯২]

---

৪৯০ . মোঃ মোবারাক আলী রহমানী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯
৪৯১. W.W. Hunter. Indian Musalman's. হাক্বীকতে ইন্সানিয়াত, পৃ. ৪৯-৫০ , উদ্ধৃত: মোঃ মোবারক আলী রহমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
৪৯২ . প্রাগুক্ত

W.W.Hunter অন্যত্র লিখেছেন–রাতারাতি মুসলিমদের 'কড়ার কাঙ্গাল বানিয়ে দিয়েছে। মুসলিম সম্রাটদের রাষ্ট্রভাষা ছিলো ফারসী। ১৮৩৬ খৃস্টাব্দে সে পথ হলো রুদ্ধ। ফলে মুসলিমগণ চাকুরি ক্ষেত্রে কার্যত হলো বঞ্চিত। বাংলাদেশে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা চালু হলো। সে শিক্ষার মাপকাঠি কেমন ছিলো, উইলিয়াম হান্টারের ভাষায়– a system exclusively adapted to the Hindu. অর্থাৎ এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা যা কেবলমাত্র হিন্দুদের জন্যই উপযুক্ত ছিলো। মুসলিমরা চাকুরি থেকে বঞ্চিত হতো। তারও প্রমাণ সরকারী গেজেটে প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন।

মুহতারাম দিওয়ান মুহাম্মদ ইবরাহীম হোসেন তর্কবাগিশ 'হাক্বীকাতে ইনসানিয়ত' পুস্তকে সে সময়ে বাংলায় শিক্ষিতের হার সম্বন্ধে সুন্দর একটি পরিসংখ্যান দিয়েছেন।
বাংলার মোট জনসংখ্যা- ৪,৬৫,৪৪৮৭০ জন, তার মধ্যে ৪৪,৮৭০ জন খৃস্টান ২,১০,০০০০০ জন হিন্দু, ২,৫৫,০০০০০ জন মুসলিম। শিক্ষার হার ১৯২৬-২৭ সালের রিপোর্টে জানা যায় যে, নিম্ন প্রাইমারীতে হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা শতকরা ৪৩ জন আর মুসলিম ৫৭ জন। উচ্চ প্রাইমারীতে হিন্দু শতকরা ৬১ জন আর মুসলিম ৩৯ জন। মধ্যশিক্ষায় হিন্দু শতকরা ৮০ জন আর মুসলিম ২০ জন। হাইস্কুলে হিন্দু শতকরা ৮৫ জন আর মুসলিম প্রায় ১৫ জন। আর্ট কলেজে হিন্দু শতকরা ৮৬ জন আর মুসলিম ১৪ জন। টেকনিক্যাল কলেজে হিন্দু শতকরা ৭৮ জন আর মুসলিম ২২ জন। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে হিন্দু শতকরা ৮৫ জন মুসলিম ১০ জন, অন্যান্য জাতি ২ জন। হিন্দু ও মুসলিমদের মিলিত শিক্ষার হার ছিলো, বাংলাদেশে পুরুষ শতকরা ৯ জন ; আর স্ত্রী পৌনে দুইজন।[৪৯৩]

এহেন যুগসন্ধিক্ষণে, মুজাদ্দিদে জামান (র.) মুসলিমদের শোচনীয় অধঃপতনের কালে স্বকীয় সহযোগিতায় ও আদেশে বাংলা–আসামে অনুমান দ্বিসহস্রাধিক মাদ্রাসা-মস্‌জিদ স্থাপন করেন। আজও বিভাগ পূর্বকালীন বাংলা ও আসামের অগণিত মাদ্রাসা তাঁর শিক্ষানুরাগের মহিমা ঘোষণা করছে।

ফুরফুরা ফাতেহিয়া খারেজী মাদ্রাসা

মুজাদ্দিদে যামান (র.) আদর্শ ও উন্নতমনা চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্যে ১৮৯৮ খৃস্টাব্দে 'মাদ্রাসায়ে ফতেহিয়া ফুরফুরা শরীফ' নামে একটি আবাসিক মাদ্রাসা স্থাপন করেন। এটাই সর্বপ্রথম আবাসিক বেসরকারী (খারিজী) মাদ্রাসা। ১৯০২ সাল থেকে উক্ত মাদ্রাসার পঠন পদ্ধতি 'আলীয়া' নিসাবে যথারীতি শুরু করেন। এ মাদ্রাসা পরবর্তীকালে ফুরফুরা ফাতেহিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা নামকরণ হয়। বস্তুত স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জীবিত খারিজী মাদ্রাসার নেসাব পরিবর্তন ব্যতীত সব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিলো, কেবল বেসরকারী খারিজী মাদ্রাসার অবলুপ্তি ঘটে।

মুজাদ্দিদে যামান (র.)- এর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বর্তমানে ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেবগণ ও পীরজাদাগণের প্রচেষ্টায় 'ফুরফুরা ফাতেহিয়া আবাসিক মাদ্রাসা' পুনঃস্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত মাদ্রাসা খুব সমারোহে চলছে। ফলে বহু গরীব ও বয়স্ক ছাত্র তা'লীমের সুযোগে 'আলিমে বা'আমল হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। ফুরফুরা ফতেহিয়া খারিজী মাদ্রাসা সুনাম ও সুযশের সাঙ্গে সমারোহে চলছে। দায়েরা শরীফে মাদ্রাসার কাজ চললেও নিজস্ব বিল্ডিংয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মাদ্রাসার ছাত্রদের শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-আচরণ, আদর্শ-উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সমাজের সজাগ দৃষ্টি পড়ার ফলে মাদ্রাসার দ্রুত উন্নতি সম্ভব বলে আশা করা যায়। 'ফুরফুরা ফাতেহিয়া খারেজী মাদ্রাসা' বে-সরকারী আবাসিক মাদ্রাসা দানশীল ব্যক্তিদের সহযোগিতায় ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে।[৪৯৪]

ফুরফুরা ফাতেহিয়া সিনিয়র টাইটেল মাদ্রাসা

মুজাদ্দিদে যামান (র.) স্বীয় পীর ও মুর্শিদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত 'মাদ্রাসায়ে ফতেহিয়া ফুরফুরা শরীফ' নামক প্রতিষ্ঠানটি ১৯০২ সালে আলীয়া নিসাব পর্যায়ভূক্ত করে 'ফুরফুরা ফাতেহিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা' নামকরণ

৪৯৩ . শরীয়তে ইসলাম : ৪র্থ বর্ষ-১০ সংখ্যা, পৃ. ২৩৯–২৪০
৪৯৪ . মোঃ মোবারক আলী রহমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

করেন। উক্ত মাদ্রাসা সিনিয়র পর্যায়ে উন্নীত হলে ১৯০৮ খৃস্টাব্দে ইংরেজ সরকার মাসিক দুইশত টাকা সাহায্য মনজুর করেন। পল্লীবাংলায় সম্ভবত প্রথম সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত মাদ্রাসা এটি। তিনি নিজ ব্যয়ে ৩৮ হাত দীর্ঘ মাদ্রাসাগৃহ নির্মাণ করে দেন। উক্ত মাদ্রাসা হতে বঙ্গ-ভারতে হাজার হাজার ছাত্র ইলমে দীন হাসিল করেছেন। ফুরফুরা মাদ্রাসা থেকে সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের (মাওলানাদের) মুজাদ্দিদে জামান (র.) ঈসালে সওয়াবের মজলিশে (২১/২২/২৩ শে ফাল্গুন) স্বহস্তে পাগড়ী বেঁধে দিতেন এবং প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রদের ‘ফখরুল মুহাদ্দিসীন’ এবং দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রদের ‘কামরুল মুহাদ্দিসীন’ খিতাবে ভূষিত করতেন। বাংলা-আসাম তথা বহির বঙ্গের হাজার হাজার কর্তব্যরত ‘আলিমেদীন এই মাদ্রাসার ছাত্র।[৪৯৫] মুজাদ্দিদে জামান (র.)-এর ইন্তিকালে ‘হাদীসে দাওরা’ ক্লাস অবলুপ্তি ঘটে।

অতঃপর বড় হুজুর পীর কেবলার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও অন্যান্য পীর কিবলাগণের পরামর্শে ‘আল্লামা মুফতী শাহ্ সূফী আবূ জাফর সিদ্দিকীর তত্ত্বাবধানে ‘বিশেষ ফান্ড’ (তহবিল) খুলে নিজেদের ব্যবস্থাপনায় (বে-সরকারী) ‘টাইটেল’ (এম.এম) ক্লাস চালু করা হয়। ৬/৭ বছর বে-সরকারীভাবে দায়িত্ব পালন করার পর সরকারী মঞ্জুরী প্রাপ্ত হয়। অদ্যাবধি ‘ফুরফুরা ফতেহিয়া সিনিয়র (টাইটেল) মাদ্রাসা ’ অত্যন্ত সুনামের সাথে চলছে। বর্তমান বাংলা-আসামের হাজার হাজার ‘আলিম এই মাদ্রাসা থেকে ডিগ্রীপ্রাপ্ত।

ফুরফুরা হাই মাদ্রাসা (নিউস্কীম)

মুজাদ্দিদে যামান (র.) ওল্ডস্কীম সিনিয়র মাদ্রাসার সাথে ১৯১৫ খৃস্টাব্দে নিউস্কীম জুনিয়র মাদ্রাসা স্থাপন করেন। তাঁর ইরাদা ছিলো মুসলিম ছেলেরা প্রাথমিক পর্যায়ে দীনি শিক্ষার সাথে সাথে দুনিয়াবী ইল্‌ম হাসিল করে কলেজে উচ্চ ডিগ্রী নিয়ে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি হোক, যদ্দারা সমাজ উপকৃত হবে।

তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী খাজা নিজামুদ্দীন, ইন্সপেক্টর মৌলভী ইবরাহীম, ডাইরেক্টর খানবাহাদুর মৌলভী আহসানুল্লাহ, স্কুল ইন্সপেক্টর রায়বাহাদুর কে.সি.রায়, ইন্সপেক্টর মৌলভী মাজেদ বখ্‌শ, ডাইরেক্টর টেলার, সহকারী ডাইরেক্টর মৌলভী মাওলা বখ্‌শ প্রমুখ ব্যক্তির চেষ্টায় ইংরেজি ১৯২৬ সালে জুনিয়র মাদ্রাসা, ‘ফুরফুরা হাই মাদ্রাসায়’ উন্নীত হয় এবং মাসিক একশত পঞ্চাশ টাকা মঞ্জুর হয়।

মুজাদ্দিদে যামান (র.) গৃহ নির্মাণ বাবত সরকার থেকে পাঁচ হাজার টাকা সাহায্য পেয়ে নিজ থেকে আরও ছয় হাজার টাকা দানে একশত পঞ্চাত হাত দীর্ঘ সুবৃহৎ পাকা ইমারতের ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৯৩৫ সালে উক্ত গৃহ নির্মাণ সমাপ্ত হয়। বস্তুত এ দু'টি মাদ্রাসা মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর চোখের মণি ছিলো। তাঁর ইন্তেকালের পর উক্ত মাদ্রাসায় প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী যথাক্রমে খানবাহাদুর কাজী মাহমুদুর রহমান এবং মুফতী ‘আল্লামা অবূ জাফর সিদ্দিকী দায়িত্ব ও কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে সম্পাদন করে চলেন।[৪৯৬] বর্তমানে ফুরফুরা হাই মাদ্রাসা দিন দিন উন্নতি লাভ করছে ও সুনামের সাথে অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলছে।

মুজাদ্দিদে যামান (র.) মাদ্রাসার ভবিষ্যৎ সংরক্ষণ ব্যবস্থার চিন্তায় অকপটে তৎকালীন প্রায় আটশ হাজার টাকার আয়ের সম্পত্তি লিল্লাহ্ ওয়াকফ্ সম্পত্তির মুতাওয়াল্লী শায়খুল মাশায়েখ, আবূ নসর মোহাম্মদ অবদুল হাই সিদ্দিকী বড় হুজুর অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে মাদ্রাসার উন্নতি বিধান করেন এবং লক্ষাধিক টাকার বাজেট বরাদ্দ করে মদ্রাসার সুদৃশ্য বৃহৎ গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। বর্তমানে সুরম্য মাদ্রাসা গৃহ ফুরফুরা শরীফের অন্যতম দর্শনীয় বস্তু। মুজাদ্দিদে যামান (র.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা আজ বড় হুজুর, মেজ হুজুর, ন'হুজুর, ছোট হুজুরগণের আপ্রাণ চেষ্টায় পল্লী বাংলায় সর্বপ্রথম ‘টাইটেল মাদ্রাসা’, সরকারী মঞ্জুরীপ্রাপ্ত, আদর্শ ও উচ্চশ্রেণীর মাদ্রাসারূপে সর্বজনবিদিত।

কুতুবখানা

---

৪৯৫ . তখন ফাযিল (জমাতে ‘উলা) পর্যন্ত সরকারী অনুমোদন ছিলো। মুজাদ্দিদে যামান (র.) নিজ দায়িত্বে বেসরকারীভাবে হাদীসের দাওরা (দু-বছরের কোর্স) খুলেন। তখন বাংলা-আসামের মধ্যে ফুরফুরা শরীফের মাদ্রাসা শীর্ষস্থান দখল করে। প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

৪৯৬ . গোলাম আহমদ মোর্তাজা, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৩

মুজাদ্দিদে জামান (র.)-এর সার্থক প্রয়াস কুতুবখানা বা মাদ্রাসা লাইব্রেরী। তৎকালীন দশ হাজার টাকা ব্যয়ে লাইব্রেরী গৃহে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা মূল্যের দুষ্প্রাপ্য তাফসীর, হাদীস, ফিক্‌হ, ইতিহাস (তারীখ), মান্তিক, হিকমত, ফালসাফা, আসমাউর রিজাল, অভিধান এবং ওলী-আল্লাহ্‌গণের জীবনী পুস্তক সযত্নে মওযুদ আছে। বর্তমানে মাদ্রাসা লাইব্রেরীতে বা কুতুবখানায় সংগৃত কিতাবের আনুমানিক মূল্য পঞ্চাশ হাজার টাকার অধিক। মুদাররিস, ছাত্র এবং বিদগ্ধজনদের পক্ষে মাদ্রাসা লাইব্রেরী অকৃতিম সহায়ক।[৪৯৭]

ছাত্রাবাস

সমাজ-দরদী, মানব-দরদী, দীন-দরদী মুজাদ্দিদে যামান (র.) মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে দেশ-বিদেশের গরীব মেধাবী ছাত্রদের জন্য লিল্লাহ্ বডিং-এর ব্যবস্থা করেন। প্রথমতঃ ফুরফুরা শরীফ ও মোজাফতে ফুরফুরার মহানুভব শিক্ষানুরাগী দানশীল ব্যক্তিগণ দূরাগত ছাত্রদের 'জায়গীর' (লজিং) দিতেন, বর্তমানেও সে ব্যবস্থা বিদ্যমান।

চিন্তাশীল নায়ক, গভীর দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করে জায়গীরদাতাদের প্রতি চাপ কমানোর উদ্দেশ্যে চুয়াল্লিশ হাত দীর্ঘ ছাত্রাবাস বা বর্ডিং নির্মাণ করেন। গরীব মেধাবী দূরাগত ছাত্ররা ফ্রি, হাফ ফ্রি এবং অন্যান্য ছাত্রদের নামমাত্র খোরাকীতে আহার ও বাসস্থানের সুব্যবস্থা বিদ্যমান। আসাম ও পল্লী বাংলার গরীব মধ্যবিত্ত ঘরের ছাত্রদের জন্য ফুরফুরা মাদ্রাসার বর্ডিং বা ছাত্রাবাস অশীর্বাদস্বরূপ।[৪৯৮]

দায়েরা শরীফ

মুজাদ্দিদে যামান (র.) যাহিরী তা'লীমের সাথে সাথেই ইল্‌মে বাতিনী তা'লীমের সুব্যবস্থা করেন। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের খনি মুজাদ্দিদে যামান, কুতুবুল 'আলম (র.) সালেকগণের জন্য বাংলা ১৩২৮ সালে ফুরফুরা শরীফে 'দায়েরা শরীফ' (আধ্যাত্মিক শিক্ষাকেন্দ্র)-এর বিল্ডিং নির্মাণ করেন। আধ্যাত্মিকের মুকুটমণী; মুজাদ্দিদে জামান (র.) এ দায়রা শরীফে বঙ্গ-আসাম, আরব, পারস্য, তুরস্ক, কাবুল, কান্দাহার, চিশতিয়া, নকশবন্দীয়া, মুজাদ্দিদীয়া, মুহাম্মদীয়া প্রভৃতি তরীকার তা'লীম দিতেন।

আল্লাহ্ পাকের নিগুঢ়তত্ত্ব শিক্ষা ও দীক্ষা কেন্দ্রের (বিশ্ববিদ্যালয়ের) অধিকর্তা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স.) আল্লাহ্ পাকের মনোনীত চ্যান্সলর। উক্ত আধ্যাত্মিক বিশ্ববিদ্যালয়ে তরীকতের পীরানে পীরগণ কর্তৃক প্রণীত সিলেবাস মুতাবিক তা'লীম (শিক্ষা-দীক্ষা) তরবিয়তের দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে সম্পন্ন করতেন দায়েরা শরীফের প্রিন্সিপাল (মহাধ্যক্ষ)কুতুবুল 'আলম সুলতানুল আওলিয়া মুজাদ্দিদে জামান হযরত মাওলানা শহ্ সূফী পীর 'আল্লামা আবূবকর সিদ্দিকী আল-কোরায়শী রহমাতুল্লাহি 'আলায়হি। মুজাদ্দিদে জামান বলতেন-"আমার ছেলেগণ যেমন আমার 'নোতফার' ছেলে, তেমনি মুরিদগণও আমার রূহের ছেলে।"[৪৯৯]

দায়েরা শরীফে তা'লীমপ্রাপ্ত (খিলাফতপ্রাপ্ত) খলীফাগণ দেশে-বিদেশে সর্বজনবিদিত। মাওলানা সূফী 'আবদুল মা'বুদ মেদেনীপুরী (র.), সূফী তাজাম্মুল হোসেন সিদ্দিকী (র.), মাওলানা নিসারুদ্দীন আহমদ (র.) শর্ষীণা, বরিশাল; 'আল্লামা রুহুল আমীন (র.) বসিরহাট, ২৪ পরগনা; সূফী সদরুদ্দীন আহমদ (র.) যশোর; পীর হাতেম (র.) শ্রীনদী, কুমিল্লা; প্রফেসর 'আবদুল খালেক (র.), প্রফেসর ড.শহীদুল্লাহ্ (র.), সূফী 'আবদুল মো'মেন (র.) প্রমুখ হাজারো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহাপ্রাণ ও যশস্বী ব্যক্তি ফুরফুরা 'দায়েরা শরীফের' সোনার ফসল। তাঁদের দীনি খেদমতে সারাজাহান আন্দোলিত।

হাকীকতের নযরে যাহিরী শিক্ষাগারের পর্যায়ে বাতিনী শিক্ষাগার 'দায়েরা শরীফের' মর্যাদা ও গুরুত্ব অপরিসীম। ফুরফুরা শরীফের আত্মমর্যাদা, স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে মুসলিম জাহানে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। সে ক্ষেত্রে দায়েরা শরীফের মর্যাদা যে সর্বোচ্চ-এ কথা বলার অবকাশ রাখে না।

৪৯৭ . প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫
৪৯৮ . প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮
৪৯৯ . মৌলভী অবদুস সাত্তার, পীর সাহেবের জীবন চরিত (ঢাকা: কুরআন মহল, ১৯৭০ খ্রী,), পৃ. ১৫৭

মাদ্রাসার ছাত্ররা জাহিরী ইল্‌ম শিক্ষা শেষে 'ইল্‌মে তাসাউফ শিক্ষা ও দীক্ষা নিয়ে উভয় 'ইল্‌মে মুকাম্মাল হয়ে হাক্কানী রব্বানীর দরজা হাসিল করার সুযোগ পায়। দূরাগত সালেকগণের হুযূর কিবলার দরবারে লিল্লাহ্‌ থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা অদ্যাবধি বিদ্যমান। ফলে আসহাবে সুফফাদের ন্যায় একদল সূফী-দরবেশ সব সময় তাঁর দরবারে বিদ্যমান থাকতেন। ফুরফুরা শরীফের দরবারে মেহমান, মুসাফিরের সংখ্যাও যথেষ্ঠ।

দারুল ইফ্‌তা

শরীয়তের মাস'আলা-মাসায়েল নিয়ে সমাজে নানারকম সমস্যার সৃষ্টি যে হয় না, এ কথা অস্বীকার করা হবে সত্যের অপলাপ। কতিপয় 'আলিমের বিভ্রান্তিকর ফাতওয়ায় সমাজ জীবনে অনর্থের সৃষ্টি হয়। মুজাদ্দিদে যামান (র.) মাস'আলা-মাসায়েলের সঠিক ফায়সালার জন্য ফখরুল মুহাদ্দিসীন আবূ জা'ফর অজিহুদ্দীন সিদ্দিকী (মাদ্দাযিল্লাহুল 'আলী)-কে 'মুফতী' খিতাবে ভূষিত করেন। মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর আদেশে 'আল্লামা রুহুল আমীন (র.) মাসিক সুন্নাতুল জামা'য়াত, শরীয়ত ইসলাম, হানাফী, মোসলেম, হেদায়েত প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় মানুষের জিজ্ঞাসিত হাজার হাজার প্রশ্নের জবাব দিতেন এবং হানাফী ফিক্‌হতত্ত্ব, ফতওয়ায়ে আমিনিয়া, জরুরী মাসায়েল, অতি জরুরী মাসায়েল প্রভৃতি বহু কিতাব প্রণয়ন করে সমাজে প্রচার করেন। তারপর মেজ হুযূরের তত্ত্বাবধানে 'দারুল ইফ্‌তা' প্রতিষ্ঠা করা হয়। যে কোন জটিল ফাতওয়া-ফারায়েজের সঠিক ফায়সালা 'দারুল ইফ্‌তা থেকে দেওয়া হয়। প্রকাশ থাকে যে, সাধারণত এজন্যে কোন ফিস গ্রহণ করা হয় না। মেজ হুযূর ও অন্যান্য খোলাফা কর্তৃক মাস'আলা-মাসায়েলের অনেক কিতাব সমাজে প্রকাশিত হয়।[৫০০]

কুর'আনিয়া হাফিযিয়া মাদ্রাসা

কুর'আনিয়া হাফিযিয়া মাদ্রাসা ফুরফুরা শরীফের আয়মাদারদের পুরাতন দীনি ঐতিহ্য। মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর আদেশে 'খাতন' গ্রামে সূফী আবদুল লতিফ ('বড় হাফিয' সাহেব) (র.) নিজ তত্ত্বাবধানে বাড়িতে বাংলা ১৩২১ সালে "দারুল কুর'আন মাদ্রাসা সিদ্দিকীয়া" নামে হাফেজী মাদ্রাসা কায়েম করেন। এতদঞ্চলে এটাই প্রথম হাফিযী মাদ্রাসা। উক্ত মাদ্রাসা থেকে প্রায় দ্বিসহস্রাধিক ছাত্র মুকাম্মাল হাফিযে কুর'আন হয়ে গেছেন। বর্তমানে মাদ্রাসার নিজস্ব বিল্ডিং তৈরি হয়েছে। এ মাদ্রাসার সুনাম বহির্বঙ্গে ছড়িয়ে আছে। তাঁর যুগ্যতম সন্তানগণ সুষ্ঠুভাবে মাদ্রাসাটি বর্তমানে পরিচালনা করছেন।

ইদানিং শাহ্‌ সূফী জুলফিকার আলী সিদ্দিকী (ছোট হুযূর (র.))-এর বাড়িতে একটি হাফিজী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ছাড়াও মোল্লাপাড়া, মিয়াপাড়া, মীরপাড়ার বিভিন্ন মহল্লায় অনেক কুর'আনিয়া মক্তব বিদ্যমান। ফুরফুরা শরীফ অতি প্রাচীন স্থান। এখনও গ্রাম প্রদক্ষিণ করলে অসংখ্য বিরান বাড়ির ভগ্নাবশেষ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। ফুরফুরা শরীফের মিয়া সাহেব মহল্লার 'মাদানী মস্‌জিদ' ও মোল্লাপাড়ার 'মেটে মস্‌জিদ' অতি প্রাচীন।

গার্লস মাদ্রাসা

ফুরফুরা শরীফের অনতিদূরে 'চকতাজপুর' গ্রামে 'খাতনে'র বিখ্যাত দানশীল প্রখ্যাত ব্যবসায়ী এল. মল্লিকের বদান্যতায় একক প্রচেষ্টায় নিজস্ব জমির উপর কয়েকটি বিল্ডিং নির্মাণ করেন। তার এক অংশে জুনিয়র মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে উক্ত মাদ্রাসা সরকারী মঞ্জুরী প্রাপ্ত হয়। পড়েথাকা অতিরিক্ত বিল্ডিং-এ একসময় সরকারী শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র করার জনশ্রুতি পাওয়া যায়। জনাব মল্লিক সাহেব বড় হুযূর পীর কিবলাকে সবিশেষ জ্ঞাত করালে তিনি তথায় গার্লস মাদ্রাসা করার সংকল্প করেন। মল্লিক সাহেবান সর্বোতঃভাবে সহযোগিতা করে পীর ভক্তির চরম পরাকাষ্ঠা দেখান। বড় হুযূরের বহু দিনের মনের বাসনার সার্থক রূপায়ণে তথায় "ওয়েস্ট বেঙ্গল সিদ্দীকা গার্লস মাদ্রাসা" কায়েম করেন। তারপর ১৯৬৭ খৃস্টাব্দে উক্ত মাদ্রাসা সরকারী স্বীকৃতি পায়।

নারী শিক্ষার প্রতি অপরিসীম গুরুত্ব অনুধাবন করে তিনি পর্দা-পুশিদার সাথে মেয়েদের সুশিক্ষিতা ও আদর্শ গৃহিণীরূপে গড়ে তোলার প্রয়াসে উক্ত মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত প্রমিষ্ঠান পল্লীবাংলার অগ্রপথিক গার্লস

৫০০. মোঃ মোবারক আলী রহমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

মাদ্রাসার দাবি রাখে। তাঁর অবর্তমানে তাঁর সাহেবজাদা মাওলানা আবূ ইবরাহীম সিদ্দিকী সাহেব ও অপরাপর হুযূরদের সজাগ দৃষ্টির ফলে মাদ্রাসাটি পুরোদমে চালু রয়েছে। এখানে দূরাগত মেয়েদের বাকায়দা থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ রেখেছেন। পল্লীবাংলার মেয়েরা সহজে অল্প খরচে এখানে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পচ্ছেন।

মাদানী মস্‌জিদ

কুতুবুল আকতাব হযরত মাওলানা হাজী মোস্তফা মাদানী (র.) ১০৭০ হিজরীতে মিয়া সাহেব মহল্লায় উক্ত মস্‌জিদ নির্মাণ করেন। মুজাদ্দিদে যামান (র.) উক্ত মস্‌জিদ অতি যত্নের সাথে হিফাযতে রাখেন। পরবর্তীকালে কেবলমাত্র খড়ের ছাউনির পরিবর্তে টালির ছাউনি দিয়ে হিফাযত করা হয়। ইদানিং উক্ত মূল মস্‌জিদ অবিকৃত অবস্থায় রেখে মস্‌জিদের 'চাতান' কংক্রিট ছাদ দিয়ে অপূর্ব করা হয়েছে। হযরত মোস্তফা মাদানী (র.) কর্তৃক নির্মিত বিধায় উক্ত মিয়া সাহেব মহল্লার মস্‌জিদকে 'মাদানী মস্‌জিদ' বলা হয়।

ফুরফুরা শরীফের বিভিন্ন মহল্লায় আরও আটটি মস্‌জিদ বিদ্যমান। নমাযের ওয়াক্তে বিশেষ করে মাগরিব ও ফজরের সময়ে আযানের সুর-লহরী একের পর এক কানে ভেসে আসে, আযান যেন শেষ হতে চায় না। সুব্‌হে সাদিকের সময় মস্‌জিদে মস্‌জিদে লাগাতার আযানের প্রাণ মাতানো মিষ্টি আওয়াজে ঘুমন্ত মানুষের সহজে ঘুম ভেঙ্গে যায়। অপূর্ব ভাবাবেগে নামাযী মানুষকে দিওয়ানা করে দেয়।

অধুনা ফুরফুরা শরীফের অধিবাসীদের জীবন-যত্রা, শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা-সকংস্কৃতি, কৃষ্টি-কালচার যথেষ্ট উন্নতমানের, পল্লীবাংলায় এর সঙ্গে তুলনীয় নমুনা পাওয়া যায় না। শিক্ষা-সভ্যতায় অনন্য নযীর সৃষ্টিকারী ফুরফুরা শরীফকে 'গ্রাম' বললে সত্যের অপলাপ হবে। বস্তুত স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জীবিত ফুরফুরা শরীফ 'শহর-গঞ্জের স্থান করে নিয়েছে।[৫০১]

মেটে মস্‌জিদ

ফুরফুরা শরীফের দক্ষিণ প্রান্তে মোল্লাপাড়ায় অবস্থিত মাটির মস্‌জিদ, ফুরফুরা শরীফের আদি মস্‌জিদ। কথিত আছে যে, অমুসলিম রাজার সময়ে বালিয়া-বাসন্তিতে মাত্র ২/১ ঘর মুসলিমের বসত ছিলো। তাদের মধ্যে একজন আল্লাহ্ ওয়ালা নিষ্ঠাবান ব্যক্তির একটি 'হুজরাখানা' ছিলো। সেই হুযরা স্থানেই পরবর্তীতে মস্‌জিদ নির্মাণ করা হয়। ফুরফুরা শরীফে মুসলিম বসতি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আদি মস্‌জিদ তৈরির কথা বিবেচনা করে অনেকেই ধারণা করেন উক্ত মস্‌জিদের বয়স প্রায় সাত শত বছর।[৫০২]

স্বাস্থ্য কেন্দ্র

যেখানে দূরাগত শত শত ছাত্র অধ্যয়নরত এবং হাজার হাজার গ্রাম্য মানুষের বসবাস, সেখানে স্বস্থ্যকেন্দ্রের প্রয়োজন অপরিসীম। মুজাদ্দিদে যামান (র.) মাদ্রাসার সন্নিকটে 'দাতব্য চিকিৎসালয়' স্থাপন করেন। এতদাঞ্চলের রোগাক্রান্ত মানুষদের 'দাতব্য চিকিৎসালয়' একমাত্র সহায়ক ছিলো।

পরবর্তী পর্যায়ে বড় হুযূরসহ অন্যান্য হুযূরদের সহযোগিতায় চল্লিশ হাজার টাকা দানে এবং সরকারী অনুকম্পায় ইংরেজী ১৯৪৯ সালে 'মাওলানা আবূবকর মেমোরিয়াল হেল্‌থ সেন্টার' নামে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করেন। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রস্তরফলকে খদিত আছে – MOULANA ABU BAKAR MEMORIAL HOSPITAL. Foundation Stone Laid by—AL-HAJJ MOULANA ABDUL HYE (pir Saheb. Fufura Shsrif) on 3rd Feb. 1948
Opend by Dr. A. C. Chatterjee. Director Health Services on 4th March. 1949

উক্ত 'হেল্‌থ সেন্টার' বড় হুযূর কিবলার তত্ত্বধানে মুহতারাম ন'হুযূর ও ছোট হুযূর কিবলাগণের জমিদানে এবং অর্থ সাহায্যে, মুহতারাম মেজ হুযূর কিবলার সাহায্য-সহানুভূতিতে ও কাজী নবিবর রহমান, জনাব মোজাম্মেল

৫০১ . ড. এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭
৫০২ . আ. ন. ম. বজলুর রহামন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

হক (সাব রেজিস্টার), আলহাজ্জ সৈয়দ আশরাফ হোসেন প্রমুখ গ্রামবাসীর সহযোগিতাপুষ্ট স্বাস্থ্যকেন্দ্র দেশবাসীর কল্যণে প্রতিষ্ঠিত।[৫০৩]

কাদিমী খানকাহ্

মুজাদ্দিদে যামান (র.) হর-হমেশা পৈতৃক বাড়িতে অবস্থিত খড়ের মেটে দহ্লিজে বসে মুরাকাবা-মুশাহাদা করতেন। তাঁর প্রথম জীবনের ব্যবহৃত দহ্লিজ ঘর তিন ভাগে বিভক্ত ছিলো। বহির্ভাগে জমিদারী কাজকর্ম, বিয়ে-শাদী ও পারিবারিক কাজে ব্যবহৃত হতো। অপর ভাগে মুরীদ শাগরেদগণের যিক্র-আয্কার ও অবস্থান স্থল এবং বিশেষ ভাগে মুজাদ্দিদে যামান (র.) নিয়মিত মুরাকাবা-মুশাহাদায় নিমগ্ন থাকতেন। একে 'কাদিমী খানকাহ্' বলা হয়ে থাকে। খড়ের মেটে দহ্লিজের দু'টি ভাগ (অংশ) কাদিমী খানকাহ্র শামিল। উহা বর্তমানে ন'হুযূর কিবলার খানকাহ্ নামে খ্যাত। এই খানকাহ্ থেকেই ১৮৯১ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত ঈসালে সওয়াব পরিচালনা হতো।

উক্ত 'কাদিমী খানকাহ্' সুলতানুল 'আরিফীন ন'হুযূরের সংস্কারের ইরাদায় ইংরেজী ১৯৭৬ সালে (২৬ শে মার্চ) ভেঙ্গে পাকা ইমারতের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। আল্লাহ্ পাকের মাহাবুব বান্দাহ্র অলৌকিক বৈশিষ্ট্য যে, উক্ত মেটে দহ্লিজের যে স্থানে মুজাদ্দিদে যামান (র.) সব সময় বসে মুরাকাবা-মুশাহাদা করতেন,উক্ত স্থান খননের সময় মৃত্তিকা থেকে নানা ফুলের খুশবু বিকশিত হতে থাকে। মাটির এক এক স্তর থেকে রকম রকম সৌরভ ছড়াতে থাকে। দেশ-বিদেশের অগণিত ব্যাক্তি মুঠো মুঠো সৌরভময় মাটি সযত্নে গ্রহণ করে বিষ্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছেন। অনেকে সযত্নে ঘরে রেখে দিয়েছেন। উক্ত বিষ্ময়কর সংবাদ ছড়িয়ে পড়ায় হাজার হাজার দর্শনার্থীর ভিড় জমতে থাকে। ফলে পত্র-পত্রিকায় উক্ত ঘটনা শিরোনাম দখল করে।[৫০৪] ন'হুযূর সাধারণ মানুষের চিন্তাধারায় চিড় ধরার অশংকায় দ্রুত উক্ত স্থান খানকাহ্র শামিল করে গেথে দেন।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ! যে মহামনীষীর ক্ষণকাল (প্রথম জীবনে) সংস্পর্শে এসে মাটি খুশবু হয়ে গিয়েছিলো, বিয়োগ ব্যথা মাটি 'সবর' করে গোপন রেখেছিলো। দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী পরে মাটির পর্দা সরিয়ে দেওয়ায় আত্মপ্রকাশ ('রাজ' জাহির) করে; মাটি নয় যেন মৃগনাভীর সৌরভময় স্তুপ।[৫০৫] যার স্পর্শে ধন্য মাটির এ 'হাল' হতে পারে, সে মহামনীষীর মূল্যায়ন অনুধাবন করুন। বস্তুত তিনি ছিলেন– পরশমণি (কিমিয়া)।

মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর প্রথম জীবনের যিক্র আয্কারের স্থানের মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে সাধনার পীঠস্থান 'দায়েরা শরীফ' এবং বিশেষ তা'লীমগাহ্ 'দরবার শরীফ' এর স্থান মর্যাদা অতি উচ্চ; এটা অস্বীকার করা সত্যের অপলাপ। এই কাদিমী খানকাহ্কে ন'হুযূর প্রায় ৪০ বছর খানকাহ্রূপে ব্যবহার করেন।

মুজাদ্দিদে যামান (র.) অপর একটি মেটে খানকাহ্ যাহা জনাব গোলাম মহিউদ্দিন (বিজুমিয়া) সিদ্দিকী ওয়াক্ফ করে দিয়েছিলেন। উক্ত খড়ের মেটে খানকাহ্ ঘরটি বড় হুযূর সংস্কার করার ইরাদায় ভেঙ্গে তাজমহলের অনুকরণে সুরম্য খানকাহ্ নির্মাণ করেছেন।

মাদানী মস্জিদের উত্তর পার্শ্বের কামরা মুজাদ্দিদে যামান (র.) তাঁর মেজ সাহেবজাদা আবূ জা'ফর সিদ্দিকীর হুজরারূপে নির্ধারিত করেন, মুজাদ্দিদে যামান (র.) তথায় অনেক সময় যিক্র-আয্কার ও রাত্রি যাপন করতেন। টিনের আটচালার পূর্ব পার্শ্বে মেজো হুযূর খানকাহ্ স্থাপন করেছেন। তাঁর খানকায় (কিয়ত অংশে) বাংলা ১৩৫৪ সালে স্থাপিত 'হিদায়াতুল মুসলেমীন লাইব্রেরী' ফুরফুরা শরীফের অন্যতম সংযোজন। তাঁর আদেশে ও যত্নে প্রকাশিত সমস্ত পুস্তক এবং অন্যান্য দীনি কিতাবপত্র ও লাইব্রেরী থেকে বাংলা-আসামের মানুষ সংগ্রহ করে থাকেন। ঈসালে সওয়াবের তিন দিনে উক্ত লাইব্রেরীর আয় মাদ্রাসার উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হয়।

মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর অপর বাড়িতে তদীয় কনিষ্ঠ সাহেবজাদা (ছোট হুযূর) খানকাহ্ স্থাপন করেছেন। মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর তৃতীয় সাহেবজাদা তাঁর সীতাপুরের বাড়িতে অবস্থান করতেন। মুজাহিদে মিল্লাত

৫০৩. প্রাগুক্ত, পৃ.৫৯
৫০৪. নিদায়ে ইসলাম, পৃ. ২৯, উদ্ধৃত: মোঃ মোবারক আলী রহমানী, প্রাগুক্ত, পৃ.২৯
৫০৫. মোবারক আলী রহমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

'অবদুল কাদের সিদ্দিকী (র.)-এর একমাত্র সাহেবজাদা মাওলানা আবুল ফারাহ সিদ্দিকী ফুরফুরা শরীফের ঈসালে সওয়াবের সুউচ্চ গেটের পূর্বে অনতিদূরে খানকাহ্ নির্মাণ করেছেন।[৫০৬]

ঈসালে সাওয়াব মাহফিল

ফুরফুরা শরীফের ঐতিহ্যবাহী ঈসালে সাওয়াব এ উপমহাদেশের অন্যতম ঐতিহাসিক মিলনকেন্দ্র। সাম্য-ভ্রাতৃত্ব, প্রীতি-সৌহার্দ, মিল ও মুহাব্বাতের পুণ্যভূমি। পাঁচ-মিশেলি বড় সমাবেশ অন্যত্র হলেও হতে পারে কিন্তু এমন আহলে সুন্নাতুল জামায়াতের অপূর্ব নির্ভেজাল সমাবেশ বিরল। প্রতি বছর ফাল্গুন মাসের ২১,২২ ও ২৩ শে নির্ধারিত তারিখে তিনদিনব্যাপী ঈসালে সাওয়বে প্রায় দশ বারো লাখ ধর্মপ্রাণ মানুষ মহতী সমাবেশে জমায়েত হয়।

লক্ষাধিক মানুষের বা-জামায়াত পাঞ্জেগানা নামায,[৫০৭] কয়েকশত খত্মি-কুর'আন, পাঁচ-ছয় স্থানে ওয়াজের মিম্বর স্থাপন করে ওয়ায-নছিহত; সর্বোপরি প্রতিদিন ফযর ও মাগরীবের নামাযবাদ মুরাকাবা-মুশাহাদা, যিক্‌র-আযকার ও মর্মস্পর্শী মুনাজাতের অনন্দ্যিসুন্দর দৃশ্য প্রতিটি সুধীজন এমন কি পাষাণ হৃদয়ও উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। সে অপূর্ব মনোহর দৃশ্য প্রত্যক্ষদর্শীরাই একমাত্র হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম।

বঙ্গভূমিতে ফাল্গুন মাসে বসন্তকালের স্নিগ্ধ হাওয়ায় সভা-সমাবেশের উপযুক্ত সময় বিবেচনা করে মুজাদ্দিদে-যামান (র.) ঈসালে সাওয়াবের তারিখ নির্ধারিত করেন। তবুও দেখা যায় হঠাৎ আদ্র-আবহাওয়ায় উন্মুক্ত ময়দানে সামিয়ানার নিচে বৃষ্টিভেজায় মানুষ কষ্ট পেতো। তিনি অতিথি-মেহমানদের সুবিধার্থে ইংরেজী ১৯২২ সালে লোহার পিলার ও কাঠামো ব্যবস্থায় বিশাল টিনের স্থায়ী প্যান্ডেল (আটচালা) নির্মাণ করেন। ৭০×১০০ ফুট টিনের প্যান্ডেলে প্রায় ৪/৫ হাজার মানুষ বসার ব্যবস্থা হয়। কুড়ি-পঁচিশটি সামিয়ানা টাঙ্গিয়ে ঈসালে সওয়াবের অন্যান্য অংশ আচ্ছাদিত করা হয়।

এ টিনের আটচালায় সুলতানুল ওয়ায়েযীন আল্লামা রুহুল আমীন (র.), মাওলানা নেছার উদ্দীন আহমদ (র.), মাওলানা মুয়িজ্জুদ্দীন হামিদী (র.), ড. শহীদুল্লাহ, অন্ধ হাফিয আজগর আলী (র.) প্রমুখ মহাত্মন ব্যক্তির ন্যায় শত শত আলিম-ফাযিল বক্তৃতা করে ধন্য হয়েছেন। টিনের আটচালায় দাদা হুজুরের প্রতিষ্ঠিত পুরানো মিম্বরের স্থানে মেজো হুজুরের তত্ত্বাবধানে ১৯৮৩ সালে চার থামবিশিষ্ট সুন্দর সুরম্য মিম্বর নির্মাণ (সংস্কার) করা হয়েছে। ওয়াযের মজলিসকে 'বাগে-জান্নাত' বলা হয়।

বড় বড় ডেগচিতে (ডেগ-হাড়ী) প্রতিদিন হাজার হাজার মেহমানের রান্নার (আহারাদির) ব্যবস্থা করা হয়। ঈসালে সওয়াবের মধ্যম দিনে মুজাদ্দিদে-যামান (র.) সমাগত সমস্ত মেহমানের জন্য 'বিরিয়ানি' পাক করে খাওয়াতেন। অদ্যাবধি সে নিয়ম চলে আসছে। এক ওয়াক্তে আশি মণ চাউল পাক করার যথেষ্ঠ নযির বিদ্যমান। কত শত মণ চাউল যে পাক করা হয় সে হিসাব দেয়া মুশকিল।

মুজাদ্দিদে-যামান (র.) ঈসালে সাওয়াবের মেহমানদের সুযোগ-সুবিধার প্রয়োজনীয় সব কিছুর ব্যবস্থা অত্যন্ত নিষ্ঠা ও যত্নের সাথে নিজে তদারকি করতেন। মেহমানদের সামান্য অসুবিধা ও কষ্টের কথা জানতে পারলে বালকের ন্যায় কাঁদতেন এবং নিজে ছুটে গিয়ে প্রতিবিধান করতেন। এমনকি শেষ দিনে বিনীতভাবে ঘাষণা করতেন "বাবারা অনেকের অনেক কষ্ট হয়েছে, কোনো অসুবিধা হলে আমাকে মাফ করে দেবেন।"

মাথায় সুন্নতি টুপি হাঁটু ঢাকা পোশাক পরিহিত দীনদার 'খাদিম' মেহমানদের খিদমতে নিয়োজিত থাকে। তিনি মেহমানদের (সমাগত প্রতিটি মানুষ তাঁর মেহমান) না খাইয়ে খেতেন না, ফলে তাঁর দিনে রোযায় পরিণত হয়। বড় হুজুরকেও আমরা অভুক্ত থাকতে দেখেছি। কোনো সময় তাঁর সম্মুখে খাওয়ার সামগ্রী হাযির করলে তিনি রাগান্বিত হয়ে বলতেন– "তোমরা আমাকে খাওয়াতে ব্যস্ত, দেখ না আমার মেহমানদের কারও খাওয়া হলো কি না।" নিজে তদারকি করে মেহমানদের সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়ে খাদ্য গ্রহণ করতেন। পীরজাদা মাওলানা আবূ

---

৫০৬. প্রাগুক্ত

৫০৭. ফুরফুরা শরীফের মাহফিলে নামাযে মাইক ব্যবহার করা হয় না। এমনকি বিনা মাইকে ওয়ায-নসিহত ও সমস্ত কার্য সম্পন্ন হয়। বিশেষ ব্যাচ পরিহিত ১৫/২০ মনোনীত মুকাব্বির সহযোগে নামাযের জামায়াত পরিচালিত হয়। উদ্ধৃত: মোঃ মোবারক আলী রহমানী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩১

ইবরাহীম সিদ্দিকী ও অন্য পীরজাদাগণ নিজেদের তত্ত্বাবধানে মেহমানদের তদারকি করে থাকেন। ঈসালে সওয়াবের তিনদিন 'আম-খাস' ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে প্রতিটি মেহমানের জন্য একইরকম বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ, এমনকি পীর কিবলা, পীরজাদা এবং আত্মীয়-স্বজনদের জন্যও একই প্রকার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। তিনি ঈসালে সওয়াবের সমাগত মেহমানদের 'পরম আত্মীয়' মনে করতেন। ঈসালে সওয়াবে যোগদাকারী 'আলিম সাহেবানদের অবস্থানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হয়ে থাকে।

মুজাদ্দিদে যামান (র.) বসিরহাটের আল্লামা পীর রুহুল আমীন (র.) ও মাওলানা শাহ্ সূফী পীর আবদুল মা'বুদ মেদিনীপুরী (র.) প্রমুখ যবরদস্ত 'আলিমের ওয়ায শুনতেন। নিজ হাতে ভাত নিয়ে তাঁদের খাওয়াতেন। ঈসালে সওয়াবের জ্বালানী কাঠ বয়ে আনতেও কুণ্ঠাবোধ করতেন না।[৫০৮] তাঁর আচার-আচরণ ও ব্যবহারে লোকেরা অভিভূত হয়ে যেতেন। বিয়ে-শাদী ও অন্যান্য অনুষ্ঠান তিনি ঈসালে সওয়াবকে 'পিট করে' (সামনে রেখে) করতে রাজী হতেন না। শায়খুল আরিফীন বড় হুজুর ও সুলতানুল আরিফীন ন'হুজুর- এরও সে 'আদত ছিলো। বর্তমান পীরও সে মত করে আসছেন। ঐতিহ্যবাহী ঈসালে সওয়াবের মূলসূত্র একতা ইত্তেহাদের প্রতি পীর সাহেবের সজাগ দৃষ্টি বিদ্যমান। বছরে এক সময় (২১, ২২ ও ২৩শে ফাল্গুন) ছাড়া অন্য সময় এ নযীর পাওয়া যায় না।[৫০৯]

পীরজাদা মাওলানা বাকীবিল্লাহ সিদ্দিকী একবার কঠিন বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। ভাতিজার শোচনীয় অবস্থায় বড় হুজুরের হৃদয়-মন কেঁদে ওঠে। তিনি আল্লাহ্ পাকের দরবারে কাঁদা কাটি করতে থাকেন। 'আয় আল্লাহ্ আমার বাকীকে সুস্থ করে দাও। আমি বাংলা আসামের ভক্ত মুরীদানদের দাওয়াত করে বিরিয়ানি খাইয়ে ঈসালে-সওয়াব করবো।' আল্লাহ্র ফজলে বড় হুজুরের দোয়া কবুল হয় এবং যথারীতি 'খোশখানা' করে ঈসালে সওয়াব করেছিলেন। তবে মাহফিল ও খাওয়ানোর ব্যবস্থা মাদ্রাসার মাঠে করেন এবং রান্নার ব্যবস্থা ঈসালে-সওয়াবের নিজস্ব বাবুর্চিখানায় করেন।

পীরজাদা বাকীবিল্লাহ সিদ্দিকী প্রমুখ, বড় হুজুরকে ঈসালে সওয়াবের ময়দানে ঈসালে সওয়াব না করার হেতু জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন– "তোমরা বোঝ, আর আমি বুঝি না ? জানি দূরে বয়ে নিয়ে খাওয়ানো কষ্ট; কিন্তু (এখানে করলে) লোকে 'দোভয়ে' পড়ে যাবে, তোমাদের দাদুর রূহ নাখোশ হবে।"

মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর চিন্তাধারা ছিলো; ঈসালে সাওয়াবে যোগদানকারী আমার মেহমানরা হোটেলে ভাত খাবেন ! (আমার এখানে না খেয়ে) তিনি তা পছন্দ করতেন না। সে জন্য তাঁর নির্দেশে ঈসালে সাওয়াবের সময় নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে কোনো হোটেলে দিনে ভাতের ব্যবস্থা থাকে না।

মুজাদ্দিদে যামান (র.) ঈসালে সওয়াবের বিরাট দায়িত্ব তাঁর সুযোগ্য সাহেবজাদা নাজমুস্ সায়াদাত সিদ্দিকীর প্রতি অর্পণ করলেও মুহতারাম হুজুরগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। বড় হুজুর (র.) আজীবন ঈসালে সওয়াবের প্রধান সেনানীর সক্রিয় ভূমিকা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করে গেছেন।

দু'তিন মাস পূর্ব থেকে ঈসালে সওয়াবের প্রস্তুতি চলতে থাকে। মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর সমস্ত পরিবারবর্গ ঈসালে সওয়াবের আঞ্জামে রত থাকেন। প্রকাশ থাকে যে, ঈসালে সওয়াবের স্থানের জমির মধ্যে হুজুরদের ও বিভিন্ন ওয়াকফ্কৃত এবং শরিকানা সম্পত্তির উপর অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

দরবার শরীফ

ফুরফুরা শরীফের ঈসালে সাওয়াবে 'দরবার শরীফ'-এর গুরুত্ব অরস্বীকার্য। মুজাদ্দিদে যামান (র.) ঈসালে সওয়াবের তিন দিনে এই দরবার থেকে লক্ষ লক্ষ সালেকীনকে 'নেসবতে জামেয়া'-র ফয়েজ প্রদান করতেন। তরিকত অন্বেষী ব্যক্তিগণ তিন দিন সকাল-সন্ধ্যায় মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর দিকে রুজু হয়ে (মুখ করে)

---

৫০৮. প্রতি বছর পীর সাহেবদের তরফ থেকে বারো শতাধিক মণ জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করা হয় এবং অন্যান্য স্থান থেকেও কয়েক শত মণ জ্বালানী কাঠ দান হিসেবে আসে। উদ্ধৃতঃ মোঃ মোবারক আলী রহমানী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩

৫০৯. দাদা হুজুরের সওয়াব রেসানী জলসা কেবল একবার পৃথকভাবে ২৯শে নভেম্বর, বাংলা ৩রা অগ্রহায়ণ ১৩৪৬ সালে হয়েছিল। কিন্তু বিজ্ঞাপনে (বিঃ দ্রঃ ঘোষণা) – প্রকাশ থাকে যে, –"এ মাহ্ফিল খাস এ বৎসরের জন্য। প্রচলিত ঈসালে সওয়াবের মাহ্ফিল যা প্রতি বৎসরের ২১, ২২ ও ২৩শে ফাল্গুন তারিখ হয়ে থাকে, তা পূর্বের ন্যায় জারি থাকবে।" উদ্ধৃতঃ মোঃ মোবারক আলী রহমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

তা'লীম-তাওয়াজ্জুহ গ্রহণ করতেন। আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান অনুশীলনের উচ্চমার্গে উপনীত হাজার হজার সুধীজনের যোগ্যগ্যতার স্বীকৃতির ঘোষণাস্থল এই দরবার শরীফ।[৫১০]

মজাদ্দিদে যামান (র.)-এর উক্ত দরবার শরীফের অপর নাম 'তা'লীমগাহ'। উক্ত তা'লীমগাহ থেকে পীর মাওলানা নেছারুদ্দীন (র.), 'আল্লামা পীর রূহুল আমীন (র.), সূফী মাওলানা আবদুল মা'বুদ (র.), সূফী তাজাম্মুল হোসেন সিদ্দিকী (র.), পীর হাতেম আলী (র.), সূফী সদরুদ্দীন অহমদ (র.), সূফী আবদুল মোমেন (র.), হাফিয পীর আবদুল লতিফ (র.) প্রমুখ হাজার হাজার রত্ন ফয়েয হাসিল করে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়েছেন। বঙ্গ-আসাম তথা ভারত উপমহাদেশের লক্ষ লক্ষ স্বনামধন্য বিদগ্ধজন দরবার শরীফের সোনালী ফসল।

ফুরফুরা শরীফের ঈসালে সাওয়াবের প্রথমদিকে মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর পৈত্রিক সম্মত্তিতে অবস্থিত খড়ের ছাউনিবিশিষ্ট দহ্লিজ ব্যতীত অন্য কোনো বৈঠকখানা বা বাহিরে বসার ঘর ছিল না। ফলে তিনি উক্ত দহ্লিজ কাম-খানকাহ থেকে ঈসালে-সওয়াব পরিচালনা করতেন। এমনকি মুরাকাবা-মুশাহাদা, যিক্র-আযকার, তা'লীম-তাওয়াজ্জুহ দিতেন। ১৮৯১ সাল থেকে বর্তমান দরবার শরীফের স্থানে খুঁটি-সামিয়ানায় তক্তপোশ পেতে ঈসালে সওয়াবের তিনদিন আঞ্জাম দিতেন।

১৯৯২ সালে ঈসালে সাওয়াবের এক পুণ্যময় তারিখে সকলে যিক্র-আযকারে মগ্ন। এমন সময় হযরত মাওলানা আবদুল মা'বুদ মেদিনীপুরী সাহেব চিক্ মেরে বলে ওঠেন– "তোমরা দেখতে পাচ্ছনা, কে আসছেন, উঠে দাঁড়াও হযরত নবী করীম (স.) তাশরীফ এনেছেন।" হঠাৎ সারা মাহফিলের লোক ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! বলে চিৎকার করতে থাকেন। বহু লোক বেহুশ হয়ে যায়। পরে জানা যায়– ঐ সময় নবী করীম (স.), হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.), হযরত ওমর ফারুক (রা.), হযরত ওসমান গণি (রা.), হযরত আলী (রা.) ও হযরত বেলাল (রা.) তাশরীফ এনেছিলেন। তাঁরা মাহফিলের যে অংশে পরিভ্রমণ করেছিলেন সে সমস্ত অংশে হুজুর বিরাট টিনের আটচালা নির্মাণ করে ওয়ায মাহফিলের জন্য নির্দিষ্ট করে দেন।

তারপর তাঁরা সকলে দরবার শরীফের ভিত্তিস্থলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে প্রস্থান করেন। পরে ঐ বছরেই তাঁদের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে ছয় থামবিশিষ্ট দরবার শরীফ টিনের ছাউনি দিয়ে নির্মাণ করা হয়।[৫১১] মাহফিলের পরিধি বাড়ার পর উক্ত দরবার শরীফ থেকে মুজাদ্দিদে যামান (র.) ঈসালে সাওয়াবে মুরাকাবা-মুশাহাদা প্রভৃতি যাবতীয় কাজ পরিচালনা করতেন। অনেকের ধারণা হযরত নবী করীম (স.) সাহাবা কিরামসহ ছয়জন মহাত্মন ছয় থামের সন্নিকট তাশরীফ রেখেছিলেন। সে জন্য মুজাদ্দিদে যামান (র.) কম-বেশি না করে ছয়টি থাম যথাস্থানেই রেখেছেন।

ফুরফুরা শরীফের ঈসালে সাওয়াবে তিন দিনের রীতি সকাল-সন্ধ্যায় পীর সাহেব (র.) দরবার শরীফে মুরাকাবা-মুশাহাদায় রত থাকতেন এবং মাহ্ফিলের সমস্ত মানুষ দরবারের দিকে মুখ করে (গোলাকার) হয়ে যিক্র-আযকার করে থাকে। শায়খুল আরিফীন বড় হুজুর (র.)-এর সময়ও এই নিয়ম প্রচলিত; অদ্যাবধি উক্ত নিয়মে তিনদিন মুরাকাবা-মুশাহাদা, যিক্র-আযকার হয়ে থাকে।

ঈসালে সাওয়াবের তিন দিন দরবার শরীফ বা তা'লীমগাহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। মুজাদ্দিদে যামান (র.) সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ বা ঘোষণা দরবার থেকে করতেন। ওয়ায-নছীহত, তওবা-মুরীদ, তা'লীম-তাওয়াজ্জুহ, দোয়া বা খাতেমা মুনাজাত এ তা'লীমগাহ বা দরবার শরীফ থেকেই করতেন। বড় হুজুর (র.) থেকেও অদ্যাবধি দরবার শরীফে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালিত হয়ে আসছে।

দরবার শরীফে মাদ্রাসা, ঈসালে সাওয়াব প্রভৃতির জন্য দান-খয়রাত গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সে উদ্দেশ্যে মুজাদ্দিদে যামান (র.) নির্দিষ্ট কয়েকটি পৃথক বাক্স রাখার ব্যবস্থা এবং তহবিল সংরক্ষণের জন্য আয়রণ-চেষ্ট

---

৫১০. যাহিরী 'ইলম শিক্ষাগার ফুরফুরা ফাতেহিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা উত্তীর্ণ ছাত্রদের, মুজাদ্দিদে যামান (র.) ঈসালে সওয়াবে টিনের আটচালা থেকে উপাধিসহ পাগড়ী দিতেন, পক্ষান্তরে বাতিনী ইলমের শিক্ষাগার 'দায়েরা-শরীফে' উচ্চমার্গের তা'লীমপ্রাপ্ত ছাত্রদের খিলাফতের অমূল্য নিয়ামতের স্বীকৃতি স্থান বস্তুত দরবার শরীফ। উদ্ধৃতঃ মোঃ মোবারক আলী রহমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

৫১১. সৈয়দ আশরাফ হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

(সিন্দুক) স্থাপন করে গেছেন, এমনকি রেজিষ্ট্রিকৃত দলিলে ঈসালে সওয়াবের যাবতীয় বিষয় লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাঁর নিয়ম-নীতির পরিবর্তন ও বিরুদ্ধাচারণ করা বস্তুত আইন বিরুদ্ধ এবং ন্যায়-নীতি ও পীরের চরম বিরোধিতার সামিল।

তিন দিনের ঈসালে সাওয়াবের সময় দরবার শরীফকে কেন্দ্র করে যিক্র-আযকার, মুরাকাবা-মুশাহাদার সময় অসংখ্য সৌভাগ্যবান বান্দার হযরত নবী করীম (স.)-এর যিয়ারত নসীব হয়েছে। অনেকে বেতাব দেওয়ানার ন্যায় 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্' বলে রোনাজারীর দৃশ্য ভুক্তভোগীরা সর্বদা দেখে থাকেন। মূলত দরবার শরীফ থেকে অসংখ্য ব্যক্তি বহু নিয়ামতের হকদার হয়েছে।

উক্ত দরবার শরীফে মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর লাশ মুবারক শেষ সময় পর্যন্ত রাখা হয়। সর্বসাধারণ তাঁকে দরবারে শেষবারের মত দর্শনর সুযোগ লাভ করে। তাঁর লাশ মুবারক দরবার থেকেই মাযারে দাফনের জন্য নীত হয়। শায়খুল আরিফীন বড় হুজুর (র.)-এরও লাশ মুবারক দরবারে শেষ শয়নে শায়িত রাখা হয় এবং দরবার থেকেই তাঁদের লাশ মাযারে (রওজায়) নীত হয়।

উক্ত তিন মহাত্মন, অমূল্য রত্ন নিয়ামতের সৌভাগ্যস্থল দরবার শরীফ ঈসালে সওয়াবের অনুষ্ঠান ব্যতীত সারা বছর অন্য কোনো কার্যে ব্যবহৃত হয় না।

উক্ত ঈসালে সাওয়াব সম্বন্ধে আল্লামা রুহুল আমীন (র.) পীর সাহেবের জীবনী পুস্তকে লিখেন– "এত বড় বিরাট সভাতে কেহ চুরুট, সিগারেট ও তামাক পর্যন্ত ব্যবহার করিয়া থাকে না, লক্ষাধিক লোকের (বর্তমানে ৮/১০ লাখ) লেবাস-পোশাক একই ধরনের সুন্নত অনযায়ী কি সুন্দর দৃশ্য, সমাগত লোকদের প্রাণের আবেগ, আদব-কায়দা পীরের মুহাব্বাত। পীর ভাইদের প্রগাঢ় প্রেম-ভালোবাসা, চলন-চরিত্র দেখলে, যেনো বেহেশ্তের নমুনা বলে বোধ হয়। হযরত পীর সাহেব স্বদেশী-বিদেশী সমাগত লোকদের যত্ন ও খাতেরদারী ও খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন, হযরত পীর সাহেব ঈসালে সওয়াবের বিরাট মাঠে প্রত্যেক স্তরে ঘুরে ঘুরে সকলের অসুবিধা দূর করতেন। সমস্ত বিষয়ে তদন্ত করতেন। সমস্ত দিবস ও অর্ধরাত্রি অনাহারে থেকে সমাগত লোকদিগকে খাওয়ায়ে শেষে ভক্ষণ করতেন। সময়ে সময়ে হযরত পীর সাহেবকে কাষ্ঠ হাতে নিয়ে আসতে দেখেছি। তদ্দর্শনে শত শত মাওলানা, মৌলভী, দরবেশ কাষ্ঠ স্কন্ধে নিয়ে তাঁর পেছনে ছুটতে দেখেছি। এটি হযরত নবী করীম (স.)-এর সুন্নত। বহু নামজাদা 'আলিম নিজেদের সম্ভ্রম ও মর্যাদার কথা ভুলে গিয়ে সমাগত লোকদিগের খাওয়ান-দাওয়ানের ব্যবস্থার জন্য খিদমতগাররূপে দিবা-রাত্রি দৌড়াদৌড়ি করতে থাকেন।[৫১২]

"এ মাহ্ফিলে কোনো প্রকার বিদ'আত কার্যের অনুষ্ঠান হয় না, বেশি উচ্চশব্দে যিক্র, নর্তন-কুর্তন, হাতে তালি দেয়া, রাগ-রাগিনীসহ মসনবি বা গজল পাঠ ইত্যাদি হারাম ও নাজায়িয কার্য অনুষ্ঠিত হয় না। পীরের পায়ে সিজ্দা কিংবা কবর সিজ্দা কিছুতেই হতে পারে না। বরং সাধারণ লোকে মস্তক নত করে পায়ে হাত দিয়ে গুনাহগার হবে আশংকায় হুজুরের কদমবুসির জন্য নিজের পা স্পর্শ করতে কাউকেও অনুমতি দিতেন না।"[৫১৩]

"এ ঈসালে সাওয়াবের তারিখ কারও জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ নয়। প্রত্যেক বৎসরে ভিন্ন ভিন্ন তারিখ নির্দিষ্ট করলে সুদূর বঙ্গ, আসাম ও ভারতের মুরীদগণের পক্ষে তা জানা ও সময়মত উপস্থিত হওয়া অসম্ভব হয়ে থাকে। এ হেতু সাধারণের উপকারের জন্য ফাল্গুনের ২১, ২২ ও ২৩ তারিখ নির্দিষ্ট করা হয়েছে, যা বেশি গ্রীষ্ম নয়, বেশি শীতও নয়। এরূপ মোসলেহাতের জন্য দিন নির্দিষ্ট করাতে কোনো দোষ নেই।"[৫১৪]

এ সভাতে প্রথম তারিখে কয়েক সহস্র কুর'আন খতম, কালিমা খতম, সূরা ইখলাস খতম, দরূদ খতম হয়ে থাকে। শেষ রাত্রে এ সমস্ত খতমের, যাবতীয় ওয়ায-নছীহত, মিলাদ শরীফ, লক্ষাধিক লোকের খাওয়ানোর যে সওয়াব তা হযরত নবী করীম (স.) তাঁর আওলাদ ও আযওয়াযে মুতাহ্হারাত, সাহাবা, তাবেয়ী, তাবে তাবেয়ী, সিদ্দিক, শহীদ, নেককার, ইমাম মুজতাহিদ, মুহাদ্দিস, মুফাচ্ছির, ফকীহ, ক্বারী, যাবতীয় 'আলিম, ওলী, গওস, কুতুব, নজীব, নকীব, আওতাদ, ওমোদ, আবদাল, আখইয়ার, আবরার, সমস্ত তরীকার পীর,

৫১২. আল্লামা রুহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩, ৮৪
৫১৩. মাওলানা সুলতান আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩
৫১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

হযরত আদম ও হাওয়া (আ.) উভয়ের, সমস্ত মুমিন মুসলিম আওলাদ, সমস্ত নবী ও রাসূল (আ.), হাযিরিন, সামিয়ীন, সহায়তাকারীগণের পূর্বপুরুষগণ বিশেষত হযরত কুত্‌বুল-আকতাব, সূফী ফাতেহ আলী সাহেব (ওয়সী) হযরত পীর সাহেবের ওয়ালেদায়েন মাজেদায়েনের পাক রূহে পৌঁছাইয়া দেয়া হয়। কাজেই তাঁদের অনেক রূহ তথায় উপস্থিত হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা।[৫১৫]

انه لا يمتنع رؤيته ذاته عليه الصلواة والسلام بجسده وروحه وذالك انه وسائر الانبياء صلى الله عليهم وسلم ردت اليهم ارواحهم بعد ما قبضوا واذن لهم فى الخروج من قبورهم لتصرف فى الملكوت العلوى والسفلى–

"অর্থাৎ হযরত নবী করীম (স.)-এর যাত মুবারক রূহ ও শরীরসহ দৃষ্টিগোচর হওয়া অসম্ভব নয়। কেননা, তাঁর অবশিষ্ট নবীগণের রূহ্‌ কবজ করার পরে তাঁদের দেহে তা ফেরত দেয়া হয়েছে এবং আত্মিক জগতে ও দুনিয়াতে কার্য পরিচালনা করার জন্য তাঁদিগকে তাঁদের কবর হতে বের হওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে।"[৫১৬]

قال الغزالى رحمه الله تعالى والرسول عليه السلام له الخيار فى طواف العوالم مع ارواح الصحابة رضى الله عنهم لقد رءاه كثير من الاولياء–

"অর্থাৎ ইমাম গায্‌যালী (র.) বলেছেন, হযরত নবী করীম (স.) সাহাবাগণের রূহ্‌সহ সমস্ত জগত ভ্রমণ করতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছেন। নিশ্চয়ই বহু ওলী তাঁকে দেখেছেন।"[৫১৭]

শাহ্‌ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (র.) বলেন, "আমি হযরত নবী করীম (স.)-কে বারম্বার দেখেছি। তিনি আমার নিকট নিজের আসল আকৃতি প্রকাশ করতেন। যদিও আমার পূর্ণ আকাঙ্খা ছিল যে, আমি তাঁকে স্বশরীরে না দেখে রূহানী সূরতে দেখি। এতে আমি বুঝতে পারলাম যে তাঁর বিশিষ্ট ক্ষমতা আছে যে, নিজের রূহকে আকৃতিধারী করতে পারেন। এর দিকে হযরত নবী করীম (স.) ইশারা করেছেন যে, নবীগণ মরেন না, তাঁরা নিজেদের কবরে নামায পড়ে থাকেন ও হজ্জ করে থাকেন।"[৫১৮]

হযরত নবী করীম (স.) আকৃতিধারী হয়ে অমুক ময়দানে বিখ্যাত ক্বারীর নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন । উক্ত ক্বারী বলেছেন– "আমি দু'চক্ষে তাঁকে দেখেছিলাম।" ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) ইন্তেবাহোল আজকিয়াতে লিখেছেন– 'নবী (স.) নিজের উম্মতের কোনো নেককার মরলে তাঁর জানাযাতে উপস্থিত হন।'[৫১৯] মুজাদ্দিদে যামান তাঁর মাকতুবাতে লিখেছেন– 'হযরত খিযির (আ.) ও হযরত ইলয়াস (আ.) তাঁর নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন।'[৫২০]

হযরত বড় পীর ও খাজা বাহাউদ্দীন নকশাবন্দী সাহেবের পাক রূহ মুজাদ্দিদ সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী (র.)-এর নিকট উপস্থিত হয়েছিলো। ঈসালে সাওয়াবের মজলিশে ফিরিশ্‌তাগণের উপস্থিতি বিশেষ সম্ভব।[৫২১] হযরত নবী করীম (স.)-এর হাদীসে কুর'আন, যিক্‌র, তাসবীহ ইত্যাদি পাঠ স্থলে ফিররশ্‌তাগণের উপস্থিত হওয়ার প্রমাণ আছে।[৫২২]

---

৫১৫. ফজলুর রহমান মুন্সী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮
৫১৬. মওলানা সুলতান অহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১
৫১৭. তাফসীরে রূহুল বয়ান, খন্ড-৪, পৃ. ৪২৮
৫১৮. শাহ্‌ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (র.), *ফায়জুল হারামায়েন* (দিওবন্দ: কুতুবখানাহ হুসাইনিয়াহ, ১৯৯৭ খ্রী.), পৃ. ২৮
৫১৯. শাহ্‌ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (র.), দোরোছ ছমিন (দিওবন্দ: কুতুবখানাহ হুসাইনিয়াহ, ১৯৮৫ খ্রী.), পৃ. ০৬
৫২০. মুজাদ্দিদে যামান হযরত আবু বকর (র.), মাকতুবাতে মুজাদ্দেদী (কলকাতাঃ মুজাদ্দেদীয়া লাইব্রেরী, ১৯৭৬ খ্রী.), পৃ. ৩৬৫
৫২১. সিরাতুল মুস্তাকিম, পৃ. ১৫১
৫২২. আল্লামা রুহুল আমীন, পাগুক্ত, পৃ. ৯১

এসব আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ফুরফুরা শরীফের মাহ্ফিলে হযরত নবী করীম (স.) ও সাহাবা কিরামের উপস্থিতি সম্ভব।[৫২৩] সারহিন্দ শরীফের গদ্দীনশীন পীর সাহেব খানকাহ শরীফের এক কোণে দাঁড়িয়ে ওয়াজ করে বলেন যে, "আমি তন্ন তন্ন করে ফুরফুরা শরীফের ঈসালে সাওয়াবের মাহ্ফিল দেখলাম, অবিকল এরূপ ঈসালে সওয়াব সারহিন্দ শরীফে হয়ে থাকে, এক তিল কম-বেশি হয় না।"[৫২৪]

মাওলানা মোহাম্মদ রূহুল আমীন (র.) আরো লিখেছেন, আমার ফুরফুরার মাহ্ফিলে যোগদান করার পূর্বে একবার হযরত পীর সাহেব ও তাঁর কামিল খলীফাগণ হযরত নবী (স.)-এর শুভাগমনে আত্ম-বিস্মৃতি সাগরে নিমগ্ন হয়েছিলেন। নাবালেগ সন্তানগণ চিৎকার করছিল। তাদেরকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তারা বলেছিলো, আমরা একটি মহা জ্যোতির্ময় বস্তু সভার চারদিকে শূন্যমার্গে উড্ডীয়মান হতে দেখে এরূপ করছিলাম। এদ্বারা প্রমাণ হয় যে, হযরত নবী করীম (স.) এই মাহ্ফিল কবূল করেছিলেন।[৫২৫]

১৮৯১ খৃস্টাব্দে ফুরফুরা শরীফে 'মাহ্ফিলে ওয়ায দর জেম্নে আঁ ঈসালে সওয়াব' মুজাদ্দিদে যামান মাত্র আড়াই সের বাতাসা দিয়ে সূচনা করেন। আজ শত শত মণ চাউল পাক করেও সিকি পরিমাণ মেহমানদের খাওয়ানো যায় কি না সন্দেহ।

বাংলা ১৩৪৩ সালের ২৩শে মাঘ তারিখে রেজিস্ট্রীকৃত এক স্বতন্ত্র দলীলে তদীয় চতুর্থ সাহেবজাদা হযরত শাহ্ সূফী নাজমুস্ সায়াদাত সিদ্দিকী (ন'হুজুর)–কে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করে ঈসালে সওয়াবের দায়-দায়িত্ব অর্পণ করেন। পরিশিষ্টে " আমার কোনো বংশধর তার কোনো অংশ নিজ স্বার্থে দাবি করতে পারবে না" বলে অসিয়ত করে গেছেন।[৫২৬]

ফুরফুরা শরীফের ঈসালে সওয়াবের মেহমানদের সুবিধার্থে বর্তমানে বহু উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। রওযা শরীফের উত্তর-পশ্চিম কোণের (পাকা সড়কের ধারে) পুকুরের পুরো একধার 'সানের ঘাট' পীরজাদা মাওলানা বাকীবিল্লাহ সিদ্দিকীর তত্ত্বাবধানে, সুলতানুল আরিফীন ন'হুজুরের ইরাদা মুতাবিক বাংলা ১৩৮৯ সালে নির্মাণ করেন। রওযা শরীফের পুকুরের তিন দিকে পাকা ঘাট হওয়ায় মেহমান ও জায়েরীনদের ওযূর চমৎকার ব্যবস্থা হয়েছে।

স্যালোসিস্টেমে ঈসালে সওয়াবের সময় ওযূ ও বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা, সুলতানুল আরিফীন ন'হুজুরের অমর অবদান।

মেজো হুজুরের তত্ত্বাবধানে মাযারের গেট, মস্জিদ সংস্কার, অযূর জন্য পুকুরের পূর্ব-দক্ষিণ কোণের পাকা ঘাট, পেশাবখানা ও পায়খানা ইত্যাদির ব্যবস্থা জনসাধারণের কল্যাণে।

রওযা শরীফ

'রওযা শরীফ' ফুরফুরার অন্যতম প্রধান যিয়ারতগাহ। বংলা ১৩৪৮ সালে প্রখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার টি. আহমদের নকশা মুতাবিক মোগল স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শনে মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর 'মাকবারাহ' সুউচ্চ গম্বুজবিশিষ্ট মাযার নির্মাণ কার্য সমাধা হয়।

বড় হুজুর (র.) বলেন– "আমি একদিন স্বপ্নে দেখছি, ছোট হযরতজী (র.)-র কবর থেকে একটি সুন্দর মেহরাব তৈরি হয়েছে, আর মেহরাবের ওপর আমি বসে দোয়া করছি।" এ খোয়াব আব্বা হুজুর মুজাদ্দিদে জামান (র.)-কে জ্ঞাত করালে, তিনি বলেন– "বাবা এতদিন আমাকে বলনি কেনো ?" তারপর তিনি তথায় নিজের 'কবর' (পূর্ব থেকে) খনন করান। মুজাদ্দিদে যামান (র.) মাযার প্রসঙ্গে বলতেন– "বাবা আমার পরে যদি তোমরা কিছু করো, দু'হযরতজীকে নিয়ে করবে।"

---

৫২৩. মোঃ মোবারক আলী রহমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯
৫২৪. আল্লামা রুহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯
৫২৫. প্রাগুক্ত
৫২৬. ১৯৭৭ সালের ২৩শে জুলাই তারিখে, উক্ত দলীলসূত্রে ন'হুজুর তদ্বীয় বড় সাহেবজাদা মাওলানা বাকীবিল্লাহ সিদ্দিকীকে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করে গেছেন। উদ্ধৃতঃ মোঃ মোবারক আলী রহমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

প্রকাশ থাকে যে, বড় হুজুরের সেদিনের স্বপ্ন আজ বাস্তব সত্য; হুজুর যেথায় শেষ শয্যায় শায়িত, স্বপ্নে দেখা উক্ত স্থানই ছিল মেহরাবের স্থান। বস্তুত দু'হজরতজীকে (হযরত মাওলানা হাজী মোস্তফা মাদানী (র.)-র দু'ছেলেকে বড় হযরতজী ও ছোট হযরতজী বলা হয়) তাদের উভয়ের মাযারকে শামিল করে নিয়ে রওযা বিরাজ করছে।

রওযার গম্বুজের মধ্যে বর্তমানে চারজন মহান বুযুর্গ শায়িত রয়েছেন। পশ্চিমের সর্বপ্রথম কবর ছোট হযরতজী মাখদুম নুরুদ্দীন মোকতাদা (র.)-র। দ্বিতীয় শায়খুল আরিফীন হযরত মাখদুম পীর আবূ নসর মোহাম্মদ আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.)-র। তারপর মুজাদ্দিদে জামান, আমীরে শরীয়ত, কুতুবুল 'আলম, মাখদুম আবু বকর সিদ্দিকী (র.)-ও, পূর্বদিকে চতুর্থ কবর ওলীয়ে-মাদারজাদ, সুলতানুল আরিফীন পীর মাখদুম নাজমুস্ সায়াদাত সিদ্দিকী (র.)-র; এবং গম্বুজের বাহিরে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সংযুক্ত ছাদবিশিষ্ট মাযার বড় হযরতজী মাখদুম মাওলানা অজিহুদ্দীন মোজতাবা (র.)-এর।

রওযা শরীফে প্রবেশ পথের বাম পার্শ্বে বাঁধানো কবর মুজাদ্দিদে জামান (র.)-এর পুণ্যময়ী আম্মাজানের এবং রওজা শরীফের দক্ষিণ দিকে তিনফুট উচ্চ থামচিহ্নিত কবর তাঁর ওয়ালেদ হাজী মাখদুম মাওলানা আবদুল মোক্তাদির (র.)-এর।
রওজা শরীফের উত্তর পার্শ্বে নারিকেল গাছের সন্নিকট বাঁধানো কবর মুজাহিদে মিল্লাত হযরত পীর মাখদুম আবদুল কাদের সিদ্দিকী (র.)-এর।
গম্বুজের ভিতরে ছোট হযরতজীর পশ্চিম ধারে মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর বড় আহলিয়া (র.)-এবং কয়েকজন শিশু সন্তানের কবর।[৫২৭]
এতদ্বতীত উক্ত মিয়া সাহেব মহল্লার গোরস্থানে বহু পীর-বুযুর্গ, 'আবেদ-'আবেদা, জাহিদা মহাত্মন ব্যক্তিগণের কবর বিদ্যমান।

প্রতিনিয়ত মাযার যিয়ারতে দেশ-বিদেশের অসংখ্য ভক্ত (আহ্লুল্লাহ্) ফয়েজপ্রাপ্ত হচ্ছেন। সে অপূর্ব সুধাপানে বিভোর হয়ে পতঙ্গের ন্যায় সালেক মানুষেরা যিয়ারত করে ফয়েজ হাসিল করে থাকেন।
ফুরফুরা রওযা শরীফ পবিত্র যিয়ারতগাহের অন্যতম আকর্ষণ। এর শান বর্ণনা করা আমার পক্ষে ধৃষ্ঠতা। তবে আমার চোখে বহু মহাত্মাকে দেখেছি মাযার যিয়ারতে তাদের বর্ণনাতীত হালাত। কানে শুনেছি, মহাত্মনগণের কার্যসিদ্ধির ঐকান্তিক সফলতা।
শির্ক তো দূরের কথা বিদ'আতের ছোঁয়াছ থেকে ফুরফুরা শরীফের রওযা পাক। শরিয়তপন্থী সুন্নাতের তাবেদার কোনো ব্যক্তি এ দরবারে ফয়েযইয়াব থেকে খালি নয়।

৫২৭. গম্বুজের ভিতরে প্রবেশ মুখে হাজী আবদুল বোরহান (র.)-এর কবর বিদ্যমান। উদ্ধৃত, মোঃ মোবারক আলী রহমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

অষ্টম অধ্যায়
পাকশী দারুস শরীয়ত কমপ্লেক্স ও মিরপুর দারুস্‌সালাম মার্কাজ
১ম পরিচ্ছেদ

মরহুম পীর হযরত মাওলানা আবু নসর মুহাম্মদ আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.)-এর অমর কীর্তি পাক্‌শী দারুস্‌ শরীয়ত দরবারে ফুরফুরা কমপ্লেক্স।

হাকীমুল ইনসান শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা আবু নসর মুহাম্মদ আবদুল হাই সিদ্দিকী আল-কুরাইশী (র.) তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা মুজাদ্দিদে যামান হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (র.)-এর কুর'আন সুন্নাহ্‌ ভিত্তিক মত ও পথ অনুসরণে এদেশবাসীকে হক হিদায়াতের তা'লীম ও তালকীন দেয়ার লক্ষ্যে পঞ্চাশ দশকে বাংলার গৌরব উজ্জল ঐতিহ্যবাহী পাক্‌শীতে প্রতিষ্ঠা করেন ফুরফুরার কায়িম মোকাম দারুস্‌ শরীয়ত খানকায়ে ফুরফুরা

অবস্থান ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা

পাবনা জেলার ঈশ্বরদী শহর থেকে তিন-চার মাইল দক্ষিণ কোণে পদ্মা নদীর পূর্ব পাড়ে ঐতিহাসিক পাকশীর অবস্থান। এ জেলার পশ্চিমে সলিলা পদ্মা প্রবাহিত। এ পদ্মা নদীর পূর্ব তীরে পাকশীর অবস্থান। এ জায়গার ইতহাস অতি প্রাচীন ও গৌরব গাথা। বৃটিশ অমলে ইংরেজরা এখানে এমন এক বৃটিশ স্থাপত্য কীর্তি স্থাপন করেন যা নাকি সমগ্র উপমহাদেশের দৃষ্টি কেড়ে নেয়। দেশে বিদেশে এর প্রশংসা ছড়িয়ে পড়ে। এ গৌরবান্বিত স্থাপত্য নিদর্শনের নাম 'হার্ডিঞ্জ ব্রিজ' (সারা সেতু)। বৃটিশ আমলের বড়লাট 'লর্ড হার্ডিঞ্জ' সাহেবের নামানুসারে এ সেতুর নামকরণ করা হয়। এ সেতু পৃথিবীর দীর্ঘ রেলওয়ে সেতুগুলির অন্যতম বলে সমাদৃত হতে থাকে। এর দৈর্ঘ্য হলো ৫,৮৯৩ ফুট।

পদ্মা অত্যন্ত প্রমত্ত নদী। এমন চঞ্চল স্রোত পৃথিবীর অতি অল্প সংখ্যক নদীতেই আছে। তাই এ সেতু নির্মাণ করতে বিশেষ বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন হয়েছিল। পদ্মার প্রবল স্রোতে সতুটির স্তম্ভগুলো যাতে অবিচল থাকে সে জন্য কোনো কোনো স্তম্ভ প্রায় ১৫০ ফুট মাটির নীচ থেকে গেথে তোলা হয়েছে। সেতুটি রক্ষার জন্য উভয় তীরে পাথরের প্রকান্ড বাঁধ দিতে হয়েছে। নদীর স্রোতের বেগ সংহত করার জন্য পার্শ্ব খাল খনন ও পানির মধ্যে 'পিরামিড' নির্মাণের প্রয়োজন হয়েছে। সেতুটি স্থাপত্য শিল্পের একটা শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে আজও সকল মহলে সমাদৃত।

এছাড়া পাকশীর অতীত ঐতিহ্যের মধ্যে আছে নর্থ বেঙ্গল পেপার মিল, যা বর্তমানে বন্ধ হয়ে গেছে। সম্প্রতি গড়ে ওঠা লালন শাহ সেতু ও ইপিজেড পাকশীর গুরুত্ব বহুলাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে। বন্ধ হয়ে যাওয়া পেপার মিলের ঠিক উল্টো দিকে এবং ইপিজেডের অতি নিকটে খানকাহ্‌ শরীফ কমপ্লেক্সর অবস্থান।

যাতায়াত

পাকশীর যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই উন্নত। সড়ক, রেল ও নৌপথে দেশের যে কোনো স্থান হতে সহজেই পাকশীতে পৌঁছা যায়। লালন শাহ সেতু হওয়াতে দেশের দক্ষিণাঞ্চল থেকে সরাসরি সড়ক পথে পাকশীতে আসা যায়। রাজধানী ঢাকা গাবতলী হতে যমুনা সেতু হয়ে মাত্র চার-পাঁচ ঘন্টায় পাকশী যাওয়া যায়।

কমপ্লেক্সের বিভিন্ন দিক

কমপ্লেক্সের প্রতিষ্ঠাতা হযরত আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.) দীন প্রচারের বহুমুখী কেন্দ্র হিসেবে এ কমপ্লেক্সকে গড়ে তুলতে শুরু করেন। ১৯৭৭ সালে ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত এ কমপ্লেক্সকে কেন্দ্র করে মস্‌জিদ, খানকাহ্‌, মক্তব, তা'লীমগাহ্‌, হুজরা, বার্ষিক ইসালে সওয়াব মাহফিলসহ বহুমুখী দীনি কর্মকান্ড পরিচালিত হতে থাকে। হযরত মাওলানা আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.)-এর ইন্তিকালের পর তাঁর সুযোগ্য বড় সাহেবজাদা ও গদ্দীনশীন শেরে ফুরফুরা হযরত মাওলানা আবুল আনসার মুহাম্মদ আবদুল কাহ্‌হার সিদ্দিকী (র.) এ কমপ্লেক্স কেন্দ্রিক

বহুমুখী ইসলামী দাওয়াতী কর্মকান্ড বহুদূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। সাড়ে বাষট্টি বিঘা জমিকে তিনি সম্প্রসারিত করে প্রায় একশত বিঘায় উন্নিত করেছেন। তাঁর সারা জীবনের সখ ছিল পাকশীতে একটি 'কুরআনী ইউনিভার্সিটি' প্রতিষ্ঠা করা। এ ব্যাপারে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে তিনি দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সরকারী অনুমতি পেতে তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত চেষ্টা করেছেন। কমপ্লেক্সের মস্‌জিদটি ভারতের হুমায়ুন টোম্বের আদলে তিন তলা ভিত দিয়ে পূণ:নির্মাণের কাজ তিনি ইন্তিকালের মাত্র বছর তিনেক আগে শুরু করেছিলেন। দু'তলা দু'টি মাদ্রাসা ভবন, মক্তব সেকশনের জন্য আলাদা একতলা দু'টি ভবন, মহিলা মাদ্রাসা ভবন, বোর্ডিং ভবন, দোতলা বাসভবন, পৃথক দোতলা মেহমান খানা, দোতলা দারুস্‌ শরীয়ত কুতুবখানা, দারুস্‌ শরীয়ত গেট, ভান্ডারখানা, দারুস্‌ শরীয়ত স্টেজ, বিভিন্ন ডিজাইনের কয়েকটি অজুখানা ও অসংখ্য টয়লেট, ইয়াতীমখানা, লিল্লাহ বোর্ডিং, দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদি তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। মরহুম পীর সাহেব হযরত মাওলানা আবুল আনসার মুহাম্মদ আবদুল কাহ্‌হার সিদ্দিকী (র.)-এর অমর কীর্তি হয়ে দাড়িয়ে আছে পাকশীর এ কমপ্লেক্স।[৫২৮]

ফুরফুরার কায়িম মাকাম বাৎসরিক
ওয়ায মাহফিল ও ইসালে সাওয়াব

পাকিস্তান ভারত বিভক্তির পর বাংলাদেশের মানুষের জন্য 'ফুরফুরা ইসালে সওয়াব' মাহফিলে যোগদান করা কষ্টসাধ্য হয়ে দাড়ায়, অনেকের জন্য অসম্ভব হয়ে পরে। এ অসুবিধা দূর করার জন্য শায়খুল ইসলাম আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.) ফুরফুরার অনুকরণে বাংলাদেশে 'ফুরফুরার কায়েম মোকাম ইসালে সওয়াব' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ উপলক্ষে তিনি জায়গা খুঁজতে থাকেন এবং পেয়েও যান মনের মতো জায়গা। পাকিস্তান হবার পর পরই নিলাম সূত্রে পাকশীতে ক্রয় করেন প্রায় সাড়ে বাষট্টি বিঘা জায়গা। এর পরই সর্বপ্রথম **১৯৫২** সালে এ জায়গায় ওয়াজ ও ইসালে সওয়াব মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এরপর থেকে প্রতি বছর এখানে ইসালে সাওয়াব মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। স্বয়ং শায়খুল ইসলাম আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.) এ মাহফিল পরিচালনা করতেন। ১৯৭৭ সনে তাঁর ইন্তিকালের পর হতে ২০০৬ সন পর্যন্ত তাঁর বড় সাহেবজাদা মরহুম পীর সাহেব হযরত মাওলানা আবুল আনসার মুহাম্মদ আবদুল কাহ্‌হার সিদ্দিকী (র.) এ মাহফিল পরিচালনা করে গিয়েছেন। তাঁর ইন্তিকালের পর গত ২০০৭ সন হতে অত্র মাহফিল পরিচালনা করছেন বর্তমান গদ্দীনশীন পীর হযরত মাওলানা আবু বকর আবদুল হাই মিশকাত সিদ্দিকী সাহেব।

প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই ইসালে সওয়াব মাহফিলের অনুষ্ঠান প্রতি বছর ফালগুন মাসের **১**ম শুক্রবার থেকে সোমবার বাদ ফজর পর্যন্ত চলতে থাকে। ২০০৫ সাল থেকে উক্ত তারিখ পরিবর্তিত করে ফালগুন মাসের প্রথম বুধ, বৃহস্পতি, শুক্রবার এবং শনিবার ফজরবাদ আখেরী মুনাজাত ধার্য্য করা হয়। এ ঐতিহ্যবাহী মাহফিলে বাংলাদেশ ও ভারতসহ বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ মুসলমান শরীক হয়ে থাকেন। উল্লেখ্য যে, ইসালে সওয়াব অর্থ সাওয়াব পৌঁছানো। এ মাহফিলে কুর'আন হাদীসের আলোকে আলোচনা, দান-খয়রাতসহ সমস্ত নেক আমলের ওসিলা করে তামাম নবী-রাসূল (আ.), সাহাবা (রা.), পীর মাশায়েখসহ সকল মু'মিন মু'মিনাতদের রূহ মোবারকে সাওয়াব পৌঁছে দেয়ার জন্য দু'আ করা হয়। উক্ত মাহফিলে বাংলদেশ ও ভারতসহ বিভিন্ন দেশের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ওলামা, খুলাফা ও পীর মাশায়েখগণ ওয়াজ নছীহত করে থাকেন। কয়েকমাস আগে থেকে শুরু হয় প্রস্তুতি। লক্ষ লক্ষ লোকের জন্য কমপ্লেক্সের আশপাশের পুরো এলাকা সমতল করে মাঠ তৈরী করা হয়। বিশাল এলাকা জুড়ে টানানো হয় সামিয়ানা। তৈরী হয় অসংখ্য অস্থায়ী টয়লেট ও ওযুর ব্যবস্থা। মাহফিলে আগতদের বাস রাখার জন্য থাকে কয়েকশ বাস রাখার উপযোগী বিশাল মাঠ। অনেকে নিজস্ব তাবুও নিয়ে আসেন। ভান্ডার খানায় রান্না হয় লক্ষ লক্ষ লোকের দুপুরের খাবার। মাহফিলে প্রথম তিন দিন দুপুরে আগত সকল মেহমানদের খানা খাওয়ানো হয়। এসব কাজে শত শত স্বেচ্ছা সেবকগণ নিয়োজিত থাকেন।

হযরত পীর সাহেব হুযূর সাধারণত প্রতিদিন মাগরিব বাদ, কখনও ফজরবাদ বা অন্য যে কোনো সময় ওয়াজ নসীহত করে থাকেন। বাংলাদেশ ও ভারতের শীর্ষস্থানীয় ওলামা মাশায়েখগণ এ মাহফিলে তাশরীফ আনেন এবং ওয়াজ নছীহত করেন। শনিবার ফজরবাদ অনুষ্ঠিত আখেরী মুনাজাতে মুসলিমদের মাঝে একতা, সংহতি

---

৫২৮. আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৯

ও কল্যাণের জন্য বিশেষভাবে দু'আ করা হয়। জনাব পীর সাহেব হুযূর আখিরী মুনাজাত পরিচালনা করেন। কাবাশরীফ ও মদীনার রওজার গম্বুজ ও মিনারার আদলে নির্মিত দারুস শরীয়ত স্টেজ হতে মাহফিল পরিচালনা ও ওয়াজ নছীহত করা হয়।[৫২৯]

জৈষ্ঠ্য মাসের ইসালে সাওয়াব

ফুরফুরার পীর হাকীকতে খলীফাতুল্লাহ্ পরতাপে কাইউমুজ্জামান (বড় হুযূর) হযরত মাওলানা আবু নসর মুহাম্মাদ আবদুল হাই সিদ্দিকী আল কুরাইশী সাহেব (র.) এর স্মরণে ত্রৈ-মাসিক তা'লীমী মাহফিল ও মুবাল্লিগ সম্মেলন প্রতি বছর জৈষ্ঠ্যমাসের শেষ বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মাহফিলে আত্মশুদ্ধি মূলক তা'লীম, কুর'আন হাদীস মুতাবিক আলোচনাসহ উপস্থিত মুরীদানদের প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করা হয়।

রিয়াজুল জান্নাত মস্‌জিদ

রিয়াজুল জান্নাত মস্‌জিদ ভবন এ কেন্দ্রের প্রধান আকর্ষণ। ওয়াজ নছীহত ও যিক্‌র-আযকার এ ভবনকে কেন্দ্র করেই হয়ে থাকে। বছরের অধিকাংশ সময় কোনো না কোনো মাহফিল এ ভবনকে মুখরিত করে রাখে। সত্তর দশকে এ ভবনের মূল ডিজাইন করেন বড় হুযূর হযরত মাওলানা আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.)। এ বিশাল ভবন সর্বমোট ১০০ টি স্তম্ভের ওপর স্থাপিত। ভবনের দৈর্ঘ্য একশত দশ ফুট, প্রস্থ একশত দশ ফুট। ভবনের মাঝখানে ৩৫৭ বর্গফুট জায়গা জুড়ে গম্বুজ রয়েছে। চারদিকে চারটা মিনার ভবনটিকে অপূর্ব শোভা দান করেছে।

গত ২০০৩ সালে মরহুম পীর সাহেব হুজুর (র.) এ মস্‌জিদের সংস্কার ও উন্নয়ন করে ভারতের বিশ্ববিখ্যাত স্থাপত্যকর্ম হুমায়ুন টোম্বের নকশায় তিনতলা বিশিষ্ট এই মস্‌জিদ কমপ্লেক্সের পূন:নির্মাণ ও সংস্কার কাজ শুরু করেন। মিনার চারটি ঠিক রেখে বাকী অংশ ভেঙ্গে একই ভিত্তির ওপরে মাঝখানের অংশ ৬০ ফুট দৈর্ঘ্য ও ৬০ ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট তিনতলা ভবন নির্মাণ করেন। তার ওপরে একশত পঞ্চাশ ফুট ব্যাস ও পঞ্চাশ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট বিশাল আকৃতির গম্বুজ নির্মাণ করেন। মস্‌জিদের বাকী অংশ এক তলা রেখে বহি:ভাগে হুমায়ুন টোম্বের আদলে অনিন্দসুন্দর আর্চ নির্মাণের পরিকল্পনা করেন। মরহুম হুযূরের ইন্তিকালের পর বর্তমান গদ্দীনশীন পীর হযরত আবূ বকর আবদুল হাই সিদ্দিকী সাহেব বাকী কাজ সমাপ্ত করার জন্য পূর্ণোদ্যমে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।[৫৩০]

দারুস্ শরীয়ত স্টেজ

মরহুম পীর সাহেব হুযূর (র.) ১৯৯৫ সালে পাঁচ কোণা বিশিষ্ট অনিন্দ সুন্দর এ স্টেজটি নির্মাণ করেন। স্টেজের ছাদে নির্মাণ করা হয়েছে মক্কার কাবা শরীফ এবং মিনারাসহ মদীনার রওজা শরীফের গম্বুজের প্রতিকৃতি। বাংলার যমিনে এ নতুন ধরনের দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্য দ্বিতীয়টি পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। স্টেজের নীচে আন্ডারগ্রান্ডে একটি কক্ষ আছে। মাহফিলের সময় মাইক ও বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণের কাজে কক্ষটি ব্যবহৃত হয়। মাহফিলের সময় এ স্টেজ থেকেই ওয়ায নছীহত ও মাহফিল পরিচালিত হয়।[৫৩১]

দারুস্ শরীয়ত কুতুবখানা

আগ্রার তাজমহল কমপ্লেক্সের একটি স্থাপনার অনুকরণে মরহুম পীর সাহেব হুযূর (র.) কর্তৃক প্রণীত নকশায় আটকোণা বিশিষ্ট কুতুবখানা ভবনটি নির্মিত হয় ২০০০ সালে। এ ভবনটির দৈর্ঘ্য পয়ত্রিশ ফুট, প্রস্থও পয়ত্রিশ ফুট, জমিন থেকে উচ্চতা পনের ফুট, চার পাশের ব্যাস সত্তর ফুট। অনিন্দ সুন্দর গম্বুজটি এ ভবনের শোভা বর্ধন করেছে। ভবনের আন্ডারগ্রাউন্ড হিফজখানা ও উপরিবাগ কমপ্লেক্সের কুতুবখানা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। চার পাশের বারান্দায় বসার ও নমাজ পড়ার ব্যবস্থা আছে।

---

৫২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫১
৫৩০. মাওলানা রুহুল কুদ্দুস ও সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২
৫৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩

শরীয়তে ইসলাম গেইট

এ কেন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অকর্ষণ সু-উচ্চ সুন্দর গেইট। এ গেইট স্থাপত্য শিল্পের একটি অপূর্ব নিদর্শন। পাকশী খানকায় যত লোক এসে হাজির হন, প্রথম নযরেই এ গেইট তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কমপ্লেক্সের উত্তর পাশে প্রধান প্রবেশ পথে এ গেইট নির্মাণ করা হয়েছে। গেইটের ডিজাইনারও স্বয়ং জনাব হযরত পীর সাহেব (র.)। গেইটটি ত্রিশ ফুট উঁচু ও প্রস্থ পঁচিশ ফুট।

অর্ধচন্দ্রাকার ভবন

১৯৯০ সালে মরহুম পীর সাহেব হুযূর (র.) একশত চল্লিশ ফুট দৈর্ঘ্য ও বাইশ ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট অর্ধচন্দ্রাকার একটি দোতলা ভবন নির্মাণ করেন। এখাণে পীর সাহেব হুযূরগণ ও বিশিষ্ট মেহমানদের অবস্থানের ব্যবস্থা আছে। এ ভবনের পূর্ব প্রান্তে যেখানে বসে মরহুম পীর সাহেব হুযূর দর্শনার্থীদের সাথে দেখা সাক্ষাত করতেন, সেখানে নির্মিত খিলানাকৃতির অপূর্ব সুন্দর আর্চ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।[৫৩২]

মেহমানখানা

মরহুম পীর সাহেব হুযূর (র.) কর্তৃক নির্মিত সত্তর ফুট দৈর্ঘ্য ও বত্রিশ ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট আধাপাকা একটি ভবন বর্তমানে মেহমানখানা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বাসভবন (মহল)

সত্তর দশকে শায়খুল ইসলাম বড় হুযূর হযরত আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.) ষাট ফুট দৈর্ঘ্য ও ষাট ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট একটি একতলা বাসভবন নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে মরহুম পীর সাহেব হুযূর এ ভবন সম্প্রসারিত করে দোতলা নির্মাণ করেন। বর্তমানে এ ভবনে সেজ ও ছোট হুযূর বসবাস করেন। ২০০৫ সালে মরহুম পীর সাহেব হুযূর ষাট ফুট দৈর্ঘ্য ও ষাট ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট প্রথম একটি দোতলা বাসভবন নির্মাণ করেন।

অযুখানা

খানকাহ্ শরীফের মূল ভবনের পূর্ব পার্শ্বে গোলাকার দু'টি ও লম্বা একটি, পশ্চিম পার্শ্বে চারকোণা আয়তকার বিশাল আকৃতির দু'টি অযুখানা নির্মিত হয়েছে। যার সাথে ডিপ টিউবওয়েল মেশিনের পানির লাইন সংযুক্ত আছে। ১৯৯০ সালে অযু, গোসল ও অন্যান্য কাজে প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহের জন্য কমপ্লেক্সের মধ্যে এ টিউবওয়েলটি মরহুম পীর সাহেব হুযূর স্থাপন করেন। বাৎসরিক মাহফিলের সময় লক্ষ লক্ষ মানুষ এসব অজুখানায় যাতে করে স্বাচ্ছন্দে অযু করতে পারেন সে দিকে দৃষ্টি রেখেই এগুলো নির্মাণ করা হয়েছে। এগুলো ছাড়াও কমপ্লেক্সের চারদিকে বিক্ষিপ্তভাবে আরও বেশ কিছু অযুর জায়গা রয়েছে।

সান বাঁধানো পুকুর

এ কেন্দ্রের আরেকটি আকর্ষণ পুকুর। মাহফিলের সময় এ পুকুরে আগত মেহমানরা গোসলের কাজ সম্পন্ন করেন। তাছাড়া অতিরিক্ত ভিড়ের সময় অযুর জন্যও এ পুকুরকে ব্যবহার করা হয়। সান বাঁধানো ঘাট আছে বলে এ পুকুর সবার কাছে দারুন প্রিয়।

ভান্ডারখানা

মাহফিলের সময় এ ভান্ডরখানায় বিভিন্ন জায়গা থেকে নিয়ে আসা খাদ্য সামগ্রী মওজুদ রাখা হয়। প্রয়োজন মতো পাকের জন্য এ ভান্ডারখানার সাথেই পাকের জায়গা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। মাহফিলের সময় প্রতিদিন দুপুরে কম করে হলেও কয়েকশ ডেগ তাবাররুক পাক করে মেহমানের মাঝে বিতরণ করা হয়।

টয়লেট

---

৫৩২. প্রাগুক্ত

এ ইসলামিক কেন্দ্রে বাৎসরিক মাহফিলের সময় কয়েক লক্ষ লোকের আগমন ঘটে। আগত মেহমানদের যাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয় সে দিকে দৃষ্টি রেখে কমপ্লেক্সের চারপাশে এক শতটিরও অধিক পাকা টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া মাহফিলের সময় অস্থায়ীভাবে আরও কয়েকশত কাঁচা টয়লেট নির্মাণ করা হয়।

ফসলের মাঠ

প্রায় একশত বিঘা জায়গার ওপর প্রতিষ্ঠিত খানকাহ্‌র অধিকাংশ এলাকা জুড়ে সবুজ ধানক্ষেত এ প্রতিষ্ঠানের শোভাকে অনিন্দ সুন্দর রূপ দিয়েছে। ফসলের জমি এ কেন্দ্রের অন্যতম আয়ের উৎস। কয়েক বছর ধরে অর্ধেকেরর বেশী জমিতে ফসলের চাষ করা হচ্ছে।

কমপ্লেক্সের শিক্ষা প্রাতষ্ঠান

ষাটের দশকে প্রখ্যাত 'আলিমে দীন ভারতের ফুরফুরা আলীয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন অধ্যক্ষ হযরত মাওলানা মোস্তফা সাহেব (দামাত বারাকাতুহুমুল 'আলিয়াহ) হুযূরের নেতৃত্বে ছোটদের জন্য মক্তব ও বয়স্কদের জন্য তা'লীমের কাজ পরিচালনা করেন। ১৯৮৮ সালে মরহুম গদ্দীনশীন পীর সাহেব (র.)-এর নির্দেশে আলহাজ মুহাম্মদ আবুল কাশেম ফকীর সাহেবের তত্ত্বাবধানে এবং প্রধান শিক্ষক মাষ্টার মুহাম্মদ আবদুল মান্নান সাহেবের নেতৃত্বে আলিয়া মাদ্রাসা চালু হয়। পরবর্তীতে আমাদের পীর ও মুর্শিদ বিশ্ব মুসলিম ঐক্যের প্রতীক, সুন্নাতে রাসূলের আশেক, খাঁটি দীন পিপাসু মরহুম গদ্দীনশীন পীর এদেশের মুসলমানের সন্তান তথা তাঁর মুরীদের ছেলেদেরকে খাঁটি নায়েবে নবী ও 'ইলম ধারী 'আলিম তৈরীর লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালের শেষ ভগে মুহতামীম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ ইদ্রীস আলী সাহেবের তত্ত্বাবধানে দরসে নিজামী ও আলীয়ার সমন্বয়ে বেফাকুল মাদারিসিল 'আরাবিয়া কওমী বোর্ড-এর অধীনে দাওরাতুল হাদীস ও বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে 'আলিম পর্যন্ত পাঠ দান চালু করেন। যা অদ্যাবধি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে।[৫৩৩]

অত্র মাদ্রাসার সিলেবাস প্রণয়নে ও সার্বিক পরামর্শে রয়েছেন পীর সাহেব হুযূর (র.)-এর সুযোগ্য সেজ জামাতা বহু গ্রন্থ প্রণেতা কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল হাদীস বিভাগের প্রাক্তন সহযোগী অধ্যাপক সৌদি আরবের আল ইমাম ইউনিভার্সিটি থেকে পি এইচ. ডি. ডিগ্রীধারী মরহুম ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব।

শিক্ষা পদ্ধতি

১. শিশু শ্রেণী হতে দশ বছরে কওমী বোর্ডের অধীনে দাওরাতুল হাদীস পরীক্ষা দেয়া এবং বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের আওতায় দাখিল এবং পরবর্তী দু'বছরে 'আলিম পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।
২. হাফেজে কুর'আন বা অষ্টম শ্রেণী সমমান বা তদুর্ধ্ব মেধাবী ছাত্রদেরকে শর্ট কোর্সে মাত্র ছয় বছরে দাওরাতুল হাদীস পরীক্ষা দেওয়ানোর ব্যবস্থাসহ উপরোল্লিখিত নিয়মে দাখিল ও 'আলিম পর্যন্ত পড়ানোর ব্যবস্থা নেয়া হয়।

প্রতিষ্ঠানের বর্তমান বিভাগ সমূহ

১. মহিলা মাদ্রাসা,
২. হিফ্য বিভাগ,
৩. মক্তব বিভাগ,
৪. সর্ট কোর্সে দাওরা বিভাগ,
৫. আলীয়া সিলেবাস অনুযায়ী 'আলিম পর্যন্ত,
৬. ইয়তীমখানা ও লিল্লাহ বোর্ডিং,
৭. মুসাফির খানা,
৮. দাতব্য চিকিৎসালয়,

---

৫৩৩. ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *ফুরফুরার পীর আল্লামা আবু বকর সিদ্দিকী (র.) আল মাউজু'আত* (ঝিনাইদহ: আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২০০৯ খ্রী.), পৃ. ৫৮

৯. দারুল আয্কার বিভাগ।[৫৩৪]

প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য

১. যুগোপযোগী উন্নতমানের শিক্ষাদানের লক্ষ্যে সৌদি আরবের আল ইমাম ভার্সিটির আরবী ভাষা কোর্সসহ দরসে নিজামী ও আলীয়ার সিলেবাস অনুযায়ী সকল ছাত্র-ছাত্রীকে পাঠদানের ব্যবস্থা এবং বাংলাদেশ বেফাকুল মাদারিসিল ‘আরাবিয়্যাহ্ ও বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড-এর অধীনে যথাক্রমে দাওরাতুল হাদীস এবং দাখিল ও ‘আলিম পর্যন্ত পরীক্ষা দেওয়ানো।

২. কুর’আন ও হাদীসের জ্ঞানে বিজ্ঞ ‘আলিম এবং সুন্নাতের তাবেদারীর মাধ্যমে খাঁটি নায়েবে নবী তৈরী করা।

৩. ছাত্র-ছাত্রীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক ও শিক্ষিকা মন্ডলী দ্বারা সার্বক্ষনিক তত্ত্বাবধানে সমস্ত বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা।

৪. ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পৃথক পৃথকভাবে আবাসিক ব্যবস্থাপনায় পাঠ দান করা।

মাদ্রাসার ভবন সমূহ

মরহুম পীর সাহেব হুযূর মাদ্রাসার জন্য নব্বই ফুট দৈর্ঘ্য ও চব্বিশ ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট দু’টি দোতলা ভবন নির্মাণ করেন। দু’টি ভবনে মোট চব্বিশটি কক্ষ রয়েছে। প্রতিটি কক্ষের সামনে রয়েছে প্রশস্ত বারান্দা। কমপ্লেক্সের প্রধান গেইট (দারুস্ শরীয়ত গেইট) দিয়ে ঢুকতে দু’পাশে দু’টি ভবন অবস্থিত।

এছাড়া মরহুম হুযূর (র.) একশত ত্রিশ ফুট দৈর্ঘ্য ও চব্বিশ ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট আধাপাকা একটি টিনশেড বিল্ডিং মাদ্রাসার জন্য নির্মাণ করেন, যা বর্তমানে ছাত্রাবাস হিসেবে ব্যবহৃহ হচ্ছে। তাছাড়া বাংলা (খ) অক্ষরের আকার বিশিষ্ট একশত চল্লিশ ফুট দৈর্ঘ্য ও পঁচিশ ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট আধাপাকা টিনশেড বিল্ডিং নির্মাণ করেন। যাতে বর্তমানে আবাসিকভাবে সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে মক্তবখানা পরিচালিত হচ্ছে।

মহিলা মাদ্রাসা

মরহুম পীর সাহেব হুযূর (র.) এ কমপ্লেক্সে একটি মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এ মাদ্রাসাটিতে মিজান জামাত ও পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাদান করা হয়। ২০০৩ সালে নির্মিত আশি ফুট দৈর্ঘ্য ও চল্লিশ ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট একটি আধাপাকা টিনশেড বিল্ডিং-এ মহিলা মাদ্রাসার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

খাবার ঘর ও রান্না ঘর

একশত পঞ্চাশ ফুট দৈর্ঘ্য ও বিশ ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট একটি আধাপাকা বিল্ডিং-এর একাংশ খাবার ঘর ও অপরাংশ রান্না ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। খাবার ঘরে এক সাথে কয়েকশত ছাত্র বসে খাওয়া দাওয়া করতে পারে।[৫৩৫]

---

৫৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০
৫৩৫. আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬

২য় পরিচ্ছেদ

হযরত মাওলানা আবদুল কাহ্হার সিদ্দিকী (র.)-এর শ্রেষ্ঠ অবদান দারুস সালাম মার্কাজে ইশা'আতে ইসলাম কমপ্লেক্স।

গোড়ার কথা

একটু পেছনের দিকে যাওয়া যাক। সবে মাত্র বৃটিশ শাসনের অবসান হয়েছে। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের বুকে উড়ছে স্বাধীনতার বিজয় পতাকা। ভারত-পাকিস্তান দুটি নবীন রাষ্ট্র নিজেদের ঘরকে মযবুত করার কাজে ব্যস্ত। ঠিক তখনকার কথা। ফুরফুরার বড় হুযূর হযরত মাওলানা আবু নসর মুহাম্মদ আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.) নতুনভাবে বাংলা-ভারতে দীনের প্রচার ও প্রসারের কাজে তৎপর। কীভাবে কাজ চালালে হকের প্রচার ও প্রসার অতি সহজ হবে– সেদিকেই তাঁর খেয়াল। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন – এতদিন দেশ একটা ছিল, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের অবাধ বিচরণ ছিলো। এখন দেশ দু'ভাগে ভাগ হওয়াতে দুদেশের মানুষ দুটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের (তৎকালীন) মানুষ ফুরফুরা থেকে বঞ্চিত। তারা আর আগের মতো ফুরফুরা যেতে পারছে না। এতসব চিন্তার মাঝে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন- এ অঞ্চলে এমন একটি 'ইসলামী কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা করবেন, যেখানে এলে মানুষ হিদায়েতের নূর পাবে। তাঁর সে স্বপ্ন থেকেই শুরু হলো কাজ।

জমি ক্রয়

১৯৬০ সনে ঢাকার গাবতলী সংলগ্ন বাগবাড়ী বাজারে হযরত আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.) এক মাহফিলে তাশরীফ আনলেন। উক্ত মাহফিল ইন্তেজাম করেন মরহুম হাজী আবদুল আজিজ সাহেব। তখন ছিল বর্ষাকাল। নৌকা যোগে যাওয়ার সময় বড় সয়েক (বর্তমানে দারুস্ সালাম)-এর কাছে নৌকাটা থামাতে বলেন হুযূর। কিছুক্ষণ মোরাকাবার হালাতে ধ্যানমগ্ন থাকেন। এরপর হাজী আবদুল আজিজ সাহেবকে বলেন–"হাজী সাহেব, এ জায়গাটা আমাকে কিনে দেয়ার ব্যবস্থা করেন।"[৫৩৬]

সফর শেষ করে আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.) ভারত চলে গেলেন। হাজী আবদুল আজিজ সাহেব তাঁর ভগ্নিপতি দলিল লিখক আবদুল আউয়াল সাহেব ও মেয়ের জামাই মির্জা মফিজ উদ্দিন সাহেব (৫৩ নয়া পল্টন নিবাসী) কে নিয়ে উক্ত জমির মালিকদের সাথে যোগাযোগ করলেন। দারুস্ সালামের বড়, মেজ ও ছোট মাতবর ছাড়াও আরও অনেকের জমি ছিল সেখানে। ৩০০/= হতে ৫০০/= টাকা পাকি দরে অধিকাংশ জমি খরিদ করা হলো। কদম আলী নামে এক ব্যক্তি বেঁকে বসলো, লাখ টাকা দিলেও জমি বিক্রি করবে না। আল্লাহ্র কি শান! কিছুদিন পর লোকটি স্বেচ্ছায় এসে ৭০০/= টাকা পাকি দরে তাঁর জমিটুকু হুযূরের নামে রেজিষ্ট্রি করে দিয়ে গেল। মোট সাড়ে একুশ পাকি জমি কেনা হলো। পুরোটাই তখন ধান, শাকসব্জি ও আখের ক্ষেত। বর্ষাকালে ১০ থেকে ১৫ ফুট পানিতে ডুবে যেত। রেজিষ্ট্রি ও যাবতীয় খরচসহ দাম পড়লো ১৭,৫০০/= (সতের হাজার পাঁচ শত) টাকা। পুরো জমিই হযরত মাওলানা আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.)-এর নামে রেজিষ্ট্রি করা হয়।
১৯৬২ সনে হযরত আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.) ঢাকায় তাশরীফ আনলেন। হাজী আবদুল আজিজ সাহেবের নিকট জমি খরিদ করা হয়েছে কিনা জানতে চাইলেন। খরিদ করা হয়েছে যেনে অত্যন্ত খুশি হলেন। হাজী আবদুল আজিজ সাহেব জমির মূল্য নিতে না চাইলে হুযূর এক রকম জোর করেই তাকে জমির মূল্য প্রদান করলেন। ঐ বছরই অর্থাৎ ১৯৬২ সনে বড় হুযূর দারুস সালামে ক্রয়কৃত নতুন জমিতে ঈদুল আযহার নামায পড়লেন, লাল ও কালো রং-এর দু'টো বড় গরু কোরবানী দিলেন এবং ইসালে সাওয়াব মাহফিলের ইন্তেজাম করলেন।[৫৩৭]

৫৩৬. আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬
৫৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৮

স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন

হযরত মাওলানা আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.) মূলতঃ জায়গা ক্রয় করে গিয়েছিলেন। খানকাহ্ তথা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় তিনি এর চেয়ে বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেননি। হায়াতী জীবনে তাঁর স্বপ্ন শুধু জায়গা ক্রয়ের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিলো। তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁরই যোগ্যতম উত্তরাধিকারী হিসেবে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল কাহ্হার সিদ্দিকী (র.) তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। পিতার জীবনের শ্রেষ্ঠ আকাংখাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য তিনি নিজের জানমাল কুরবান করে দিন রাত কাজ করে গিয়েছেন। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে দারুস্ সালাম আজকের রূপ লাভ করেছে।

জনাব পীর সাহেব প্রায়ই বলতেন, "আমার ওয়ালেদ সাহেব বড় হুযূর (র.) বলতেন–বাবা, আমি দারুস্ সালামে তাজমহলের নকশায় খানকাহ্ করবো।" আবদুল কাহ্হার সিদ্দিকী সাহেব যখনই একথা স্মরণ করতেন, তখনই তাঁর চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি ঝরতে থাকতো। হযরত পীর সাহেব আরো বলতেন– "দারুস্ সালাম আমার বাপের স্বপ্ন।"[৫৩৮] একথা বলেই তাঁর চোখ দিয়ে পানি ঝরতে থাকতো। চেহারা মুবারকে ব্যাথার ছাপ ফুটে উঠতো।

দারুস্ সালামে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার শুরুতেই হযরত আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.) তাঁর বড় ছেলে হযরত আবদুল কাহ্হার সিদ্দিকী সাহেবের সাথে কেন্দ্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করতেন। হযরত বড় হুযূর আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.)-কে মাহান আল্লাহ্ হয়তো জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁর অন্তরের একান্ত আশা তাঁর এই সুযোগ্য সন্তানের দ্বারা সম্পন্ন হবে। তাই তিনি তাঁর বড় সাহেবজাদাকে দারুস্ সালাম কেন্দ্রের সব দিক সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান দান করে যান।

১৯৭৭ সালে যখন হযরত আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.) ইন্তিকাল করেন, তখন সকল দায়দায়িত্ব মরহুম পীর আবদুল কাহ্হার সিদ্দিকী (র.)-এর কাঁধে এসে যায়। সিংহের ঘরে যেমন সিংহই হয়, তেমনি পূর্ণ যোগ্যতা নিয়ে তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সকল দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। দায়িত্ব প্রাপ্তির পরেই তিনি দারুস্ সালামের দিকে নজর দেন এবং "ইসলামী কেন্দ্র" প্রতিষ্ঠার সকল উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

দারুস্ সালাম তখন অত্যন্ত নীচু জায়গা ছিলো। কোটি কোটি টাকার মাটি দিয়ে ভরাট করে তার উপর নির্মাণ কাজ শুরু হয়। সকল বাঁধাকে অতিক্রম করে প্রতিষ্ঠিত হয় আজকের এ বিশাল ইসলামী কেন্দ্র মার্কাজে ইশা'আতে ইসলাম। হযরত পীর সাহেব মার্কাজের জন্য তাঁর সব হাদীয়া-নজর নিজের পরিবার পরিজনদের জন্য জমা না রেখে অকাতরে বিলিয়ে দিতেন। প্রথম দিকে হযরত পীর সাহেব (র.)-এর বাড়ীতে কারেন্ট ছিলো না। চেষ্টা করলেই তিনি কারেন্ট আনতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে ঘরে মোমবাতি জ্বালাবার নির্দেশ দেন এবং কারেন্ট আনার টাকা মার্কাজের নির্মাণ কাজে ব্যয় করেন। সারাটি জীবন তিনি তাঁর হাদিয়া-নজর এর প্রায় সবটাই দীনের কাজে খরচ করে গিয়েছেন। খুব সামান্যই তিনি সংসার নির্বাহের জন্য নিজের কাছে রাখতেন।

মরহুম পীর সাহেব (র.) জীবনে যতো কাজ করেছেন সব কাজই মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য করার দৃঢ় নিয়ত করে নিয়েছিলেন। দারুস্ সালামে যতো নির্মাণ কাজ হয়েছে সব কিছুর মাঝেই এ বিশুদ্ধ নিয়ত কাজ করেছে। তিনি এ নেক নিয়ত থেকে চুল পরিমাণ বিচ্যুত হওয়াকেও কোনো ভাবেই প্রশ্রয় দিতেন না। এ প্রসঙ্গে দারুস্ সালামের রাজমিস্ত্রী আবদুল গফুর একটি ঘটনা বর্ণনা করেন।

দারুল আয্‌কার খানকাহ্‌র পশ্চিম দিকের প্রধান সিঁড়ি জমিন থেকে চন্দ্রাকৃতির করে প্রথমে নির্মাণ করা হয়। নির্মাণের পর হযরত পীর সাহেব (র.) তা দেখে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, মুসল্লী ভাইয়েরা নামাজ পড়তে পারবে না। সিঁড়িটা শুধুই খানকাহ্ শরীফে উঠা-নামার কাজে লাগবে। তা কি করে হয় ? তাই তিনি সিঁড়িটা ভেঙ্গে নতুন করে গড়ার জন্য হুকুম করলেন। তখন সে সিঁড়িটা সোজা করে তৈরী করা হলো। ফলে আল্লাহ্‌র বান্দারা মাহফিলের সময় প্রয়োজন হলে সিঁড়িতে নামাজ আদায় করতে পারেন।[৫৩৯]

মার্কাজের মূল ভবন তাজমহলের নকশার অনুকরণে নির্মাণ করা হয়েছে। এ ছাড়া দারুস্ সালামে যতো নির্মাণ কাজ হয়েছে তার সবই মরহুম পীর সাহেব হুযূরের পছন্দমতো নকশায় হয়েছে।

---

৫৩৮. কুরআন হাদীস রিসার্চ সেন্টার, *সংবাদ পত্রের পাতায় ফুরফুরার পীর হযরত আবদুল কাহহার সিদ্দিকী* (ঢাকা: ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, ২০০৯খ্রী.), পৃ. ৩৩

৫৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

বাংলার তাজমহল

বাদশাহ শাহ্জাহান তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী মমতাজ মহলের প্রতি গভীর ভালোবাসার নিদর্শন স্বরূপ আগ্রার তাজ মহল নির্মাণ করেছিলেন। আজও তা ভারতের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আর ফুরফুরার হযরত পীর সাহেব (র.) মহান আল্লাহ্ পাকের প্রতি অফুরন্ত মুহাব্বাতের নিদর্শন স্বরূপ এ 'বাংলার তাজমহল' হিসেবে খ্যাত 'মার্কাজে ইশা'আতে ইসলাম' গড়ে তুলেছেন।

চার কোণে চারটা সুন্দর মিনার আর মাঝে একটা অপূর্ব বিশাল গম্বুজ কেন্দ্রের শোভাকে পূর্ণতা দান করেছে। মুসলিম স্থাপত্য কলার এ এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বিশাল এ কেন্দ্রের মূল ভবনের আয়তন (২২৮ ফুট × ১৯৫ ফুট) ৪৪,৪৬০ বর্গফুট যা ২২৮ টি পিলারের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। মূল ভবন চত্তরে ৪০ থেকে ৫০ হাজার লোকের এক সাথে বসে ওয়াজ শুনার সুবন্দোবস্তো রয়েছে। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এ কেন্দ্রের পূর্ব , পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকটা এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলার পুরোটা মাদ্রাসার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ ভবনের চার কোণের ছাদ ইংরেজী (L) আকৃতির মতো করে মস্জিদে নববী-এর অনুকরণে উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। দক্ষিণ পূর্ব কোণে কবরস্থানের জন্য স্থান নির্বাচন করা হয়েছে। ভবনের মাঝে তিন তলা দালানের ওপর অপূর্ব ডিজাইনে প্রধান গম্বুজ নির্মিত হয়েছে। গম্বুজে শ্বেত পাথর লাগানো হয়েছে। প্রধান গম্বুজের চার পার্শ্বে চারটা ছোট গম্বুজ রয়েছে। নীচে চারপাশে বহু সংখ্যক খিলান (আর্চ) কেন্দ্রের শোভাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে।
১৯৫১ সালের কথা। মরহুম পীর সাহেবের বড় সাহেবজাদা বর্তমান গদ্দীনশীন পীর হযরত মাওলানা আবু বকর মুহাম্মদ আবদুল হাই মিশকাত সিদ্দিকী তখন ছোট। বয়সে তিনি কি সাড়ে তিন বছরের হবেন। শীতের এক স্নিগ্ধ সকালে এ কচি শিশু আজকের এ বিশাল কেন্দ্রের ভিত রচনা করেন। নিজের নামকে স্থায়ীভাবে স্মরণীয় ব্যক্তিবর্গের কাতারে অন্তর্ভুক্ত করেন। আর সেদিন থেকেই শুরু হয় বহু আকাংখিত দারুস্ সালাম কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ।
এ সময় মরহুম হযরত পীর সাহেব (র.) নিজে মাথায় করে মাটি ও ঢালাইয়ের শুরকি বহন করেছেন। কখনও কোদাল দিয়ে মাটি কেটেছেন। কখনও বড় ওযনী নিয়ে মাটি দাবিয়ে সমান করেছেন। তাঁকে সহযোগিতা করেন মার্কাজ কমিটির সদস্যবর্গ।[৫৪০]

বহুমুখী দীনি কার্যক্রম

এ প্রতিষ্ঠান একটা পরিণত ও স্বয়ং সম্পূর্ণ দীন প্রচার কেন্দ্র। মহান আল্লাহ্ পাকের একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য এ কেন্দ্র সর্ববিধ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এটাকে কমপ্লেক্স বলা হয় এ কারণে যে, অনেকগুলো দীনি প্রতিষ্ঠান ও কার্যক্রম এ প্রকল্পের অধীন। যেমন– মস্জিদ, দরসে নেজামী মাদ্রাসা, হিফ্য খানা, মক্তব, মহিলা মাদ্রাসা. কিন্ডরগার্টেন মাদ্রাসা তারবিয়াতুল মিল্লাত একাডেমি, ইয়াতিমখানা, লিল্লাহ বোর্ডিং, মেহমানখানা/ মুসাফিরখানা, খানকাহ্, ঈদগাহ, কুতুবখানা, রিসার্চ সেন্টার, পাঠাগার, ওয়ায মাহফিল ও ইসালে সওয়াব, মাসিক তা'লীমী মাহফিল, প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান, মাসিক পত্রিকা ইত্যাদি।
মস্জিদ
মার্কাজের মূল ভবনের ঠিক মাঝখানে মস্জিদের অবস্থান। মহান আল্লাহ্র এ ঘর সমস্থ মার্কাজকে রওশন করে রেখেছে। এ মস্জিদকে কেন্দ্র করেই দীনের নানা কার্যক্রম চলছে।
কারুকার্যমন্ডিত খিলান, ছাদ ও পিলারগুলো মস্জিদের শোভা বর্ধন করেছে। মাঝে মাঝে টাইলস আর ঝাড়বাতির ব্যবহার সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। মুসুল্লীদের সুবিধার্থে পুরো মস্জিদটা এসি করার পরিকল্পনা ছিলো মরহুম বড় হুযূর হযরত আবদুল কাহ্হার সিদ্দিকী (র.)-এর।[৫৪১]
বাবুল মিরাজ গেট (মস্জিদ গেট)
মার্কাজ মস্জিদের প্রবেশ পথে নির্মিত গেটটি মুসলিম স্থাপত্য কলার এক অনন্য নিদর্শন। মরহুম হযরত পীর সাহেব (র.) নিজেই এর আর্কিটেকচারাল ডিজাইন প্রনয়ণ করেন। সাতটি পিলার, আর্চ, গম্বুজাকৃতির ছাদ, ছোট ছোট মিনার ও গম্বুজ, ডিজাইন ও খাঁজকাটা পিলার সবকিছু মিলিয়ে অসাধারণ একটি স্থাপত্য কর্ম। গেটের

৫৪০. আবদল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৯
৫৪১. মাওলানা বাকীবিল্লাহ সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

নীচের ফ্লোর পুরোটাই মূল্যবান মার্বেল পাথরে আবৃত। গেট দিয়ে ঢুকতেই প্রাচীন আমলের 'এক মানুষ লম্বা' বিশাল একটি ঘড়ি স্থাপন করা হয়েছে যা সবার নযর কাড়ে।

কমপ্লেক্সের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ

১. আল জামিয়াতুস সিদ্দিকীয়া দারুল উলুম মাদ্রাসা কেন্দ্রের অন্যতম আকর্ষণ এ মাদ্রাসা। বিশিষ্ট শিক্ষকমন্ডলী দ্বারা পরিচালিত এ মাদ্রাসা জ্ঞান সঞ্চয়ের অন্যতম কেন্দ্র বলে বিবেচিত। কিতাবখানা, হিফ্যখানা ও মক্তব এ তিন শাখায় প্রায় সহস্রাধিক ছাত্র নিয়মিত বর্ডিংয়ে থেকে পড়াশুনা করছে। মাদ্রাসার গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, সুন্নাতে নববী (স.)-এর অনুসরণ। প্রত্যেক ছাত্রকে পুরোপুরিভাবে সুন্নাতের ওপর চলার জন্য সবসময় জোর তাকীদ দেয়া হয়। পড়াশুনায় যাতে ফাঁকি দিতে না পারে সে জন্য সার্বক্ষণিকভাবে প্রত্যেক ছত্রের প্রতি নযর রাখা হয়। এ বিষয় দু'টির ওপর প্রশাসন অত্যন্ত কঠোর।

মার্কাজের মূল ভবনের মস্জিদ অংশ বাদে দোতলা-তিনতলাসহ প্রায় পুরোটাই মাদ্রাসার ক্যাম্পাস রূপে ব্যবহার হয়। এছাড়া পূর্বপাশে ইংরেজি এল আকৃতিতে ২২০ ফুট লম্বা ও ৩২ ফুট চওড়া ১৫টি কক্ষ বিশিষ্ট দোতলা বিশাল ভবনটিতে দাওরায়ে হাদীস বিভাগের ক্লাশ সমূহ অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৮১ সনে মাত্র ১১ জন ছাত্র নিয়ে সর্ব প্রথম শুরু হয় মক্তব। তখন দারুস্ সালাম আদি মস্জিদের ইমাম সাহেব ক্লাশ নিতেন। এরপর ১৯৮৩ সনে ৮ জন ছাত্র নিয়ে শুরু হয় হিফ্যখানা। নয়া বাজার নিবাসী হাফিয নুরুজ্জামান সাহেবকে পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়। মরহুম পীর সাহেব হুযূর (র.)-এর বাসভবনের একাংশেই সর্বপ্রথম এসব কার্যক্রম শুরু করা হয়। পরে মাটির গাথনি দিয়ে টিনসেড ঘর করে (বর্তমান মহিলা মাদ্রাসার পাশে) মাদ্রাসা স্থানান্তর করা হয়। হিফ্যখানার পিছনে টিনসেড করে মক্তব ও রান্নাঘর করা হয়।

১৯৮৮ সনে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কিতাব, হিফ্য ও মক্তব বিভাগের দরসে নিজামী মাদ্রাসার কার্যক্রম শুরু হয়। মুহতামিমের দায়িত্ব দেয়া হয় হাফিয মাওলানা আবদুল কাইউম সাহেবকে। কিতাব বিভাগের ইবতেদায়ী হতে নাহুমীর পর্যন্ত চার জামাতে ২৪ জন, হিফ্য বিভাগে ৩ গ্রুপে ৩৯ জন, মক্তব বিভাগে ৩ গ্রুপে ৫৮ জন এই সর্বমোট ১২১ জন ছাত্র নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে প্রতিষ্ঠানটি।

শিক্ষক ছিলেন মোট আটজন। কিতাব বিভাগে তিনজন

১. মাওলানা নোমান,
২. মাওলানা আনোয়ার হোসেন,
৩. মাওলানা ইলিয়াছ।

হিফ্য বিভাগে দুইজন

১. হাফেজ মুস্তাফিজুর রহমান,
২. হাফেজ গোলাম রব্বানী।

মক্তব বিভাগে দুইজন

১. ক্বারী আবদুল বাসেত,
২. ক্বারী আবদুল্লাহ্।

ধাপে ধাপে এ ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটি আল্লাহ্ পাকের অশেষ মেহেরবানীতে ১৯৯৬ সনে দরসে নিজামীর সর্বোচ্চ জামাত দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত উন্নিত হয়। এ বছর দাওরায়ে হাদীসের মোট ছাত্র সংখ্যা ছিলো ২৯ জন। শুরু থেকে ২০০৮ সন পর্যন্ত সর্বমোট ৩৭৩ জন ছাত্র এই প্রতিষ্ঠান থেকে 'ইল্মে নববী (স.)-এর এই সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৮৮ হতে ২০০৮ পর্যন্ত ৬০২ জন হাফেজ হয়ে বের হয়েছেন।[৫৪২]

অত্র মাদ্রাসার সিলেবাস কওমী মাদ্রাসা বোর্ডের সাথে সমন্বয়ের পাশাপাশি 'অভ্যন্তরীন শিক্ষা উন্নয়ন বোর্ড' এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-হাদীস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের পরামর্শক্রমে নতুনভাবে ঢেলে সাজানো হয়েছে। মরহুম হুযূর (র.)-এর আজীবনের স্বপ্ন ছিলো এ প্রতিষ্ঠানকে 'কুর'আন হাদীস বিশ্ববিদ্যালয়ে' উন্নিত করা। বর্তমান পীর সাহেব সে লক্ষ্য বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছেন।

হযরত ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী (র.), কারামত আলী জৈনপুরী (র.) ও আবু বকর সিদ্দিকী ফুরফুরাভী (র.) এ তিন বুজুর্গের ইয়াদগারে এবং বৃহত্তর মুসলিম ঐক্য প্রকাশার্থে মরহুম পীর সাহেব (র.) এ মাদ্রাসার নাম দেন

৫৪২. মাওলানা আবুল বাশার জিহাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১

'ইমদাদিয়া কারামতিয়া দিদ্দিকীয়া দরসে নিজামীয়া মাদ্রাসা'। বর্তমানে এটি 'আল জামিয়াতুস্ সিদ্দিকীয়া দারুল 'উলুম' নামে খ্যাতি লাভ করেছে।

২. হযরত আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.) ইয়াতিমখানা ও লিল্লাহ বোর্ডিং

শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.)-এর নামে প্রতিষ্ঠিত এতিমখানা ও লিল্লাহ বোর্ডিং এ কেন্দ্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। শত শত ইয়াতীম অসহায় ছাত্র এখানে বিনা খরচায় লেখাপড়া করছে। তাদের থাকার ও খাওয়ার দায়িত্ব এ কেন্দ্রেই বহন করছে।

৩. উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) মহিলা মাদ্রাসা

দীনি শিক্ষায় শিক্ষিত একজন আদর্শ মা-ই পারেন তার সন্তানকে একজন আদর্শবান শিক্ষিত ও দীন সচেতন মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলতে। মরহুম পীর সাহেব (র.) তাই মেয়েদের দীনি শিক্ষার প্রতি খুবই গুরুত্ব দিতেন এবং তারই ধারাবাহিকতায় তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন বেশ কয়েকটি মহিলা মাদ্রাসা। দারুস্ সালামে প্রতিষ্ঠিত উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (র.) মহিলা মাদ্রাসাটি তম্মধ্যে অন্যতম।

২০০০ সালে ৩৩ জন ছাত্রী ও ৩ জন শিক্ষিকা নিয়ে ৩য় শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে মাদ্রাসাটি। বর্তমাতনে ২০০৮- ২০০৯ শিক্ষাবর্ষে ছাত্রী সংখ্যা ২৫১ জন। শিক্ষিকা ৯ জন, শিক্ষক ১২ জন, সেবিকা ২ জন ও অফিস সহকারী ১ জনসহ স্টাফ মোট ২৪ জন। ২০১৭- ২০১৮ শিক্ষাবর্ষে ছাত্রী সংখ্যা ১৬০০ জন। শিক্ষিকা ২৬ জন, শিক্ষক ৩২ জন, সেবিকা ৭ জন ও অফিস সহকারী ৩ জনসহ স্টাফ মোট ৬৮ জন।

বেফাক বোর্ডের সিলেবাস অনুযায়ী পরিচালিত অত্র মাদ্রাসায় দাওরায়ে হাদীস বিভাগ আরম্ভ হয় এবং ৩ জন দাওরা পরীক্ষার্থী বোর্ডে পরীক্ষা দিয়ে কৃতিত্বের সাথে পাশ করেছেন। হাফেজ মাওলানা আবদুল কাইয়ুম সাহেব মহিলা মাদ্রাসার মুহতামিম হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

মহিলা মাদ্রাসার চারতলা একটি ভবন নির্মিত হয়েছে যার প্রতি তলার আয়তন ১,৩৬০ বর্গফুট। নীচতলায় কমিটির সভাকক্ষ, অফিস কক্ষ, শিক্ষকদের আবাস কক্ষ, গোডাউন এবং ২য় থেকে ৪র্থ তলা পর্যন্ত রয়েছে মাদ্রাসার ১২টি বৃহৎ ক্লাসরুম।[৫৪৩]

৪. তারবিয়াতুল মিল্লাত একাডেমী

বর্তমানে চাহিদার প্রেক্ষিতে এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা প্রয়োজন যেখানে প্রাথমিকভাবে শিশুদের ইমানদার, পরহেজগার, মুত্তাকী হতে যেমন সাহায্য করবে, তেমনি তাদেরকে আধুনিক শিক্ষায়ও শিক্ষিত করে গড়ে তুলবে, যারই ফলশ্রুতিতে তারা হবে আখিরাতমুখী। এসব প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখেই প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে গতানুগতিক ধারা থেকে আধুনিকায়ন ও উন্নত করে বিজ্ঞান সম্মত, যুগোপযোগী ধারায় রূপদান এবং এ শিক্ষায় শিক্ষিতদের কুর'আন সুন্নাহে সুদক্ষ ও একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায় যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তারবিয়াতুল মিল্লাত একাডেমীর আবির্ভাব হয়েছে।

১৯৯৮ সালে ফুরফুরার মরহুম পীর হযরত মাওলানা আবুল আনসার মুহাম্মদ আবদুল কাহ্হার সিদ্দিকী (র.) দারুস্ সালামে 'ইকরা দারুস্ সালাম' নামে একটি আধুনিক কিন্ডার গার্টেন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। পরে এর নাম পরিবর্তন করে 'তারবিয়াতুল মিল্লাত একাডেমী' রাখা হয়েছে। ইকরা পবিত্র কুরআনের প্রথম শব্দ, তাই নাম পরিবর্তন করা হলেও ইকরা শব্দটি এখনো প্রতিষ্ঠানের মনোগ্রামে বিদ্যমান আছে। তারবিয়াত শব্দের অর্থ প্রতিপালন, আর মিল্লাত শব্দের অর্থ জাতি অর্থাৎ জাতির প্রতিপালন বা জাতি গঠন। তারবিয়াতুল মিল্লাত একাডেমী গতানুগতিক কোনো মাদ্রাসা বা স্কুল নয়, বরং এটি হচ্ছে জেনারেল তথা সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষার সমন্বয়ে একটি ব্যতিক্রমধর্মী আধুনিক ইসলামী স্কুল। তারবিয়াতুল মিল্লাত একাডেমী যে প্রত্যাশা নিয়ে কাজ শুরু করেছে তাহলো এ প্রতিষ্ঠানে যারা শিক্ষা লাভ করবে তারা একদিকে যেমন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হবে, তেমনি সমপর্যায়ের ধর্মীয় শিক্ষায়ও শিক্ষিত হয়ে গড়ে উঠবে। এ দিকে লক্ষ্য রেখে ইংরেজী ও আরবী উভয় ভাষার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে।[৫৪৪]

তারবিয়াতুল মিল্লাত একাডেমীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো– একটি শিশু ১৬/১৭ বৎসর বয়সেই ইনশাআল্লাহ্ হাফিযে কুর'আন হওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে একজন মেধাবী ছাত্র/ছাত্রী হিসেবে দাখিল অথবা এস.এস.সি পাশ করতে পারবে, উপরন্তু তার মধ্যে দীনি ও কারিগরী শিক্ষার এক দৃষ্টান্তমূলক সমন্বয় ঘটবে।

৫৪৩. আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩২
৫৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৩

বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে তিনটি বিভাগ চালু রয়েছে
১. স্কুল বিভাগ
২. হিফযুল কুর'আন বিভাগ
৩. সর্ট কোর্স (৪ বছরে দাখিল পাশ)।

বর্তমানে স্কুল বিভাগ নার্সারী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত। নার্সারী থেকে ২য় শ্রেণী পর্যন্ত একাডেমীর সিলেবাস অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে ছাত্র-ছাত্রীদের হিফ্যুল কুর'আনের জন্য তৈরী করা হয়ে থাকে এবং ৩য় শ্রেণীতে তাকে হিফ্য বিভাগে দেয়া হয়। ছাত্রের প্রতি যাতে কোনো রূপ চাপ না হয় সেদিকে লক্ষ্য করে হিফ্য সিলেবাস ঠিক রেখে জেনারেল সাবজেক্টগুলোকে ২ বৎসরে শেষ করা হয়, এ কারণে হিফ্যের জন্য তাকে কোনরূপ বেগ পেতে হয় না।
একাডেমীর হিফ্য বিভাগ থেকে ২০০২ সালে ৫ জন, ২০০৩ সালে ৩ জন, ২০০৪ সালে ৮ জন, ২০০৫ সালে ৭ জন, ২০০৬ সালে ৪ জন, ২০০৭ সালে ৫ জন ছাত্র খুব সুন্দরভাবে হিফ্য সম্পন্ন করেছে। ২০০৭ সালে ৮ম শ্রেণীতে মাদ্রাসা বোর্ডের আওতাধীন বৃত্তি পরীক্ষায় ৩ জন ছাত্র বৃত্তি পেয়েছে।
যেহেতু তারবিয়াতুল মিল্লাত একাডেমী একটি ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেহেতু এ প্রতিষ্ঠানের সিলেবাসের সাথে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের সিলেবাসের হুবহু মিল না থাকাই স্বাভাবিক। সঙ্গত কারণে, তারবিয়াতুল মিল্লাত একাডেমীতে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রী ব্যতীত অন্য নতুনদেরকে সাধারণত: নার্সারী বা কে.জি তে ভর্তি করা হলে তারা গোড়া থেকেই খুবই ভালো করে থাকে। বর্তমানে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ১৭০ জন।
বর্তমানে প্রতি তলা (৩১ ফুট × ৮০ ফুট) ২,৪৮০ বর্গ ফুট বিশিষ্ট একটি পাঁচতলা নিজস্ব ভবনে 'তারবিয়াতুল মিল্লাত একাডেমী' পরিচালিত হচ্ছে। নীচ তলায় অফিস কক্ষ এবং দোতলা থেকে পঞ্চম তলা পর্যন্ত মাদ্রাসার ক্যাম্পাস।

সিদ্দিকীয়া লাইব্রেরী

হযরত মরহুম পীর সাহেব (র.)-এর কিতাব সংগ্রহের আগ্রহ ছিলো সত্যিই নজিরবিহীন। যেখানে যেতেন পছন্দসই কিতাব পেলেই সংগ্রহ করতেন। শুধুমাত্র সৌদি আরব হতেই কয়েক লক্ষ টাকার সহস্রাধিক অত্যন্ত মূল্যবান কিতাব তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। নিজের কষ্টার্জিত টাকা দিয়ে ক্রয় করে প্রতি বছর অল্প অল্প করে প্রায় কয়েক টন ওজনের কিতাব তিনি আরব থেকে বয়ে এনেছিলেন। এভাবে তিলে তিলে তিনি গড়ে তুলেছেন এক সমৃদ্ধ রেফারেন্স লাইব্রেরী, যার নাম দেয়া হয় 'সিদ্দিকীয়া লাইব্রেরী'। এছাড়া আছে 'হিলফুল ফুযূল পাঠাগার' ও 'ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা'। সব মিলিয়ে দারুস্ সালামে গড়ে ওঠেছে প্রায় দশ সহস্রাধিক পুস্তকের দুর্লভ সংগ্রহশালা।[৫৪৫]

ফুরফুরার কায়েম মোকাম
বাৎসরিক ওয়ায মাহফিল ও ইসালে সওয়াব

পাকিস্তান ভারত বিভক্তির পর বাংলাদেশের মানুষের জন্য 'ফুরফুরা ইসালে সওয়াব' মাহফিলে যোগদান করা কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়, অনেকের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ অসুবিধা দূর করার জন্য শায়খুল ইসলাম আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.) ফুরফুরার অনুকরণে বাংলাদেশে 'ফুরফুরার কায়েম মোকাম ইসালে সাওয়াব' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সর্বপ্রথম ১৯৫২ সনে পাকশীতে এবং ১৯৬২ সনে দারুস্ সালামে ওয়ায মাহফিল ও ইসালে সওয়াব এর প্রতিষ্ঠা করা হয়। এরপর থেকে প্রতি বছর এ দু'স্থানে ওয়ায মাহফিল ও ইসালে সওয়াব অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। স্বয়ং শায়খুল ইসলাম আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.) এ মাহফিলগুলো পরিচালনা করতেন। ১৯৭৭ সনে তাঁর ইন্তিকালের পর হতে ২০০৬ সন পর্যন্ত তাঁর বড় সাহেবজাদা মরহুম পীর হযরত মাওলানা আবুল আনসার মুহাম্মদ আবদুল কাহ্হার সিদ্দিকী (র.) এ মাহফিলগুলো পরিচালনা করে গিয়েছেন। তাঁর ইন্তিকালের পর গত ২০০৭ সন হতে অত্র মাহফিলগুলে পরিচালনা করছেন বর্তমান গদ্দীনশীন পীর হযরত মাওলানা আবু বকর আবদুল হাই মিশকাত সিদ্দিকী সাহেব।
প্রথম দিকে প্রতি বছর চৈত্র মাসে ওয়ায মাহফিল ও ইসালে সাওয়াব অনুষ্ঠিত হতো। বড় হুযূর শায়খুল ইসলাম আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.) সহ অন্যান্য হুযূররা এ সময় দারুস্সালামে তাশরীফ আনতেন। মাহফিলের সময়

৫৪৫. ইয়াকুব ও খুরশিদ আনোয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

গাবতলী বাগাবাড়ী নিবাসী হাজী আবদুল আজিজ সাহেব, মীর্জা মফিজ উদ্দীন, হাজী বাকের প্রমুখ এবং দারুস্‌সালাম মহল্লার বড়, মেজ ও ছোট মাতবরসহ দারুস্‌সালাম, আদাবর, গৈদারটেক এলাকাবাসী বিশেষ করে সাহায্য সতযোগিতা করতেন।
হযরত আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.)-এর ইন্তিকালের পর দায়িত্ব গ্রহণ করেন মরহুম পীর আবদুল কাহ্‌হার সিদ্দিকী সাহেব। দারুস্‌সালাম ইসালে সওয়াবের যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের ও ইন্তেজামের জন্য তিনি ‘দারুস্‌সালাম ইসালে সওয়াব কমিটি’ নামে একটি কমিটি গঠন করে দেন। তখন থকে ইসালে সাওয়াবের যবতীয় ইন্তিজাম ও তদারকি এই কমিটির তত্ত্বাবধানে চলতে থাকে।[৫৪৬]
হযরত পীর সাহেব (র.) ছিলেন এ কমিটির পৃষ্ঠপোষক। পারবর্তীতে ১৯৮৩ সনে এই কমিটিকেই মার্কাজে ইশা'আতে ইসলাম কমিটিতে রূপান্তরিত করা হয় এবং কার্যপরিধি বৃদ্ধি করে দারুস্‌সালাম মার্কাজে ইশা'আতে ইসলামের যাবতীয় উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের দায়িত্ব অর্পন করা হয়।
প্রথম দিকে চৈত্র মাসে মাহফিল অনুষ্ঠিত হলেও পরবর্তীতে অগ্রহায়ণ মাসের শেষ শুক্র, শনি ও রবিবার মাহফিলের দিন নির্ধারণ করা হয়। সোমবার ফজরবাদ আখিরী মুনাজাত অনুষ্ঠিত হতো। নব্বইয়ের দশকে এসে একবার সাতদিন এবং পরবর্তীতে কয়েক বছর ধরে পাঁচদিন ব্যাপী মাহফিল হতে থাকে অগ্রহায়ণ মাসের শেষ শুক্র, শনি, রবি, সোম ও মঙ্গলবার। এরপর একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে মাহফিলের সময়সূচী আরও একবার পরিবর্তিত হয়ে হয় অগ্রহায়ণ মাসের তৃতীয় মঙ্গলবার শুরু হয়ে শুক্রবার জুমার নামাজের পর আখেরী মুনাজাত। বার ঠিক রেখে তারিখ পিছিয়ে বর্তমানেও এই সময়সূচী বলবত আছে।
ইসালে সওয়াব অর্থ সাওয়াব পৌঁছানো। এ মহতী মাহফিলে যত নেকী হয় তা তামাম নবী, তামাম সাহাবা, তামাম পীরানে পীর ও মু'মিন মুসলমানদের রূহ মুবারকে পৌঁছে দেয়া হয়। লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয় এ মাহফিলে। হাজারো আলেমের উপস্থিতিতে দিন রাত ওয়াজ-নসীহত, যিক্‌র-আযকার, কুর'আন তিলাওয়াত ও দরূদ শরীফ চলতে থাকে।
কয়েক মাস আগে থেকে শুরু হয় প্রস্তুতি। বিশাল সামিয়ানা খাটানো হয়। পর্যাপ্ত বাতির ব্যবস্থা করা হয়। গোটা দারুস্‌সালাম অঞ্চলকে মাইকের অওতায় আনার জন্য অসংখ্য মাইক ব্যবহার করা হয়। দেশ বিদেশ থেকে আগত প্রত্যেক মেহমানকে প্রতিদিন দুপুর বেলা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সে এক বিরাট আয়োজন, এক অসাধারণ ব্যবস্থাপনা। এছাড়া রাতের বেলা স্বল্প মূল্যে টিকিট কেটে খাওয়ার ব্যবস্থা থাকে। সার্বিক কাজ তদারকির জন্য মাহফিল কমিটিকে সদা তৎপর থাকতে হয়। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচের মধ্য দিয়ে এক সময় এসে যায় মাহফিলের শেষ দিন। ঐ দিন দুপুরে জুম'আর নামাজের সময় প্রায় ত্রিশ সহস্রাধিক প্যাকেট বিরিয়ানী দিয়ে সমবেত মুসলমান ভাইদের আপ্যায়ন করানো হয়।
প্রতিদিন মূল অনুষ্ঠান শুরু হয় মাগরিবের নামাযের পর। তখন স্বয়ং হযরত পীর সাহেব ‘নালায়েন শরীফের মঞ্চে’ বসে কয়েক ঘন্টা তাকরীর করেন। উপস্থিত জনসমুদ্র ধীরস্থির ভাবে বসে অত্যন্ত আগ্রহ ভরা অন্তর নিয়ে তাঁর তত্ত্বপূর্ণ বক্তৃতা শুনেন। তাঁর ওয়াযের পরে দেশ বিদেশ থেকে আগত খ্যাতনামা আলেম-ওলামা একের পর এক বক্তব্য রাখতে থাকেন।
প্রতিদিন সকাল দশটার দিকে শুরু হয় মাহফিলের বিশেষ কার্যক্রম। ইসলাম মিশন, হিজবুল্লাহ্, হিলফুল ফুযূলসহ অন্যান্য সংগঠনের সম্মেলন ও বৈঠকের মধ্য দিয়ে জোহরের সময় হয়। মাহফিলের আগেই বিস্তারিত কর্মসূচী নির্ধারণ করা হয়। এ খোদায়ী মাহফিলের জন্য আল্লাহ্‌র পাগলেরা চাতক পাখির মত সারা বছর অপেক্ষা করতে থাকে। যখন মাহফিল আসে তখন তাঁদেও পাগল পাড়া মন আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। হযরত পীর সাহেবের পরিচালনায় এ মাহফিলে শরীয়তের তিল পরিমাণ খেলাফ কাজ স্থান পায় না।
মাহফিল শেষে আখেরী মুনাজাত অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার জুম'আর নামাজের সময়ে। দূর দূরান্ত থেকে আগত লক্ষ জনতার সাথে ঢাকা ও তার আসে পাশের ধর্মপ্রাণ মানুষের হাজারো কাফেলা এ মুনাজাতে শরীক হন। হযরত পীর সাহেব স্বয়ং এ মুনাজাত পরিচালনা করেন। জুম'আর নামাজের পূর্বে কিছু সময় ওয়ায-নছীহতের পর যখন তিনি মোবারক হাত আসমানের দিকে তুলে ধরেন, তখন সমবেত জনতার মাঝে কান্নার রোল পড়ে যায়। প্রত্যেকের চোখে পানি, হৃদয় নিংড়ানো আর্তি– ‘হে আমাদের পরওয়ার দিগার! আমাদের গুনাহ্‌কে মাফ করে দিন, আমাদেরকে কবূল করে নিন, দুনিয়া ও আখিরাতের ভালাই দান করুন।’ গোটা দারুস্‌সালামের বুকে

৫৪৬. হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

একটা ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। মনে হয় যেন মহান আল্লাহ্পাক তখনই তাঁর মাহবুবের দু'আকে কবুল করে নিয়েছেন।[৫৪৭]

রামাদানে ইফতার, তা'লীম ও দু'আর মাহফিল

নব্বই দশকের প্রথম দিকে হযরত পীর সাহেব মাওলানা আবুল আনসার মুহাম্মদ আবদুল কাহ্হার সিদ্দিকী (র.)-এর উদ্যোগে রমজান মাসে তিন দিন ব্যাপী ইফতার, তা'লীম ও দু'আর মাহফিল শুরু হয়। সেই থেকে প্রতি বছর এ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। হিযবুল্লাহ্র মুবাল্লেগীন, কর্মী ও কয়েক হাজার রোজাদার মুসলমান এ মাহফিলে শরীক হয়ে থাকেন। দিনের বেলা ওয়ায ও তা'লীম, তাফসীর ও কুর'আন শিক্ষা, ইফতারের পূর্বে বিশেষ দু'আ, তারাবীহ, তাহাজ্জুদ, সেহরী সবকিছু মিলিয়ে এক নূরানী পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

মাসিক তা'লীমী মাহফিল

মরহুম পীর সাহেব হযরত মাওলানা আবুল আনসার মুহাম্মদ আবদুল কাহ্হার সিদ্দিকী (র.) গদ্দীনশীন হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের কিছুদিন পর আশির দশকের শুরুতে প্রতি বাংলা মাসের শেষ শুক্রবার মাসিক তা'লীমী মাহফিলের কার্যক্রম শুরু করেন। সে থেকে এ মাসিক মাহফিল অদ্যবধি নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। বাদ অসর দীনি আলোচনা, বাদ মাগরিব যিক্র ও তা'লীম এবং পরিশেষে দু'আ মুনাজাতের মাধ্যমে তা'লীমী মাহফিল শেষ হয়। উপস্থিত সকল মেহমানদের জন্য বিশেষ আপ্যায়নের ব্যবস্থাও করা হয়। হযরত পীর সাহেব হুযূর ঢাকায় অবস্থানকালে নিজেই উক্ত মাহফিলে তা'লীম প্রদান করেন।

দারুল আয্কার খানকাহ্

মার্কাজের মূল ভবনের পশ্চিম-উত্তর কোনে 'দারুল আযকার খানকাহ্' এর অবস্থান। অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে অবস্থিত এ খানকাহ্ স্থাপত্য শিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন। মরহুম হযরত পীর সাহেব (র.) নিজেই এ সুন্দর ইমারতের নকশা করেছেন। মেঝেতে মার্বেল পাথর দিয়ে নামাজের মুছল্লার আকৃতির মতো করে তৈরী এ খানকাহ্ অনিন্দ্য সুন্দর রূপ লাভ করেছে। ৭০ ফুট দৈর্ঘ্য ও ১৯ ফুট প্রস্থের মূল ভবন এবং ৭০ ফুট দৈর্ঘ্য ও ১২ ফুট প্রস্থে বারান্দা সম্বলিত এ খানকায় এক সাথে প্রায় এক হাজার লোক বসে যিক্র করতে পারবে। পূব-পশ্চিমে লম্বা এ খানকাহ্র উত্তর দিকের দেয়ালে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা খোদাই করে লিখা হয়েছে। এছাড়া খানকাহ্র পশ্চিম দিকের দেয়ালে 'কালিমা শরীফ' খোদাই করে লিখা রয়েছে।

বিভিন্ন রং এর কাঁচের দ্বারা সূর্যের আকৃতিতে তৈরী করা হয়েছে অনেকগুলো আর্চ। আর্চগুলো দক্ষিণ ও পূর্বের দেয়ালের উপরিভাগে স্থান পেয়েছে। খানকাহ্র পশ্চিম কোনে একটা দরজা রাখা হয়েছে যা নাকি শায়খুল ইসলাম আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.)-এর স্মৃতি বহন করছে। ঐ জায়গাতেই তিনি মাহফিলের সময় অবস্থান করতেন।[৫৪৮]

খানকাহ্র ছাদ ও দেয়ালে বিভিন্ন রং এর অপূর্ব সমাহার ঘটেছে। খানকাহ্র বাইরের ডিজাইনও নয়নাভিরাম। যেকোনো নতুন অতিথি দারুস্সালামে এলে এ দালানের সৌন্দর্য তার হৃদয়কে পুলকিত করবেই। খানকাহ্র দোতলা ও তৃতীয় তলা আবাসিক কাজে ব্যবহৃত হয়।

নালায়েন শরীফ স্টেজ

মার্কাজের মূল ভবনের পশ্চিম দিকে যে ওয়ায মাহফিলের মাঠ অবস্থিত, তারই পশ্চিম প্রান্তে এ নালায়েন শরীফ স্টেজের অবস্থান। মূলত: এটা বার্ষিক ইসালে সাওয়াব ও ওয়ায মাহফিলের স্থায়ী স্টেজ (মঞ্চ)। আয়তন ৩০ ফুট × ১৭ ফুট। প্রতি বছর বার্ষিক মাহফিলের সময় এখান থেকে ওয়ায়িযীনগণ তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দান করেন। এক সাথে বহু 'আলিমের বসার মতো করে তৈরী এ স্টেজ হযরত নবী করীম (স.)-এর জুতা মোবারকের নকশায় তৈরী করা হয়েছে। এ কারণে এটাকে 'নালায়েন শরীফ স্টেজ' বলা হয়। ভূমি থেকে চার ফুট উঁচু মেঝে, ছয়টা পিলারের ওপর কারুকার্যময় সুন্দর গম্বুজ এ মঞ্চকে অপূর্ব সৌন্দর্য দান করেছে।

---

৫৪৭. মাওলানা রুহুল কুদ্দুস ও সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯
৫৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

বার্ষিক মাহফিলের সময় এ স্টেজকে ঘিরে ‘আলিম ওলামার বাগান বসে যায়। সবার নযর থাকে এ স্টেজের দিকে। নালায়েন শরীফের ডিজাইনও স্বয়ং মরহুম হযরত পীর সাহেব (র.) করেছেন।[৫৪৯]

দারুসসুন্নাত মেহমান ও মুসাফিরখানা

দূর-দূরান্ত থেকে আগত বিষেশ মেহমান ও মুসাফিরদের জন্য মেহমানদারী ও থাকার সু ব্যবস্থা আছে এ মেহমান ও মুসাফিরখানায়। কয়েকটি কামড়া (কক্ষ) এজন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে।

মা'রিফাত হাউস

মা'রিফাত হাউস এক অনন্য সুন্দর স্থাপত্য কর্ম। মরহুম পীর সাহেব হুজুর (র.) নিজেই এর ডিজাইন করেছেন। সাড়ে তেইশ ফুট ব্যাসের গোলাকার মোট আটটি পিলারের ওপর গড়ে তোলা আট কোণা বিশিষ্ট স্টেজ ও অপূর্ব সুন্দর গম্বুজ সবার নযর কেড়ে নেয়। বিভিন্ন মাহফিল ও অনুষ্ঠানাদিতে বসা, সভা-বৈঠক করা ও স্টেজ হিসেবে ব্যবহারের জন্য এটি নির্মিত হয়েছে। মরহুম হুযূর (র.)-এর নামকরণ করেছেন ‘মা'রেফাত হাউস’।

দায়েরা

দারুল আয্‌কার খানকাহ্ সংলগ্ন ৩৩ ফুট × ১৮ ফুট আয়তনের আরেকটি অনিন্দ সুন্দর স্থাপত্য কর্ম এ দায়েরা। এর আর্চ আর খিলানের অপূর্ব কারুকাজ সত্যিই দৃষ্টি নন্দন। বিশেষ করে প্রবেশ পথের কারুকাজ যে কানো দর্শনার্থীর নজর না কেড়ে পারে না। গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ সভা, মিটিং, আলোচনা ইত্যাদি এখানে অনুষ্ঠিত হয়। মাহফিলের সময় বিশিষ্ট মেহমানগণ এখানে অবস্থান করেন।

বার্ষিক মাহফিলের মাঠ

মার্কাজের মূল ভবনের পশ্চিম দিকটা বার্ষিক ওয়াজ মাহফিলের মাঠ হিসেবে নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে। এ মাঠেই প্রতি বৎসর মাহফিলের সময় প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোকের সমাগম হয়। মার্কাজের মূল ভবনের পুরো চত্বর ও উত্তর দিকের জায়গাও মাহফিলের কাজে মাঠ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

মার্কাজে ইশাআতে ইসলাম কমিটির অফিস ভবন

মার্কাজের মূল ভবনের উত্তর দিকে মার্কাজে ইশা'আতে ইসলাম কমিটির অফিস ভবন অনস্থিত। এ ভবন থেকেই এ বিশাল কেন্দ্রের যাবতীয় কার্যক্রম আঞ্জাম দেয়া হয়। মার্কাজের অফিস ছাড়াও এ ভবন হিজবুল্লাহ্ হিলফুল ফুযূল সংগঠনের অফিস, জমিয়তুল মুসলিমীন হিযবুল্লাহ্ ও ইসলাম মিশন অফিস এবং ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানার বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে। এ ভবনের উপরে দ্বিতীয় তলা হতে পঞ্চম তলা পর্যন্ত তারবিয়াতুল মিল্লাত একাডেমীর ক্যাম্পাস।

ভান্ডাখানা, রান্নাঘর ও খাবারঘর

প্রতিদিন দেড় হাজারের মতো লোকের রান্না করতে হয়। এ জন্য বিশাল রান্নাঘর তৈরী করা হয়েছে। ছয়জন বাবুর্চি রান্নার কাজে নিয়োজিত আছেন। শুধু চালই লাগে প্রতিদিন প্রায় পঞ্চাশ কেজি। বাজার করা মালামাল রাখার জন্য রান্নাঘর সংলগ্ন ভান্ডারখানা রয়েছে। এছাড়া ছাত্ররা যাতে বসে খেতে পারে এজন্য আছে বড় একটি খাবার ঘর।

অযু ও ইস্তিঞ্জাখানা

বিশাল মাদ্রাসা ও বার্ষিক ওয়া মাহফিল ও ইসালে সাওয়াবে লোক সমাগমের দিকে খেয়াল রেখে মার্কাজ ভবনের বিভিন্ন সাইডে একত্রে শতাধিক লোকের অজু করার সুবিধা সম্বলিত পাঁচটি অযুখানা এবং প্রায় একশত লোকের

৫৪৯. আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৮

ইস্তিঞ্জা করার সুবিধা সম্বলিত শতাধিক স্থায়ী বাথরুম নির্মাণ করা হয়েছে। অযুখানাগুলোর নির্মাণ সৌন্দর্যও সবাইকে মুগ্ধ করে।

পূর্ব পাশের বড় অযুখানাটির ৫২ ফুট × ১৪ ফুট আয়তনের বিশাল ও গভীর হাউজ ও ছাদের মনোরম খিলান ও আর্চ সত্যিই অপূর্ব। একত্রে ৪০ জনের বসার ব্যবস্থা আছে এখানে। মাদ্রাসার সামনের গোলাকার অজুখানায় একত্রে ২৬ জনের বসার ব্যবস্থা আছে। এর নির্মাণ শৈলী সকলের দৃষ্টি কাড়ে। মস্‌জিদে ঢুকতে ডান দিকের অযুখানায় একত্রে ৩৬ জনের বসার ব্যবস্থা আছে।

গোসলের হাউজ

মস্‌জিদের উত্তর পশ্চিম কোণে প্রথমত অযু করার জন্য বড় একটি হাউজ (২৭ ফুট × ২৮ ফুট) নির্মাণ করা হয়েছিলো। বর্তমানে এখানে সবাই গোসল করে থাকেন। এখানে অযুর ব্যবস্থাও আছে।

কবরস্থান

মস্‌জিদের দক্ষিণ পূর্ব কোণে এ কবরস্থান অবস্থিত। এটি বাংলা (খ) আকৃতির। বেষ্টনি দিয়ে ঘেরাও করা। এখানেই চির নিদ্রায় শায়িত আছেন মরহুম হযরত পীর সাহেব মাওলানা আবুল আনসার মুহাম্মদ আবদুল কাহ্‌হার সিদ্দিকী (র.)।

বাসভবন

১৯৭৭ সনে গদ্দীনশীন হাবার পর মরহুম পীর সাহেব হুযূর (র.) পরিবার-পরিজন নিয়ে বসবাস করার উপযোগী একটি বাসভবন নির্মাণ করেন। মার্কাজের পশ্চিম-উত্তর পার্শ্বে দারুল আযকার খানকাহ্‌র পেছনে উঁচু প্রাচীর পরিবেষ্টিত এ বাসভবন অবস্থিত। পরিবার-পরিজন ও মেহমানের সংখ্যাধিক্যের কারণে স্থান সংকুলান না হওয়ায় তা পর্যায়ক্রমে তিন তলা করা হয়।

পীর সহেব হুযূরের বাসভবন ও মার্কাজের অফিস ভবনের মাঝখানে এবং ইসালে সওয়াব মাঠের পশ্চিম পার্শ্বে বসবাসের জন্য বেস কিছু টিনশেড কামড়া আছে যেগুলোতে বর্তমানে নামমাত্র ভাড়ায় মার্কাজের বেশ কয়েকজন কর্মচারী, শিক্ষক, হুযূরের খদেম ও নিকটাজনরা থাকেন।

দারুস্‌ সালাম টাওয়ার

মার্কাজ কমপ্লেক্সের জমির ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক সংলগ্ন অংশে কয়েক বিঘা জমিতে ডেভেলপারদের মাধ্যমে যৌথ উদ্যোগে ১৭ তলা আবাসিক কাম কমার্শিয়াল টাওয়ার বিল্ডিং গড়ে ওঠেছে। বর্তমানে এ বিল্ডিং-এর সমাপনী এক্সটেনশন কাজও প্রায় সমাপ্তির পথে।

ইসলাম প্রচারের দীনি সংগঠন

ফুরফুরার মরহুম পীর সাহেব (র.) ইসলাম প্রচারের জন্য খোদায়ী সংগঠন 'জামিয়াতুল মুসলিমীন হিযবুল্লাহ্‌' প্রতিষ্ঠা করেছেন।[৫৫০] এ সংগঠন পথহারা মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে ডাকার জন্য সদা নিয়োজিত রয়েছে। সমগ্র বিশ্বে এ সংগঠন হেদায়াতী কাজকে সম্প্রসারণ করার জন্য এক ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে এবং সংগঠন যথেষ্ঠ অগ্রগতি সাধন করেছে। এ পর্যন্ত প্রায় ৫৫টি জেলা, ৩২৫টি উপজেলা, ১৫৫টির মত ইউনিয়ন এবং ১২ হাজারেরও বেশী গ্রামে এ সংগঠনের মাধ্যমে হেদায়াতী কাজ চলছে।

এ সংগঠনের আওতায় সাতটি অংগ সংগঠন পরিচালিত হচ্ছে। অংগ সংগঠনগুলো হচ্ছে–

১. তালীমী জামাত (মুরীদদের জন্য)
২. ফাতিমা জামাত (পর্দানশীন মহিলাদের জন্য)

---

৫৫০. মাওলানা আতাউর রহমান কালামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫

৩. হিযবুল্লাহ্ হিলফুল ফুযূল (ছাত্র ও যুবকদের জন্য)
৪. আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীন (ওয়ায়িযীনদের জন্য)
৫. জমিয়তে ওলামায়ে হানাফিয়া (আলিমদের জন্য)
৬. হিযবুল্লাহ্ তাবলীগ ইসলামী কাফেলা (ঘরে ঘরে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানের জন্য
৭. সিদ্দিকীয়া বিশ্ব ইসলাম মিশন কুরআনী সুন্নী (মানবসেবামূলক কাজের জন্য)[৫৫১]

দীনি সংগঠন জমিয়তুল মুসলিমীন হিযবুল্লাহ্‌র কেন্দ্রীয় দপ্তর মার্কাজে ইশা'আতে ইসলাম, দারুস্ সালাম, মিরপুর, ঢাকায় অবস্থিত। এ মার্কাজকে কেন্দ্র করেই তামাম বিশ্বে এ সংগঠন দীন প্রচারের কাজ করছে।

বিগত বছরগুলিতে বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশে শাখাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জিলা ও উপজিলা পর্যায়ে বহু মার্কাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসব কেন্দ্র মস্‌জিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ্, কুতুবখানা প্রভৃতি স্থাপন করা ছাড়াও দীন প্রচারের ক্ষেত্রে আরো বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেসব মার্কাজ এ কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে তাদের মধ্য থেকে কয়েকটি জেলা মার্কাজের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হলো–
১. ঢাকা (দারুস্ সালাম),
২. নারায়ণগঞ্জ (ফতুল্লা),
৩. মুন্সীগঞ্জ,
৪. নেত্রকোণা,
৫. ফরিদপুর,
৬. রাজবাড়ী,
৭. চাঁদপুর,
৮. ব্রাহ্মণবাড়ীয়া,
৯. চট্টগ্রাম,
১০. ফেনী,
১১. লক্ষীপুর/রায়পুর,
১২. ঝিনাইদহ,
১৩. চুয়াডাঙ্গা,
১৪. মেহেরপুর,
১৫. খুলনা,
১৬. কুষ্টিয়া,
১৭. মাগুরা,
১৮. পাবনা (পাকশী),
১৯. রাজবাড়ী,
২০. নওগাঁ,
২১. রংপুর,
২২. ঠাকুরগাঁও,
২৩. গাইবান্ধা,
২৪. দিনাজপুর ইত্যাদি।[৫৫২]
আর্তমানবতার সেবায় এগিয়ে আসা নবী করীম (স.)-এর গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ্। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পর্যুদস্ত (যেমন–বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প ইত্যাদি), যুদ্ধবিধ্বস্ত, সর্বশান্ত, ইয়াতীম, নিরাশ্রয়, অনাথ, বিধবা, দুস্থ, ঋণগ্রস্থ, কন্যাদায়গ্রস্ত, পীড়িত ও অভাবগ্রস্থের অভাবমোচন ও পূনর্বাসনের জন্যে ফুরফুরার পীর সাহেবের বিভিন্নমুখী উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসার দাবীদার।
হযরত পীর সহেবের প্রতিষ্ঠিত সিদ্দিকীয়া বিশ্ব ইসলাম মিশন কুরআনী সুন্নী জমিয়তুল মুসলিমীন হিযবুল্লাহ্ সংগঠনের মূল লক্ষ্যই হলো ইসলাম প্রচারের সাথে সাথে আর্তমানবতার সেবা করা। বাংলা-ভারতের বিভিন্ন

৫৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬
৫৫২. মাওলানা রুহুল কুদ্দুস ও সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

স্থানে এ সংগঠনের মাধ্যমে অনেক ইয়াতীমখানা, দাতব্যচিকিৎসালয়, কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদি পরিচালিত হচ্ছে।

কুরআন-হাদীস রিসার্চ সেন্টার ও ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা

মরহুম পীর সাহেব হযরত মাওলানা আবুল আনসার মুহাম্মদ আবদুল কাহ্হার সিদ্দিকী (র.) ইসলামের তাহরীরী ইশা'আতের জন্যে 'কুরআন-হাদীস রিসার্চ সেন্টার' ও 'ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা' প্রতিষ্ঠা করেছেন। কুরআন, হাদীস ও ইসলামের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা করে প্রবন্ধ-নিবন্ধ-পুস্তক প্রনয়ণ করা কুরআন-হাদীস রিসার্চ সেন্টারের কাজ। আর এসব প্রবন্ধ-নিবন্ধ, সাময়িকী, পত্রিকা, বই-পুস্তক প্রকাশ করছে 'ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা'। আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয় এ কুতুবখানা।[৫৫৩]

দারুস্ সালামে (১৬ ফট × ১৬ ফুট), (২৮ ফুট × ১০ ফুট) ও ২৮ ফুট × ১০ ফুট) আয়তনের তিনটি বড় কক্ষে এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বাংলাবাজারে কুতুবখানার নিজস্ব শো-রুমও আছে। ঠিকানা : ৬৬, প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

দরবারে ফুরফুরার প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এ পর্যন্ত প্রকাশিত কিছু পুস্তক, বুকলেট, সাময়িকীর নাম এখানে দেয়া হলো :

বই পুস্তক

১. রাহ বিলায়েত.
২. সহীহ্ মাসনূন ওযীফাহ্,
৩. আমপারার তাফসীর,
৪. হাদীসের নামে জালিয়াতী,
৫. আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত,
৬. এহইয়াউস্ সুনান,
৭. ইসলামী আকীদা,
৮. পোশাক, পর্দা ও দেহসজ্জা,
৯. ইসলামে পর্দা,
১০. দোয়া ও মুনাজাত,
১১. ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ,
১২. সালাতুল ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর,
১৩. বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত,
১৪. খুতবা,
১৫. কুর'আন সুন্নাহ্‌র কষ্টি পাথরে তাওহীদ ও রিসালাত,
১৬. শরীয়ত ভিত্তিক মা'রিফাত,
১৭. আল-কুর'আনের পার্লামেন্ট,
১৮. মিলাদুন্নবী ও সীরাতুন্নবী,
১৯. আরিফ ও মা'রিফাত,
২০. ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের ভুল ধারণা,
২১. ১০০ অমুসলিম মনীষীর দৃষ্টিতে আল-কুর'আন,
২২. অমুসলিম বিশ্বে ইসলামের বিস্ময়কর অগ্রযাত্রা,
২৩. যুক্তি প্রমাণের নিরিখে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব,
২৪. সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলাম,

৫৫৩. মাওলানা রাশিদুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

২৫. দি গ্রেটেস্ট অব অল লিডার্স,
২৬. কেন মুসলমান হলাম ১ম খন্ড,
২৭. কেন মুসলমান হলাম ২য় খন্ড,
২৮. কেন মুসলমান হলাম ৩য় খন্ড,
২৯. কেন মুসলমান হলাম ৪র্থ খন্ড,
৩০. কেন মুসলমান হলাম ৫ম খন্ড,
৩১. কেন মুসলমান হলাম ৬ষ্ঠ খন্ড,
৩২. কেন মুসলমান হলাম ৭ম খন্ড,
৩৩. ৫০ জন অমুসলিম মহিলার ইসলাম গ্রহণের ঈমানদীপ্ত কাহিনী,
৩৪. কম্পিউটার ও আল কুরআন,
৩৫. সুন্নত ও বিজ্ঞান ১ম খন্ড,
৩৬. কলিজা ছিড়া কাহিনী,
৩৭. ইসলামের সত্যতার বিস্ময়কর নিদর্শন ১ম খন্ড,
৩৮. ইসলামের সত্যতার বিস্ময়কর নিদর্শন ২য় খন্ড,
৩৯. ফুরফুরার ইতিহাস,
৪০. হৃদয়ে রক্তক্ষরণ (দিল কি খুন),
৪১. অল্প পুঁজি বেশী রুজী,
৪২. হালাল রুজী,
৪৩. স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা,
৪৪. প্রাথমিক চিকিৎসা গাইড,
৪৫. তা'লীমুন নিসা,
৪৬. জাহান্নামের ছয় রমণী,
৪৭. জাহান্নামের আট রমণী,
৪৯. কবর আযাব প্রত্যক্ষ করার ভয়ংকর ঘটনাবলী,
৫০. জান্নাতের বিস্ময়কর নিয়ামত,
৫১. মরা মানুষের আশ্চর্য ঘটনা,
৫২. মরা মানুষের কান্না,
৫৩. জাহান্নামের আগুনে ৩০ সেকেন্ড,
৫৪. মৃত ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ,
৫৫. জীবন্ত লাশ,
৫৬. আদর্শ ছাত্র যেভাবে হবে,
৫৭. আম্মু আব্বু : আমাদের করণীয়,
৫৮. যে যুবক পাবে আরশের ছায়া,
৫৯. সোনালী দিনের কাহিনী,
৬০. এসো গল্প পড়ি,
৬১. আমি ফুরফুরার পীর বলছি,
৬২. বুখারী শরীফ,
৬৩. গুনাহ মাফের আমল,
৬৪. আসুন জান্নাতে যাই,
৬৫. এক নজরে সুন্নতে নববী (স.),
৬৬. মুসলমানী নেসাব বা ওযীফায়ে রাসূল (স.),
৬৭. তা'লীমুস সালাত,
৬৮. কাদিয়ানী রদ,
৬৯. বেহেশতী জেওর ১ম খন্ড,
৭০. বেহেশতী জেওর ২য় খন্ড,

৭১. বেহেশতী জেওর ৩য় খন্ড,
৭২. বেহেশতী জেওর (১ থেকে ১১ একত্রে),
৭৩. ইবাদাতুল মু’মিনীন,
৭৪. মুসলমানী বিবাহ,
৭৫. মুসলমান কেমন করে কাফির হয়,
৭৬. শির্‌ক, কুফ্‌র, বিদ‘আত, লিদ্‌দীন ফিদ্‌দীন,
৭৭. কুরআন সুন্নাহ্‌র আলোকে ইসলামী আকীদা,
৭৮. দি গাইড,
৭৯. ফাতওয়ায়ে সিদ্দিকীন ১ম খন্ড,
৮০. ফাতওয়ায়ে সিদ্দিকীন ২য় খন্ড,
৮১. ফাতওয়ায়ে সিদ্দিকীন ৩য় খন্ড,
৮২. ফাতওয়ায়ে সিদ্দিকীন ৪র্থ খন্ড,
৮৩. ফাতওয়ায়ে সিদ্দিকীন ভলিয়ম (১ থেকে ৪র্থ খন্ড একত্রে),
৮৪. আশিকে নবী,
৮৫. হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (র.)-এর বিস্তারিত জীবনী,
৮৬. হযরত আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.)-এর জীবনী হাকীকতে খালীফাতুল্লাহ,
৮৭. ফতোয়ায়ে আবদুল হাই সিদ্দিকী,
৮৮. হাকীকতে ইনসানিয়াত,
৮৯. তরীকত দর্পণ,
৯০. ওছীয়তনামা,
৯১. মালফুজাতে আনসারিয়া,
৯২. এই তো সেই ওলী,
৯৩. ওপেন সিক্রেট,
৯৪. মাওলানা রুহুল আমীন (র.) : জীবন ও কর্ম,
৯৫. তরীকতের ফজিলত,
৯৬. হিলফুল ফুযূল একটি অনন্য সংগঠন,
৯৭. ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেব কেবলাত্রয়ের অছীয়ত ও নছীহত,
৯৮. ফাজায়েলে আমল,
৯৯. উছূলে তা‘লীম.
১০০. Voice of Islam,
১০১. Superiority of Islam,
১০২. ঈমান ও আমল,
১০৩. এক নজরে জান্নাতী দল,
১০৪. তাজকেরাতুল আউলিয়া ১ম খন্ড,
১০৫. তাজকেরাতুল আউলিয়া ২য় খন্ড,
১০৬. আত্মশুদ্ধি লাভের উপায়,
১০৭. হাকীকতে হিজবুল্লাহ্‌,
১০৮. নুরানী তা‘লীম,
১০৯. একজন আদর্শ মুসলিম যুবকের আত্মকাহিনী,
১১০. তা‘লীমী নেছাব,
১১১. নূরে ত্বারীক্বাত,
১১২. ফুরফুরার ইতিবৃত্ত,
১১৩. বিশ্ব হারামী,
১১৪. ইজহারে হক,
১১৫. শান্তি,

১১৬. মায়ের অভিশাপ ও শ্বাশুরীর জ্বালা,
১১৭. খুলুকে মুবাল্লিগ,
১১৮. ফুরফুরা শরীফের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস,
১১৯. আদাবুল মুরীদ,
১২০. ফুরফুরা শরীফের মুরীদের নির্দেশিকা,
১২১. হক হিদায়েতের ডাক,
১২২. চিশ্তিয়া তরীকায় আল্লাহর দীদার,
১২৩. মানবতার বাণী ১ম খন্ড,
১২৪. মানবতার বাণী ২য় খন্ড,
১২৫. মানবতার বাণী ৩য় খন্ড।

পকেট বুক সিরিজ

১২৬. বিধর্মী মণীষীদের দৃষ্টিতে বিশ্বনবী,
১২৭. পর ধর্মগ্রন্থে বিশ্বনবী,
১২৮. এক নজরে কবীরা গুনাহ,
১২৯. তা'লীমী নেছাব,
১৩০. এক নজরে জান্নাতী দল,
১৩১. আত্মশুদ্ধি লাভের উপায়,
১৩২. হযরত শাহ নেয়ামতুল্লাহ (র.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী,
১৩৩. গীবত,
১৩৪. মুসলিম জাতির প্রতি ঐক্যের আহবান,
১৩৫. জবানের হেফাজত,
১৩৬. কুফরী কালাম,
১৩৭. অবিশ্বস্য হলেও সত্য কাহিনী,
১৩৮. রাসূলুল্লাহর ভবিষ্যদ্বাণী,
১৩৯. ফাজায়েলে দরূদ,
১৪০. দাড়ির গুরুত্ব,
১৪১. নামায শিক্ষা,
১৪২. হক্কানী জামাতভূক্ত হওয়া ও নেতার হুকুম মানা,
১৪৩. আল্লাহর ওলী হওয়ার মাপকাঠি,
১৪৪. ফানাফিশ শায়েখের অপূর্ব নজীর।

সাময়িকী

১৪৫. বিশ্ব মুসলিম ঐক্য ও শান্তির মিলন কেন্দ্র,
১৪৬. ইসলাম ও মানবতা,
১৪৭. The Message of Islam,
১৪৮. ঈমান বাঁচান,
১৪৯. ফুরফুরা শরীফের ডাক : ঈমান বাঁচান,
১৫০. হক্বের দাওয়াত ও শয়তানী বিভ্রান্তি থেকে আত্মরক্ষার অভিযানে ফুরফুরা শরীফ,
১৫১. জিহাদ,
১৫২. আমি ফুরফুরার পীর- আমার মত কুরআন সুন্নাহ,
১৫৩. এজহারে হক,
১৫৪. ফুরফুরা শরীফে কেন আসলাম? কি পেলাম? কেন আসব না?,

১৫৫. দুনিয়া ও আখিরাত,
১৫৬. কুরআন সুন্নাহ্‌র বাইরে আমার কোন মত নাই,
১৫৭. আত্‌ তাওহীদ,
১৫৮. ফুরফুরা শরীফের নামে ধোকা,
১৫৯. আল-মুজাদ্দিদ,
১৬০. হাইজাকারের খপ্পরে ইসলাম বনাম নির্ভেজাল খাঁটি ইসলাম,
১৬১. Hyjakers Captivating Islam,
১৬২. মুসলমান কে ?,
১৬৩. দারুস্‌ সালাম,
১৬৪. ইয়াদগারে ফুরফুরা শরীফ,
১৬৫. কে কে বেহেস্তে যাবে,
১৬৬. হিযবুল্লাহ্‌,
১৬৭. জুলফিকার,
১৬৮. কুরআন সুন্নাহ্‌র কষ্টি পাথরে ফুরফুরার মত,
১৬৯. এক নজরে ফুরফুরা শরীফ,
১৭০. মারেফাত না মারার পথ,
১৭১. মুসলিম কণ্ঠ, মজলুম সন্ত্রাসী কণ্ঠ,
১৭২. আমি মুরীদ হলাম,
১৭৩. মানবতা,
১৭৪. আপনাদের হাতে পায়ে ধরে বলছি,
১৭৫. বিংশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ,
১৭৬. ফুরফুরার আলো কার হাতে?,
১৭৭. আমাকে পড়ুন,
১৭৮. ধোকাবাজ,
১৭৯. আমি কেনো ইসলাম গ্রহণ করলাম?,
১৮০. ইসলামের ক্ষতি বেশি করেছে নামধারী মুনাফিক মুসলমান,
১৮১. মত ও পথ,
১৮২. শেফাউন নাস,
১৮৩. আল ইত্তেহাদ,
১৮৪. শর্টকাট ইসলাম,
১৮৫. কেমন করে কাফের হলাম,
১৮৬. তালাশ,
১৮৭. ইয়াদগারে ফুরফুরা শরীফের পীর মুজাদ্দেদে জামান হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (র.),
১৮৮. পীর আলেম নারী নেতৃত্ব।[৫৫৪]

মাসিক নিদায়ে ইসলাম

মুসলিম জাতির এক ক্রান্তিলগ্নে ১৯৪১ সালে ইসলামের বাণী মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার জন্যে ফুরফুরার বড় হুযূর হযরত আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.) এ পত্রিকা সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন। তখনকার দিনে ইসলামী পত্রিকার সংখ্যা ছিলো নিতান্তই হাতে গোনা। যা-ও দু'চারটা ছিলো তারও সার্কুলেশন সংখ্যা ছিলো একেবারেই নগন্য। আর সবগুলোর প্রতিষ্ঠতা পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ফুরফুরার পীর সাহেব ও তাঁর খলীফাগণ। অবশ্য মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন প্রমুখ কিছু পত্রিকা বের করেছিলেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে বহু ঘাত প্রতিঘাত পেরিয়ে নেদায়ে ইসলামের প্রকাশনা আজও অব্যাহত আছে। প্রথমে কলকাতা হতে প্রকাশিত হলেও দেশ বিভাগের পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গ্রাহক এবং এজেন্টদের কাছে নেদায়ে ইসলাম পৌঁছাতে নানা

৫৫৪. আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৫

রূপ জটিলতা দেখা দেয়। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে পৃথকভাবে নেদায়ে ইসলাম মুদ্রণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। বহু বাঁধা ভিঘ্ন অতিক্রম করে ১৯৬২ সনের জানুয়ারীতে ঢাকা হতে সর্বপ্রথম নেদায়ে ইসলাম প্রকাশ করা হয়। তখন পর্যন্ত এদেশে নিয়মিত ইসলামী পত্রিকা প্রকাশিত হতো না। ঢাকায় ৬০ নং হেমেন্দ্রদাস রোড, বাংলাবাজার হতে নেদায়ে ইসলাম প্রকাশিত হতে থাকে, সম্পাদকের দায়িত্ব পান জনাব আবদুল মজিদ সাহেব (র.)। তখন নেদায়ে ইসলামের প্রকাশনায় আরও যাঁরা অবদান রাখেন তাঁদের মধ্যে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ (র.), মাওলানা ইসমাইল (র.) প্রমুখের নাম চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে।[৫৫৫]

হযরত আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.)-এর ইন্তিকালের পর হযরত আবদুল কাহ্হার সিদ্দিকী (র.)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় নেদায়ে ইসলাম প্রকাশিত হতে থাকে। আশির দশকের মাঝামাঝি তৎকালীন সম্পাদক আবদুল মজিদ (র.)-এর ইন্তিকালের পর সম্পাদনার দায়িত্ব পান মাওলানা গুলজার হোসাইন সাহেব। আর্থিক সমস্যা ও লোকবলের অভাবে আশির দশকের শেষের দিকে কিছুদিন নেদায়ে ইসলাম প্রকাশ বন্ধ থাকে। অতঃপর নব্বই দশকের শুরুতে মরহুম পীর সাহেব হযরত আবদুল কাহ্হার সিদ্দিকী (র.)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় জমিয়তুল মুসলিমীন হিযবুল্লাহর ভারপ্রাপ্ত পরিচালক হযরত মাওলানা আবুল বাশার জিহাদী সাহেব ট্যাবলয়েট সাইজে নিদায়ে ইসলাম পুন:প্রকাশ করেন। তখন এ পত্রিকার পৃষ্ঠা ছিলো ৪ (চার), হাদীয়া ২ (দুই) টাকা। কিছুদিন পর ম্যাগাজিন সাইজে পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। ছাপা হতো লেটার প্রেসে। তখন পৃষ্ঠা সংখ্যা উন্নিত হয় ২৪ (চব্বিশ)-এ ও এর পরে ৩২ (বত্রিশ)-এ, হাদীয়া ৫ (পাঁচ) টাকা। এ সময় প্রচ্ছদ হতো এক কালারে। পত্রিকার ম্যানেজার ছিলেন জনাব মোহাম্মদ আলম সাহেব। অফিস ছিল ঐ ৬০ নং হেমেন্দ্রদাস রোডেই। এভাবে হযরত মাওলানা আবুল বাশার জিহাদী সাহেবের তত্ত্বাবধানে শুরু হয় পত্রিকার নতুন অভিযাত্রা।

১৯৯৪ সনে আর্থিক সংকটের কারণে মাঝে মাঝে দু'মাসের পত্রিকা একসাথে প্রকাশিক হতে থাকে। এ পর্যায়ে পত্রিকার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ফুরফুরার মরহুম পীর হযরত মাওলানা আবদুল কাহ্হার সিদ্দিকী সাহেব (র.) সরাসরি নিজের তত্ত্বাবধানে নেদায়ে ইসলাম প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেন। পত্রিকার অফিস স্থানান্তরিত হয় মার্কাজে ইশা'আতে ইসলাম, ২/২ দারুস্ সালাম, মীরপুর, ঢাকায়। এখান থেকে প্রথম সংখ্যা ছাপা হয় ১৯৯৪ সনের নভেম্বরে। তখন কম্পিউটার কম্পোজে, উন্নত অপসেট ছাপায় পত্রিকাটি এক নতুন মাত্রা পায়। 'মত ও পথ' বিশেষ সংখ্যা হিসেবে এ সংখ্যাটি ছাপা হয়। গঠিত হয় 'নেদায়ে ইসলাম প্রকাশনা পরিষদ' একদল উদ্যোগী যুবককে নিয়ে। ম্যানেজার হিসেবে যোগদান করেন আমাদের সবার পরিচিত মোমীন সাহেব। নিজের চাকুরী ছেড়ে দিয়ে একান্তভাবে সময় দেন নেদায়ে ইসলামকে। তাঁর ত্যাগ অতুলনীয়।[৫৫৬] ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানায় প্রচুর বই ও পুরানো নেদায়ে ইসলাম বস্তায় ভরে দেশময় ঘুরে বেড়ান এ উদ্যোমী যুবক পীর সাহেব হুযূরের মাহফিলে মাহফিলে, এসব বিক্রি করে নেদায়ে ইসলামের জন্য ফান্ড সংগ্রহের লক্ষ্য নিয়ে। সংগৃহীত হয় একটি ক্ষুদ্র ফান্ড। চলতে থাকে নেদায়ে ইসলামের অব্যাহত প্রকাশনা।

তখন পত্রিকার প্রচ্ছদ ছিল না। ফর্মা কাগজের এক পৃষ্ঠায় এক কালারে প্রচ্ছদ মুদ্রিত হতো। পরে ১৯৯৫ সনের রবিউস সানি মাস থেকে দু'কালারের ডিজাইন, প্রসেস ও পজিটিভ করে প্রচ্ছদ ছাপা শুরু হয়। এক পর্যায়ে কিছু 'পৃষ্ঠপোষক' ও 'আজীবন সদস্য' সংগ্রহের উদ্যোগ নেয়া হয়। উদ্দেশ্য ফান্ড কালেকশন। তিনজন প্রষ্ঠপোষক ও সাত জন আজীবন সদস্য সংগৃহীত হয়। ফান্ডও কিছু সমৃদ্ধ হয়। তখন পর্যন্ত নেদায়ে ইসলাম ৩২ পৃষ্ঠায় ছাপা হচ্ছিলো।

পরবর্তীতে ১৯৯৮ সনের ডিসেম্বর মাস হতে নতুন আঙ্গিকে বর্ধিত কলেবরে ৪০ পৃষ্ঠায় নিদায়ে ইসলাম ছাপা শুরু হয়। তখন থেকে আর্ট পেপারে চার কালারে কম্পিউটার ডিজাইনে পৃথক প্রচ্ছদে নিদায়ে ইসলাম ছাপা হয়ে আসছে। হাদীয়া রাখা হয় ১০ (দশ) টাকা। অদ্যাবধি এ কলেবরেই নেদায়ে ইসলাম প্রকাশিত হচ্ছে। এক পর্যায়ে নেদায়ে ইসলামের জন্য নিজস্ব কম্পিউটার কেনা হয় ১৯৯৯ সনে। নতুন আঙ্গিকে নতুন কার্যালয়ে নতুন ব্যবস্থাপনায় প্রকাশনা শুরু হবার পর পর্দার আড়ালে যারা তাঁদের অক্লান্ত শ্রম দিয়ে তিলে তিলে নেদায়ে ইসলামকে বর্তমান পর্যায় নিয়ে আসতে সাহায্য করেছেন তাদের মধ্যে আছেন প্রতিষ্ঠিত লিখক ও কলামিস্ট ডা. তারেক সিদ্দিকী, সহকারী সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেন সাইফুল্লাহ্, একাউন্টস অফিসার মাহবুব আলম ও

---

৫৫৫. ড. আবদুল গফুর সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪
৫৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

আবদুল্লাহ জাবির তপাদার, প্রাক্তন কম্পিউটার অপারেটর আবদুল গাফ্ফার, বিভাগীয় সম্পাদক আবদুল্লাহ ইব্নে মুর্শিদ, সম্পাদনা সহকারী মাহমুদ ওয়াজেদ, হিলফুল ফুযূলের প্রাক্তন সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. একে মাহমুদ রুমী, ম্যানেজার আবদুল মোমিন এবং অফিস সহকারী হাবীবুর রহমান, আনোয়ার হোসেন খান এবং আরো অনেকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। লেখা দিয়ে, গ্রাহক ও এজেন্ট হয়ে, পত্রিকা পড়ে ও অন্যকে পড়তে দিয়ে যে হাজারো মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নেদায়ে ইসলমের কাজে সাহায্য করেছেন আর করছেন তার ইয়ত্তা নেই।[৫৫৭]

সিদ্দিকীয়া মিডিয়া সেন্টার

আধুনিক প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার যুগে ইসলাম প্রচারে অডিও-ভিজুয়াল মিডিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অডিও-ভিজুয়াল মিডিয়ার মাধ্যমে দাওয়াতে ইসলামের কাজকে জোরদার করার লক্ষ্যে মরহুম পীর সাহেব হযরত মাওলানা অবুল আনসার মুহাম্মদ আবদুল কাহ্হার সিদ্দিকী (র.) প্রতিষ্ঠা করেন 'সিদ্দিকীয়া মিডিয়া সেন্টার'। ওয়াজ, গজল ইত্যাদির ক্যাসেট ও সিডি রেকর্ডিং প্রকাশ এ প্রতিষ্ঠানের মূল কাজ। এ প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার মূল দায়িত্বে আছেন মরহুম পীর সাহেব (র.)-এর মেজ সাহেবজাদা হযরত আবুল আরাফাত মো. মোস্তফা মাদানী সিদ্দিকী।

এ প্রতিষ্ঠান থেকে এ পর্যন্ত যেসব ক্যাসেট ও সিডি বের হয়েছে মন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো প্রধান :
১. ফুরফুরার মরহুম পীর সাহেব হুযূরের ওয়ায,
২. ফুরফুরার মেজ হুযূরের ওয়ায,
৩. ফুরফুরার বর্তমান গদ্দীনশীন পীর সাহেব হুযূরের ওয়ায,
৪. ড. খোন্দকার আ. ন. ম. আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের ওয়ায,
৫. হামদ ও নাত ও গজলের ক্যাসেট এবং সিডি,
৬. হেরার জ্যোতি,
৭. হৃদয়ের বাণী,
৮. আত্মার শান্তি,
৯. মুক্তির মোহনায়।
এ ছাড়াও এ প্রতিষ্ঠান বিশ্ব বিখ্যাত কারীদের তিলাওয়াত, দেশ বিখ্যাত আলিমদের ওয়ায ও জনপ্রিয় গজলের ক্যাসেট পরিবেশন করে থাকে।[৫৫৮]

৫৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২
৫৫৮. মহিউদ্দীন খান ও গোলাম হোসাইন সলীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭

নবম অধ্যায়

ইসলামের প্রচার ও প্রসারে ফুরফুরার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য 'আলিমগণ

১. হযরত মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমাদ, ছারছীনা।
২. হযরত সূফী আবদুল মুমিন, চট্টগ্রাম।
৩. হযরত মাওলানা আবেদ আলী এনায়েতপুরী, যশোর।
৪. আবদুর রহমান হানাফী, কুমিল্লা মুরাদনগর।
৫. মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, চন্দনাইশ চট্টগ্রাম।
৬. হযরত মাওলানা আবদুল হামিদ, যশোর।
৭. হযরত মাওলানা আজীম উদ্দীন আহমাদ, ধামতী।
৮. হযরত মাওলানা মোয়েজ উদ্দীন, সাতক্ষীরা।
৯. হযরত মাওলানা সাজেদ উল্লাহ, মিরেশ্বরাই চট্টগ্রাম।
১০. হযরত মাওলানা ফয়জোর রহমান, নোয়াখালী।
১১. হযরত সূফী শাহ মাহতাবুদ্দীন, পাবনা।
১২. শাহ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, নোয়াখালী।
১৩. হযরত সূফী সদরুদ্দীন, যশোর।
১৪. প্রফেসর আবদুল খালেক, কসবা বি.বাড়িয়া।
১৫. মাওলানা আবদুল জব্বার, বাঁশখালী চট্টগ্রাম।
১৬. হযরত মাওলানা তমিজ উদ্দীন, খুলনা।
১৭. হযরত মাওলানা আবদুল গনি, মীরসরাই চট্টগ্রাম।
১৮. কবি মুনশী জহির উদ্দীন গাজী, ঝিনাইদহ।
১৯. মাওলানা মনসুর আহমেদ, হাজিগঞ্জ চাঁদপুর।
২০. মাওলানা আবদুল মজিদ, ফেনী।
২১. হযরত মাওলানা আবদুল গফুর, বোয়ালমারী ফরিদপুর ২৮২
২২. হযরত সূফী মাওলানা ইয়াসীন, ফরিদগঞ্জ চাঁদপুর।
২৩. মাওলানা আজিম উদ্দীন, ছাগলনাইয়া ফেনী।
২৪. হযরত মাওলানা প্রফেসর নূরুল আফসার, সীতাগঞ্জ চট্টগ্রাম।
২৫. আল্লামা রূহুল আমীন (র.)।।
২৬. ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ
২৭. সৈয়দ আবুল বাশার মুহাম্মদ বশীরুদ্দীন
২৮. সূফী সায়েম উদ্দীন।
২৯. হযরত মাওলাানা তোয়াজ উদ্দীন আহমাদ।
৩০. হযরত নওয়াব আলী।
৩১. সূফী আবুল বারাকাত।
৩২. মুনসী শাহাদাত হেসেন।
৩৩. হযরত শাহ ফতেহ আলী ওয়সী।

হযরত মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ (র.)

হযরত মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ (র.) বাংলা-ভারতের একজন প্রখ্যাত 'আলিম ও বিখ্যাত পীর ছিলেন। 'ছারছিনার পীর সাহেব' নামে তিনি সমধিক পরিচিত ছিলেন। লক্ষ লক্ষ পথহারা মানুষ তাঁর সান্নিধ্যে এসে সঠিক পথের দিশা পেয়েছে। মুজাদ্দিদে জামান হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (র.)-এর তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান খলীফা। বর্তমানে নেছারাবাদ উপজেলার ছারছিনা নামক গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে বাংলা ১২৭৯ সালে এ মহাপুরুষের জন্ম। পারিবারিক অস্বচ্ছলতা থাকা সত্বেও বিশেষ কৃতিত্বের সাথে তিনি মাদ্রাসার

পাঠ সমাপন করেন। হুগলী মোহছেনীয়া মাদ্রাসায় অধ্যায়নকালে তিনি বাংলায় ইসলামী রেঁনেসা সৃষ্টিকারী মুজাদ্দিদে যামান ফুরফুরার পীর হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (র.)-এর সাহচর্যে আসেন। অতি অল্প দিনের মধ্যেই আধ্যাত্মিক সাধনায় পারদর্শিতা অর্জন করে মুর্শিদে কামিলের অনুমতি নিয়ে দেশে ফিরে এলেন এবং হেদায়েতের দীপ্ত মশাল হাতে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন অজ্ঞতা আর কুসংস্কারে জর্জরিত সমাজের বুকে। উদাত্ত কণ্ঠে তিনি আহব্বান জানালেন- কুর'আন ও সুন্নাহ্ গ্রহণ করো। লাখ লাখ মানুষ তাঁর ডাকে সাঁড়া দিল। কত বে নামাজী নামাজী হলো, কত সুদখোর সুদের কারবার বন্ধ করলো, কত চোর-ডাকাত তাঁর হাতে হাত দিয়ে পথের সন্ধান পেলো তার ইয়ত্তা নেই। ধীরে ধীরে সমাজের বুকে তাঁর এক অভাবনীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হলো।

শরীয়ত গর্হিত কাজে জুতা পেটা থেকে শুরু করে সমাজবন্ধ পর্যন্ত তিনি যাকে যে শাস্তি প্রদান করতেন, সে তাই অবনত মস্তকে মেনে নিত। শুধু তাই নয়, বিচার মিমাংসায় তাঁর বিচক্ষণতার পরিচয় পেয়ে সে বৃটিশ আমলেও সরকারের কাছে দাখিলকৃত বহু মামলা মুকাদ্দামা মীমাংসার জন্য স্বয়ং মহকুমা হাকীম পর্যন্ত বিনা দ্বিধায় তাঁর মত তরুণ বয়স্ক একজন ধর্মীয় 'আলিমের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ উপলব্ধি করেছিলেন শুধুমাত্র ওয়াজ নছীহত দ্বারা সমাজে স্থায়ী ধর্মীয় জাগরণ সম্ভব নয়। এ জন্য প্রয়োজন একদল সত্যিকারের হাদী 'আলিম গঠন করা। এ উদ্দেশ্যেই ১৯১৪ সালে নিজ বাড়ীর বিরাট নারিকেল সুপারীর বাগান কেটে একখানি মাদ্রাসার গোড়াপত্তন করেন।[৫৫৯] শিক্ষক শিক্ষার্থীর চাল-চলন, পোশাক-পরিচ্ছদ, আদব-আখলাক সবকিছু খাঁটি সুন্নাত তরীকায় হতে হবে, এটি ছিলো তাঁর নির্দেশ। তাঁর নিঃস্বার্থ নিরলস প্রচেষ্টার পরিচয় পেয়ে তাঁর ভক্তবৃন্দ ছাড়াও জনাব মরহুম এ কে ফজলুল হকের মত সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মাদ্রাসার উন্নতিকল্পে এগিয়ে এলেন। ধীরে ধীরে গড়ে উঠলো ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলীয়া মাদ্রাসা। এদেশে এ মাদ্রাসাতেই প্রথম টাইটেল বিভাগ খোলা হয়। শিক্ষার্থীগণ যেনো বাইরের পরিবেশে নিজের 'আমল আখলাক নষ্ট করে না ফেলে সেজন্য তাদের সার্বক্ষণিক থাকার জন্য লিল্লাহ বোর্ডিং-এর ব্যবস্থা করেন। তাঁর অগণিত ভক্তবৃন্দ ও দীনদার মুসলিমগণ তাঁর আত্মত্যাগ দর্শনে মুগ্ধ হয়ে মুক্তি পেতে এ বোর্ডিংয়ে ধান, চাল ও টাকা-পয়সা দান করার জন্য এগিয়ে এলেন। তাঁর এ প্রচেষ্টার ফল অচিরেই মানুষ উপলব্ধি করলো। দেশের বিভিন্ন এলাকায় এ মাদ্রাসার অনুকরণে গড়ে উঠলো শত শত মাদ্রসা ও মক্তব।

দেশের আনাচে-কানাচে ঘুরে ঘুরে ওয়াজ নছীহতের মাধ্যমে শরীয়তের তা'লীমের পাশাপাশি মানুষকে তাছাউফের প্রক্রিয়া শিক্ষা দতেন। শুধু তাই নয়, বছরে দু'বার পীরের নির্দেশে নিজ বাড়ীতে ইসালে সওয়াবের মাহফিল করে মানুষকে দাওয়াত দিতেন। পীরের নির্দেশে দু'তিন দিন নিজ খরচে তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে তাদেরকে বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়েল, ওযীফা-মোরাকাবা শিক্ষা দিতেন, সত্যিকারের মানুষ হওয়ার তা'লীম দিতেন। মাওলানা নেছারুদ্দীনের হেদায়েত ছিল বিভিন্নমুখী। ইমান-আকায়েদ, মাসআলা-মাসায়েল থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ে তিনি অসংখ্য পুস্তক প্রণয়ন করেছেন। নিজ প্রচেষ্টায় গড়ে তুলেছেন বহু মূল্যবান কিতাব সম্বলিত এক বিরাট কুতুবখানা। প্রকাশ করেছেন 'তাবলীগ' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা। এ যুগ সংগঠনের যুগ। এ যুগে কোনো বিষয়ের সত্যিকারের প্রচার প্রসার সংগঠন ছাড়া সম্ভব নয়। তাই তিনি গঠন করেছিলেন 'জমিয়তে হিযবুল্লাহ্'।[৫৬০]

দেশের একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে রাজনীতির ব্যাপারেও তিনি ছিলেন সজাগ, যদিও প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে তিনি কোনোদিনই অংশগ্রহণ করেন নি। পীরের নির্দেশে পাকিস্তান আন্দোলনে তাঁর বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিলো। পাকিস্তান অর্জিত হওয়ার পর ছারছীনায় আহূত সর্বদলীয় ওলামা সম্মেলন তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার এক সুস্পষ্ট নিদর্শন। তাঁর জীবন পর্যালোচনা করলে বুঝা যায়, তিনি ছিলেন নবী চরিত্রের এক মূর্ত প্রতীক। হেদায়াত, তাবলীগ, ইবাদাত-বন্দেগী থেকে শুরু করে জীবনের খুঁটিনাটি প্রতিটি কাজ হুবহু ছুন্নত তরীকায় পালন করতে তিনি সব সময়ই সচেষ্ট থাকতেন।

---

৫৫৯. মহিউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০

৫৬০. পরিচাল দারুছ ছুন্নাহ লাইব্রেরী, *পীর মাওলানা নেছার উদ্দীন আহমদ (র.)-এর জীবনী* (বরিশাল: দারুছ ছুন্নাহ লাইব্রেরী, ১৯৮৮ খ্রী.), পৃ. ২১

একদিন তিনি বলেছিলেন– 'নেছারুদ্দীনকে কেহ লক্ষ টাকা দিলেও একটি সুন্নতে যায়েদার 'আমল হতে ইনশাআল্লাহ্ ফিরিয়ে রাখতে পারবে না।'[৫৬১] তাঁর এ উক্তি থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, শরীয়তের 'আমলে তিনি কতটুকু সাবধান ছিলেন। আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরতা, তাকওয়া, ক্ষমা, ধৈর্য ইত্যাদি গুণগুলো তাঁর দৈনন্দিন কাজে ও কথায় এমনভাবে ফুটে উঠতো যে, সে সব ঘটনা আমাদেরকে আগেকার ওলী-দরবেশ ও নবী-রাসূলগণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মানবতাবোধ, সহানুভূতি, সহমর্মিতা তাঁর চরিত্রের এক অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য। সৃষ্টির সেবাই তরীকার মূল উদ্দেশ্য- এ কথাটি তাঁর জীবনে অত্যন্ত সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। নও মুসলিমদের দুঃখ-দুর্দশায় অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষকে আর্থিক সাহায্য প্রদানের জন্য 'হেমায়েত ইসলাম তহবিল', বিভিন্ন মাদ্রাসার আর্থিক অস্বচ্ছলতা দূরীকরণে 'ইহইয়ায়ে সুন্নত তহবিল', 'মক্কা-মদীনা রিলিফ ফান্ড' ইত্যাদি তহবিল তিনি গঠন করেছিলেন। তাঁর তাকওয়া পরহেজগারী কিংবদন্তীতুল্য। তাঁর জীবনের কিছু স্মরণীয় ঘটনা এখানে তুলে ধরা হলো–

১. একবার তিনি ঢাকায় অবস্থানকালে এক ব্যক্তির কাছ থেকে একটি সুঁই ধার নিয়েছিলেন। কিন্তু সুঁইটি ফেরত দেয়ার কথা বেমালুম ভুলে গেলেন। এ দিকে দেশ থেকে জরুরী খবর আসায় তিনি অবিলম্বে ছারছীনা রওয়ানা হলেন। দেশে পৌঁছে বাড়ীর ঘাটে নামবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে সুঁইটির কথা তাঁর মনে পড়লো। তিনি নৌকা থেকে না নেমে পুনরায় ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। ঢাকা পৌঁছে সুঁইয়ের মালিকের কাছে সুঁইটি ফেরত দিলেন এবং এ ভুলজনিত দেরী হবার জন্য তার কাছে বার বার মাফ চাইতে লাগলেন। সঁইয়ের মালিক যতক্ষণ না মুখে 'আমি আপনাকে মাফ করে দিলাম' কথাটি না উচ্চারণ করলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত অনুনয়-বিনয় করে তার কাছে মাফ চাইতে লাগলেন।[৫৬২]

২. নেছারুদ্দীন (র.)-এর লংগরখানার এক বাবুর্চি মাদ্রাসার কাজের জন্য রক্ষিত বালু হতে সামান্য একটু বালু থালা-বাসন মাজবার জন্যে নিয়েছিল। তিনি এটা জানতে পেরে বাবুর্চিকে বললেন, 'তুমি এটা কোথা থেকে এনেছ?' সে বললো, 'মাদ্রাসার কাজের জন্য যে বালু আনা হয়েছে, সেখান থেকে এনেছি।' তিনি তখন বললেন, 'মাদ্রাসার বালু খরচ করবে কেন? তা খরচ করলে মস্ত বড় অন্যায় হবে।' একথা বলে তিনি নিজ তহবিল হতে এ বালুর মূল্য স্বরূপ কিছু পয়সা মাদ্রাসার ফান্ডে জমা দিয়ে পরে বালু কাজে লাগাতে হুকুম দিলেন।[৫৬৩]

৩. নেছারুদ্দীন (র.) ছেলেবেলা হতেই সত্য কথা বলতে অভ্যস্ত ছিলেন। বাল্যাবস্থায় তাঁর এক পরশী হিন্দু জমি নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করে। জমি তাঁর নামে রেকর্ড করা হয়েছিলো। কিন্তু হিন্দু লোকটি অভিযোগে বললো, 'এ জমি আমার, ভুলে তাঁর নামে রেকর্ড করা হয়েছে। যদি এ জমি তাঁর সম্মুখে রেকর্ড করা হয়ে থাকে, তবে তিনি তাঁর স্বকারোক্তি দিক।'

পড়াশুনার জন্যে বিদেশে থাকায় জমিটি নেছারুদ্দীন (র.)-এর সম্মুখে রেকর্ড করা হয়নি। তাঁর চাচাদের সম্মুখে তাঁর নামে রেকর্ড করা হয়েছিলো। তাঁর পক্ষের উকিল তাঁকে এ বলে পরামর্শ দিলেন যে, 'হাকীম আপনাকে জিজ্ঞেস করলে আপনি বলবেন যে, উক্ত জমি আপনার সম্মুখেই রেকর্ড করা হয়েছে।' একথা শুনে নেছারুদ্দীন (র.) বললেন, 'আমি সম্পত্তি না পেলেও কখনও মিথ্যে কথা বলতে পারবো না।' উকিল তাঁকে বার বার মিথ্যা বলাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তিনি তাতে রাজী হলেন না।

নির্দিষ্ট দিনে কোর্টে মামলা আরম্ভ হলো। হাকীম সাহেব তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'এ জমি কি আপনার সম্মুখে রেকর্ড করা হয়েছে?' উত্তরে তিনি বললেন. 'সত্যিই এ জমি আমার; কিন্তু আমার সম্মুখে রেকর্ড করা হয়নি। কেননা আমি তখন পড়ালেখার জন্য বিদেশে ছিলাম। চাচারা আমার নামে রেকর্ড করেছেন।'

তাঁর এ উত্তর শ্রবণ করে তাঁর পক্ষীয় উকিল এবং চাচারা নিরাশ হয়ে গেলেন। উকিল বললেন, 'তাঁর নিজের সাক্ষী মতে এ জমি তিনি কিছুতেই পাবেন না।' হাকীম সাহেবও মুখে হাত রেখে চিন্তা করতে লাগলেন।

---

৫৬১. ইয়াকুব ও খুরশিদ আনোয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ, ৯৭
৫৬২. মুফতী আহমদ ইয়ার খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫
৫৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

পরিশেষে এ বলে রায় দিলেন যে, "জমি আমার সম্মুখে রেকর্ড করা হয়েছে, এতটুকু মিথ্যা বললেই জমি পাওয়া যাবে-এটা জানা সত্ত্বেও যিনি সত্যের খাতিরে এতটুকু মিথ্যা বলতে পারলেন না, তিনি নিজেই বলেছেন যে, 'এ জমি আমার।' কাজেই তাঁর দাবী মিথ্যা হতে পারে না। সুতরাং এ জমি তাঁরই।" হাকীম সাহেবের রায় শুনে বিপক্ষ দল ম্লান মুখে ফিরে গেল। পরিশেষে সত্যের জয় হলো।[৫৬৪]

৪. হযরত নেছারুদ্দীন (র.) একদিন তাঁর কুতুবখানার বারান্দা থেকে ভিতরে যাচ্ছিলেন। এমন সময় একটি বিড়াল তাঁর পায়ের নীচে পড়ে গেল। তিনি বিড়ালটির উপর পা চাপা না দিয়ে একপাশে হেলে মাটিতে পড়ে গেলেন। ফলে শরীরে বেশ ব্যথা পেলেন। কিন্তু তিনি নিজের ব্যথার কথা প্রকাশ না করে বিড়ালটি ব্যথা পেয়েছে নাকি– তা চিন্তা করে বারবার অনুতাপ করতে লাগলেন।

৫. একদিন তিনি ওযু করছিলেন। এমন সময় দেখলেন যে, কয়েকটি পিপিলিকা ওযুর পানির সাথে ভেসে যাচ্ছে। এটা দেখে তিনি বিশেষভাবে অস্থির হয়ে পড়লেন এবং সঙ্গী খাদেমকে পিপিলিকাগুলো উঠিয়ে শুকনা জায়গায় রেখে দিতে বললেন। যতক্ষণ না পিপিলিকাগুলোকে পানি হতে সরিয়ে শুকনো জায়গায় রেখে দেয়া হলো, ততোক্ষণ পর্যন্ত তিনি শান্ত হলেন না।[৫৬৫]

৬. নেছারুদ্দীন (র.) একদিন বহুলোক বেষ্টিত অবস্থায় মজলিসে বসে ছিলেন। একজন গরীব লোক এসে ভিক্ষা চাইলে তিনি তাকে ২টি টাকা দিলেন। গরীব লোকটি আরো বেশি টাকা পাওয়ার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয়বার ভিক্ষা চাইলো। তিনি তাকে আরো ২টি টাকা দিলেন। ভিক্ষুক এতেও খুব একটা সন্তুষ্ট হলো না। সে আবার ভিক্ষা চাইলে তিনি সামান্য বিরক্ত হয়ে বললেন, 'বাবা, আর কত কষ্ট দিবেন? এখন চলে যান।'

ভিক্ষুকটি দরবার হতে চলে গেল। সি কিছুদূর যেতে না যেতেই তিনি তার জন্যে অন্য একজন লোক মারফত আরো ২টি টাকা পাঠিয়ে দিলেন। ঐদিন বিকালে ভিক্ষুকটি আবার তাঁর দরবারে আসলো। তিনি তাকে দেখে বললেন, 'বাবা! সকাল বেলা আপনার প্রতি আমি রাগ করেছিলাম, তাতে কি আপনি মনে ব্যথা পেয়েছেন?' লোকটি আজিজি এনকেছারীর সাথে বললো, 'হুযূর, আমি কোনো ব্যথা পাইনি।' তিনি তাকে আবার বললেন, 'বাবা! নিশ্চয়ই আপনি মনে ব্যথা পেয়েছেন, মেহেরবানী করে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে অন্তর থেকে আমাকে মাফ করে দিন।' ভিক্ষুকটি যতক্ষণ না বললো যে, 'হুযূর, আপনাকে আমি অন্তর থেকে মাফ করে দিলাম।' ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তার কাছে বার বার অনুনয় বিনয় সহকারে মাফ চাইতেই লাগলেন।[৫৬৬]

৭. আরেকদিনের ঘটনা। মুজাদ্দিদে যামান হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (র.) উপস্থিত বেশ কয়েকজন মুরীদকে পুকুর থেকে মাছ ধরে আনার হুকুম দিলেন। তখন ছিল শীতকাল। পুকুরের পানি ছিলো বরফের মত ঠান্ডা। উপস্থিত অনেকে ইতস্তত করছিলো। কিন্তু পীরের হুকুম পেয়ে নেছারুদ্দীন (র.) সঙ্গে সঙ্গে পুকুরে নেমে মাছ ধরা শুরু করলেন। তাঁর দেখা-দেখি আরও কয়েকজন পুকুরে নামলো। মাছধরা শেষ হলে সবাই পুকুর থেকে উঠে আসলো। কিছুক্ষণ পরে উঠে আসা ব্যক্তিদের মধ্যে নেছারুদ্দীন (র.)-কে দেখতে না পেয়ে মুজাদ্দিদে যামান (র.) বললেন, 'নেছারুদ্দীন কোথায়?' সবাই চারদিকে তাকাতে লাগলো। কিন্তু তাঁকে দেখা গেল না। বহু খোজাখুজির পর পুকুর পাড়ে গিয়ে দেখা গেলো– তিনি পুকুরে ঠান্ডা পানির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন। এ অবস্থায় তাঁকে দেখে মুজাদ্দিদে যামান (র.) বললেন, 'বাবা, তুমি এখনও পানিতে দাঁড়িয়ে আছো কেনো? সবাই তো সে কখন ওঠে গেছে!' নেছারুদ্দীন (র.) বললেন, 'হুযূর! পুকুরে নেমে মাছ ধরতে আপনি হুকুম করেছেন। কিন্তু পুকুর থেকে উঠে আসার হুকুম তো আপনি করেননি। আপনার হুকুম ছাড়া কি করে আমি পুকুর থেকে ওঠে আসি?' তাঁর এ উক্তি শুনে উপস্থিত সবাই অবাক বিস্ময়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন। পীরের হুকুম তামীলের এরূপ ঘটনা ইতিহাসে সত্যিই বিরল।[৫৬৭]

---

৫৬৪. মুজাদ্দিদ আলফ সানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮
৫৬৫. পরিচালক দারুছ ছুন্নাহ লাইব্রেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭
৫৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩
৫৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

৮. সব বাড়ীর মলমূত্র-আবর্জনা এসে যেখানে জমা হয় (সেপ্টি ট্যাংকি) মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর বদনাটি একদিন সেখানে পড়ে গেলো। তিনি বদনাটির জন্য আফসোস করতে লাগলেন। পীরের আফসোস দেখে ছারছীনার পীর নেছারুদ্দীন (র.) থাকতে পারলেন না। গভীর রাতে ওঠে তিনি ঐ মলমূত্রপূর্ণ গর্তের মধ্যে নামলেন। ডুব দিয়ে তুলে আনলেন বদনাটি। তারপর ভালো করে ধুয়ে, নিজে গোসল করে বদনাটি পীরের ঘরের দরজার কাছে রেখে আসলেন। সকালে বদনা পেয়ে মুজাদ্দিদে যামান (র.) খুশীতে বাগ বাগ হয়ে গেলেন।[৫৬৮]

৯. নেছারুদ্দীন (র.) তাঁর পরিবার-পরিজনদের সর্বদা কঠোর পর্দার মধ্যে রেখেছেন। সামান্যতম পর্দার খিলাফও তিনি বরদাস্ত করতেন না। একদিনের ঘটনা। হুযূর জনৈক খাদেমকে গাছ থেকে নারকেল পেড়ে আনতে বললেন। নরকেল পাড়তে পাড়তে খাদেমটি হঠাৎ একবার অন্দর মহলের দিকে তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলো। এটা হুযূরের চোখ এড়ালো না। তিনি খাদেমকে নীচে নেমে আসতে হুকুম দিলেন। খাদেম নেমে এলে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'অন্দরের দিকে তাকিয়ে তুমি কি দেখলে?' খাদেম ভয়ে ভয়ে বললো, 'হুযূর! কোনো লোকজন দেখিনি, শুধুমাত্র একটি কাপড় দেখেছি।' হুযূর তৎক্ষণাত কাপড়টি অন্দর থেকে আনালেন। দেখা গেলো, 'ওটা একটা শাড়ী।' তিনি সাথে সাথে খাদেমটির চোখের সামনে শাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দিলেন। শাড়ীটি পুড়ে ছাই হয়ে গেল। তারপর বললেন, 'মহিলাদের কাপড়ও বেগানা পুরুষের কাছ থেকে পর্দায় রাখতে হয়। কেননা, কাপড় দেখে মনে কল্পনা জন্মাতে পারে– যে মহিলা এ কাপড় পড়ে সে হয়তো খুব সুন্দরী দেখতে! যেহেতু শাড়ীটিকে তুমি দেখে ফেলেছ, তাই এটা পড়লে পর্দার খেলাফ হবে। সে জন্য শাড়ীটি পুড়িয়ে ফেললাম।'[৫৬৯]

১০. অপর একটি ঘটনা। একটি লোক কোলে করে ছোট্ট একটি বাচ্চা মেয়েকে হুযূরের দরবারে নিয়ে এলো। হুযূর সাথে সাথে লোকটিকে মেয়েসহ চলে যাবার নির্দেশ দিলেন। তারপর বললেন, 'ছোট মেয়েদেরর বেপর্দায় নিতে নেই। কেননা এরূপ খেয়াল হয়তো পয়দা হতে পারে– সে বাচ্চা মেয়েটি এত সুন্দর, তার মা না জানি কত সুন্দর! এতে ক্ষতি হবে।'

১১. নদীনালার দেশ বরিশাল। নৌকা এখানে প্রধান বাহন। তা সত্ত্বেও হুযূরের সাহেবজাদীকে শাদীর পর যখন নৌকায় করে স্বামীর বাড়ী পাঠানো হলো, তখন নৌকা দেখে তিনি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন। পরে জানা গেলো, নেছারুদ্দীন (র.) কন্যাদের জন্মের পর থেকে কখনই ঘর হতে তাদেরকে বাইরে বের হবার ইজাজত দেননি। ফলে নৌকার দেশে থেকেও নৌকা কি জিনিসি তা তারা জানতেন না।[৫৭০]

হযরত সূফী আবদুল মুমিন (র.), চট্টগ্রাম।

মুজাদ্দিদে জামান হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (র.)-এর বিশিষ্ট খলীফা সূফী আবদুল মুমিন (র.) উচ্চ শ্রেণীর 'আবিদ ও তাকওয়া-পরহেজগারীতে ছিলেন অনন্য। তিনি চট্টগ্রাম জেলার রাওজান থানার নওয়াপাড়া গ্রামে বিখ্যাত কুলীন সেন বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ব নাম ছিলো শ্রী প্রতাপচন্দ্র সেন। শৈশবে তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। ফলে তিনি তাঁর একমাত্র ফুফুর কাছে প্রতিপালিত হন। বাল্যকালে তিনি নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হতেন। কঠিন রোগে আক্রান্ত প্রতাপচন্দ্র সেনকে তাঁর ফুফু সাথে নিয়ে ইসাপুরের বিখ্যাত দরবেশ আহামদ উল্লাহ্ (র.)-এর খেদমতে হাজির হন। দরবেশের দু'আয় তিনি রোগমুক্ত হন। সেদিন থেকে দরবেশের প্রতি প্রতাপচন্দ্র সেন আকৃষ্ট হন এবং প্রায়ই উপদেশ ও দু'আ গ্রহণের জন্য দরবেশের দরবারে গমনাগমন করতেন।

বাবু প্রতাপচন্দ্র সেন ওরফে সূফী আবদুল মুমিন এফ. এ পাঠকালে একদিন ইসাপুরের বিখ্যাত দরবেশ মাওলানা আহমাদ উল্লাহ সাহেবের কাছে দু'আ নিতে যান। তিনি বলেন, 'তুমি এ পরীক্ষায় মনে হয় পাস করতে পারবে

৫৬৮. পরিচালক দারুছ ছুন্নাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০
৫৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭
৫৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

না।’ যথেষ্ট মেহনত করে পরীক্ষা দিয়েও দরবেশের কথা সত্যে পরিণত হলো। বাবু প্রতাপচন্দ্র সেন ফেল করলেন। ফেল করা প্রতাপচন্দ্রের কিন্তু দরবেশের প্রতি ভক্তি- শ্রদ্ধা বেড়ে গেলো। আবার দেখা করতে গেলেন। দরবেশ সাহেব এবার বললেন, “প্রতাপচন্দ্র! বোধ হয় তোমার সাথে আমার আর দেখা নাও হতে পারে। যদি শীঘ্রই তোমাকে সরকারী চাকরি গ্রহণ করতে হয় তবে দুনিয়ার মোহে পড়ে সত্যভ্রষ্ট হইও না। কেননা আল্লাহ্ পাকের মর্জি হলে, তোমাকে ইনশাআল্লাহ্ চিরসত্য ইসলাম ধর্ম কবুল করতে হবে এবং এমন একজন কামেল ওলী আল্লাহ্‌র কাছে বায়াত হতে হবে যিনি কয়েক বছর অতীত হলো হুগলী জেলায় পয়দা হয়েছেন।”[৫৭১]

বাস্তবে দরবেশের কথা সত্যে পরিণত হলো। প্রতাপ বাবু সার্ভেয়ারের চাকরি পেলেন। কিন্তু বিপত্তি হলো চট্টগ্রামের সাতকানি বিবিটালায় সরকারী রাস্তা বের করার সময়। ম্যাপ অনুযায়ী লোকজনকে খুঁটা গাড়তে বললেন। কিন্তু খুঁটা গাড়ার স্থানটিতে জনৈক ওলী আল্লাহ্‌র কবর ছিলো। অনেকে খুঁটা গাড়তে আপত্তি করায় প্রতাপ বাবু রাগান্বিত হয়ে খুঁটা গাড়তে হুকুম করেন। কয়েকজন লোক খুঁটা গাড়তে আরম্ভ করলো, কিন্তু খুঁটাটি আপনা থেকে মাটির নীচে প্রবেশ করতে লাগলো, ফলে সেখান থেকে একটু ধোঁয়া বের হলো। আশ্চর্য ব্যাপার দেখে সমস্ত লোকেরা অবাক হয়ে গেলো। এরপর প্রতাপচন্দ্র সেনের হাঁড় কাঁপানো জ্বর এসে গেল। হুঁসে-বেহুঁসে তার তিনদিন কেটে গেলো। ইতিমধ্যে স্বপ্নে দেখলেন যে, কে যেনো বলছেন– প্রতাপ তুমি আমার বুকের ওপর খুঁটা গেড়ে কেনো কষ্ট দিলে? জ্বর আর অনুশোচনায় ভুগে প্রতাপ বাবু সুস্থ হয়ে ওঠলেন এবং সে কবরের ওপর একটা ঘর করে দেন; কিন্তু তা হঠাৎ আগুন লেগে পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। প্রতাপ বাবু অগত্যা স্থানীয় মৌলভী আবদুর রহমান সাহেবের স্মরণাপন্ন হলেন। মৌলভী সাহেব দু'আ দরূদ পড়ে উক্ত ওলী-আল্লাহ্‌র রূহে সওয়াব বখশে দেন। এরপর প্রতাপ বাবু অন্যত্র গমন করেন।

কলকাতায় এসে সত্যের সন্ধানে মরিয়া হয়ে ওঠলেন। সে সময় তিনি বড় বড় বুযুর্গানে দীনকে স্বপ্নে দেখতেন। তাঁরা তাকে স্বপ্নে মুসলমান হবার পরামর্শ দিতেন, এমনকি ঐ সময় নবী করীম (স.)-এর জিয়ারত নসীব হয়। তার মন টানে ইসলামের দিকে, আর আত্মীয়-স্বজনেরা টানে তাদের দিকে। শেষে তিনি একদিন লুকিয়ে চলে এলেন সকলের কাছ থেকে। মেটুয়াবুরুজ এলাকায় একটি পাঠশালা স্থাপন করে তথাকার গুরুমহাশয়রূপে পরিচিত হন। প্রথমত একটি মুদির দোকানে থাকার ব্যাবস্থা করেন। আর সময়-সুযোগে মালিপাড়ার হাজি আবদুল কাদেরের সাথে পরিচয় ঘটার সুযোগে তাঁর কাছে গুপ্তভাবে কুর'আন শরীফ পড়তে আরম্ভ করেন। ইতিমধ্যে নামাজের নিয়ম-কানুন, মাসআলা-মাসায়েল ও আকইদের কয়েকটি কিতাব পাঠ করেন এবং গোপনে নামাজ পড়তে থাকেন। এভাবে দু'বছর কেটে যাবার পর তালতলার কাজী হাফিজ আবদুশ শাকুর সাহেবের হাতে প্রকাশ্যে দীন-ইসলাম কবূল করেন। তখন তার নামকরণ করা হয় আবদুল মুমিন। দীন-ইসলাম গ্রহণ করার তিনদিন পর উদানা নিবাসী মৌলভী সূফী আবদুল করীম সাহেবের কাছে মুরীদ হন। কিছুদিন তরীকত বিদ্যা শিখার পর সূফী সাহেব ইন্তিকাল করেন। তখন তিনি তদীয় শ্বশুর ধসা নিবাসী মৌলভী সূফী গোলাম কাদের (র.)-এর নিকট শিক্ষা পেতে থাকেন। অতি অল্পদিন পরে উক্ত মৌলভী সাহেব গভীর রাতে তাঁকে বলেন যে, ‘আর বিলম্ব করো না, এখনই মাওলানা মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিকী সাহেবের কাছে মুরীদ হও। সেখানে তোমার বাঞ্ছিত দ্রব্য পাবে।’

আনন্দিত চিত্তে সূফী আবদুল মুমিন একদিন কলকাতা টিকাটুলি (চাঁদনীচক) মসজিদে মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর কাছে মুরীদ হয়ে তাঁর খেদমতে মুরাকাবা-মুশাহাদায় আত্মনিয়োগ করেন। অতঃপর পীরের ইজাজতে হজ্জে গমন করেন এবং মক্কা শরীফে থেকে দু'বার হজ্জ সমাপন করেন ও মদীনা-মুনাওয়ারা যিয়ারত করেন। হজ্জ থেকে ফিরে পুনরায় পীর সাহেবের খেদমতে অত্যন্ত কঠোর মেহনত ও রিয়াজত করতে থকেন। তরীকতের রাস্তায় সাধনা করার ফলে প্রভূত উন্নতি করতে থাকেন। সে সময় থেকে তিনি কোনো বেনামাজী, ফাসিক লোকের হাতের রান্না খেতেন না। পরহেজগার-মুত্তাকী ব্যক্তি ছাড়া কারও বাড়িতে দাওয়াত কবূল করতেন না।

দু'বছর পীর সাহেবের খিদমতে সাধ্য-সাধনা করার পর তিনি মুজাদ্দিদে যামানের অনুমতি গ্রহণ করে যিয়ারতে বের হন। তাঁর ভ্রমণকাল প্রায় পঁচিশ বছর ছিলো। সংক্ষেপে তাঁর যিয়ারতের বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হলো–

---

৫৭১. জুলফিকার আলী কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

ওলী-আল্লাহ্গণের মাযার যিয়ারত করে প্রথমত যশোর টাউনের মস্‌জিদে কিছুদিন অবস্থান করে খড়কী নিবাসী প্রসিদ্ধ পীর মাওলানা শাহ্ সূফী মুহাম্মদ আবদুল করীম (র.)-এর সঙ্গ লাভ করেন। বারবাজার, ঝিনাইদহ, কালীগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের বুযুর্গদের মাযার যিয়ারত করে খুলনা জিলার বাগেরহাটের বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত খান জাহান আলী (র.)-এর মাযার যিয়ারত করেন। অতঃপর নোয়াখলীতে মাওলানা হাফিয আহমদ জৈনপুরীর খিদমতে কিছুদিন কাটিয়ে তদীয় ওয়ালেদ বঙ্গের হাদী হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী কেরামত আলী (র.)-এর মাযারে (রংপুর) একমাস অবস্থান করেন। তথা থেকে এক গভীর জঙ্গলে দু'বছরকাল নির্জনবাস অবলম্বন করেন।

দিনে রোযা ও রাত্রে জঙ্গলের ফলমূল, ঝিলের পানি, গাছের পাতা ছিলো তাঁর জীবন ধারনের অবলম্বন। অনেক সময় কেবলমাত্র পানিই হতো একমাত্র অবলম্বন। কখনও মুরাকাবা-মুশাহাদা অবস্থাতে দুই/চারদিন কেটে যেতো। দৈনিক ইফতার করার আবশ্যক হতো না। সে সময় তিনি পরপর তিনদিন স্বপ্নে নবী করীম (স.)-এর আহবানে মদীনা শরীফে যিয়ারতের ইরাদায় দু'টি পরিধেয় বস্ত্র, একটি টুপি, তসবিহ, জায়নামাজ এবং লোটা সম্বল করে কপর্দকহীন অবস্থায় রওয়ানা হন। জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি তাঁকে বোম্বাই পর্যন্ত যাওয়ার একখানি টিকিট করে দিয়েছিলেন। বোম্বাইয়ের কয়েকজন মুসলমান ব্যক্তিদের চেষ্টায় জাহাজে চড়ে জেদ্দায় উপনীত হন। জেদ্দায় কিছুদিন থেকে মক্কা মোয়াজ্জমায় খানায়ে কা'বা যিয়ারত করেন এবং নিযামী মুসাফিরখানায় তিনদিন অবস্থান করেন। একদিন প্রথম প্রহরে হেরেম শরীফের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। হযরত মাওলানা মুহাদ্দিস দেহলবী মুহাজিরে মাক্কী (র.) তথায় তালেবে ইলমদের হাদীস পড়াচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁকে দেখতে পেয়ে কাছে আহবান করেন এবং নির্জনে জিজ্ঞাসা করেন– "প্রায় দু'বছর হতে চললো বঙ্গদেশ থেকে মাওলানা হাফিয আহমদ সাহেব একজন বিশেষ লোকের ব্যাপারে সংবাদ দিয়ে আসছেন। আকার-প্রকারে বোধ হচ্ছে সে তুমিই হবে। তোমার নাম কি আবদুল মুমিন নয়? তুমি কি নব-দীক্ষিত মুসলমান এবং ফুরফুরার জনাব পীর সাহেবের মুরীদ?"

শাহ্ সূফী আবদুল মুমিন যথাযথ উত্তর প্রদান করেন। তিনি তাকে স্নেহে নিজের কাছে রাখলেন এবং বিশেষ আগ্রহসহ তা'লীম দিতে থাকেন। হযরত মুহাদ্দিস আবদুল হক (র.)-এর পরামর্শে ও পথ নির্দেশে তিনি মক্কা মোয়াজ্জমা শহরে, জঙ্গলে, পাহাড়ের গুহায় অবস্থানরত ওলী-আল্লাহ্‌দের খিদমতে হাযির হয়ে তা'লীম নিতে থাকেন। উক্ত বুযুর্গানে দীনেরা ফুরফুরার পীর সাহেবের মুরীদ এবং মুহাজিরে মাক্কী সাহেব কর্তৃক প্রেরিত জেনে অত্যন্ত সমাদরে খিদমতে রেখে তা'লীম দিতে থাকেন। অত্মবিস্মৃত অবস্থায় দিন কাটাতেন, যিক্‌র-আযকারে প্রায় তিন বছরকাল তথায় থেকে পচাত্তরজন ওলী-আল্লাহ্‌র সঙ্গ লাভ করেন এবং চারবার হজ্জ আদায় করেন।

অতঃপর মক্কা মোয়াজ্জমা থেকে মদীনা-মুনাওয়ারায় নবী করীম (স.)-এর যিয়ারত হাসিল করেন। তথায় নানাভাবে পয়তাল্লিশ জন ওলী-আল্লাহ্‌র সঙ্গলাভ করেন এবং বিভিন্ন মাজার যিয়ারত করেন। উভয় স্থানে যিয়রত সমাপন করে তিনি 'করণ' দেশে যাওয়ার মনস্থ করেন এবং মাত্র একসের যবের ছাতু খাদ্য সঙ্গে নিয়ে ২৬ দিন অনাবরত পরিশ্রমসহ পায়ে হেঁটে 'করণে' উপস্থিত হন। এ দীর্ঘ দুর্গম বিজনপ্রান্তে একটি উজ্জ্বল আলোকরশ্মিই ছিলো তাঁর পথপ্রদর্শক। শহর থেকে অনতিদূরে পাহাড়ের গায়ে আশেকে রাসূল হযরত ওয়ায়েস করনী (র.)-এর মাযার যিয়ারত করেন। এগার দিন তথায় থেকে তিনি মদীনা শরীফে ফিরে যান। মদীনা শরীফে হযরত সৈয়দ আব্বাস মাদানীর বাড়ীতে ক্ষণকাল থেকে সর্বদা নবী করীম (স.)-এর রওজা মুবারকে মুরাকাবা-মুশাহাদায় দিন কাটাতেন। এ সময়ে তথায় দু'বার হযরত খিযির (আ.)-এর যিয়ারত নসীব হয়।

আল্লাহ্ তা'আলার মেহেরবাণীতে আশ্চর্যজনকভাবে তুর্কী কাফেলার সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে এবং তাদের সাথে প্রায় সাড়ে তিনমাসের পথ অতিক্রম করে 'বায়তুল মাকদাস'-এ উপনীত হন। তথায় এগার মাস থেকে বুজুর্গদের সাক্ষাত লাভ এবং হযরত সুলায়মান (আ.), হযরত মরিয়ম (আ.), হযরত মূসা (আ.) ও বহু বুজুর্গের মাযার যিয়ারত করেন এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর পয়দায়েশের স্থান দর্শন করেন। এখানেই রমাদান মাসের রোযা আদায় করেন।

অতঃপর তিনি নানা উপায়ে আফ্রিকার মিসর, মিসরের পিরামিড, বিশ্ববিখ্যাত দারুল 'উলুম আল-আযহার, হযরত ইউসুফ (আ.) ও বিবি জোলায়খার মাযার যিয়ারত করেন। একদিন নীল নদের ধারে কুদরতে কামিলার সাধনায় রত থাকা অবস্থায় তুর্কী নৌসেনা (কর্নেল) তাঁর খিদমতে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি তুর্কী সুলতানের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল যাওয়ার ইচ্ছা করেন? তিনি বলেন, ইচ্ছা আছে, কিন্তু উপায় নেই। কর্নেল সাহেবের ব্যবস্থাপনায় তুর্কী মনোয়ারের (যুদ্ধজাহাজ) কাপ্তানের দায়িত্বে কুস্তুনতুনিয়ায় উপস্থিত হয়ে মুসাফিরখানায় ১৭ দিন অতিবাহিত করেন। তথাকার শাহী মস্‌জিদে সুলতান আবদুল হামিদ খানের সাথে মুসাফাহ ও বাক্যালাপ হয়। সুলতানের দাওয়াত তিনি বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। ১৭ দিন তথায় থাকেন। কুফা, কারবালা, বাগদাদ, বসরা, পারস্য, ইরান, বোখারা, গজনী, কাবুল ইত্যাদি বহুস্থানে গমন করে তথাকার বড় বড় বুযুর্গদের জিয়ারত লাভ করেন।

কাবুলের আমীর আবদুর রহমানের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। আমীর তাঁকে পঁচিশটি কাবুলি মুদ্রা হাদিয়া পেশ করে হুযরায় মেহমানরূপে থাকার আহবান জানান। কুফা শহরে নয় দিন, বসরায় এগার দিন, পারস্যে উনিশ দিন, সমরকন্দ ও বোখারায় দেড় মাস, বলখ শহরে আড়াই মাস, কাবুলে সাড়ে তিন মাস অবস্থান করার পর তিনি গজনি আসেন। সতের দিন পর তথা থেকে সওয়াদ ইবনে মোল্লা আখুন (র.)-এর পৌত্র মোল্লা আবদুর রহমান সাহেবের সাক্ষাত ঘটে। তিনি তাঁকে মহাসমাদরে নিজের স্থানে আসীন করেন। গজনী থেকে সওয়াদ ইবনের পথে একটি ভয়ঙ্কও বাঘ তাঁকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। তিনি ভয় না করে আল্লাহ্‌র নূরের ফয়েজে বসে রইলেন। রো'ওবের ফয়েজে বসে রক্তলোলুভ বাঘকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'তোমার আমার মালিক সে আল্লাহ্, রুযীর মালিক তিনিই। তাঁর বিনা অনুমতিতে তোমার কি সাধ্য আমায় ভক্ষণ করবে। আর যদি মালিকের মর্জি হয় আমায় ভক্ষণ করা, তবে তাতেও আমি রাজি আছি। আমি একজন আল্লাহ্‌র গুনাহগার বান্দা ও ফুরফুরার পীর সাহেবের খাদেম।

আল্লাহ্‌র ফজলে উক্ত বাঘ এরপর পোষা বিড়ালের মতো ব্যবহার করতে থাকে। তিনি জঙ্গলের বাঘ, ভাল্লুক, সিংহ, হাতীর কবলে যখনই পড়েছেন তখনই মহান আল্লাহ্‌র ফজলে অলৌকিকভাবে রক্ষা পেয়েছেন। গৃহপালিত পশুর ন্যায় জঙ্গলের পশুরা তাঁর সাথে আচরণ করতো।

হযরত শাহ্ সূফী আবদুল মুমিন (র.) এবার শ্যাম দেশের 'মিনামত' (বার্মা-থাইল্যান্ড) পাহাড়ের এক সুশীতল গাছের তলায় গভীরভাবে ইবাদাত-বন্দেগীতে লিপ্ত হন। মুরাকাবা-মুশাহাদায় এমন নীবিড়ভাবে লিপ্ত হন যে, বাহ্যজ্ঞানবোধ তাঁর লোপ পেয়ে যায়। কত শীত, বর্ষা, গ্রীষ্ম যে তাঁর মাথার ওপর দিয়ে গেছে তারও হদিস ছিলো না। একটু হুঁশ পেয়ে দেখেন– সে দেশের জনৈক ধনী মুসলমানের বাড়ীতে তিনি শায়িত। শরীর অস্থি চর্মসার, দাড়ি-গোঁফ, চুল ও হাত পায়ের নখগুলি অত্যধিক লম্বা হয়ে গেছে। দীর্ঘদিন পানাহার না করায় চোয়াল দু'টি আড়ষ্ট হয়ে গেছে। কয়েকদিন তাঁকে বেশ অসুবিধা করে দুধ ও পানীয় কষ্টের সাথে পান করাতে হয়েছিলো।[৫৭২]

৫/৬ দিন অত্যধিক সেবা ও যত্নের ফলে আবদুল মুমিন সাহেব স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পান। এখানে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করায় ধনী মুসলিম বাড়ী ওয়ালা বলেন– আমরা মাঝে মেধ্যে জঙ্গলে শিকারে যাই। এবার শিকারের উদ্দেশ্যে মিনামত পাহড়ের এক গাছতলায় লতাপাতা আবৃত অবস্থায় আপনাকে উপবিষ্ট পাই। আপনি জীবিত কি মৃত পরীক্ষা করা হয়। জীবিত বুঝতে পেরে আপনার অসাড় দেহ আমরা বাড়ীতে নিয়ে আসে। এ ব্যবহারের জন্য আমাদের ক্ষমা করুন এবং আপনার এহেন অবস্থার কথা আমাদের খুলে বলুন।

আত্মপ্রচারবিমুখ সূফী মুমিন সাহেব অতি সংক্ষেপে নিজের পরিচয় দিয়ে সন তারিখ জিজ্ঞাসা করেন। হিসাব করে পাওয়া যায় যে, উক্ত গাছের তলায় একই মুরাকাবা হালাতে মুমিন সহেবের পূর্ণ সাত বছর পার হয়ে গেছে। সাতটি বছর আহার-নিদ্রা তথা দুনিয়ার খেয়াল মুক্ত হয়ে অনাবিল যিক্‌রে ইলাহিতে এমনিভাবে নিমগ্ন ছিলেন। ভাবতে গেলে আমাদের চিন্তাশক্তি খেই হারিয়ে ফেলে। তিনি ছয় মাসাধিকাল তথায় থাকতে বাধ্য হন। তথাকার বহু মানুষ ইসলাম কবুল করে তাঁর মুরীদ হন।

৫৭২. এ. কে. এম. আমজাদ আলী এনায়েতপুরী, প্রাগুক্ত. পৃ. ১২৫

এখান থেকে শাহ্ মুমিন সিলেট শাহ্ জালাল মুজাররাদ ইয়ামানী (র.) এবং চট্টগ্রামের হযরত দাদাপীর কুতুবুল আকতাব সূফী নূর মুহাম্মদ নিযামপুরী (র.)-এর মাজার জিয়ারত করেন। বেশ কিছুদিন তথায় কাটিয়ে তিনি বার্মা হয়ে সিঙ্গাপুর উপস্থিত হন। তথায় কিছুদিন থাকার সময় তিনি জানতে পারেন যে, হযরত পীর সাহেব তাঁকে কলকাতায় উপস্থিহ হওয়ার আদেশ করেছেন। এরূপে একাধিকবার আহবানে তিনি সুদীর্ঘ ২৫ বছর প্রবাসে কাটিয়ে সঙ্গাপুর থেকে জাহাজে ১৩৩০ সালের চৈত্র মাসে কলকাতায় উপস্থিত হন।

১৩৩১ সালে ফুরফুরার পীর সাহেবের মাধ্যমে শাহ সাহেবের সাথে শরীয়ত ও শরীয়তে ইসলাম পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক হযরত মাওলানা আহমদ আলী এনায়েতপুরী সাহেবের মোলাকাত ঘটে। মাওলানা এনায়েতপুরী তদীয় পীর ভাই শাহ সাহেবের কথা ইতোপূর্বে অবগত ছিলেন। কিন্তু দেখা সাক্ষাত হয়নি। কাকতালিভাবে সাক্ষাত হওয়ায় মাওলানা সাহেবের অনুরোধে শাহ সাহেব নিজের ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন। মাওলানা সাহেব তা যথাযথভাবে কলমবন্দী করেন এবং পত্রিকায় প্রকাশ করার ইযাজত প্রাপ্ত হন। অতঃপর তিনি 'কারামতে আউলিয়া' নামে শাহ সাহেবের বিস্তারিত জীবনী প্রকাশ করেন।

বৈচিত্রময় জীবনের অধিকারী হযরত শাহ সাহেব যে কি পরিমাণ কষ্ট-মেহনত স্বীকার করে সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে পাহাড়-জঙ্গল, মরু-প্রান্তর অতিক্রম করে আয়াস-আরামকে ঘৃণাভরে ত্যাগ করে, হিংস্র জীবজন্তুর লোলুপ ভ্রূকুটি অতি সন্তর্পণে অতিক্রান্ত হয়ে দুস্তর পারাবার লংঘন করে রিয়াজত মেহনতে যে সাধ্য সাধনা করেছিলেন সে ইতিহাস মন্থন করা অসাধ্য। সারাটি জীবন তাঁর অলৌকিক কারামতে ঢাকা। অনাহার, অর্ধাহার, উপবাসে দিনান্তে এক মুঠো ভাত ভর্তা, তার আবার নিজের হাতে রান্না করে খাওয়া ছিলো যার স্বভাব। সর্বত্র দাওয়াত খাওয়ার প্রশ্নই তো আসে না![৫৭৩]

এহেন মহামনীষী ফুরফুরার মুজাদ্দিদে যামান আবু বকর সিদ্দিকী (র.)-এর নির্দেশক্রমে চট্টগ্রাম রাওজানে খানকাহ তৈরী করে দীনে ইলাহীর দাওয়াত মারনুষের ঘরে ঘরে পৌঁছাতে থাকেন। তাঁর নিকট বহুলোক মুরীদ হয়ে দুনিয়া বিমুখ হয়ে আখিরাত মুখি হয়েছেন। শাহ সাহেব জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কঠোরভাবে নিয়মানুবর্তিতার সাথে মুরাকাবা-মুশাহাদা, যিক্র-আযকারের অনুশীলন করে গেছেন এবং মুরীদদেরকেও এর অনুশীলন করাতেন। তিনি যখন পীর সাহেবের খেদমতে হাযির হতেন, আসামীর ন্যায় কম্পিত কলেবরে, বিনম্র শান্তশিষ্ট আদবের সাথে থাকতেন।

জীবনের শেষ দিকে তিনি কলকাতায় গিয়ে পীরের সাক্ষাত শেষে জগৎবল্লবপুর থানার অন্তর্গত বাঁকুল গ্রামের জনাব আবদুল জাব্বার সাহেবের বাড়িতে যান এবং সেখানে ১৩৩১ সালের ২রা চৈত্র রবিবার দবাগত রাতে শেষ নিঃস্বাশ ত্যাগ করেন। ৩রা চৈত্র দিবাগত রাত প্রায় ৭টায় বাঁকুল গ্রামে তাঁকে দাফন করা হয়।

হযরত মাওলানা আবেদ আলী ইনায়েতপুরী (র.), যশোর।

হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী আবেদ আলী (র.) যশোর জেলার ইনায়েতপুরের অধিবাসী ছিলেন। মুজাদ্দিদে যামান হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (র.)-এর প্রথম জীবনের বিশিষ্ট খলীফা ছিলেন তিনি। মুজাদ্দিদে যামান (র.) তাঁর সম্পর্কে বলতেন, 'আবেদ আলী নামেও 'আবিদ, কামিল 'আবিদ।' বাস্তবিকই তিনি মস্ত বড় 'আবিদ ও পরহেজগার ব্যক্তি ছিলেন। সন্দেহজনক হালাল ও তিনি পরিত্যাগ করে চলতেন। বৃন্তচ্যুত ফল মালিকের অগোচরে গ্রহণ করাকে তিনি নাজায়িয মনে করতেন, যদিও উক্ত বৃন্তচ্যুত ফলের উপর মালিকের দাবী থাকতো না। ছোট ছোট বালকদেরও তিনি উক্ত ফল ভক্ষণ করতে দিতেন না। কেউ কুড়িয়ে আনলে তাঁর নির্দেশ ছিলো সাথে সাথে তা যথাস্থানে রেখে আসতে হবে।

দুধের জন্য তিনি বাড়িতে গাভী পলতেন। যদি কোনো সময় উক্ত গাভী কারো সামান্য ফসলও খেয়ে ফেলতো, তবে সাথে সাথে তিনি মালিককে ক্ষতি পূরণ দিয়ে দিতেন। মালিককে যদি কোনো ক্রমেই ক্ষতিপূরণ নিতে

৫৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২

রাজি করানো না যেতো, তবে তিনি বিনয় সহকারে তার কাছ থেকে মাফ চেয়ে নিতেন। কিয়ামতে দাবী না তোলার প্রতিশ্রুতি না দেয়া পর্যন্ত তিনি মাফ চাইতে থাকতেন। হারাম দ্রব্য মিশ্রিত থাকতে পারে, এ ভয়ে বিদেশী বিস্কুট তিনি খেতেন না। জমির খাজনা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত সে জমিতে উৎপন্ন ফসল তিনি ভোগ করতেন না। জীবনে কখনই মিথ্যার আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা করতেন না।

বাড়ির পাশে তিনি কয়েকটি কলাগাছ লাগিয়ে ছিলেন। আর বাগানে কলাও হয়েছিলো প্রচুর। একদিন গ্রামের এক চোর সে কলা চুরি করে নিয়ে যশোরের হাটে বিক্রি করতে গেলো। চোর বিক্রির আশায় কলা নিয়ে বসে আছে হাটে। হঠাৎ তাঁর সমস্ত শরীর পাথরের মতো জমাট বদ্ধ হয়ে গেলো। চোরের সাথী এ অবস্থা দর্শনে মহা চিন্তিত হয়ে পড়ে এবং আরও লোকজন নিয়ে চোরের জড় পিন্ডবৎ দেহ ধরাধরি করে আবিদ আলী (র.)-এর বাড়িতে নিয়ে আসে। সাথে সাথে কলার কাদিটিও একজন কাঁধে করে নিয়ে আসলো। ঘটনা খুলে বলে চোরের সাথী মাফ চাইতে লাগলো। আবেদ আলী (র.) মাফ করে দিতেই চোর পুনরায় চলনশক্তি ফিরে পেলো। হযরত তাদেরকে তাওবা পড়িয়ে ভবিষ্যতে এসব কাজ ন করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে বিদায় দিলেন। সাথে কলার কাদিটিও চোরকে দিয়ে দিলেন। কিন্তু প্রবাদ আছে, চোর না শুনে ধর্মের কাহিনী। উক্ত চোর কয়েকদিন পর আবার কলা চুরি করতে আসলো। কিন্তু এবার যেই না গাছে হাত দিয়েছে, অমনি শরীর নিস্তেজ হয়ে গেলো। গাছ ধরা অবস্থায় চোরের দেহটি সারারাত পড়ে রইলো। সকালে আবিদ আলী (র.)-এর পড়া পানি তার গায়ে ছিটানো মাত্রই সে সুস্থ হয়ে ওঠলো।[৫৭৪]

এ মহান অবিদ ও পরহেজগার সূফী সাধক স্বীয় বাড়িতে ফুরফুরার পীর হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (র.)-এর নির্দেশে ইসলামের সুমহান বাণীকে মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে একটি খানকাহ্ তৈরী করেন। যশোরের আনাচ-কানাচ থেকে মানুষ এসে তাঁর নিকট 'ইল্‌মে তাসাউফের তা'লীম গ্রহণ করে মহান আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভে ধন্য হলেন। এবং প্রতি বছর এ খানকাহ্‌তে ইসালে সওয়াব মাহফিল হতে থাকে। তাঁর সন্তানেরা অদ্যাবধি এ ইসালে সওয়াব মাহফিলের ইন্তেজাম করে আসছেন।

হযরত আবদুর রহমান হানাফী (র.), মুরাদনগর, কুমিল্লা।

কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর থানার সোনাকান্দা নবাসী হযরত মাওলানা হাফিজ আবদুর রহমান (র.) ছিলেন মুজাদ্দিদে যামান হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (র.)-এর একজন শীর্ষস্থানীয় খলীফা। 'সোনাকান্দার পীর সাহেব' নামে তিনি সমধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন উচ্চ দরজার আল্লাহ্‌র ওলী ও সুবক্তা। দীর্ঘদিন ধরে তিনি মক্কা, মদীনা, তায়েফ, শাম, দামেস্ক, বাগদাদ, কারবালা, কুফা, নজ্‌ফ, বসরা, মুসেল ইত্যাদি আরব জাহানের বহুস্থান যিয়ারত করেন।

যিয়ারত শেষে তিনি আল্লাহ্‌পাকের নিয়ামতের শোকর আদায় এবং জন্মভূমিতে সমাজ ও বন্ধু-বান্ধবের সম্মুখে হাদীয়া হিসেবে পেশ করার জন্যে একখানা দীনি কিতাব লিখার কাজ শুরু করেন। উক্ত কিতাবের সংক্ষিপ্ত মর্ম লিপিবদ্ধ করে দেশে ফেরার পথে বাংলা ১৩৪৫ সনে ফুরফুরার মুজাদ্দিদে জামান (র.)-এর খেদমতে কলকাতা ৯ নং হালদার লেনে উপস্থিত হন। তাঁর ভ্রমন বৃত্তান্ত শুনে মুজাদ্দিদদে জামান বিশেষভাবে সন্তুষ্ট হন এবং কয়েকদিন তাঁকে তা'লীম দান করেন। অতঃপর তাঁকে খেলাফত দান করলেন এবং সে সাথে উক্ত কিতাবখানা সমাজে প্রকাশ করার অনুমতি দান করলেন।

এ সময় পীর সাহেব হুযূর তাঁকে বললেন, 'বাবা আবদুর রহমান! তুমি এবার বাংলদেশে চলে যাও। বাংলাদেশের বিপথগামী দিশেহারা মানুষকে হেদায়েতের আলো দিয়ে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল পাক (স.)-এর রেজামন্দি হাসিল করার মাধ্যমে জান্নাতের পথ দেখাও।'

ইতোপূর্বে বাগদাদে বড় পীর আবদুল কাদের জিলানী (র.)-এর দরবারে তৎকালীন দায়িত্বশীল পীর মাওলানা আহমদ শরফুদ্দিন আল কাদরী (র.) তাঁকে খিলাফত ও তা'লীম দেবার অনুমতি প্রদান করেছিলেন।

---

৫৭৪. আল্লামা ইব্রাহীম হোসেন তর্কবাগীশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩

পীরের হুকুমে বাংলাদেশে এসে তিনি হিদায়াতের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এং কুমিল্লার মুরাদনগরের সোনাকান্দায় খানকাহ্ তৈরী করে সুষ্ঠুভাবে সুচারুরূপে দীনে ইলাহীর দিকে মানুষকে আহবান জানাতে লাগলেন। পীরের ইজাযত প্রাপ্ত কতাবটি 'আনিছুত্তালেবীন' নামে পাঁচ খন্ডে প্রকাশ করেন। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রবীণ মুরুব্বীদের মুখে মুখে আজও আক্ষেপের সূরে উচ্চারিত হয়, "ওয়াযতো শুনি হে, কিন্তু সোনাকান্দার মরহুম পীর সাহেব হুযূর যে ওয়ায করতেন সে ওয়াযতো আর হয় না।"

কথিত আছে যে, তিনি যখন কোথাও ভ্রমণ করতেন, তখন তাঁর ওয়াজ নছীহত শুনার জন্য ঝড়, তুফানসহ যে কোনো বাঁধা উপেক্ষা করে লাখ লাখ মানুষ হাজির হয়ে যেতো। পাষাণ হৃদয় মুহূর্তের মধ্যে প্রেমে উদ্বেলিত হয়ে অজ্ঞান হয়ে যমিনে পড়ে থাকতো ঘন্টার পর ঘন্টা। অজ্ঞাত সংখ্যক চোর, ডাকাত, সন্ত্রাসী পথভ্রষ্ট দিশেহারা মানুষ আল্লাহ্র ওলীর তা'লিমপ্রাপ্ত হয়ে আল্লাহ্র খাছ ওলীতে পরিণত হয়েছে।

অসংখ্য কারামত তাঁর জীবনে প্রকাশিত হয়েছে। যেগুলো আজও বাংলার আনাচে-কানাচে লোক মুখে বয়ে বেড়ায়। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে বহু মস্জিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ্ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশেষ করে ঐতিহ্যবাহী সোনাকন্দা দারুল হুদা আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা তাঁর নিরলস প্রতিষ্ঠার ফল। বর্তমানে এ মাদ্রাসা কামিলে চার বিভাগে উন্নীত হয়েছে। যেখান থেকে প্রতি বছর শতাধিক ছাত্র 'ইল্‌মে শরীয়ত, 'ইল্‌মে মা'রিফাতের জ্ঞান লাভ করে পূর্ণ হক্কানী 'আলিম হয়ে বের হচ্ছে। তার পাশাপাশি হিফ্যখানা ও ইয়াতীমখানায় প্রতি বছর বহু ছাত্র পূর্ণ হাফিযে কুর'আন হয়ে বের হচ্ছে।

হযরত আবদুর রহমান হানাফী (র.) 'আনিছুত্তালেবীন' নামে পাঁচ খন্ডের গ্রন্থটি লিখার কারণ সম্পর্কে ভূমিকায় লিখেছেন– "প্রত্যেক বস্তুরই আসল ও নকল আছে জ্ঞানী লোকেরা আসলের গুণ গরীমা দর্শনে নকলের ধোকায় পতিত হয় না। আর যাদের জ্ঞান শক্তি প্রবল নহে, তারা এতদুভয়ের পার্থক্য করতে না পেরে অনেক সময় নকলের ধোকায় পতিত হয়। পীর মুরীদি তদ্রূপ। প্রকৃত প্রস্তাবে পীর মুরীদি পরকালের অত্যাবশকীয় সম্বল। কিন্তু আজকাল এর বহু নকল বের হয়েছে। একদল লোক শরীয়ত ত্যাগ করত: মা'রিফাতের দাবী করে পীর সেজেছে। এদের ধোকায় পড়ে অনেক লোক ইমান হারা হচ্ছে। আশাকরি এ কিতাবখানা পাঠ করলে আসল ও নকল পার্থক্য করার ক্ষমতা জন্মিবে।"[৫৭৫]

মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (র.), চট্টগ্রাম, চন্দনাইশ।

আজাদী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ দূরদর্শী রাজনীতিক, শ্রেষ্ঠ 'আলিম, বাংলা সাংবাদিকতার অন্যতম দিশারী, গ্রন্থকার, প্রবন্ধকার, বাগ্মী, সমাজসেবক ও বিশিষ্ট ভাষাবিদ হযরত মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (র.) ছিলেন মুজাদ্দিদে যামান হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (র.)-এর একজন খাছ মুরীদ ও খলীফা। ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ থানার অন্তর্গত বরমা ইউনিয়নের আড়ালিয়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে বাংলা, ইংরেজী, আরবী, উর্দু ও ফার্সী ভাষায় বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। তিনি আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাংলার জয়েন্ট সেক্রেটারী হিসেবে বহুদিন দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে 'সাপ্তাহিক ছোলতান', 'আল-ইসলাম', 'দৈনিক ছোলতান', 'দৈনিক আমীর', 'হাবলুল মাতীন', 'সাপ্তাহিক ইসলামাবাদ', প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

পীরের নির্দেশে তিনি প্রায় পনরটির মত কিতাব বাংলা ভাষায় রচনা করেছিলেন। বিভিন্ন ভাষায় তাঁর রচিত প্রবন্ধের সংখ্যা গুনে শেষ করা সম্ভব নয়। তিনি বহু মাদ্রাসা, মস্জিদ, ইয়াতীমখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায়ই চট্টগ্রামের পটিয়া থানার দেয়াং-এর পাহাড়ে ছয়শত বিঘা জমির ওপরে 'মাওলানা শওকত আলী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপিত হয়। মাওলানা ইসলামাবাদী পীরের নির্দেশে পাকিস্তান আন্দোলনে যোগ দেন। পাকিস্তান আন্দোলনে তাঁর অসাধারণ তৎপরতা লক্ষ্য করে বৃটিশ সরকার তাঁকে দিল্লীর লাল কেল্লায় বন্দী করে

৫৭৫. কুরআন হাদীস রিসার্চ সেন্টার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫

রাখে। অতঃপর তাঁকে পাঞ্জাবের মিয়া ওয়ালীর কারাগারে স্থানান্তর করা হয়। ১৯৪৫ সালে তিনি জেল থেকে মুক্তি পান।

ফুরফুরার এ উজ্জল নক্ষত্র ৭৫ বছর বয়সে ১৯৫০ সালের ২৪ শে অক্টোবর ইন্তিকাল করেন। তাঁর মাযার চট্টগ্রামের 'কদম মোবারক নবাব ইয়াসিন খাঁর মস্‌জিদ'-এর সামনে অবস্থিত।[৫৭৬]

হযরত মাওলানা আবদুল হামীদ (র.), মাগুরা।

যশোর জিলার মাগুরার নিকটবর্তী কসুনদিয়া একটি ছোট গ্রাম। সে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ফুরফুরার এক উজ্জল তারকা, মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর খাছ খলীফা, জবরদস্ত আল্লাহ্‌র ওলী আলহাজ্জ হযরত মাওলানা আবদুল হামীদ (র.)। 'মাগুরার হাজি সাহেব হুযূর' নামেই তিনি বেশি পরিচিত ছিলেন। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি পীরের খেদমতে অতিবাহিত করেন। ছোট বেলায় পিতৃহারা হওয়ায় তাঁকেই সংসারের হাল ধরতে হয়। কিন্তু শত সাংসারিক ঝামেলার মাঝেও সকল বাঁধাকে অতিক্রম করে পীরের মুহাব্বতে থাকতে না পেরে সুদূর ফুরফুরায় পীরের খেদমতে মাঝে মাঝে ছুটে চলে যেতেন। পীরকে তিনি অত্যধিক শ্রদ্ধা করতেন। পীরের নামে তিনি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মাদ্রাসায় জুতা পায়ে দিয়ে ঢুকলে বেয়াদবী হবে, তাই তিনি সবসময় খালি পায়ে মাদ্রাসায় ঢুকতেন। বেয়াদবী হয়ে যায় কিনা এ ভয়ে তিনি কখনও মাদ্রাসার ভেতরে চেয়ারে বসতেন না।

শুধু পীরকেই নয়, পীরের আওলাদদেরও খুব সম্মান করতেন। পীরের যে কোনো আওলাদকে পেলে তিনি খুশীতে আত্মহারা হয়ে যেতেন এবং তাঁর খিদমতে নিজেকে বিলীন করতেন। তৎকালীন গদ্দীনশীন পীর হযরত মাওলানা আবুল আনসার মুহাম্মদ আবদুল কাহ্‌হার সিদ্দিকী হুযূরকে দেখলে তিনি কাঁদতেন আর বলতেন, 'আপনি আমার পীর।' কেননা কাহ্‌হার সিদ্দিকী সাহেবের চেহারা হুবহু তাঁর দাদা পীর আবু বকর সিদ্দিকী (র.)-এর মতই ছিলো।

মাওলানা আবদুল হামীদ কঠোর রিয়াযত সাধনা করতেন। প্রায় দিনই বসা অবস্থায় মুরাকাবার হালতে সারা রাত কাটিয়ে দিতেন। তাঁর মত উচ্চ শ্রেণীর ওলীআল্লাহ্ খুব কমই দেখা যায়। কয়েক বছর আগে প্রায় একশত বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। মাগুরা শহরে নিজ বাড়িতে তাঁরই হুজরার পাশে এ মহান সাধককে দাফন করা হয়।[৫৭৭]

হযরত মাওলানা আজীম উদ্দীন আহমাদ (র.), ধামতী, কুমিল্লা।

ধামতী ইসলামিয়া আলীয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা যুগশ্রেষ্ঠ মুর্শীদে কামিল, আমীরে শরীয়ত, ফুরফুরার বিশিষ্ট খলীফা হযরত মাওলানা আজীম উদ্দীন আহমাদ (র.) কুমিল্লা যজলার অন্তর্গত দেবীদ্বার থানার পদ্মকোট গ্রামে ১৮৯৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলভী নিজাম উদ্দীন আহমাদ এবং মাতার নাম মুসাম্মাৎ জরিনা বেগম। পিতা-মাতার অপত্যস্নেহ ও মমতা শিশু আজীম উদ্দীন আহমাদের ভগ্যে জোটেনি। শৈশবের পরিমন্ডল অতিক্রম করতে না করতেই নিজাম উদ্দীন আহমদ ও তদীয় পত্নী জরিনা বেগম ইন্তিকাল করেন।

তারপর এ ইয়াতিম শিশুটির লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তদীয় চাচা ছৈনুদ্দীন আহমাদ সাহেব। স্নেহময়ী চাচার স্নেহ ও যত্নে বালক আজীম উদ্দীন আহমাদ দিনে দিনে বড় হতে লাগলেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন মৌলভী আহমাদ উল্লাহ সাহেব ও আবদুর রহমান মাস্টার সাহেবের নিকট। তীক্ষ্ণ ধীশক্তি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অধিকারী বালক আজীম উদ্দীন প্রাইমারী বৃত্তি লাভ করেন এবং উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে হাম্মাদিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন।

---

৫৭৬. জুলফিকার আলী কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬-৪৪
৫৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০-৫১

হাম্মাদিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষা জীবন সমাপনের পর তিনি খুলনা জিলার অধীন মোড়েলগঞ্জ থানাধীন সূতালড়ি গ্রামের মক্তবে শিক্ষকতার কাজ শুরু করেন। পরম নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনের ফাঁকে ফাঁকে তিনি আধ্যাত্ম জ্ঞানের সাগরে সাঁতার কাটার প্রত্যাশা পোষণ করতেন। তারপর সে সুযোগও তাঁর জীবনে এসে গেল। তিনি উনবিংশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ কুতুবুল 'আলাম মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (র.)-এর মুরীদ হন।

একাগ্র সাধনা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাসহ তিনি কাদেরিয়া, চিশতিয়া, নকশে বন্দিয়া ও মুজাদ্দেদীয়া তরীকার কামালিয়াত হাসিল করেন। তারপর তিনি খুলনায় প্রত্যাবর্তন করেন। কিছুদিন সেখানে অবস্থান করার পর তিনি শর্ষিনার দারুস সুন্নাত মাদ্রাসায় শিক্ষকতার কাজে যোগদান করেন। বেশ কিছুদিন শর্ষিনায় শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করার পর তিনি স্বীয় মুর্শিদের নির্দেক্রমে ১৯২০ সালে ধামতী গ্রামের পূর্বপ্রান্তে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন, যা বর্তমানে কামিল পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে এবং গোটা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঙ্গনে এ মাদ্রাসার ছাত্রগণ দায়িত্ব পালন করে চলছে।

হযরত মাওলানা আজীম উদ্দীন আহমাদ (র.) বাংলা ১৩৩০ সালে ফুরফুরার পীর সাহেবের সাথে প্রথমবার হজ্জ আদায় করে ফুরফুরায় যান এবং ১৩৩৪ সালে ধামতীতে আগমন করেন। এরপর পরই ধামতীর বুকে নেমে আসে এক নব প্রাণ বন্যার জোয়ার ধারা। তারই পূণ্যস্মৃতি রক্ষার্থে এবং সকল তরীকতপন্থী মুরীদানদের সবক মশ্‌ক করা, যিক্‌র-আযকার ও তা'লীমের জন্য খানকায়ে সিদ্দিকীয়া, কুতুবখানায়ে সিদ্দিকীয়া প্রতিষ্ঠা করা হয়। যার অমীয় ফলগুধারা অদ্যাবধি জারি আছে এবং ভবিষ্যতেও জারি থাকবে ইনশাআল্লাহ্।[৫৭৮]

'ধামতীর পীর সাহেব' নামে তিনি সমধিক পরিচিত ছিলেন। তাঁর জীবনের কয়েকটি শিক্ষণীয় ঘটনা এখানে পেশ করা হলো−

১. একদিন তিনি ধামতীর কোনো এক বাড়িতে দু'আ করতে গেলেন। কিন্তু বাড়ির উঠানে গিয়ে তিনি আর সামনের দিকে অগ্রসর হলেন না। টিনের ঘরের চালের দিকে বার বার তাকাতে লাগলেন। তারপর গৃহস্বামীকে বললেন, 'আমরা তোমার ঘরে প্রবেশ করবো না।' গৃহস্বামী আরজ করলো , হুযূর! আমার ঘরে বসে দু'আ করার জন্যইতো আপনাকে দাওয়াত দিয়েছি।' আজীম উদ্দীন (র.) তখন বললেন, 'তোমার ঘরের টিনে পাখি ও কুকুরের ছবি খোদাই করা আছে। এমন গৃহে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না। সুতরাং যে গৃহে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না, এমন গৃহে আমি দু'আ করতে পারি না।' একথা বলে তিনি বাড়ির উঠান থেকেই দু'আ না করে ফিরে আসেন।

২. আজীম উদ্দীন (র.)-এর জীবনের আরেকটি ঘটনা। একদিন এক দাওয়াত হতে বাড়ি ফেরার পথে 'খিলাল' করার প্রয়োজন বোধ করলেন। তখন তিনি রাস্তার পাশের একটি শুকনা গাছের ডাল থেকে কিছুটা ভেঙ্গে নিয়ে খিলাল করলেন। সে সরু ডালের খিলালটি তাঁর সাথেই ছিল। বাড়ি ফিরে তাঁর খেয়াল হলো−পথিপাশের শুকনা গাছের ডাল খিলালরূপে ব্যবহার করেছি, কিন্তু এর মালিকের কাছে তো অনুমতি নেয়া হয়নি! তারপর তিনি উক্ত খিলালটিসহ গাছের মালিকের কাছে লোক পাঠিয়ে দিলেন তার কাছে ক্ষমা চেয়ে ইজাযত নেয়ার জন্যে। সাথে সাথে এ অপরাধের জন্যে আল্লাহ্‌পাকের দরবারে কেঁদে কেঁদে ক্ষমা চাইতে লাগলেন।

৩. আজীম উদ্দীন (র.) একবার এক মজলিশে বসা ছিলেন। হঠাৎ তিনি বলে ওঠলেন, 'দু'আ চায় কে, আর দু'আ পায় কে?' উপস্থিত এক মুরীদ প্রশ্ন করলো, 'হুযূর! হঠাৎ করে এ কথা বললেন কেন?' উত্তরে তিনি বললেন, 'আরে মিয়া যশোরের সে লোকটি আমার দু'আ নিয়ে গেল।' ঐ মুরীদ আবারও প্রশ্ন করলো, হুযূর! এখানেতো যশোরের কেউ নেই।' তিনি তখন মুচকি হেসে বললেন, 'আমার সামনে যে লোকটিকে তোমরা বসা অবস্থায় দেখতে পাচ্ছ, তিনি খুব আরজু করে আমার কাছে দু'আ নেয়ার জন্য এসেছেন। আমি তার জন্যে যে দু'আ করলাম, তা আল্লাহ্‌র ফিরিশতারা যশোরের সে লোকটিকে দিয়ে দিলেন, যে আমার মালপত্র মাথায় করে

---

৫৭৮. ২৬ জানুয়ারী, ১৯৯৫, দৈনিক ইনকিলাব, পৃ. ০৭

ট্রেনে ওঠিয়ে দিয়েছিলো! যদিও সে এখানে আসেনি বা দু'আও চায়নি, তবুও আমার এ দু'আ তাকেই দেয়া হয়েছে।'

২৩শে শাবান' ১৩৯৪ হিজরী, মুতাবিক ২৫শ ভাদ্র' ১৩৮১ বাংলা এবং মে' ১৯৯৪ সালে সুবহে সাদিকের সময় এ ক্ষণজন্মা মহান আল্লাহ্র ওলী ইহকালের কর্মবহুল জীবনপ্রবাহের পথ অতিক্রম করে পরলোকগমন করেন।[৫৭৯]

হযরত মাওলানা মোয়েজ উদ্দীন হামিদী (র.), সাতক্ষীরা।

দক্ষিণ বাংলার কৃতি সন্তান, বহু ধর্মীয় গ্রন্থ প্রণেতা, বাগ্মী 'আলিম হযরত মাওলানা মোয়েজ উদ্দীন হামিদী (র.) বাংলা ১৩০২ সালে বর্তমান সাতক্ষীরা জিলার আলাইপুর গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মুন্শী কাদির বকশ একজন আল্লাহ্ভীরু এবং নেক্কার ব্যক্তি ছিলেন। স্থানীয় পরানপুর স্কুলে বালক হামিদীর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। এরপর তিনি মাধবকাঠী বাংলা স্কুলে ভর্তি হন। এ স্কুলে পড়াশুনা করার সময় তিনি মাদ্রাসা শিক্ষার দিকে ঝুকে পড়েন। তাঁর মন কুর'আন হাদীসের আলোকে উদ্ভাসিত হবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। ফলে জনাব হামিদী তাঁর পিতার অনুমতি নিয়ে যোগীখালী মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সেখান থেকে জুনিয়র পাস করার পর তিনি প্রথমে ফুরফুরা মাদ্রাসায় এবং পরে হুগলী গভর্নমেন্ট আলীয়া মাদ্রাসায় পড়াশুনা করেন।

হুগলী হতে প্রথম বিভাগে সিনিয়র পাস করার পর তিনি হুগলীতেই ম্যাট্রিক পড়ার চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। এ ব্যাপারে 'আল্লামায়ে বাংলা হযরত মাওলানা রুহুল আমীন (র.)-এর নিকট পরামর্শ করলে তিনি বলেছিলেন, "আমি ইংরেজী পড়তে নিষেধ করি না। কিন্তু আমার মত এ যে, যারা ইংরেজী শিখে সমাজ সেবা করতে চায়, তারা সে লাইনে খেদমত করুক।" আর আপনি যখন সিনিয়র পাস করেছেন, তখন আপনি এ লাইনেই সমাজ সেবা করুন। তারপর হামিদী সাহেব ফুরফুরা মাদ্রাসায় টাইটেল ক্লাসে ভর্তি হন এবং প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে উক্ত মাদ্রাসা থেকে টাইটেল পাস করেন।

ফুরফুরা মাদ্রাসায় অধ্যয়নকাল থেকেই হামিদী সাহেব ফুরফুরার পীর হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (র.)-এর নিকট থেকে 'ইলমে মা'রিফাতের জ্ঞান অর্জন করেন। হযরত পীর সাহেব ইন্তিকালের পর তিনি হযরত মাওলানা রুহুল আমীন সাহেবের সাথে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং দীর্ঘ ১৫/১৬ বছর বশীরহাট হুযূরের সাহচর্যে থেকে ওয়াজ-নছীহত শিক্ষা, ফাতওয়া দান, গ্রন্থ রচনা করা প্রভৃতি বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করেন। কর্মবীর মাওলানা মোয়েজ উদ্দীন হামিদীর কর্মজীবন খুবই বিস্তৃত। ফুরফুরা মাদ্রাসায় অধ্যাপনার মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। কিছুদিন পর ফুরফুরার তৎকালীন পীর সাহেব তাঁকে বলেছিলেন, "বাবা, কে তোমাকে চকুরি করতে বলেছে? তুমি খোদার চাকুরি করো, মানুষের চাকুরি করিও না।" পীর সাহেবের মূল্যবান পরামর্শ অনুযায়ী হামিদী সাহেব তাঁর এ ক্ষণস্থায়ী জীবনকে মানুষর সেবায় নিয়োজিত করেন। ফুরফুরার পীর সাহেবের প্রতিষ্ঠিত আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীনের মুবাল্লিগ হিসেবে তিনি ব্যাপক কর্মতৎপরতা চালান।

বাংলার 'আলিম সমাজের মধ্যে সাহিত্যক এবং সাংবাদিক 'আলিম খুবই বিরল। মাওলানা হামিদী ছিলেন একাধারে কবি, সাহিত্যক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ এবং সমাজ সংস্কারক। হুগলী মাদ্রাসায় অধ্যয়ন কাল থেকেই তিনি লেখনী শুরু করেন। ঐ সময় তিনি মোসলেম প্রভা নামে একখানা দেয়াল পত্রিকা বের করেন। তিনি মোসলেম জগৎ ও ইসলাম জগৎ পত্রিকা পরিচালনা করেন। 'হেদায়েত' নামে একখানা মাসিক পত্রিকাও তিনি বের করেন। মাওলানা হামিদী বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গড়ে গিয়েছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত হামিদপুর আলীয়া মাদ্রাসা, মস্জিদ, মেহমানখানা, পোষ্ট অফিস, লাইব্রেরী, পুকুর, কলরোয়া ব্রীজ ইত্যাদি জনসেবার অন্যতম নিদর্শন। তিনি ১৩৫০ সালে জেলা বোর্ডের নির্বাচনে জয়লাভ করেন। নির্বাচনের পর তাঁরই প্রচেষ্টায় দীর্ঘ ৫০/৬০ বছর পর খুলনা জেলায় সর্ব প্রথম মুসলিম চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা প্রায় অর্ধ শতাধিক। এসব গ্রন্থের মধ্যে বিজ্ঞানে কুর'আনের দান, রমনী কণ্ঠহার, ওয়াজ ভান্ডার, আদর্শ জীবন,

---

৫৭৯. ফজলুর রহমান মুন্সী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

সমাজ সংস্কার, হজ্জ দর্পণ, লক্ষপতি, ধুমপানের অপকারিতা প্রভৃতি গ্রন্থাবলী বাংলার ইসলাম পিপাসু সমাজে বিপুল সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়।

হযরত মাওলানা হামিদী সাহেবের জীবন ছিলো অনাড়ম্বর। তিনি সাধারণ জীবন-যাপনেই অভ্যস্থ ছিলেন। তিনি কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন। সব কাজ নিজ হাতে করতেন। দিন-রাত সফর, গ্রন্থ প্রণয়ন, সমাজসেবা ইত্যাদির ফলে তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়ে। অবশেষে বাংলার গৌরব হযরত মাওলানা মোয়েজ উদ্দীন হামিদী বাংলা ১৩৭৭ সালের ২৯শে শ্রাবণ ইন্তিকাল করেন।[৫৮০]

হযরত মাওলানা ছাজেদ উল্লাহ (র.), মিরেশ্বরাই, চট্টগ্রাম।

তিনি ১৮৫৭ সালে (মতান্তরে ১৮৬০) চট্টগ্রাম মিরেশ্বরাইধীন ইছাখালী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালে পূর্ব ভারতে হুগলী আরবী ও ফার্সী শিক্ষার বড় কেন্দ্র ছিলো এবং বঙ্গ এলাকায় শীর্ষস্থানীয় ছিল। কাজেই ছাজেদ উল্লাহকে তাঁর পিতা সেখানেই পাঠিয়ে দিলেন। এখানে পড়ার সময় তিনি ওলীয়ে কামিল ফুরফুরার সনামধন্য পীর মরহুম আবু বকর সিদ্দিকী (র.)-এর সংস্পর্শে আসেন। তাঁরই অনুপ্রেরনায় মিঠাছড়া ফয়েজ-এ আম ইসলামিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮৪ সালে এবং এতদাঞ্চলে ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী ভূমিকা নেয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে। নিজামপুরের প্রাচীনতম সিনিয়র মাদ্রাসা হিসেবে এ প্রতিষ্ঠানটি আজও সুনামের সাথে ইসলামী শিক্ষার আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে।

জনাব ছাজেদ উল্লাহ্ শুধু একজন বড় দরজার মুহাদ্দিস ছিলেন তাই নয়, তাঁর গুণের পরিধিও ছিলো অসাধারণ। যার জন্য তাঁকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদবীতে ভূষিত করা হতো। অনেকে তাঁকে 'আল্লামা বলে সম্বোধন করতেন। আরবী সাহিত্য ও হাদীসে তাঁর বুৎপত্তির জন্য তাঁর সহযোগীরা অনেকে তাঁকে শায়খুল হাদীস হিসেবেও জানতেন এবং শায়েখ ছাহেব হুযূর বলেও সম্বোধন করতেন।

সারা উত্তর ভারত, বার্মা (মায়ানমার), দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে তিনি ব্যাপক সফর করেছিলেন। চারবার হজ্জব্রত পালন করা ছাড়াও মধ্য ও নিকট প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে তথা ইয়েমেন, ইরান, ইরাক, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন (বাইতুল মোকাদ্দেছ), মিসর ও তুরস্কের ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির স্থান ও প্রতিষ্ঠানগুলোও ঘুরে এসেছিলেন। মিসর ভ্রমনকালে তিনি আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল হয়েছিলেন। সুদূর বোখারা পর্যন্ত ইসলাম চর্চার প্রাচীন কেন্দ্রগুলো দেখারও তাঁর সুযোগ হয়েছিলো। তাঁর সারা জীবন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছিলো কর্মময়। মিরেশ্বরাইতে তিনি ফুরফুরার পীর সাহেবের অনুমক্রমে ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র হিসেবে একটি খানকাহ্ নির্মাণ করেন। এভাবেই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি দেশের, দশের ও ইসলামের খিদমত করে গিয়েছিলেন। ১৯৩৬ সালে তাঁর কর্মময় জীবনের ইতি হলেও শিক্ষা, নৈতিকতা ও আর্থ-সামাজিক সংস্কারে আবদানের জন্য তাঁর স্মৃতি চির-জাগরুক হয়ে আছে।[৫৮১]

হযরত মাওলানা ফয়জোর রহমান (র.), নোয়াখালী।

খ্যাতনামা 'আলিম প্রখ্যাত বুজুর্গ মুজাদ্দিদে জামান হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (র.)-্এর প্রধান খলীফাদের অন্যতম হলেন নোয়াখালী নিবাসী পীরে কামিল মরহুম মাওলানা ফয়জোর রহমান (র.)। ১৮৮২ সালে নোয়াখালী জেলার সেনবাগ থানার অন্তর্গত মোহাম্মদপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ঐ সময়ে ফুরফুরার পীর হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (র.)-এর নাম-যশ সারা বঙ্গ-ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিলো। মাওলানা ফয়জোর রহমান তখন ফুরফুরার পীর সাহেবের নিকট গমন করেন এবং তাঁর হাতে বায়াত গ্রহণ করেন। পীর সাহেব হুযূরের তা'লীম গ্রহণ করে তিনি অল্প দিনের মধ্যেই অসাধারণ তরক্কী লাভ করে খেলাফত প্রাপ্ত হন। পীর সাহেবের এজাজতক্রমে মাওলানা ফয়জোর রহমান মানবজাতির হেদায়েতের জন্য দীন ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। নোয়াখালী, কুমিল্লা, বরিশাল, সিলেট, ফরিপুর, রংপুরসহ বাংলার অনেক জেলায় অসংখ্য

---

৫৮০. দৈনিক ইনকিলাব, ১৬ চৈত্র, ১৩৯৫ বাংলা, পৃ. ০৬
৫৮১. মাওলানা আতাউর রহমান কালামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০

লোক তাঁর মুরীদ হন। তাঁর বাড়িতে প্রতিবছর বিশাল ইসালে সওয়াব মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে বহু লোকের সমাগম ঘটে।

মাওলানা ফয়জোর রহমান (র.) একজন বাগ্মী ও লিখক ছিলেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে এরশাদে মোরশেদ, এছলাহুর রুছুম, মৌলুদ শরীফ, কিশোরগঞ্জে কেয়ামের বাহাছ, বক্তৃতা শিক্ষা, জোবদাতুল ফরায়েজ, হক নছিহত, মুফিদুল কোররা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

পবিত্র হজ্জ পালনের পর মাওলানা ফয়জোর রহমান (র.) দেশ-বিদেশের বহু স্থানে বহু মস্‌জিদ, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ইন্তিকালের পূর্বে তিনি তাঁর নিজ বাড়ির সম্মুখে একটি দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন, সেটাই বর্তমানে কল্যান্দী ফয়জুল 'উলুম মাদ্রাসা নামে পরিচিত। মাদ্রাসার সামনে পীর সাহেবের কবর ও মাজারের উত্তর পার্শ্বে মস্‌জিদ অবস্থিত। মাওলানা ফয়জোর রহমানের জীবনে অনেক কারামত প্রকাশ পেয়েছে। তিনি ২৪ জানুয়ারী' ১৯৬২ সালে তাহাজ্জুদ নামাজের সময় উপস্থিত শত শত দেশবাসী ও ভক্ত-মুরীদানের উপস্থিতিতে কালিমা পড়তে পড়তে হাসিমুখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। উল্লেখ্য যে, ঐ দিন তাঁর বাড়িতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইসালে সওয়াব মাহফিল অনুষ্ঠিত হচ্ছিলো এবং মাহফিল শেষে শেষ রাতে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৫৮২]

হযরত সূফী শাহ মাহতাবুদ্দন (র.), পাবনা।

পাবনার সাগর কান্দির মাহতাবুদ্দীন (র.) বড় দরের কাশ্‌ফ শক্তিসম্পন্ন জিন্দা ওলী ছিলেন। বড় মাওলানা সাহেবের সাহেবজাদা মাওলানা আবুল বারাকাত গোলাম মহিউদ্দীন ও মুফতী মাওলানা আবু জাফর সিদ্দিকী নিউ মার্কেটের মসজিদে থেকে একত্রে কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় পড়তেন। মাওলানা মহিউদ্দীন ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্র পড়তেন। শাহ সাহেব ইংরেজী কঠিন শব্দের মানে এবং টাইটেল ক্লাসের জটিল প্রশ্ন, কঠিন আরবী শব্দের মানে-মতলব, হাদীস ও আয়াতে কারিমার তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা সহজভাবে বলে দিতেন। অথচ শাহ সাহেব ইংরেজী, আরবী জানতেন না। এ সম্বন্ধে শাহ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, "আমার প্রথম জীবনে ১৭/১৮ বছর বয়সের মেয়ের সাথে বিয়ে হয়। বছর কয়েক পরে মুহব্বাতের স্ত্রী মারা যান। তখন থেকে আমার মাথা একটু খারাপ হওয়ায় জঙ্গলে চলে যাই, তথায় এক সাধুর পাল্লায় পড়ি। তিনি আমাকে স্ত্রী পাইয়ে দেবেন বলেন এবং কঠিন তপস্যায় রত হতে নির্দেশ দেন। সে মত তপস্যার ফলে স্বপ্নে স্ত্রীকে দেখতে থাকি। কিছুদিন পর স্ত্রীকে নদীর ওপর দিয়ে চলে যেতে দেখি। কিন্তু তাকে ধরতে পারি না।

আমি আরও ব্যাকুল হয়ে পড়ি। তখন সাধুর নির্দেশে 'নদীর চরে' বুক পর্যন্ত পুঁতে এবং গাছের ডালে পা বেঁধে মাথা ঝুলিয়ে তপস্যা করতে থাকি, লোকের দেয়া ফলমূল ছাড়া কিছুই খেতাম না। কঠিন তপস্যায় আমি স্ত্রীকে নদী পারাপার ও আকাশে উড়তে দেখলাম, আমিও তার সাথে সাথে নদী পারাপার ও আকাশে উড়তাম; কিন্তু তাকে ধরতে পারতাম না। এমতাবস্থায় দেখতাম অমুসলিমদের উপাস্য দেব-দেবীরা আকাশে উড়ছে, কিন্তু ওপরে গিয়ে ফিরে আসছে, শত চেষ্টায় আর ওপরে যেতে পারছে না। আমি অবাক হয়ে ঐসব কারবার দেখতে লাগলাম এবং ওপরে ওঠার চেষ্টা করলাম। তখন শব্দ শুনলাম, মাহতাবুদ্দীন এর বেশি যেতে পারবে না; এর বেশি যেতে হলে ফুরফুরায় বড় মাওলানা সাহেবের খিদমতে যাও।"

কোথায় ফুরফুরা আর কে 'বড় মাওলানা' সাহেব, আমি কিছুই জানতাম না। কঠিন তপস্যায় বশীভূত মন ও পা দুটিকে বললাম, 'চল ফুরফুরায়।' মনের নির্দেশে পা দুটি চলতে লাগলো। সিরাজগঞ্জে এসে শিয়ালদহগামী ট্রেনে চড়ে বসলাম। ট্রেনে কত মানুষ আমার কাছে রোগের শাফা চায়, আমি পানি-ধুলা-বালি যা কিছু দিই, মহান রবের ইচ্ছায় তাতেই ভালো হয়ে যায়।

শিয়ালদহ নেমে থমকে দাঁড়াই। পা দুটিকে আবার বললাম, চলো, পা দুটি চলতে লাগলো। হ্যারিসন (মহত্মাগান্ধী রোড) রোড ধরে হেঁটে 'হাওড়া ময়দান' এসে মার্টিন ট্রেন ধরে শিয়াখালা নামলাম। তখন আর পা চলতে চায় না, পা দুটিকে জোরে ধমক দিয়ে ফুরফুরায় আমতলায় নিয়ে এলাম। সেদিন ছিলো শনিবার। হুযূর

৫৮২. দৈনিক ইনকিলাব, ১ ডিসেম্বর'১৯৯৪, পৃ. ০৫

(বড় মাওলানা সাহেব) তখন ওযু করছিলেন। তিনি বললেন, 'এ দোর (দরওয়াজা) বন্ধ, ঐ দোরে যাও।' তিনি অঙ্গুলি সংকেতে মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর বাড়ির দিকে নির্দেশ করলেন। আমি তৎক্ষণাৎ জোরের সাথে বললাম, 'হুযূর এ বন্ধ দোরই খুলবো।' তখন তিনি আমাকে বসতে বললেন। অতঃপর তিনি নাপিত ডাকিয়ে লম্বা চুল, গোফ কাটতে এবং গেরুয়া বসন খুলে গোসল করতে বললেন। কিছুদিন তাঁর খিদমতে সাধারণভাবে কেটে যায়। অতঃপর তিনি তাকে নমায পড়ার নির্দেশ দিলেন। দু'চার বছর তাঁর দরবারে খেদমতের ফলে আমার এ 'হাল' হয়েছে।[৫৮৩]

একদিন তিনি কিছু সংখ্যক অনুসারীসহ সফরে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে লোকজন তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, 'হুযূর! কোথায় যাচ্ছেন?' উত্তরে তিনি বললেন, 'শয়তানদী যাচ্ছি।' তাঁর এ উত্তর শুনে উপস্থিত লোকেরা ভীষণ অবাক হয়ে বলে উঠলো, 'হুযূর! ধারে কাছে আমাদের জানামতে 'শয়তানদী' নামে তো কনো জায়গা নেই।' উত্তরে হুযূর মুখে কিছুই বললেন না, চুপ করে রইলেন। পরে তাঁর সঙ্গীদের কাছ থেকে জানা গেল যে, তিনি ঈশ্বরদী যাচ্ছেন। ঈশ্বরদীকে 'শয়তানদী' বলার কারণ হলো– যেসব জায়গার সাথে হিন্দু বা খৃস্টানী নাম জড়িত আছে, তিনি কখনও সেগুলো মুখে উচ্চারণ করেন না। যেমনঃ রামপুর, কেশবপুর, হরিপুর নামগুলো তিনি ভূলেও মুখে আনতেন না। সে অভ্যাস অনুযায়ীই তিনি ঈশ্বরদীকে শয়তানদী বলেছেন।

হযরত সূফী শাহ মাহতাবুদ্দীন ফুরফুরার আদলে পাবনায় দু'টি খানকাহ্ প্রতিষ্ঠাসহ স্বীয় এলাকায় কয়েকটি মসজিদ ও কুর'আন হাদীস তা'লীমের জন্য প্রায় পনরটি মক্তব বিভিন্ন জায়াগায় প্রতিষ্ঠা করেন। সেগুলো থেকে দীনী কার্যক্রম চলতে থাকে এবং আজো সেগুলো বিদ্যমান রয়েছে। প্রতিবছর তাঁর খানকায় ইসালে সওয়াব মাহফিল হয়ে থাকে।

মুজাদ্দিদে যামান হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (র.)-এর বিশিষ্ট খলীফা মাওলানা রুহুল আমীন (র.) ওয়াজ করার সময় 'পবিত্র' শব্দটি বার বার বলছিলেন। এটা শুনে হযরত মাহতাবুদ্দীন (র.) বলে ওঠলেন, "ভাই রুহুল আমীন! 'পবিত্র' বলো না 'পাক' বলো।"

শাহ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, নোয়াখালী।

নোয়াখালী জিলার বশিকপুর গ্রামের মাওলানা শাহ মুহাম্মদ অবদুল্লাহ্ (র.) মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর বিশিষ্ট খলীফাদের অন্যতম ছিলেন। শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি প্রায়ই ফুরফুরার পীরের খেদমতে ছুটে চলে যেতেন। সেখানে তা'লীম গ্রহণ করে তিনি এলাকায় এসে পীরের অনুমতি নিয়ে বিশাল এক খানকাহ তৈরী করে তার নাম দেয় 'খানকায়ে আবদুল্লাহ্।' তাঁর বহু মুরীদান রয়েছে যারা তাঁর খানকায়ে প্রতিনিয়ত এসে মুরাকাবা ও মুশাহাদার মাধ্যমে ইলমে মা'রিফাত হাসিল করে থাকেন।

একবারের ঘটনা। চারজন সাথীসহ তিনি ফুরফুরা রওয়ানা হলেন। কিন্তু ট্রেনে শিয়াখালায় নেমে সেখান থেকে ফুরফুরা পৌঁছাতে পৌঁছাতে গভীর রাত হয়ে গেল। অসময়ে পীরের বাড়িতে অতিথি হওয়া বেআদবী মনে করে অন্য এক লোকের দহলিজে তার অনুমতি নিয়ে শয়ন করলেন। কিন্তু অতিরিক্ত মশার জন্যে সেখানে থাকতে না পেরে বাধ্য হয়ে সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে মুজাদ্দিদে জামান (র.)-এর দহলিজে উপস্থিত হলেন। সাথীসহ তিনি শোয়ার এন্তেজাম করতেই সেখানকার এক মোদাররেস সাহেব এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা কয়জন লোক এসেছেন?' আবদুল্লাহ (র.) বললেন, 'মোট পাঁচজন।' উত্তর শুনে মোদাররেস বললেন, 'আপনাদের খানা তৈরী করে রাখা হয়েছে। আপনারা খানা খেয়ে তারপর বিশ্রাম করুন।'

মাওলানা আবদুল্লাহ অবাক হয়ে বললেন, 'এই মাত্র আমরা এসে পৌঁছলাম। এতো তাড়াতাড়ি খানা তৈরী হলো কেমনে.' উত্তরে মোদাররেস সাহেব বললেন, "আমরা কয়েকজন একত্রে খানা খেতে বসেছিলাম। আমাদেরকে বাসনে করে খানা দেওয়া হলো। মুজাদ্দিদে যামান (র.) আরও পাঁচটি বাসনে ভাত তরকারী দিয়ে উঠিয়ে রাখতে বললেন। 'আমরা সকলে বাসন পেয়েছি'–হুযূরকে একথা জানালে তিনি ধমক দিয়ে বললেন, 'পাঁচটি

---

৫৮৩. মোঃ মুবারক আলী রহমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১-৬২

বাসনে করে ভাত তরকারী উঠিয়ে রাখনা কেনো!' এখন বুঝতে পারছি যে, হুযূর আপনাদের জন্যেই ভাত-তরকারী উঠিয়ে রাখতে বলেছিলেন।"[৫৮৪]

হযরত সূফী সদরুদ্দীন (র.), যশোর।

যশোর জিলার গঙ্গারামপুরের সূফী সদরুদ্দীন (র.) ছিলেন মুজাদ্দিদে যামান হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (র.)-এর খাছ খলীফা। তিনি ম্যাট্রিক পাস করে পুলিশে চাকুরি নেন এবং ওসীর পদে উন্নীত হন।

পুলিশের চাকুরি করলেও তিনি নিষ্কলুষ চরিত্রের আধিকারী অত্যন্ত খোদাভীরু মানুষ ছিলেন। আল্লাহ্‌র ওলীদের যথেষ্ঠ শ্রদ্ধা করতেন। চাকুরি করাকালীন সময়ে একজন বিশিষ্ট আল্লাহ্‌র ওলীর কিছু কাপড়-চোপড় নিজ হাতে ধুয়ে পরিষ্কার করে দিলেন। ধৌত করা কাপড়গুলো নিয়ে উক্ত আল্লাহ্‌র ওলীর সামনে উপস্থিত হলে তিনি খুশি হয়ে সদরুদ্দীন (র.)-এর জন্য দু'আ করলেন– "তুমি আমার ময়লা কাপড়গুলো যেভাবে কেচে পরিষ্কার করে দিয়েছো, আল্লাহ্‌তা'আলা তেমনিভাবে তোমার দিলের যাবতীয় ময়লা দূর করে তাকে পরিষ্কার ও নির্মল করে দিন।" পরবর্তী রাতেই সদরুদ্দীন (র.) স্বপ্নে দেখলেন, 'আসমান হতে একখানা মসৃন ও ফিনফিনে কাপড় তাঁর মুখে এসে লেগেছে, এ কাপড়খানির মাধ্যমে তাঁর অভ্যন্তর বাতিনী 'ইল্‌মে পরিপূর্ণ হয়ে গেলো।'

এ স্বপ্ন দেখার পর হতে তাঁর মনে এক আমূল পরিবর্তন দেখা দিলো। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি পুলিশের চাকুরিতে ইস্তাফা দিয়ে দীনি 'ইল্‌ম শিক্ষার উদ্দেশ্যে কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় গিয়ে হাজির হলেন। মাদ্রাসার ওলামায়ে কিরাম তাঁর মনের গতি উপলব্ধি করতে পেরে তাঁকে ফুরফুরায় পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি মুজাদ্দিদে জামান হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (র.)-এর নিকট বায়াত গ্রহণ করেন। বায়াত হবার পর তিনি অসাধারণ রিয়াজাত সাধনা শুরু করলেন। অল্পদিনের মধ্যেই খিলাফত প্রাপ্ত হন। ফুরফুরা অবস্থানকালে তিনি নিজ হাতে পীরের বহু কাজ করে দিতেন। এমনকি কুড়াল দিয়ে লাকড়ী পর্যন্ত চিরে দিতেন।

একবার পাবনা জিলার এক মুরীদের বাড়িতে কয়েকজন মুরীদসহ এমন সময়ে যেয়ে পৌঁছলেন যে, তখন গৃহস্বামীর নিকট এ সম্মানিত মেহমানদের মেহমানদারীর উপযোগী কিছুই ছিলো না। তিনি অভ্যাগত মেহমানদেরকে অভ্যর্থনা ও সমাদর জানিয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে চিন্তা করছিলেন, এখন কি করা যায়। এমন সময় একটি বিরাটকায় পাখি পনেরো কেজি ওজনের একটি বড় মাছ এনে উক্ত মুরীদের পাকের ঘরের সম্মুখে ফেললো। মুরীদ তখন সদরুদ্দীন (র.)-এর কাছে এ মাছটি সম্পর্কে মাসআলা জিজ্ঞেস করলেন। সদরুদ্দীন (র.) বললেন, 'এ মাছ আল্লাহ্‌পাক আমাদের খাওয়ার জন্যে পাঠিয়েছেন।' অতঃপর উক্ত মাছটি দ্বারা প্রশস্ততার সাথে তাঁদের মেহমানদারী সম্পন্ন হলো।

অন্য আর একদিনের ঘটনা। তিনি এক জলছায় যাবেন। কিন্তু আবহাওয়া ভীষণ খারাপ। তাঁর নিজস্ব বজরার মাঝিরা বজরা ছাড়তে রাজি হলো না। এদিকে তিনি ঠিক করলেন, জলছায় যেতেই হবে। নচেৎ দীনের কাজে বেঘাত সৃষ্টি হবে। অগত্যা তিনি একাই বজরা ছেড়ে দিলেন এবং তসবীহ হতে নিয়ে বজরার সম্মুখ দিকের গলুইয়ের ওপর চুপচাপ বসে রইলেন। আল্লাহ্‌র কি অপার মহিমা! কারও কোনো প্রকার চেষ্টা বা তদবীর ছাড়াই মাঝিমাল্লা ব্যতীত ঠিক সময়ে বজরা জলছার নিকটবর্তী ঘাটে গিয়ে পৌঁছলো। পথে তিনি খুব পিপাসার্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু দশ মাইলের মধ্যে কোনো বসতি ছিলো না। হঠাৎ একটি চর দেখা গেলো। বজরা চরের কাছে পৌঁছতেই কয়েকজন লোক দেখা গেলো। তারা সদরুদ্দীন (র.)-এর জন্য নারকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে! তিনি তখন ঐ নারকেলের পানি পান করে পিপাসা নিবারণ করলেন।

তিনি আল্লাহ্‌পাকের তরফ থেকে গায়েবী ইশারা না পেয়ে অর্থাৎ ইস্তেখারা না করে কোনো কাজ করতেন না। এমনকি হেদায়েতের জন্য কোনো দিকে যেতে হলে তাতেও আল্লাহ্‌পাকের ইশারার অপেক্ষা করতেন। বির্ণিত আছে যে, একবার তিনি হেদায়াতের জন্যে সাহারানপুরের দাওয়াত কবুল করেন। ইতিমধ্যে তাঁর প্রতি রেঙ্গুনে হেদায়াতের জন্যে যাবার গায়েবী নির্দেশ এলো। তিনি সাহারানপুরের দাওয়াত ফেরত দিয়ে রেঙ্গুন গমন

৫৮৪. মাওলানা আবুল বাশার জিহাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮

করলেন। এরূপে তিনি তিনবার হেদায়াতের উদ্দেশ্যে রেঙ্গুন গমন করেন এবং বহু সংখ্যক লোককে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। তিনি শেষবারে যখন রেঙ্গুনে হেদায়েতের কাজে ব্যস্ত ছিলেন, তার কিছুকাল পরেই দ্বিতীয় মহযুদ্ধের অনল রেঙ্গুনে ছড়িয়ে পড়েছিলো। আল্লাহ্পাকের তরফ থেকে তাঁর প্রতি এলহাম হলো যে-'রেঙ্গুন শহরে বোমা বর্ষিত হবে। সত্বর রেঙ্গুন পরিত্যাগ করো।' এ ইলহাম প্রাপ্ত হওয়া মাত্র তিনি ফেনী চলে আসেন। তাঁর রেঙ্গুন পরিত্যাগের খানিক পরেই সেখানে মারত্মকভাবে বোমা বর্ষিত হয়েছিলো।

ফেনীতে এসে সূফী সদরুদ্দীন (র.) একটি খানকাহ্সহ কয়েকটি মস্জিদ নির্মাণ করেন। সে খানকায় তিনি প্রতিবছর ইসালে সওয়াব মাহফিল করতেন। অসংখ্য লোকের সমাগম হতো তাঁর ইসালে সওয়াবে এবং বহু লোক এ মাহফিল থেকে দীনি তা'লীম গ্রহণ করে মহান আল্লাহ্র একনিষ্ঠ বান্দায় রুপান্তরিত হয়েছেন। ইন্তিকালের পর থেকে তাঁর সন্তানগণ পিতার রেখে যাওয়া ইসালে সওয়াব মাহফিল প্রতি বছরই করে অসছেন। সদরুদ্দীন (র.) মুরীদদেরকে তাসাউফও শিক্ষা দিতেন এবং তিনি নিজেও তাসাউফের জ্ঞানে সমৃদ্ধ ছিলেন। তিনি অনেকগুলো কিতাব রচনা করেন। তম্মধ্যে তাসাউফ (কয়েক খন্ড), বিবি শওহরের কর্তব্য, আমার প্রাণের রাসূল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[৫৮৫]

প্রফেসর আবদুল খালেক, কসবা বি.বাড়িয়া।

প্রফেসর আবদুল খালেক (র.) ছিলেন একজন মর্দে মুমীন, পীরে কামিল ও 'আলিমে দীন। ফুরফুরার হযরত মাওলানা শাহ সূফী আবু বকর সিদ্দিকী (র.) ও তাঁর সুযোগ্য খলীফা হযরত মুন্সী সদরুদ্দীন আহমেদের দরবার হতে তিনি আধ্যাত্মিক জগতের উচ্চ মর্যাদা ও আলোর সন্ধান পেয়েছিলেন।

মানব প্রেমিক মাওলানা আবদুল খালেক ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা থানাধীন ছত্রউড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কৃতিত্বের সাথে মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষা পাস করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করেন। অতঃপর তিনি কয়েক বছর অধ্যাপনার কাজ সম্পাদন করেন। তাঁর তেজোদীপ্ত ভাষণে থাকতো শিক্ষিত-অশিক্ষিত মানুষের আত্মশুদ্ধি ও আত্মোৎসর্গের সহজবোধ্য উপদেশ। তাঁর প্রতিটি বক্তৃতা মানুষের হৃদয় স্পর্শ করতো। সর্বপ্রকার অনাচার, কদাচার ও পাপাচার পরিত্যাগ করে সত্যিকার হৃদয়বান মানুষ হবার জন্য তিনি জোর তাকীদ দিতেন। তিনি বলতেন, "আল কুর'আন ও সুন্নাহ্ই মুসলমানের ইহ-পারলৌকিক মুক্তির একমাত্র রক্ষাকবচ। আল্লাহ্ ও রাসূলের দেখানো পথনির্দেশ মেনে চললে মানুষের কোনোরূপ বিপদ আসতে পারে না। রাসূলুল্লাহ্র প্রদর্শিত পথ অনুসনরণ করে এবং রাব্বুল 'আলামীনের লা শারীক আল্লাহ্তা'আলার নাম স্মরণ করে জিন্দেগী যাপনকারীর কোনো ভয় নেই।" মোটকথা আত্মিক মুক্তির পথ বা সিরাতুল মুস্তাকিমের পথ প্রদর্শনই ছিলো তাঁর ভাষণের মূল মন্ত্র। তাঁর ভাষণের সামান্য অংশ পাঠকের অবগতির জন্য এখানে তুলে ধরা হলো-

"আপনারা চোখের যে অংশটুকু দিয়ে দেখেন তার পরিমিতি হলো এক ইঞ্চির চৌদ্দ ভাগের এক ভাগ। এ সামান্য অংশটুকু দিয়েই আপনারা আপনাদের আবেষ্টনীর সবকিছু, আকাশলোক ও গ্রহলোকের কিয়দাংশ পর্যন্ত অবলোকন করতে পারেন।" তিনি আরও বলেন- "যে শিক্ষা শুধু মানুষের বুদ্ধিশক্তির উৎকর্ষ আনয়ন করে, অপরপক্ষে কাল্ব বা হৃদয় শক্তি খর্ব করে দেয় সে শিক্ষা মানুষের মুক্তি আনয়ন করতে পারে না। কিন্তু যে শিক্ষা মস্তিষ্ক বা হৃদয় শক্তিকে প্রসারিত করে তোলে, সে শিক্ষাই আদর্শ শিক্ষা-আল কুর'আন ও আদর্শের শিক্ষা বিশ্ব জগতের নিগুঢ়তত্ত্ব লাভের শিক্ষা। এরূপ শিক্ষা লাভ করতে পারলেই মানুষ আত্মিক পবিত্রতা বজায় রাখতে ও আত্মিক উন্নতি লাভে সমর্থ হয়।"[৫৮৬]

মানব প্রেমিক মাওলানা সাহেব মানুষকে অহংকার, লোক দেখান ইবাদাত, পরনিন্দা ইত্যাদি হতে এবং শির্ক, বিদ'আত ও কবিরা গুনাহ হতে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। মানুষ যাতে শরীয়ত যথাযথভাবে পালন করে তরীকতপন্থী হয়ে ইহ-পারলৌকিক শক্তি পেতে পারে তজ্জন্য ভাষণ ও লেখনির মাধ্যমে সর্বদা চেষ্টা করে গিয়েছেন। এ পর্যায়ে তাঁর লিখিত গ্রন্থ 'সেরাজুস সালেহীন' এর কথা বলা চলে। গ্রন্থটি বাংলা ১৩৫৬ সালে

৫৮৫. এম. ওবায়দুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯
৫৮৬. মাসিক মদীনা, সেপ্টেম্বর, ১৯৬২ খ্রী. পৃ. ১৬

প্রকাশিত হয়। মানুষকে উপরক্ত কুরিপু ও গুণাহ হতে বাঁচিয়ে রখার জন্যে তিনি গ্রন্থে পথনির্দেশ দিয়েছেন। যে কোনো তরীকতপন্থী ও মু'মীন এ গ্রন্থ থেকে পথের দিশা পাবেন। তাছাড়া পবিত্র কুর'আন, হাদীস ফিক্হ থেকে এ গ্রন্থে এমন কতকগুলো অত্যাবশ্যকীয় সুস্পষ্ট বিধান উদ্ধৃত করে দিয়েছেন যা মেনে চললে সালেহীনের আত্মা পরিশুদ্ধ হবেই ইনশাআল্লাহ্।

তাঁর অন্য একটি উপদেশমূলক গ্রন্থ হলো 'মুনাব্বেহাত'। এটি একটি উৎকৃষ্ট নিত্য পাঠ্য গ্রন্থ। মুসলিম বিশ্বের অমর সাহিত্যিক, হাদীসবিদ, মুফাস্‌সির, ফিকাহবিদ ইমাম 'আল্লামা শায়খ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) যে ১৫০টি অমূল্য গ্রন্থ লিখে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন "আল মুনাব্বেহাত" এর মাঝে একটি। মূল আরবী হতে মাওলানা আবদুল খালেক গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ করেন। এটি বাংলা ১৩৬২ সালে প্রকাশিত হয়।

তাছাড়া তিনি সাইয়েদুল কাউনাইন সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবনী রচনা করেছেন। 'সাইয়েদুল মুরসালীন' নামে গ্রন্থটি ২টি খন্ডে প্রকাশ করে এদেশের সুধী সমাজের প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেছেন। গ্রন্থটি সম্পর্কে 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান ও মোঃ আবদুল হাই মন্তব্য করেন– "মাওলানা আবদুল খালেক এম. এ. রচিত 'সাইয়েদুল মুরসালীন' অধুনা প্রকাশিত জীবনী গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এ বিরাট গ্রন্থটি রচনায় লিখকের শ্রমশীলতা ও হযরতের প্রতি অকৃত্রিম হৃদয়ানুরাগ লক্ষ্য করার মতো।"

তিনি ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের প্রবল প্রতাপের সময় প্রার্থী হিসেবে প্রাদেশিক সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি পাকেস্তানের শাসনতন্ত্রে ইসলামী বিধানের সুসামঞ্জস্য করণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিয়োজিত উপদেষ্টা কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন। এসব কারণে তিনি প্রায়ই দেশের বাইরে বা করাচিতে অবস্থান করতেন। এতদসত্ত্বেও তিনি তরীকতের কাজ অব্যাহত রাখেন। আর এ উপলক্ষ্যে সাধারণ গ্রামবাসী যেমন তাঁর কাছে আসতেন, তেমনে আসতেন দেশের সর্বোচ্চ পদেও অধিকারী মানুষও। পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদসহ অনেক গণ্যমান্য মানুষ তাঁর নিকট ইসলামের বাণী শুনে এ ধর্মে দীক্ষা নিয়েছেন। এমনি এক ব্যক্তি ছিলেন 'আইসিএম' ক্যাডারের জাঁদরেল অফিসার তাঁর পবিত্র হাতে বায়'আত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

প্রফেসর আবদুল খালেক নিজ থানা কসবায় অসংখ্য মস্‌জিদ, মাদ্রাসা, মক্তব ও খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা করেন। বছরের বিভিন্ন সময়ে খনাকাহ্‌তে যিক্‌র-আযকারসহ মুরাকাবা-মুশাহাদার ব্যবস্থা করতেন। এসব কারণে বহু লোক তাঁর মুরীদ হন এবং অনেক অমুসলিম তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করে মহান আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছেন। বিশ্ব নবীর একনিষ্ঠ উম্মত হওয়ার সুযোগ লাভ করেছেন। শান্তির ধর্ম ইসলামের ছায়াতলে সমবেত হয়েছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত খানকাহ্ কসবাতে বর্তমানেও চালু রয়েছে।

১৯৫৫ সালের ২রা এপ্রিল তাঁর ইন্তিকালের পর ঢাকার বিখ্যাত মাসিক 'মাহেনও'-তে মন্তব্য করা হয়েছিল যে, "একজন জ্ঞানী-গুণী, আদর্শবাদী, ধর্মপরায়ন ও সাধু ব্যক্তি হিসেবে তাঁর শ্রদ্ধেয়তা ছিল প্রশ্নাতীত। বাগ্মী ও লেখক হিসেবেও তিনি ছিলেন সুপরিচিত।"[৫৮৭]

মাওলানা আবদুল জব্বার, বাঁশখালী চট্টগ্রাম।

চট্টগ্রাম জেলার নিজামপুরের বাঁশখালী নিবাসী হযরত মাওলানা আবদুল জব্বার সাহেব ছিলেন মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর একজন বিশিষ্ট খলীফা। তিনি উচ্চ স্তরের কাশ্‌ফ শক্তি সম্পন্ন জবরদস্ত বুযুর্গ ছিলেন।

একবারের ঘটনা। মুজাদ্দিদে যামান (র.) আবদুল জব্বার সাহেবের বাড়িতে তাশরীফ আনবেন। আবদুল জব্বার সাহেব আনন্দে আটখানা। চারদিকে জোড়ালোভাবে পীরের আগমন সংবাদ প্রচার করতে লাগলেন। বিরাট ওয়ায মাহফিলের ইন্তিজাম করলেন। এলাকার কিছু কিছু হিংসুটে 'আলিম মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর আগমনের বিরোধিতা করতে লাগলো। তাদের নেতা ইছাখালীর জবরদস্ত 'আলিম মাওলানা গোলাম রহমান

৫৮৭. আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩

সাহেব আবদুল জব্বার সাহেবকে বিদ্রূপ করে বললো– "শুনেছিলাম তুমি নাকি ফুরফুরার মাওলানা সাহেবের কাছে মুরীদ হয়েছো? এবারতো সে আসছে, দেখে নেব তোমার পীর কেমন। এমন প্রশ্ন করবো যে, সে থ'বনে যাবে।" মাওলানা গোলাম রহমান সাহেব কতগুলো জটিল মাসআলা সংক্রান্ত প্রশ্ন ঠিক করে রাখলো।

নির্দিষ্ট দিনে মুজাদ্দিদে জামান (র.) তাশরীফ আনলেন। ইলমের গর্ব নিয়ে হাজির হলো মাওলানা গোলাম রহমান। মুজাদ্দিদে জামান (র.)-এর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। নামাজের সময় উপস্থিত হলে মুজাদ্দিদে যামান হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (র.) উক্ত মাওলানা গোলাম রহমান সাহেবকেই ইমামতি করার নির্দেশ দিলেন। এতো 'আলিম থাকতে তাকে নির্বাচিত করায় মাওলানা গোলাম রহমান অন্তর গর্বে ফুলে ওঠলো। গর্বিত অন্তর নিয়ে তিনি নামাজের মুসল্লায় গিয়ে দাঁড়ালেন। অতঃপর নামাজ আরম্ভ করলেন।

কিন্তু আল্লাহ্‌র কি অপূর্ব শান! নামাজ শুরু করার সাথে সাথে তার শরীরে মহা কম্পন শুরু হলো। অতি কষ্টে সূরা ফাতেহা শেষ করার পর তিনি অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। কিছুই মনে পড়ছিলো না। কুর'আনের শত শত আয়াত যেখানে তাঁর তরজমা ও তাফসীর সহকারে কণ্ঠস্থ, সেখানে কোনো আয়তই খেয়ালে আনতে পারছিলেন না। বহুক্ষণ চুপ থাকার পর কোনমতে সূরা ফালাক ও সূরা নাছ দিয়ে নমাজ শেষ করলেন। নামাজ শেষ হলে তিনি আবদুল জব্বার (র.)-এর কাছে গিয়ে বলতে লাগলেন, 'আপনার পীরতো ভাই মানুষ নন, তিনি একজন ফেরেশতা।'

এরপর শুরু হলো ওয়াযের মাহফিল। মাওলানা গোলাম রহমান সাহেব যে জটিল প্রশ্নগুলো ঠিক করে এসেছিলেন, মুজাদ্দিদে যামান (র.) ওয়াযের মধ্যে তার প্রতিটি প্রশ্নের দলিল ভিত্তিক জবাব দিলেন। প্রশ্ন না করতেই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে মাওলানা তাজ্জব হয়ে গেলেন। মুজাদ্দিদে যামানের প্রতি ভক্তিতে তাঁর মন ভরে উঠলো। মাওলানা তাঁর হাতে বায়'আত হয়ে গেলেন। মাহফিলের পর থেকে আবদুল জব্বার সাহেবের বিপক্ষের লোকতো রইলোই না বরং যারা বিরোধিতা করতো তারাও এক একজন ফুরফুরার ভক্তে পরিণত হয়।[৫৮৮]

হযরত মাওলানা তমিজ উদ্দীন, খুলনা।

খুলনার মাওলানা তমিজ উদ্দীন (র.) ছিলেন মুজাদ্দিদে যামান(র.)-এর একজন খাছ খলীফা। ধনীর দুলাল হওয়া সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত সাধারণভাবে জীবন-যাপন করতেন। তিনি আজীবন ইবাদাতে কঠোর মুজাহাদা করতেন। অবশ্য লোক চক্ষুর অন্তরালে ইবাদাত করাই তাঁর 'আদাত ছিলো। তাঁর মত গোপন আবেদ খুব কমই দেখা যায়। যখনই কোনো ব্যক্তি তাঁর ইবাদাত ও মুজাহাদা সম্পর্কে জানতে পারতো, তখনই তিনি উক্ত ব্যক্তিকে তা গোপন রাখার জন্য অনুরোধ করতেন। হালাল খানার জন্যে তিনি আজীবন সাধনা করে গিয়েছেন। সাধারনত: সতর্কতার খাতিরে ধনীদের বাড়িতে তিনি খানা খেতেন না। হালাল খাদ্যের জন্যে তাঁর অসাধারণ রিয়াজতের ফলে কখনও কোনো হারাম খাদ্য আল্লাহ্‌পাক তাঁর জন্যে কবুল করতেন না।

একদা এক ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে অছিয়ত করে যায় যে, তার জানাযার নামায যেনো হযরত মাওলানা তমিজ উদ্দিন (র.) পড়ান। তখন গ্রীষ্মকাল চলছিলো। প্রখর সূর্যতাপের মধ্যে বাড়ি হতে এক মাইল দূরে উক্ত ব্যক্তির জানাযার নামাজ সমাপনান্তে ফিরবার সময় তিনি ভীষণ পিপাসার্ত হয়ে পড়েন। মৃত ব্যক্তির সন্তানগণ তাঁকে একটি ডাবের পানি পান করার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি বললেন, 'বাবা! আজ হতে তিন দিন তোমাদের বাড়িতে পানাহার করা শরীয়তে জায়িয নয়।' বরং মৃত ব্যক্তির বাড়িতে খানা পৌঁছানো অন্যান্যদের জন্যে মুস্তাহাব।' তিনি উক্ত বাড়ি হতে বের হয়ে মাত্র দু'টি বাড়ি অতিক্রম করে জনৈক মুন্সী সাহেবের বাড়িতে গেলেন পানি পান করতে। ঐ ব্যক্তি হুযূরের পিপাসার কথা শুনে বাড়ির পেছনের পথ দিয়ে মৃত ব্যক্তির বাড়ি গিয়ে একটি ডাব এনে কাটতে লাগলেন। শব্দ শুনে তমিজ উদ্দীন (র.) বাড়ির মালিককে ডেকে বললেন, 'আপনি ঐ বাড়ির ডাব কাটছেন কেনো? আমি ঐ বাড়ির ডাব খেলে তো সেখানেই খেতে পারতাম।' তাঁর কথা লক্ষ্য না করে মুন্সী সাহেব ডাবটি কেটে ফেললো। সবাই অবাক হয়ে দেখলো যে, ডাবটাতে বিন্দু মাত্র পানি নেই। নাজায়েয খানা থেকে আল্লাহ্‌পাই তাঁর ওলীকে রক্ষা করলেন।

---

৫৮৮. রুহুল আমীন, *মুজাদ্দিদে জামান (র.)-এর জীবনী* (ঢাকা: ইসলামিয়া কুতুবখানা, ১৩৪০ বাংলা), পৃ. ৩২

আরেক দিনের ঘটনা। ভারতের ক্যানিং হতে সফর শেষে তমিজ উদ্দীন (র.) বাড়ি ফিরছিলেন। গ্রীষ্মের দুপুরে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পথিমধ্যে তাঁর পার্শ্বস্থ গ্রামের এক ব্যক্তির বহির্বাড়িতে কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্য বসলেন। হুযূরকে পেয়ে লোকটি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলো! ব্যস্ত হয়ে নিকটের এক দোকান থেকে দু'টো ডাব কিনে আনলো। কিন্তু কেটে দেখে দু'টোর একটাতের পানি নেই। আবার দৌড়ে অন্য একটি দোকানের ডাব কিনে এনে কেটে দেখে তাতেও পানি নেই। লোকটি কাঁদতে কাঁদতে হুযূরের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়লো। বলতে লাগলো– 'হুযূর! আমাকে ক্ষমা করুন। আমার বদ নছীব। আমি আপনাকে পানি পান করাতে পারলাম না। তারপর পুরো ঘটনা খুলে বললো। হুযূর ঘটনা শুনে বললেন, 'বাবা! তুমি মনে হয় সুদ খাও? তুমি সুদ খাওয়া ত্যাগ করো। আমার মত কত তমিজ উদ্দীন তোমার বাড়িতে খাবে!' লোকটি তৎক্ষণাৎ তওবা করলো। জীবনে আর সুদ খাবে না বলে ওয়াদা করলো।

সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলাধীন ছোট ভোটখালীর জনৈক প্রভাবশালী ব্যক্তি ব্যভিচার করায় জনগণ তার প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। বিষয়টি সমাধান করে অপরাধীর প্রতি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে হযরত তমিজ উদ্দীন (র.)-কে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। বিচারের দিন বহু লোকের সমাগম হলো। উক্ত ব্যক্তি উপস্থিত লোকদের জন্যে খাওয়ার বন্দোবস্ত করছিলো। যেহেতু ব্যভিচারের ঘটনা, তাই চারজন প্রত্যক্ষ দর্শনকারী সাক্ষী পাওয়া না যাওয়ায় উক্ত ব্যক্তি আপাতত নির্দোষ প্রমাণিত হলো। কিন্তু সবার মনের সন্দেহের পরিবর্তন হলো না। ঐ ব্যক্তি খাওয়ার জন্যে সবাইকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। জনগণ বলতে লাগলো, 'হুযূর খেতে রাজি হলে আমরাও খাব।' পরিশেষে তমিজ উদ্দীন (র.) তাকে বললেন, "আপনি আমাকে খাওয়ানোর জন্য চেষ্টা করবেন না। কারণ, ঐ অপকীর্তি যদি সত্যি সত্যিই আপনি করে থাকেন, তবে আমাকে খাওয়ানোর ফলে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হবেন।" কিন্তু ঐ ব্যক্তি একথা শুনেও নিবৃত হলো না। পীড়াপীড়ি করতেই লাগলো। অগত্যা তমিজ উদ্দীন (র.) খানা খেতে শুরু করলেন। দুই/তিন লোকমা খাওয়ার পরই তাঁর বমি শুরু হলো।

এদিকে উক্ত ব্যক্তির দু'খানি কাঠের নৌকা মধুমতি নদীতে চলছিলো। হঠাৎ কোনো ঝড় তুফান ছাড়াই নৌকা দু'টি ডুবে যেতে শুরু করলো; মাঝিরা কোন মতে প্রাণ নিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং সাঁতার কেটে পাড়ে উঠে এলো। তারা নদীর দিকে তাকিয়ে নৌকার কোনো নাম নিশানাও দেখতে পেলো না। নিরূপায় হয়ে তারা বহু কষ্টে বাড়িতে ফিরলো। তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে জানা গেলো যে, তমিজ উদ্দীন (র.) ঠিক যে সময়ে মুখে খানার প্রথম লোকমা দিয়েছিলেন, ঠিক তখনই নৌকা দু'টির সলিল সমাধি হয়েছিলো। তমিজ উদ্দীন (র.) সম্পর্কে এরূপ আরো বহু ঘটনা লোকমুখে শুনতে পাওয়া যায়।[৫৮৯]

মাওলানা তমিজ উদ্দীন (র.) একজন বড় ধরণের ওলী ও 'আবিদ ছিলেন। তিনি বহুদিন ফুরফুরার দরবারে অবস্থানের পর দীনের প্রচার ও প্রসারের জন্য স্বীয় এলাকায় চলে আসেন। স্বীয় এলাকা খুলনায় এসে তিনি সাধারণ লোকদের মাঝে দীনের কাজ করতে লাগলেন। তাঁর আচার-আচরণে আকৃষ্ট হয়ে অনেকেই তাঁর মুরীদ হন। তিনি মুরীদানদের সহযোগীতায় খুলনায় বিশাল এক খানকাহ্ তৈরী করেন এবং তাঁর মুরীদানরা এখানে এসে যিক্‌র-আযকার, মুরাকাবা, মুশাহাদা ইত্যাদিতে লিপ্ত থাকেন। বছরে দু'বার তিনি এলাকার সকলকে নিয়ে জলসা করতেন, অদ্যাবধি তাঁর মুরীদানগণ তরীকত ও তাসাউফের এ কাজ চালিয়ে আসছেন। বছরে দু'বার এখনও সেখানে ইসালে সওয়াব মাহফিল হয়ে থাকে।[৫৯০]

হযরত মাওলানা আবদুল গনি (র.), মীরসরাই চট্টগ্রাম।

চট্টগ্রাম জিলার মীরসরাই-এর শাহ সূফী মাওলানা আবদুল গণি (র.) ছিলেন মুজাদ্দিদে যামান হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (র.)-এর একজন প্রবীন খলীফা। তিনি 'সুফিয়ার আউয়াল সাহেব হুযূর' নামে সকলের নিকট সুপরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে হাদীস বিশারদ, মুফতী, মুত্তাকী, ইসলামী আন্দোলনে নিবেদিত এক সৈনিক, মীরসরাই তথা চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও ফেনীবাসীর জন্যে দীনের বাতি স্বরূপ।

---

৫৮৯. আবদুল্লাহ মারুফ আল মান্নান, প্রগুক্ত, পৃ. ২৬৪
৫৯০. রুহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

১৮৬৩ সালের ৫ই জুলাই তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বিভিন্ন মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ করার পর তিনি দিল্লী চলে যান এবং সেখানকার আমানীয়া মাদ্রাসায় দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত করেন। সেখান থেকে দেওবন্দ মাদ্রাসায় এসে শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র.)-এর নিকট সিহাহ্ সিত্তার তা'লীম লাভ করেন। এরপর তিনি মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর হাতে বায়'আত হন এবং কঠোর রিয়াযত সাধনা করতে থাকেন। পরবর্তীতে তিনি খিলাফত প্রাপ্ত হন।

১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে মুজাদ্দিদে যামান (র.) সুফিয়ায় তাশরীফ আনেন এবং তাঁর নির্দেশে 'সুফিয়া নূরিয়া মাদ্রাসা' নামে আবদুল গণি (র.) মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। পীরের নির্দেশে প্রতিষ্ঠিত এ মাদ্রাসায় তিনি আজীবন খিদমত করে গেছেন। সুদীর্ঘ সত্তর বছর তিনি এ মাদ্রাসায় মুহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি নিজের হাতে হাজার হাজার 'আলিমে দীন তৈরী করেন।

মাদ্রাসায় শিক্ষকতার পাশাপাশি চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও কুমিল্লার হাজার হাজার 'আলিমকে তিনি তরীকতের সিলসিলা ভুক্ত করেন। শেষ জীবনে বার্ধক্যজনিত কারণে বাইরে বের হতে পারতেন না তখন ঘরে বসেই আগত দর্শনার্থীদের জাহিরী ও বাতিনী তা'লীম দিতে থাকেন। তাঁর হাতে বায়'আত হয়ে অসংখ্য পথহারা মানুষ সত্যপথের দিশা পেয়েছে।

তিনি রাতদিন ইবাদাত বন্দেগীতে ব্যস্ত থাকতেন। সাধাসিধে পোষাক পরিধান করতেন। তিনি সম্পূর্ণরূপে সুন্নতের পাবন্দ ছিলেন। জরুরী প্রয়োজন ছাড়া তিনি নিজের জন্যে এক পয়সাও খরচ করতেন না, কিন্তু দান-খয়রাতের বেলায় দু'হাত উজাড় করে দিতেন। তিনি হক্ককথা বলতে দিধা করতেন না। মেহমানদারীতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। জীবনে তিনি এগার বার হজ্জ করেছিলেন।

তিনি ১৯৭৬ সালের ২৭ জুলাই ১১২ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তাঁর নামাজে জানাযায় প্রায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়েছিলো। সুফিয়া নূরিয়া মাদ্রাসা কম্পাউন্ডেই তাঁকে দাফন করা হয়।[৫৯১]

কবি মুন্সী জহির উদ্দীন গাজী, ঝিনাইদহ।

মর্দে মুজাহিদ মুন্সী জহির উদ্দীন (র.) বর্তমান ঝিনাইদহ জেলার খাজুরা গ্রামে ১৮১০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন শেখ আবদুল করিম। তাকওয়া ও পরহেজগারীর জন্য আবদুল করিমকে সকলে করিম মুসল্লী বলে সম্বোধন করতো। করিম মুসল্লীর দুই পুত্র ও দুই কন্যা যথাক্রমে হাজি জহির উদ্দীন, শেখ সুরাত আলী, নেকজান বিবি ও রাবিয়া খাতুন। জহির উদ্দীন (র.) পিতা শেখ করিম মুসল্লীর নিকট এবং স্থানীয় মক্তবে আরবী, ফার্সী ও বাংলা ভাষা পঠন-পাঠনে অভ্যস্ত হন। অনেকে অনুমান করেন, ১৯২১ সালে সাইয়িদ আহমদ ব্রেলভী (র.) কোলকাতায় অবস্থান কালে অনেকের মত শেখ করিম মুসল্লী ও পুত্র জহির উদ্দীনকে বায়'আত করেন। এভাবে কিশোর জহির উদ্দীন ধর্ম ও স্বজাতির জন্য জান কুরবানীর অনুপ্রেরণা লাভ করেন। ইংরেজ ও তার পদলেহী দেশীয় মুৎসুদ্দী তালুকদার জমিদারগণ প্রজা সাধারণের ওপর অমানুষিক অত্যাচারে লিপ্ত হয়। মুসলমানদের ধর্মীয় জীবন-যাপনে হিন্দু জমিদারগণ বাঁধা দেয়, এমনকি পরহেজগার মুসলমানদের মুখের দাঁড়ির জন্য খাজনা দিতে হতো। রাজ্যহারা, সম্মানহারা মুসলিমদের ওপর ক্রমে ক্রমে অত্যাচার বৃদ্ধি পেতে থাকলে তিতুমীর (র.) এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং নারকেল বাড়িয়ায় বাঁশের কেল্লা স্থাপন করতঃ জিহাদে ব্যাপৃত হন। তরুণ জহির উদ্দীন অগনিত মুজাহিদ বীরের সঙ্গে বীর দর্পে পা মিলিয়ে জিহাদের মানসে উপস্থিত হলেন বাঁশের কেল্লার বীর নায়ক সৈয়দ নিসার আলী তিতুমীর (র.)-এর সন্নিধানে।

বাঁশের কেল্লার যুদ্ধে দুর্ভাগ্যজনক পরাজয়ের পর অর্থাৎ ১৮৩১ সনের ১৪ই নভেম্বরের পর বাঁশের কেল্লার তরুণ যোদ্ধা বিভিন্ন স্থানে আত্যগোপনে থেকে ২২ নভেম্বর কলকাতার পত্নীতলা মস্‌জিদে আশ্রয়গ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে বাংলা সাহিত্যে 'যশোহরের অবদান' গ্রন্থে মুহাম্মদ শাহাদাত আলী আনসারী লিখেছেন, "তিনি (জহির

৫৯১. ফজলুর রহমান মুন্সী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

উদ্দীন) তিতুমীরের স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন বীর সৈনিক। তিতুমীরের আন্দোলন ব্যর্থ হলে ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের ২২ নভেম্বর কোলকাতার পত্নীতলা মসজিদে তিনি আশ্রয়গ্রহণ করেন।"[৫৯২] অন্য মতে, জহির উদ্দীন (র.) কলকাতার সিন্দুরিয়া পট্টি মস্‌জিদে আশ্রয়গ্রহণ করেন। বাঁশের কেল্লার পতন হলে জহির উদ্দীন (র.) যে কলকাতার কোনো মস্‌জিদে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে সিন্দুরিয়া পট্টিতে স্থানীয় মস্‌জিদে তিনি দীর্ঘদিন অবস্থান করেছিলেন। সিন্দুরিয়া পট্টির মস্‌জিদের হাফিজ জামাল উদ্দীন ছিলেন সৈয়দ অহমদ ব্রেলভী (র.)-এর খাস খলীফা ও মুজাহিদ। ব্রেলভী ও তিতুমীর (র.)-এর পরাজয়ের পরে মুন্সী জহির উদ্দীন ও হাফিজ জামাল উদ্দীন আন্দোলনের বাণী প্রচার করতে থাকেন। যতদূর জানা যায়, মুন্সী জহির উদ্দীনের প্রচারাভিযান ছিলো ইসলামী মূল্যবোধ, ইসলামী জাগরণ, শিক্ষা ও দরিদ্র বিতাড়নের পক্ষে। আরো জানা যায়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে মুন্সী জহির উদ্দীন (র.) মুজাহিদ আন্দোলনের বাণী প্রচার করেন। কলকাতার মোটয়া বুরুজ পত্নীতলা, নাখোদা, সিন্দুরিয়া পট্টি মস্‌জিদসমূহের তিনি ছিলেন প্রচারক মুজাহিদ। যতদূর জানা যায়, সিন্দুরিয়া পট্টি মস্‌জিদে মুন্সী জহির উদ্দীন (র.) কিছুকালের জন্য ইমামতীও করেন।

ফুরফুরার পীর মুজাদ্দিদে যামান হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (র.) এ সময় মুন্সী জহির উদ্দীনের মুজাহিদী জীবন, বাগ্মীতা ও কবিত্ব শক্তিতে বিমুগ্ধ হয়ে তাঁকে কাছে টানলেন।

তিতুমীর (র.)-এর অনুসারীদের ১৪০ জনকে ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলিয়ে ইংরেজ কোম্পানী সরকার কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লে জহির উদ্দীন ঝিনাইদহের খাজুরা গ্রামে ফিরে আসেন এবং বর্তমান চুয়াডাঙ্গা জেলার লক্ষীপুর গ্রামের এনায়েত উল্লাহ বিশ্বাসের কন্যা জহিরুন্নেসাকে বিবাহ করেন। জহির উদ্দীন (র.)-এর কুর'আন, হাদীস ও ইসলামী দর্শনে বিপুল পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁর অসংখ্য ভক্ত তাঁকে মুন্সী খেতাবে ভূষিত করেছিলেন। তিনি দু'বার হজ্জ পালন করেন। প্রথমবার তিনি হজ্জে গিয়েছিলেন পদব্রজে। দ্বিতীয়বার অর্থাৎ ১৩৩০ বাংলা সনে ফুরফুরার পীর হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (র.)-এর সাথে মুন্সী জহির উদ্দীন হজ্জ পালন করেন।

ইসলামী শিক্ষায় নব জীবন সঞ্চারের উদ্দেশ্যে জিহাদী মনোভাব নিয়ে বিদ'আতী ফিরকাগুলোর বিরুদ্ধাচরণ ও খ্রীস্টান মিশনারীদের অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্র থেকে মুসলিমদের সমাজ জীবন ও ধর্মীয় জীবন রক্ষার্থে বাংলা ১৩১৭ সনে কলকাতায় সাহিত্যক আবদুর রহিম প্রমুখের সাহায্যে ফুরফুরার পীর সাহেব দীনদার মুসলমানদের আর্থিক সাহায্যে বাংলা আসামের শ্রেষ্ঠ 'আলিম বুযুর্গানে দীন ও বাগ্মীদের নিয়ে আঞ্জুমানে ওয়ায়িযীনের পক্ষে একটি ইসলাম প্রচারক দল বের করেন। আবু ফাতেমা মোহাম্মদ ইসহাক তাঁর "ফুরফুরা শরীফের পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী আবু বকর সিদ্দিকী (র.)" নামক গ্রন্থে বাংলা আসামের ১২জন ইসলাম প্রচারকের নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করেছেন; তাঁদের মধ্যে হাজি মুন্সী জহির উদ্দীনের নাম ও পরিচয় স্থান পেয়েছে। তিনি চুয়াডাঙ্গার লক্ষীপুর গ্রামে ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র হিসেবে একটি বড় খানকাহ্ তৈরী করে মুত্যু পর্যন্ত ইসলাম প্রচারের কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন।[৫৯৩]

বাঁশের কেল্লার যোদ্ধা ইসলাম প্রচারক, বিখ্যাত বাগ্মী ও তিনখানি কাব্যগ্রন্থ রচয়িতা কবি মুন্সী জহির উদ্দীন (র.) নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে প্রায় ১২১ বছর বয়সে ১৯৩১ সনে স্বীয় গ্রাম খাজুরিয়ায় ইন্তিকাল করেন।

মাওলানা মনসুর আহমেদ, হাজিগঞ্জ চাঁদপুর।

চাঁদপুরের হাজিগঞ্জ উপজিলার দো আউলিয়া গ্রামের হাফেজ হাজি মাওলানা মনসুর আহমেদ (র.) ছিলেন মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর একজন বিশিষ্ট খলীফা। তিনি এলাকায় বড় হাফিজ সাহেব নামে পরিচিত ছিলেন। বেশ কিছুকাল তিনি কোলকাতা খিদিরপুর জামে মস্‌জিদের পেশ ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

---

৫৯২. আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২
৫৯৩. আবু ফাতেমা মোহাম্মদ ইসহাক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

তাঁর এলাকায় একটি বিদ'আতী পীরের মাযার ছিলো। দূর-দূরান্ত থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ এ মাযারে এসে সমবেত হতো। হারাম কার্যকলাপের মাত্রা অত্যধিক পরিমাণ বেড়ে গিয়েছিল। প্রতিদিন মাজারে মণে মণে দুধ ঢালা হতো।
গ্রামের ইসলাম সচেতন কিছু গণ্যমান্য লোক এসে হাফিজ মনসুর আহমেদ (র.)-কে এ মাজারের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়ার আবেদন জানালো। হাফিজ সাহেব হুযূর মাযারের সামনে গিয়ে সওয়াব রেসানী করে দু'আ করে সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, 'বাবারা! এখানে কোনো পীরের মাযার নেই, একটা বাচ্চা ছেলের কবর আছে।'
কেউ কেউ তাঁর কথা বিশ্বাস করলো, আবার কেউবা উড়িয়ে দিলো। পরিশেষে সিদ্ধান্ত হলো মাযার ভেঙ্গে কথাটির সত্যতা যাচাই করা হবে।

মাযার ভেঙ্গে দেখা গেলো, আসলেই সেখানে কিছুই নেই, একটা বাচ্চা ছেলের কয়োটি হাড়গোড় ছাড়া। এরপর থেকে মাজারের বিদ'আতী কার্যকলাপ বন্ধ হলো। হাফিয সাহেব সেখানে একটি মস্‌জিদ প্রতিষ্টা করলেন। মস্‌জিদটি এখনও সেখানে বিদ্যমান রয়েছে। শির্‌ক, বিদ'আত ও ইসলামের সাথে অসংগতিপূর্ণ কার্যকলাপ থকে মানুষ ও সমাজকে মুক্ত করে দীনে ইলাহীর দিকে আহবানের নিমিত্তে তিনি মস্‌জিদ সংলগ্ন একটি খানকাহ্ নির্মাণ করেন এবং কুর'আন হাদীস তা'লীমের জন্য তৎসংলগ্ন একটি মক্তবও প্রতিষ্ঠা করেন।

মুজাদ্দিদে যামান হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (র.)-এর সাথে তিনি হজ্জে যাবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। যে কয়জন বুযুর্গ মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর কাফন-দাফনে সহযোগিতা করার বিরল সৌভাগ্য লাভ করে ধন্য হয়েছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদেরই একজন।[৫৯৪]

মাওলানা আবদুল মজিদ, ফেনী।

ফেনী জিলার গোবিন্দপুর গ্রামের সূফী মাওলানা আবদুল মজিদ সাহেব (র.) ছিলেন মুজাদ্দিদে যামান হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (র.)-এর একজন খলীফা। গোবিন্দপুরের হুযূর নামে তিনি বেশি পরিচিত। তাঁর মুরীদ হওয়ার ঘটনাটি খুবই চমকপ্রদ।
মুজাদ্দিদে যামান (র.)-কে পরীক্ষা ও যাচাই করার জন্য কতগুলো জটিল প্রশ্ন ঠিক করে একজন সঙ্গী সাথে নিয়ে তিনি ফুরফুরায় হাজির হলেন।
মুজাদ্দিদে যামান (র.) তখন দরবারে বসে ওয়াজ-নছীহত করছিলেন। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, 'দুজন মেহমান আসছে, ভালোভাবে তাঁদের মেহমানদারী করবে।' এর বেশ কিছুক্ষণ পরে সঙ্গীসহ সূফী মাওলানা আবদুল মজিদ সাহেব (র.) উপস্থিত হলেন। মেহমানদারী শেষ হলে মুজাদ্দিদে জামান (র. অবসর মুহূর্তে তাঁদের কাছে ডাকলেন। তারপর তিনি এমন সব বিষয় আলোচনা করলেন, তাতে তাঁরা তাঁদের সবগুলো প্রশ্নের দলীল ভিত্তিক জবাব পেয়ে গেলেন।

মুজাদ্দিদে যামানের এ কারামত দেখে সূফী মাওলানা মজিদ সাহেব ও তাঁর সঙ্গী সাথে সাথে হুযূরের হাতে বায়'আত হয়ে যান। অতঃপর কঠোর রিয়াযত সাধনা করতে থাকেন এবং খিলাফত প্রাপ্ত হন। তারপর তাঁরা উভয়ে দেশে ফিরে দীনকে সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে মস্‌জিদ, খানকাহ্, মক্তব মাদ্রাসা তৈরীতে উৎসাহী হন এবং এলাকার লোকদের সহযোগীতায় কয়েকটি মস্‌জিদ ও খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা করে আমৃত্যু দীনের দাওয়াত স্বীয় এলাকায় মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছিয়ে দেন।[৫৯৫]

হযরত মাওলানা আবদুল গফুর, বোয়ালমারী, ফরিদপুর।

---
৫৯৪. হিযবুল্লাহ গবেষণা পরিষদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫
৫৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭

Dhaka University Institutional Repository

ফরিদপুর জিলার বোয়ালমারী উপজেলার ডোবরা গ্রামের মাওলানা আবদুল গফুর (র.) মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর স্বনামধন্য একজন খলীফা ছিলেন। তিনি 'ডোবরার পীর সাহেব' নামেই সুপরিচিত ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে তিনি ফরিদপুর জিলার নগরকান্দা উপজিলার জঙ্গুরদী গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। দিওবন্দ মাদ্রাসা হতে তিনি দাওরায়ে হাদীস পাস করেন। অতঃপর মদীনা শরীফে বেশ কিছুদিন অবস্থান করে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন।

প্রথম জীবনে তিনি খুব পীর বিদ্বেষী ছিলেন। পীর আউলিয়াদের নামই শুনতে পারতেন না। ফরিদপুরে মুজাদ্দিদে জামান (র.) তাশরীফ আনবেন শুনে তিনি ও তাঁর এক সহপাঠী মাওলানা আবদুল আজীজ তাঁকে একটু পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে মনস্থ করলেন। নির্দিষ্ট দিনে তাঁরা রওয়ানা হলেন। পথে 'নূর ও নার' সম্পর্কে তাঁরা আলাপ করছিলেন। কিন্তু বহু তর্ক বিতর্কের পরও তাঁরা কোনো সমাধানে উপনীত হতে পারলেন না।

মাহফিলে উপস্থিত হয়ে তাঁরা মুজাদ্দিদে যামান (র.)-কে খোঁজ করতে লাগলেন। যামানার মুজাদ্দিদেও সামনে যেই না দাঁড়িয়েছেন, অমনি তিনি বলে উঠলেন, "কি গো বাবারা! নূর ও নারের সমাধান হলো?" সঙ্গীসহ মাওলানা আবদুল গফুর চমকে ওঠলেন। বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে থতমত খেয়ে বললেন– 'জি না হুযূর!'
'আপনরা কি এর সমাধান চান?' জামানার মুজাদ্দিদ জিজ্ঞেস করলেন।
তাঁরা বললেন, 'জি হুযূর।' এরপরে মুজাদ্দিদে যামান (র.) বিষয়টির এমন সমাধান পেশ করলেন যে, মাওলানা আবদুল গফুর তাঁর প্রতি ভীষণভাবে আকৃষ্ট হলেন এবং তাঁর হাতে বায়'আত হয়ে গেলেন।

বায়'আত হবার পর তিনি বেশির ভাগই মাদ্রাসার খিদমতে নিবেদিত থাকতেন এবং ফরিদপুরের ডোবরায় তাঁর পীর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত খানকাহ্‌র দায়িত্ব পালন করতেন। মাদ্রাসা এবং খানকাহ্‌র দায়িত্ব পালনার্থে তিনি পীরের দরবারে যাতায়াতের তেমন সুযোগ পেতেন না। তাঁর বেশকিছু চেনাজানা পীর ভাই পীরের দরবারে যাতায়াতের মাধ্যমে দ্রুত রূহানী তরক্কী লাভ করেছিলেন। কিন্তু আবদুল গফুর (র.)-এর তেমন কোনো পরিবর্তন হলো না। একদিন তাঁর মধ্যে জযবা এসে গেলো। তিনি ঠিক করলেন, এবার পীরের দরবারে গিয়ে একাধারে নয় বৎসর থাকবেন। যেই সিদ্ধান্ত-সেই কাজ। তিনি সামনাদী প্রস্তুতিতে লেগে গেলেন। বাড়ির জন্যে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র জোগাড় করে দিয়ে ফুরফুরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন।

ফুরফুরা পৌঁছে তিনি মুজাদ্দিদে যামানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। মুজাদ্দিদে যামান বিস্তারিত জেনে তাঁকে বললেন, "বাবা! তোমাকে নয় বছর এখানে থাকতে হবে না। তুমি নয়দিন আমাকে পুকুর থেকে মাছ ধরে খাওয়াও। ইনশাআল্লাহ্ এতেই নয় বছরের রিয়াযত সাধনায় যে তারাক্কী হতো, তার চেয়ে অনেক বেশী হবে।"

পীরের নির্দেশ মোতাবেক তিনি নয়দিন পুকুর থেকে মাছ ধরে মুজাদ্দিদে যামান (র.)-কে খাওয়ালেন। দশম দিনে পীর হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (র.) তাঁকে খিলাফত দিয়ে মানুষকে হিদায়াত করার জন্যে ফরিদপুরে তাঁর নিজ এলাকায় ফিরে যেতে নির্দেশ দিলেন।
হযরত আবদুল গফুর কঠোর রিয়াযত সাধনা করতেন। অনেক সময় এশাবাদ মোরাকাবায় বসলে সারারাত কেটে যেতো। তাঁর অভ্যাস ছিলো ফজরবাদ মোরাকাবা শেষ করে তিনপারা কুর'আন শরীফ না পড়ে তিনি নাস্তা খেতেন না।
জীবনে পাঁচবার তিনি হজ্জ করেছিলেন। তম্মধ্যে তিনবার পায়ে হেঁটে আর দু'বার জাহাজযোগে। তিনি সত্তর দশকের মাঝামাঝি ইন্তিকাল করেন। তাঁর কবর ফরিদপুরের বোয়ালমারী উপজেলার ডোবরা গ্রামে অবস্থিত।[৫৯৬]

হযরত সূফী মাওলানা ইয়াসীন, ফরিদগঞ্জ চাঁদপুর।

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলার ইসলামপুর (দেবীপুর) গ্রামের হযরত সূফী মাওলানা ইয়াসীন সাহেব (র.) ছিলেন মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর একজন বিশিষ্ট খলীফা। সাবেক মন্ত্রী মাওলানা আবদুল মান্নান সাহেব তাঁর সাহেবজাদা।

৫৯৬. তাজকেরাতুল আউলিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামের লোকেরা তাঁকে 'মুন্সী সাহেব' বলে ডাকতো। মুজাদ্দিদে যামান (র.) এক জলসায় ঘোষণা করলেন–"আপনারা ওঁকে মুন্সী সাহেব বলে ডাকেন কেনো? এখন থেকে 'শাহ সাহেব' বলে ডাকবেন।" এরপর থেকে শাহ সাহেব নামেই তিনি পরিচিত হলেন। এই শাহ সাহেব ফরিদগঞ্জে নিজ বাড়ির সামনে প্রথমে ছোট্ট একটি মক্তব চালু করেন, পরবর্তীতে এ মক্তবটিকে কেন্দ্র করে তাঁর ছেলে মাওলানা আবদুল মান্নান সেখানে একটি বড় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত মাদ্রাসাটিই এখন ফরিদগঞ্জ আলীয়া মাদ্রাসা নামে খ্যাত। পাশাপাশি এলাকার সাধারণ মানুষ যাতে দীন ইসলামের আলোয় নিজেদেরকে ধন্য করতে পারেন, সেজন্য শাহ সাহেব মাদ্রাসা সংলগ্ন একটি খানকাহ্ও প্রতিষ্ঠা করেন। আলীয়া মাদ্রাসা ও খানকাহকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর তথায় বিশাল ইসালে সওয়াব মাহফিল হয়ে থাকে। বহু লোক সেখান থেকে দীনী তা'লীম গ্রহণ করে থাকেন।

তিনি সাধারণত নৌকায় করে সফর করতেন। যে নৌকাটিতে চড়ে তিনি বিভিন্ন জলসায় যেতেন, ইন্তিকালের পূর্বে সেটি সম্পর্কে অছিয়ত করে যান যে, 'আমার ইন্তিকালের পর এ নৌকাটিকে ভালোভাবে হিফাযত করবে।'

কিন্তু তাঁর ইন্তিকালের বেশ কিছুকাল পরে তাঁর অছিয়ত অমান্য করে নৌকাটিকে জেলেদের কাছে বিক্রি করে ফেলা হয়। জেলেরা নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে গেলো। হঠাৎ শুনতে পেলো, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' যিক্রের আওয়াজ। চারদিকে থৈ থৈ পানি আর পনি। কোনো জনমানবের চিহ্ন সেখানে নেই। এমতাবস্থায় যিক্রের শব্দ কত্থেকে এলো?

বহু অনুসন্ধানের পর তারা নিশ্চিত হলো যে, কাঠের তৈরী নৌকাই যিক্র করছে। জেলেরা ভয় পেয়ে গেলো। নৌকা নিয়ে ফিরে এলো এবং নৌকার মালিককে নৌকাটি ফিরিয়ে দিলো। আজও এ নৌকাখানা ইসলামপুর গ্রামে সযত্নে রক্ষিত আছে।[৫৯৭]

মাওলানা আজিম উদ্দীন, ছাগলনাইয়া ফেনী।

ফেনী জিলার ছাগলনাইয়া উপজেলার দক্ষিণ কুহুমা গ্রামের হযরত মাওলানা আজিম উদ্দীন (র.) ছিলেন মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর একজন খাছ খলীফা। তিনি অত্যন্ত উচ্চ শ্রেণীর বুযুর্গ ছিলেন।

একবারের ঘটনা। মুজাদ্দিদে যামান (র.) তাঁর বাড়িতে তাশরীফ আনলেন। ওয়াজের মাহফিলের এন্তেজাম করা হয়েছিলো। বহু সহস্র লোকের সমাগম হলো। মুজাদ্দিদে যামান (র.) এক পর্যায়ে বললেন, "বাবারা! আপনারা যে যা পড়াতে এনেছেন (তেল, পানি, কালজিরা বা অন্য কিছু) স্ব স্ব স্থানে থেকেই সেগুলোর মুখ খুলে ধরুন। আমি ফুঁক দিয়ে দিচ্ছি।" সবাই তেল, পানি, কালজিরার পাত্রের মুখ খুলে ধরলে মুজাদ্দিদে যামান (র.) হাওয়ার মধ্যে ফুঁক দিয়ে বললেন, "বাবারা! ওগুলোতে ফুঁক দেয়া হয়ে গেছে। এবার ঢাকনা লাগিয়ে ফেলুন। সবাই ঢাকনা লাগিয়ে ফেললো।" মুজাদ্দিদে যামান এরূপ ফুঁক দেয়াতে উপস্থিত এক ব্যক্তি সন্তুষ্ট হতে পারলো না। সে তার পানির পাত্রটি অবহেলার সাথে হাতে নিয়ে পুকুরের পাড়ে চলে গেলো এবং পানির পাত্র থেকে সবটুকু পানি পুকুরে ফেলে দিলো। যেই না লোকটি পানিটুকু ফেললো, আর অমনি পুকুরের পানি উপচে পাড়ে উঠে এলো। এমনকি কিছু মাছ ডাঙ্গায় চলে এলো। সঙ্গে সঙ্গে মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর কাছে সবিস্তারে ঘটনা জানানো হলো। তিনি বললেন, আজিম উদ্দীনকে দিয়ে পানি পড়িয়ে পুকুরে ঢেলে দাও।' আজিম উদ্দীন (র.)-এর কাছ থেকে পানি পড়া নিয়ে পুকুরে ঐ পড়া পানিটুকু ঢেলে দিতেই উপচে পড়া পানি পূর্বাবস্থায় ফিরে গেলো।

আর একবারের ঘটনা। আজিম উদ্দীন (র.)-এর গ্রামের এক গৃহস্থ একবার নিয়ত করলো, 'কাঁঠাল গাছের প্রথম ও সবচেয়ে বড় কাঁঠালটি মাওলানা আজিম উদ্দীন সাহেবকে দিবো।' আল্লাহ্পাকের কি কুদরত! প্রথম কাঁঠালটি মস্ত বড় হলো। অত বড় কাঁঠালটি দিতে মনে না চাওয়ায় গৃহস্থ অপেক্ষাকৃত ছোট কাঁঠালটি তাঁর জন্যে নিয়ে

৫৯৭. মাওলানা নূরুর রহমান, *তাযকেরাতুল আউলিয়া* (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯২ খ্রী.), পৃ. ২৯

Dhaka University Institutional Repository

এলো। মাওলানা আজিম উদ্দীন (র.) কাঁঠাল দেখেই বলে উঠলেন, 'বাবা! যেটা দেয়ার নিয়ত করেছিলে সেটা যখন দিলে না, তা এটা আমি খাবো না।' একথা বলেই তিনি কাঁঠালটি পুকুরে ফেলে দিলেন।

গৃহস্থ আবার নিয়ত করলো যে, 'আগামী বছর বড় কাঁঠালটি মাওলানা সাহেবকে দিবো।' পরবর্তী বছর গৃহস্থ যখন বড় কাঁঠালটি নিয়ে এলো। তখন মাওলানা তাঁর খাদেমকে ডেকে বললেন, 'বাবা! গত বছর গৃহস্থ যে কাঁঠালটি দিয়েছিলো, সেটা পুকুরের ঘাটের সিঁড়ির নীচে আছে। ওটা ওখান থেকে তুলে এনে গৃহস্থকে দিয়ে দাও।' খাদেম পুকুরের সিঁড়ির নীচে পানি থেকে কাঁঠালটি উপরে তুলে আনলো। সবাই তাজ্জব হয়ে দেখলো যে, সুদীর্ঘ এক বছর পানিতে থাকার পরও কাঁঠালটির বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি, এমনকি বোটা থেকে তখনও কস পড়ছিলো। খাওয়ার সময় দেখা গেলো যে, স্বাদও বিন্দু মত্র বদলায়নি।
ইন্তিকালের পর মাওলানা আজিম উদ্দীনকে কুহুমা গ্রামেই সমাধিস্থ করা হয়।[৫৯৮]

হযরত মাওলানা প্রফেসর নূরুল আফসার, সীতাগঞ্জ চট্টগ্রাম।

হযরত মাওলানা প্রফেসর নূরুল আফসার সাহেব (র.) মুজাদ্দিদে যামান ফুরফুরাভী (র.)-এর মুরীদ। সূফী সদরুদ্দীন (র.) ছিলেন তাঁর তা'লীমী ওস্তাদ। পরে সদরুদ্দীন (র.)-এর তরফ থেকে তিনি খিলাফত প্রাপ্ত হন।

চট্টগ্রামের সীতাগঞ্জ উপজিলার গুপ্তাখালী গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তবে ফেনীতেই বেশীর ভাগ সময় অবস্থান করতেন। ফেনী কলেজের আরবী বিভাগের প্রধান হিসেবে তিনি বহুদিন যাবৎ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি একজন সুসাহিত্যিক ছিলেন। 'তাসাউফ শিক্ষা' ও 'ইসলামী শিক্ষা' নামে তিনি দু'টো বইও লিখেন। দীনের দাওয়াত ঘরে ঘরে পৌঁছিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে এবং মুরাকাবা মুশাহাদার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে, মুরীদানদের তাসাউফ ও মা'রিফাতের শিক্ষা দেয়ার লক্ষ্যে 'আফসারিয়া খানকাহ্' নামে একটি খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা করেন।

এত বড় একজন প্রফেসর হওয়া সত্ত্বেও তিনি সাধাসিধেভাবে চলতেন। কোনো দাওয়াতে গেলে যে রকমই খানা হোক না কেনো, তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে খেয়ে নিতেন। ফেনীতে এক ইসালে সওয়াবের মাহফিলে তিনি বিশেষ অতিথি হিসেবে তাশরীফ আনলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাবাররুকের মধ্যে বেশ কিছু ময়লা পড়ে বিষাদ হয়ে যাওয়ায় কেউ সেগুলো খেতে পারছিলো না। কিন্তু নূরুল আফসার (র.) টু শব্দটি না করে এমনভাবে খেতে লাগলেন যে, দেখে মনে হলো যেন তিনি খুব সুস্বাদু খানা খাচ্ছেন।

হযরত আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.) একবার তাঁর বাড়িতে তাশরীফ আনলেন। নূরুল আফছার (র.) তাঁর জন্যে পৃথকভাবে থাকার সুবন্দোবস্ত করলেন। স্পেশালভাবে একটি টয়লেটও তৈরী করা হলো। পীরের যাতে কোনো কষ্ট না হয় যথাসাধ্য তিনি সেদিকে খেয়াল রাখলেন।

বড় হুযূর (র.) তাঁর বড় সাহেবজাদা বর্তমান গদ্দীনশীন পীর সাহেবকে সাথে করে এনেছিলেন। তিনি তখন একেবারে ছোট ছিলেন। তিনি বললেন, 'আব্বার জন্য সব আলাদা আলাদা ব্যবস্থা করেছেন, আমারটা কোথায়? আমি কোন্ টয়লেটে যাবো? তাঁর কথা শুনে নূরুল আফসার (র.) ব্যস্ত হয়ে গেলেন এবং তাঁর জন্যে পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা করে দিলেন। উপস্থিত কয়েক ব্যক্তি এতে আপত্তি তুলে বললো, হুযূর! এতটুকু একটা ছেলের কথায় আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? জবাবে নূরুল আফসার (র.) বললেন, 'বাবা! ওকথা বলবেন না। বেআদবী হবে। উনি পীরের আওলাদ। সাপের বাচ্চা সাপই হয়ে থাকে।'

ফেনী জেলার রামপুর গ্রামের সূফী মাওলানা আনোয়ার উল্লাহ সাহেব প্রফেসর নূরুল আফছার (র.)-এর মুরীদ ছিলেন। তিনি সারারাত জেগে 'ইবাদাত বন্দেগী করতেন। দুর্ঘনাবশত যদি ওয়াক্তের নামাজের জামাত ছুটে

---

৫৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

Dhaka University Institutional Repository

যেতো, তবে তিনি পগলের মত হয়ে যেতেন। তাঁর ওয়ালেদ সাহেব মক্কা শরীফে হেরেম শরীফের এলাকার মধ্যে শায়িত আছেন।[৫৯৯]

আল্লামা রূহুল আমীন (র.), ২৪ পরগনা।

আমীরুস শরীয়ত কুতুবুল 'আলাম 'আল্লামা পীর আবু বকর সিদ্দিকী ফুরফুরাভী (র.)-এর অন্যতম প্রধান খলীফা প্রখ্যাত 'আল্লামা পীর মুহাম্মদ রূহুল আমীন (র.) বাংলা ১২৮৯ সনে পশ্চিম বঙ্গের ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত নারায়ণপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[৬০০]

'আল্লামা রূহুল আমীন (র.) ছিলেন ক্ষণজন্মা কালজয়ী মহাত্মন, অতুলনীয় প্রতিভা-ভাস্কর। এমন ধরনের সর্বগুণ সম্পন্ন বহুমুখী প্রতিভা-সীমিত, সংখ্যায় হাতে গোনা যায়। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন, 'নায়েবে মুজাদ্দিদ'। তিনি ছিলেন একাধারে হাদীসতত্ত্ববিদ, ফেকাহতত্ত্ববিদ, তাফসিরতত্ত্ববিদ, আধ্যাত্মিকতত্ত্ববিদ, পীরে কামিল, সুলতানুল ওয়ায়িযীন, প্রখ্যাত বাগ্মী ও তার্কিক।

রূহুল আমীন (র.) বাল্যকাল থেকে অত্যন্ত মেধাবী, প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। খেল-তামাশা বাজে খেয়াল তাঁর মাঝে কোনো সময়ই ছিলো না। ফলে পাড়া-প্রতিবেশী, পড়ার সাথীরা তাঁকে যথেষ্ঠ সমাদর করতো। পড়ার জামানায় প্রথম শ্রেণী থেকে মাদ্রাসার সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত পরীক্ষায় সর্বদা তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন।

হাজারো মেহনত করেও সহপাঠীরা তাঁকে দ্বিতীয় স্থানে বসাতে সক্ষম হননি। এমনকি ১৯০৫ সালে কলকাতা মাদ্রাসা-ই-আলীয়ার সর্বোচ্চ পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করে 'স্বর্ণপদক' লাভ করেন এবং যে নম্বর প্রাপ্ত হন, অদ্যাবধি সে রেকর্ড অম্লান রয়েছে। প্রায় দু'শত বছরের মধ্যে এমন কৃতি ছাত্র একজনও পাওয়া যায় নি।[৬০১]

তিনি মাত্র চৌদ্দ দিনে 'পাঞ্জেগাঞ্জ' কিতাবখানা সম্পূর্ণ কণ্ঠস্থ ও আয়ত্ত করেছিলেন। কোনো বিষয় একাধিকবার পড়লেই মুখস্ত হয়ে যেত। পরীক্ষার খাতায় হাশিয়া বা পাদটিকাও উল্লেখ করতেন। কোলকাতা মাদ্রাসা-ই-আলীয়ার কর্তৃপক্ষ তাঁকে উক্ত মাদ্রাসার শিক্ষকতা করার জন্য আহবান জানালে তিনি পীরের নির্দেশে ইশা'আতে ইসলামের উদ্দেশ্যে চাকুরি গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন।

'আল্লামা রূহুল আমীন বার্মা, রেঙ্গুন, বাংলা-আসামের দিক-দিগন্তে শহর পলদীতে উল্কার ন্যায় ভ্রমণ করেছেন, দীনের খাতিরে হাজারো কষ্ট মসিবত উপেক্ষা করে ইশা'আতে ইসলামে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

হাদীস শরীফের সনদ ও বিশুদ্ধতা, কিতাবের পৃষ্ঠা উল্লেখ করে ওয়াজ নছীহত করা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ছিলো। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দু'গন্ডদেশ বেয়ে অশ্রু ঝরতো, শ্রোতারা তন্ময় হয়ে শুনতে শুনতে কেঁদে কেঁদে জারেজার হয়ে যেতো। মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর উপস্থিতিতে খোদ আরবের বুকে সৌদি বাদশাহের আয়োজিত মাহফিলে প্রায় সাড়ে তিনশত সহীহ হাদীস শরীফ সনদসহ বর্ণনা এবং ঘন্টার পর ঘন্টা বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় ওয়াজ নসীহতের বিরল দৃষ্টান্ত 'আল্লামা রূহুল আমীনের জ্ঞানের গভীরতা ও যোগ্যতার সম্যক পরিচয় বহন করে।

বাংলা ১৩২৩ সালের ৮ই চৈত্র তারিখে ফুরফুরার শামসুল ওলামা, পীর হযরত মাওলানা গোলাম সালমানী আব্বাসী (র.)-এর ইসালে সওয়াবের মাহফিলে হযরত পীর আবু বকর সিদ্দিকী (র.) বলেন– "আমার খান্দানে 'ইল্‌মে লাদুন্নীর ফয়েজ আছে, আমি তা মাওলানা রূহুল আমীন সাহেবকে দিয়েছি।" তাঁর মতো প্রতিভা ভাস্কর

৫৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১
৬০০. হাবীবুর রহমান বশিরহাটী, *রূহুল আমীন (র.)-এর জীবনী* (বশিরহাট: আল্লাহওয়ালা লাইব্রেরী, ১৪০৫ বাং.), পৃ. ২০
৬০১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

Dhaka University Institutional Repository

তত্ত্ববিদ বিদগ্ধজন বাংলা ও ভূ-ভারতে বিরল। মুজাদ্দিদে যামান (র.) তাঁকে 'ইমাম ও 'আল্লামা-ই-বাঙ্গালা' উপাধিতে ভূষিত করেন।

'আল্লামা রূহুল আমীন (র.) কত উচ্চ স্তরের মুহাদ্দিস ছিলেন তাঁর সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় তৎপ্রণীত 'বঙ্গানুবাদ মেশকাতুল মাসাবিহ' কিতাবের মাধ্যমে। বাংলা ভাষায় মূল্যবান হাদীস শরীফের কিতাব 'মিশকাতুল মাসাবিহ' এর সর্বপ্রথম বঙ্গানুবাদক 'আল্লামা রূহুল আমীন (র.)। হাদীস শাস্ত্রের আদি অন্ত, তারিখুল হাদীস ও হাদীসের ইতিবৃত্ত তাঁর অমর অবদান। ইতিপূর্বে বাংলা ভাষায় এমন অপূর্ব গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না।

'আল্লামা পীর রূহুল আমীন (র.) ক্ষুরধার লিখনীতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতাদর্শকে সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরেছেন। তন্মধ্যে মাযহাব মিমাংসা বা বোরহানুল মুকাল্লেদীন, সায়েকাতুল মুসলিমীন, দাফেউল মুকাসেদীন, ফেরকাতুন নাজেয়ীন, কেয়ামুল মুজতাহেদীন, নাসরুল মুজতাহেদীন, ফতুয়ায়ে আমিনীয়া, দল্লীন যল্লীন এর মিমাংসা, যাকাত ফেতরার মাসায়েল, যবেহ কুরবানীর মাসায়েল, গ্রামে জুম'আ, কদমবুছির ফাতওয়া, নিকাহ জানাজাতত্ত্ব, কালিমাতুল কুফর, দাফন-কাফনের মাসায়েল, ইসলাম ও পর্দা, ইসলাম ও সঙ্গীত, জরুরী মাসায়েল তিন খন্ড, জরুরী ফতওয়া তিন খন্ড, মাসয়ালা ভান্ডার তিন খন্ড, বাগ্‌মারী ফকীরের ধোকা ভঞ্জন, কাদিয়ানী রদ ছয় খন্ড, খন্দকারের ধোকা ভঞ্জন, মোস্তফা চরিত্রের প্রতিবাদ, আজাদের বীমা সংক্রান্ত বাতিল ফাতওয়া, রদ্দে শিয়া, রদ্দে বিদ'আত তিন খন্ড, রদ্দে হাফায়েতে শিহাবিয়া, হযরত বড় পীরের জীবনী, বঙ্গ-আসামের পীর আউলিয়া কাহিনী, মীলাদে মোস্তফাতত্ত্ব বা তরীকত দর্পণ সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি তাফসীরুল কুর'আন প্রথম তিন পারা চার খন্ডে প্রকাশ করেছিলেন।

তাছাড়া তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সম্পাদনা ও পৃষ্ঠপোষকতায় নিয়োজিত ছিলেন। মাসিক মস্‌জিদ, সাপ্তাহিক হানাফী, মাসিক সুন্নাত ওয়াল জামায়াত, দৈনিক মোজাহেদ, বার্ষিক ছোটদের মাহফিল, সাপ্তাহিক নবযুগ, মাসিক হিদায়াত, মাসিক শরীয়ত ইসলাম, মাসিক শরীয়ত, মাসিক মুসলিম হিতৈষী, মাসিক ইসলাম দর্শন ইত্যাদি পত্র-পত্রিকার সাথে গভীরভাবে জড়িত ছিলেন।

সমাজের বুকে অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত লোকেরা বক্তা সেজে বাজে কিচ্ছা কাহিনী ও জইফ হাদীস বর্ণনা, কুর'আন হাদীসের অপব্যাখ্যা করে মানুষদের বিভ্রান্ত করে সমাজ জীবনে বাতিল মতবাদের আমদানী শুরু করলে তিনি আট খন্ড 'ওয়াজ শিক্ষা' (৬৬৮পৃষ্টা) প্রকাশ করে সঠিক ওয়াজের ধারা প্রবর্তন করেন। ঝাড়ফুক ও শির্‌কী কুফরী করে জ্বিন পরী ও বিমার আজাবের রুগীদের ইমান বরবাদ করার জঘন্য কারবার করে মুসলিম সমাজের চরম ক্ষতি দেখে তিনি সহীহ কিতাবসমূহ থেকে এবং ফুরফুরার হযরত পীর সাহেবের এজাজতে প্রাপ্ত তদবীরসমূহ ছয় খন্ডে তাবিজাত কিতাব লিখে সমাজের প্রভূত কল্যাণ করেন।[৬০২]

শিয়া, কাদিয়ানী, লা-মাজহাবী, মুহাম্মদী, আজানগাছী, সুরেশ্বরী, মাইজভান্ডারী প্রভৃতি বাতিল ফিরকাপন্থী ও বিদ'আত বে-শরাদের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিটি কিতাব মরণাস্ত্র স্বরূপ। গবেষকদের জন্য অমূল্য পাথেয়, দিকদর্শন। তিনি ছিলেন হাফিযুল হাদীস। তিনি চোখ বন্ধ করে ওয়ায করতেন। বলতেন, 'আমি যখন কোনো মাহফিলে ওয়ায করবার জন্য দাঁড়াই, তখন চোখ বন্ধ করলেই দেখতে পাই, কে যেনো আমার সামনে হাদীসের কিতাব খুলে রেখেছেন। আমি তা দেখে অনর্গল হাদীস বলে যাই। তাঁর আঠারো হাজারেরও বেশি হাদীস কণ্ঠস্থ ছিলো।

তাঁর মাহফিলে মাইকের প্রয়োজন হতো না। সভাস্থলের ২/৩ মাইল দূর থেকেও তাঁর আওয়াজ শুনা যেতো। পীরের নির্দেশে বেদ'আতী বে-শর'আ পীর ও ভন্ড আলেমদের সাথে তিনি জীবনে বহু বাহাছ করেছেন এবং সবগুলোতেই জয়ী হয়েছেন।

সারা বছরই হিদায়াতের কাজে ছুটে বেড়াতেন। পথে-ঘাটে, রেলে, স্টিমারে, এমনকি গরুর গাড়িতে বসেও তিনি দীনি কিতাব লিখায় ব্যস্ত থাকতেন। তিনি প্রায় দেড় শতাধিক মূল্যবান কিতাব বাংলায় লিখে গেছেন। তন্মধ্যে ১১৪টি কিতাব তিনি নিজেই ছাপিয়ে ছিলেন। যার পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রায় বার হাজার। তিনি বাংলার প্রায়

---

৬০২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিটি জেলার প্রতিটি খানকাহ্‌র বাৎসরিক ইসালে সওয়াব মাহফিলগুলিতে অংশগ্রহণ করতেন এবং ওয়াজ-নছীহত করতেন। এভাবে তিনি আজীবন দীনের খিদমতে নিজেকে নিয়োযিত রেখেছিলেন।

‘আল্লামা রূহুল আমীন (র.) বাংলা ১৩৫২ সালের ১৬ কার্তিক ইন্তিকাল করেন। বসিরহাটের মাওলানা বাঁগে তাঁর কবর অবিস্থিত।[৬০৩]

ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ

বিংশ শতাব্দীর অদ্বিতীয় জ্ঞান-তাপস, ২২টি ভাষার পন্ডিত হযরত মাওলানা ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (র.) ছিলেন মুজাদ্দিদে যামান আবু বকর সিদ্দিকী (র.)-এর শীর্ষস্থানীয় খলীফাদের একজন। উপমহাদেশের খুব কম লোকই খুঁজে পাওয়া যাবে যিনি এ মহান মনীষী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

তিনি ছিলেন চলিষ্ণুবিদ্যাকল্পদ্রুম-চলন্ত বিশ্বকোষ, বিদ্যাবাচম্পতি, ‘আল্লামা। কবি, প্রাবন্ধিক, গবেষক, গল্প লিখক, সম্পাদক, সাংবাদিকসহ বিচিত্রময় কর্মগুণ ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র জীবন ইতিহাস সমুজ্জ্বল করেছে। ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র পূর্বপুরুষ শায়খ দারা মালিকী বাংলাদেশে ইসলাম প্রচরের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। এসেছিলেন পীর সৈয়দ আব্বাস আলী মাক্কী ওরফে পীর গোরাচাঁদের খাদেম হিসেবে। তাঁরা দক্ষিণ বাংলা ও পশ্চিম বাংলা অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করে ইতিহাস সৃষ্টি করেন। শায়খ দারা মালিকীর উত্তর-পুরুষ ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বংশীয় ধারা থেকেই সূফী মানসের উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করেন।

তাঁর পিতা মুন্‌শী মফিজুদ্দীন আহমদ ছিলেন একজন সূফী সভাবের মানুষ। জীবিকার তাকীদে তিনি সরকারী চাকরি করলেও পূর্বপুরুষদের তাসাউফ চর্চার ঐতিহ্য ধরে রেখেছিলেন। তিনি ফুরফুরার পীর মুজাদ্দিদে জামান মাওলানা শাহ্ সূফী আবু বকর সিদ্দিকী (র.)-এর খাস মুরীদ ছিলেন। স্বাভাবিকভাবে ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র জীবন গড়ে ওঠে এক নিখাদ ইসলামী পরিবেশে, যা তাঁর জীবন-চেতনায় ইসলাম মানস সঞ্চারিত করে। ১৯০৮-১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে যশোর জেলা স্কুলে শিক্ষকতা করার সময় ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌র পরিচয় হয় যশোরের খড়কীর পীর হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আবদুল করীম (র.)-এর সংগে। ডক্টর শহীদুল্লাহ এ মহান সূফী ব্যক্তিত্বের খানকাহ্ শরীফে যশোরে অবস্থানের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন এবং তাসাউফ সম্পর্কিত আলোচনা করেছেন। পীর মুহাম্মদ আবদুল করীমের সংগে তাঁর আত্মিক বন্ধন স্থাপিত হয়েছিলো। হুগলী কলেজে বি.এ পড়ার সময় তিনি ফুরফুরার পীর মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর একান্ত সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি পীরের মুরীদ হননি বটে, কিন্তু তাঁর পিতার পীর মুর্শিদ ফুরফুরার পীর মুজাদ্দিদে জামান হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (র.)-এর সংগে সম্পর্ক রেখেছেন সব সময়। ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ইসলাম প্রসঙ্গ গ্রন্থের ‘হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিকী (র.)’ শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন, আমার ওয়ালিদ মরহুম মুন্‌শী মফিজুদ্দীন আহমদ সাহেব তাঁর নিকট তাল্‌কীন ছিলেন। হুযূরের সে সময় খুবই কম সংখ্যক খাস মুরীদান ছিলেন। এ কারণে তিনি আমাকে সবিশেষ স্নেহ করতেন।

তিনি আরও লিখেছেন, ‘আমরা ছাত্ররা তাঁকে ঘিরে ধরে ধর্ম সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করতাম, তিনি সে সকল প্রশ্নের সদুত্তর দিতেন। নিতান্ত বেয়াড়া প্রশ্নের তিনি কখনও বিরক্ত হতেন না।’ ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ফ্রান্সের প্যারিসের সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে। দেশে ফিরে তিনি ‘ইল্‌মে তাসাউফে অত্যধিক আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং সে লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে তিনি ফুরফুরার মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর কাছে মুরীদ হন। তিনি জ্ঞান রাজ্যের বিভিন্ন আঙিনা সার্থকভাবে বিচরণ করে উপলব্ধি করেন যে, সত্যিকার জ্ঞানী হতে হলে আল্লাহ্ পাবার জ্ঞান অনুশীলন করা অতি জরুরী আর সে জ্ঞানই হচ্ছে ‘ইল্‌মে তাসাউফ। ‘ইল্‌মে তাসাউফ হাসিল করা ছাড়া কারো জ্ঞানে পরিপূর্ণতা হাসিল হতে পারে না এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ করা সহজতর হয় না। তিনি পীরের কাছে মুরীদ হয়ে কাদিরীয়া, চিশতীয়া,

৬০৩. হাবিবুর রহমান বসিরহাটী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

Dhaka University Institutional Repository

নকসবন্দীয়া, মুজাদ্দিদীয়া প্রভৃতি তরীকার সবক একে একে গ্রহণ করেন এবং সফলতার সনদ বা খিলাফতনামা প্রাপ্ত হয়েছিলেন।[৬০৪]

ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খিলাফতনামা প্রাপ্তির পর নামের শেষে কখনো কখনো মুজাদ্দেদী উপাধী ব্যবহার করেছেন বলে জানা যায়। তাঁর মধ্যে যে সূফী মানস সঞ্চারিত হয়েছিলো তা এক সময় পরিপূর্ণতা লাভও করেছিলো। তিনি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানতাপস ও ভাষাবিজ্ঞানী যেমন ছিলেন তেমনি ছিলেন একজন খাঁটি সূফী। তিনি নিয়মিত তরীকতের নিয়ম অনুযায়ী যিক্র-ফিক্র, মুরাকাবা- মুশাহাদা করতেন, মাহে রমজানুল মুবারকের শেষ দশকে মস্জিদে গিয়ে ই'তিকাফ করতেন। মানুষকে আত্মিক উন্নয়নের শিক্ষা দিতেন। তাঁর পীর সাহেবের সঙ্গে তিনি বহু ওয়াজ মাহফিল ও যিক্রের মাহফিলে শরীক হয়েছেন। একবার তিনি তাঁর পীরের সঙ্গে হিন্দুস্তান সফর করতে যান। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, পীর সাহেব তাঁর ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত প্রত্যেক বৎসর প্রধানত বাংলা-আসামের বহু স্থানে ধর্ম সভায় মর্মস্পর্শী ওয়ায-নছীহত করেছেন। তাতে বহু লোক ধর্ম জীবন লাভ করেছে এবং মুরীদ হয়েছে। ১৩৪১ সালের ২৬ আশ্বিন, তিনি হিন্দুস্থানে সফরে যান। প্রায় একশত মুরীদ ও ভক্ত তাঁর সহযাত্রী ছিলো।[৬০৫]

ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর পীর সাহেবের কাছ থেকে তাসাউফ শিক্ষায় পরিপূর্ণতা লাভের সনদরূপ যে খিলাফতনামা পেয়েছিলেন, তাতে মন্তব্যের ঘরে পীর সাহেব স্বহস্তে ফার্সীতে যা লিখেছিলেন তার বাংলা তরজমা হচ্ছে–'তওবা করতে ও বায়াত করতে, ওয়াজ করতে ও তওবা করতে ও তা'লীম দিতে অনুমতি দেয়া হলো।' জানা যায়, তাঁর ডক্টরেট ডিগ্রী লাভের বহু পূর্ব থেকেই ফুরফুরার পীর সাহেব তাঁকে মাওলানা ও 'আল্লামা লকবে ভূষিত করেন। তিনি তাঁর পীরের ন্যায় শির্ক বিদ'আত উৎখাতের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। বার্ধক্যে উপনীত হয়েও তিনি মানুষকে কুরআন-হাদীসের শিক্ষা দান করেছেন, মস্জিদে মস্জিদে যেয়ে কুরআনের তাফসীর করে শুনিয়েছেন।

জীবন গড়ার মূল প্রেরণা যে তিনি মুজাদ্দিদে যামান হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (র.)-এর কাছ থেকে পেয়েছিলেন, তা প্রায়ই উল্লেখ করতেন। এমনকি তিনি তাঁর কিতাবের মধ্যে লিখেছেন– 'আমি বিশ্বাস করি, হুযূর কেবলার তাওয়াজ্জুহ আমার সফলতার মূল কারণ ছিলো।' পীরের পদাংক পুংখানুপুংখরূপে অনুসরণ করতে চেষ্টা করতেন। কঠোর রিয়াযত সাধনা করতেন। শত ব্যস্ততার মধ্যেও নিয়মিত যিক্র-আযকার ও ওযিফা আদায় করতেন। ফুরফুরা গেলে নিতান্ত সাধারণ মানুষের মত এক কোণে পড়ে থাকতেন। ইসালে সাওয়াব মাহফিলের সময় তিনি নিজ হাতে পেয়াজ ছিলা থেকে শুরু করে আরও বহু কাজ করতেন।

পীরের প্রতি ছিলো তাঁর অগাধ সম্মান ও মুহাব্বাত। এমনকি পীরের আওলাদেরও তিনি অত্যধিক তা'জীম করতেন। তিনি যখন দারুস্ সালাম আসতেন, তখন বেয়াদবী হবার ভয়ে গাড়ি দারুস্ সালামের ভেতরে নিতেন না। বেশ দূরে বড় রাস্তায় গাড়ি রেখে নিজ হাতে কলা, নারকেল ইত্যাদি হাদিয়া বহন করে আদবের সাথে হেটে হেটে খানকায় আসতেন। তিনি বলতেন, 'আমার পীরের আমি নিজেই একটা কারামত। আমাকে দেখা মানেই আমার পীরের একটা কারামত দেখা, আমি কি ছিলাম আর কি হয়েছি।'[৬০৬]

প্রচুর টাকা উপার্জন করা সত্যেও তিনি খুব মিতব্যয়ী ছিলেন। পরিবার ঢাকায় রেখে বেশ কিছুদিন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ঢাকা থেকে একটি চাদর ও একটি কম্বল নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু প্রচন্ড শীত পড়ায় এগুলোতে শীত মানতো না। সঙ্গীরা তাঁকে লেপ কিনে নিতে বললে তিনি বললেন – 'না, লেপ কিনব না, ঢাকায় লেপ আছে।' শীতের কষ্ট সহ্য করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু ঢাকায় লেপ থাকায় আবার রাজশাহীতে গিয়ে লেপ কিনে অপচয় করতে প্রস্তুত ছিলেন না।

---

৬০৪. শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী, *আল বালাগুল মুবীন*, অনুবাদ: মুহাম্মদ আবদুল্লাহ (ঢাকা: ইসলামীয়া কুরআন মহল, ১৯৯৯ খ্রী.), পৃ. ১০৩
৬০৫. ফজলুর রহমান মুন্সী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯
৬০৬. সম্পাদনা পরিষদ, ড. *মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০ খ্রী.), পৃ. ১০৫

Dhaka University Institutional Repository

তিনি একদিন দুপুরে খেতে বসেছেন। এমন সময় একজন ফকীরের হাঁক শুনা গেলো, 'আম্মা আমি ক্ষুধার্ত, একটু ভাত খেতে দিন।' শহীদুল্লাহ (র.) স্ত্রীকে বললেন, 'ফকীর ভাত চাচ্ছে, ওকে ভাত খেতে দাও।' স্ত্রী বললেন, 'আপনি খেয়ে নিন, পরে ওকে খেতে দিব।' ডক্টর শহীদুল্লাহ রাগ করে খানা রেখে ওঠে গেলেন। রাগত স্বরে বললেন, 'দুয়ারে ফকীর খানা চাচ্ছে, আর আমি ভাত খাব? আমি ভাত খাব না।'[৬০৭]

ডক্টর শহীদুল্লাহ অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন। মায়ের বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার সময় তিনি খুব সেবাযত্ন করতেন। তিনি জীবনে কখনও মায়ের মনে ব্যাথা দেননি। তিনি বলতেন, 'মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেস্ত। আমি মায়ের মনে কখনও ব্যাথা দেইনি, মায়ের দু'আতেই আমার এত উন্নতি হয়েছে।' কাজের ফাঁকে সময় পেলেই মায়ের কাছে এসে বসে তাঁর খোঁজ-খবর নিতেন। মায়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন, মাথায় তেল মালিশ করে দিতেন, আঙ্গুর খাওয়াতেন। মাঝে মাঝে হাত পাখা দিয়ে বাতাস করতেন। মিটিং থেকে ফিরে এসে উপহার পাওয়া ফুলের মালা, ফুলের তোড়া ইত্যাদি মায়ের সামনে রেখে কিছুক্ষণ তাঁর খিদমতে দাঁড়িয়ে থাকতেন, তারপর নিজের ঘরে যেতেন।[৬০৮]

তিনি বিদেশ ফেরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। কিন্তু তবুও হালাল-হারাম, জায়েজ-নাজায়েজ সবই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে চলতেন। প্যারিস অবস্থানকালীন সময়ে তিনি কোনদিন গোশ্‌ত খাননি। এ্যালকোহল মিশানো এ্যালোপ্যাথি ঔষধ তিনি কোনদিন নিজে খাননি, পরিবারের কাউকে খেতে দিতেন না। স্ত্রী ও মেয়েদের কঠোর পর্দায় রাখতেন। গান-বাজনা মোটেই পছন্দ করতেন না।

একদিন তাঁর মেয়ে রুমালে সুতা দিয়ে ময়ূর বুনলে তিনি রাগান্বিত হয়ে বললেন, 'ময়ূর বানালে কেন? ফুল, ঘর, বাড়ি বা অন্য কিছু বুনতে পারলে না? আখিরাতে আল্লাহ্‌পাক যখন ওর জান দিতে বলবেন, তখন তুমি কি জান দিতে পারবে? আর কখনও জানদার জিনিস তৈরি করবে না।' তিনি জীবনে কখনও নামাজ কাজা করেননি বা প্যান্ট-সার্ট পরেননি।

এ মহান জ্ঞানসাধক ও সূফী ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই জুলাই রোববার সকাল ৯ট ৫৮ মিনিটে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ৯নং কেবিনে ইন্তিকাল করেন।[৬০৯]

সৈয়দ আবুল বাশার মুহাম্মদ বশীরুদ্দীন

পশ্চিম বঙ্গের চব্বিশ পরগনা জিলার আলীপুর মহকুমার সৈয়দ মুহাম্মদ বশীরুদ্দীন (র.) ছিলেন মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর একজন বিশিষ্ট খলীফা। মাদ্রাসার শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি আলীপুরে কাজীর পদে নিযুক্ত হন। এরপর মুজাদ্দিদে জামান (র.)-এর হাতে বায়াত হয়ে কঠোর রিয়াযত সাধনা করতে থাকেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই খিলাফত প্রাপ্ত হন। কলকাতায় অধ্যয়নকালে তিনি আঞ্জুমান-ই-ইশা'আতে মুজাদ্দিদীয়ার সভাপতি হিসোবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫১ সালে স্থায়ীভাবে ঢাকায় বসবাসের জন্যে কলকাতা ছেড়ে চলে আসেন।

মান অভিমান, হিংসা ক্রোধ তাঁকে কোনোদিন আঁকড়ে ধরতে পারেনি। তিনি নিজেকে সবার খাদেম মনে করতেন। তিনি বলতেন, "আমার নিকট মহান আল্লাহ্‌পাকের যেসব বান্দা আসেন, তারা চলে যাবার পর তাদের পদধুলি হাতে নিয়ে চুমু দেই, এজন্য যে, তারা আল্লাহ্‌কে পাবার আশায় আমার কাছে এসেছিলো। নিশ্চয়ই তাঁরা আল্লাহ্‌র মেহমান, আল্লাহ্‌র ভালোবাসার পাত্র তাঁরা, আমি বিশ্বাস করি তাঁদের খাতিরে আল্লাহ্‌ আমায় ক্ষমা করে দেবেন।"

---

৬০৭. মুফতী আবু জাফর সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০
৬০৮. মহিউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭
৬০৯. আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯

Dhaka University Institutional Repository

তিনি অত্যন্ত শরীফ লোক ছিলেন। কথাবার্তায়, চালচলনে সর্বদা আদব বজায় রাখতেন। এ ব্যাপারে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো যা থেকে পাঠক সমাজ সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন যে, তিনি ছোটখাট বিষয়ে আদব বজায় রাখার প্রতি কিরূপ সচেতন ছিলেন। মাওলানা মুহাম্মদ ফরীদুদ্দীন আত্তার সাহেব বর্ণনা করেন–

একদিন আমি দু'ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে বশীরুদ্দীন (র.)-এর খেদমতে উপস্থিত হই। ঐ দু'ব্যক্তিকে পরিচয় করার উদ্দেশ্যে তাদের উভয়ের মাঝে আত্মীয়তা বুঝতে যেয়ে আমি বলি যে, 'ইনি ওনার শ্যালক।' বশীরুদ্দীন (র.) পরে এক সময় আমাকে কথা বলার আদব শিখিয়ে দিয়ে বললেন, 'এভাবে বলতে নেই। বলতে হয়, ইনি ওনার ছেলে-মেয়ের মামা।'
আরেকবার জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছিলাম, 'তিনি খুব চালু লোক।' বশীরুদ্দীন (র.) এটা শুনে আমাকে বলে দিলেন, 'চালু লোক বলতে নেই। বলতে হয় বুদ্ধিমান লোক।'

আরেক দিনের ঘটনা। তাঁর আচকানের ওপর একটা পোকা হাটছিলো। আমি আরজ করলাম, 'হুযূর! আপনার জামার ওপর একটা পোকা বসে আছে,' তিনি খুশি হলেন। পোকা ঝেড়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন, 'হাত দিয়ে যদি তুমি পোকা ঝেড়ে দিতে, তাতে পুরোপুরি বেয়াদবী না হলেও শারাফতের বিরোধী হতো। আমাকে বলে দিয়ে তুমি হেদায়েত দিয়েছ, এজন্য মহান আল্লাহ্র দরবারে পুরস্কৃত হবে। এরূপ ক্ষেত্রে হাত দরাজী করতে নেই। বরং মুখে বলে দিয়ে সাবধান করা শরীয়তের বিধান।'

অন্য একদিন একসাথে এক মজলিসে খেতে বসেছিলাম। মহল্লার মস্‌জিদের মুয়ায্‌যিনও ছিলো মজলিসে। সে খানা সম্পর্কে নিমন্ত্রণকারীর অগোচরে সমালোচনা করছিলো যে, "খানাতে ঠিকমত নিমক দেয়া হয়নি।" সৈয়দ সাহেব বললেন, মুয়ায্‌যিন সাহেব! আপনার কথায় মনে হয়, আপনি কোনো দিন মেহমানদারী করেননি। নিমন্ত্রণকারী কোনো দিনই মেহমানদের খারাপ খাওয়াতে চায় না। প্রকৃতপক্ষে যার যা কিছমত আল্লাহ্‌পাক নির্ধারণ করেছেন, তার অধিক খাবার ও পাবার সুযোগ নেই। হাজার টাকা যিনি খরচ করতে পারেন, এক টাকার নিমক তিনি যোগাড় করতে পারেননি এমন নয়। নিশ্চয়ই তার ইচ্ছার ত্রুটি ছিলো না। সবই আমাদের কিছমতের মুয়ামালাহ্।

বশীরুদ্দীন (র.)-কে কেউ কিছু হাদীয়া দিলে তিনি তা সাধারণ গরীব ছাত্র ও মিসকীনদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। বাংলা ভাষায় কেউ কোনো দীনি কিতাব প্রকাশ করলে তিনি তা আগ্রহের সাথে কিনে পড়তেন। ভালো লাগলে শত শত কপি কিনে মুহাব্বাতের লোকদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। বিয়ে শাদীতে তিনি নবদম্পতীকে বই উপহার দিতেন। কেউ তাঁকে নতুন কিতাব উপহার দিলে তিনি যতটা খুশি হতেন, হাজার টাকা হাদিয়া পেলেও ততটা খুশি হতেন না।

তিনি সবসময় লেখাপড়ায় ব্যস্ত থাকতেন। জ্ঞানী লোকের কদর করতেন, জ্ঞানী লোকের সোহ্‌বতে যেতে পছন্দ করতেন। অল্প বয়সে তাঁর স্ত্রী ইন্তিকাল করেন। কিন্তু চর্চায় বিঘ্ন ঘটতে পারে, একথা ভেবে তিনি আর ২য় বিবাহ করেননি। জ্ঞান তাপস ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (র.) তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন। তারা উভয়ে গভীর মনোনিবেশ সহকারে সারা দিন রোযা রেখে জ্ঞান চর্চায় লেগে থাকতেন। তাফসীর, হাদীস, ফিক্‌হ, সীরাত, দর্শন, তাসাউফ, ওযীফাহ্-কালাম ইত্যাদি নিয়ে তাঁদের মাঝে ঘন্টার পর ঘন্টা, দিনের পর দিন খুঁটিনাটি আলাপ চলতো। খানা খেতে খেতে, আবার কখনও কখনও গাড়িতে বসেও তিনি জ্ঞান চর্চা করতেন।

বাংলা ভারতের তৎকালীন শীর্ষ স্থানীয় জ্ঞানীগুণীদের মধ্যে তাঁর নামা জানে না এমন ব্যক্তি খুব কমই খুঁজে পাওয়া যাবে। বাংলা সাহিত্য ও বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস চর্চায় তাঁর মতো পারদর্শী ব্যক্তি ইতিহাসে বিরল। ইসলমিক ফাউন্ডেশ, বাংলা একাডেমী, ইতিহাস পরিষদসহ বহু প্রতিষ্ঠানের তিনি আজীবন সদস্য ছিলেন। কোনো ছাত্র পরীক্ষার আগে দোয়ার জন্যে গেলে বলতেন, 'তোমার বাপ-মাকে রাযী করো। তাঁরা তোমাকে দোয়া না করলে আমার দোয়ায় কাজ হবে না। বাপ-মার দোয়ার সাথে আমাদের দোয়া শামীল হলে তবেই তা কবুল ও মনজুর হবে।'

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ছিলেন একজন খাঁটি আশিকে রাসূল (স.)। নবী প্রেমে এতো দেওয়ানাহ ছিলেন যে, হর-হামেশা 'ইশ্‌ক মুহাব্বতের জোশে তাঁর নয়ন যুগল থেকে অশ্রু ঝরতো। আউলিয়া কেরামের জীবন ইতিহাস চর্চার সময়ও মুহাব্বাতের জোসে কেঁদে ফেলতেন। ৬০, হেমেন্দ্র দাস রোড, বাংলাবাজারস্থ খানকায়ে ফুরফুরায় তিনি সাপ্তাহিক তা'লীম দিতেন, মানুষদেরকে দীনের দাওয়াত দিতেন, তাসাউফ ও তরীকতের শিক্ষা দিতেন। চট্টগ্রামের মীরসরাইতে সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী (র.)-এর ইছালে সওয়াব মাহফিলের তিনিই প্রথম উদ্যোক্তা ছিলেন।

৬০ বছর ১০ মাস বয়সে ১৯৭৯ সালের ১৩ই অক্টোবর তিনি ইন্তিকাল করেন।[৬১০]

সূফী সায়েম উদ্দীন

মুজাদ্দিদে জামান (র.)-এর একজন কামিল খলীফা ছিলেন বগুড়া জিলার খঞ্জনপুরের সূফী সায়েম উদ্দীন (র.)। তিনি একাধারে বাংলা, সংস্কৃত, আরবী, উর্দুসহ কয়েকটি ভাষায় বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি বেশ কয়েক বছর পীরের অনুসন্ধানে অতিবাহিত করেন। অবশেষে কয়েকজন উচ্চ শ্রেণীর ওলিউল্লাহ্‌র কাছ থেকে নির্দেশ পান: 'তোমার পীর ফুরফুরায় আছেন, তাঁর কাছে মুরীদ হও।' এরপর মুজাদ্দিদে জামান (র.) বগুড়ায় তাশরীফ আনলে তিনি তাঁর হাতে বায়'আত হন।

তিনি অত্যধিক রিয়াজত সাধনা করতেন। সামান্য মাটির কুঁড়ে ঘরে থাকতেন। নিজ হাতে রান্না করে অতি সাধারণ খাদ্য খেতেন। সম্ভ্রান্ত হিন্দু, মুসলিম, উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারিরা তাঁকে এক নজর দেখার অভিলাসে ঘন্টার পর ঘন্টা তাঁর কুঁড়ে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতো। তিনি বিকেল বেলা একাকী বন-জঙ্গলে প্রবেশ করে নিবিষ্ট চিত্তে সূলতানুল আয্‌কার যিক্‌র করতেন। চারদিকের তৃণলতা, ঘাষপাতা পর্যন্ত তাঁর সাথে যিক্‌র করতো এবং এটা স্পষ্ট শুনা যেতো। তিনি বর্ণনা করেন–
"আমরা কয়েকজন যাকেরীন একদিন ফুরফুরায় উপস্থিত হলাম। ফজরের নামাজের পরে একটুখানি মুরকাবা শিক্ষা দিয়ে মুজাদ্দিদে যামান (র.) বললেন, 'বাবা! তোমরা এদিকে এসো। মাদ্রাসার পুকুরে প্রচুর কচুরিপানা, ময়লা-আবর্জনা ইত্যাদি জমেছে। পরিষ্কার করতে হবে।'

তখন শীতকাল। পুকুরের পানি ছিলো বরফের মত ঠান্ডা। তাই সহজে কেউ অগ্রসর হচ্ছিলো না। কিন্তু হুযূরের হুকুম পাওয়ার সাথে সাথে আমি বরফ-শীতল পুকুরের পানিতে ঝাপ দিয়ে কচুরীপানা পরিষ্কার করতে শুরু করে দিলাম। আমার দেখাদেখি আমার সাথে আরও কয়েকজন পুকুরে নামলেন। কেউ কেউ দাঁড়িয়েই রইলেন। এমন সময় হঠাৎ মুজাদ্দিদে যামান (র.) পুকুরের পাড়ে হাজির হয়ে বললেন, 'বাবা, তোমরা যে ঠান্ডাতে মরে গেলে! তাড়াতাড়ি উঠে এসো।'

হযরতের নির্দেশ পেয়ে আমরা উঠে আসলাম। উঠে এসে দেখি আমার সমস্ত শরীর আল্লাহ্‌র যিক্‌রে কম্পিত হচ্ছে। আমার সারা জিস্‌ম হতে নূর পরিলক্ষিত হচ্ছিলো। সুদীর্ঘ কয়েক বছর রিয়াজত সাধনা করে যে হাল পয়দা হয়নি, পীরের একটি নির্দেশ পালনের বদৌলতে মহান আল্লাহ্‌পাক পীরের খাছ দোয়ার বরকতে তা নসীব করলেন।"[৬১১]

হযরত মাওলানা তোয়াজ উদ্দীন আহমদ

হযরত মাওলানা তোয়াজ উদ্দীন আহমদ (র.) ছিলেন মুজাদ্দিদে যামান হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (র.)-এর একজন খাস খলীফা। 'দ্বারিয়াপুরেরর পীর সাহেব' নামে তিনি পরিচিত ছিলেন।

---

৬১০. ড. এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০
৬১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মাওলানা তোয়াজ উদ্দীন আহমদ (র.) বাংলা ১৩১৬ সনের ৭ অগ্রহায়ন মঙ্গলবার তদানীন্তন যশোর জেলার মাগুরা মহকুমার শ্রীপুর থানার দ্বারিয়পুর গ্রামের এক ঐতিহাসিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এ পরিবারের পূর্বপুরুষ সৈয়দ সাবির, সানাউল্লাহ গাজী প্রমুখ বিশিষ্ট আল্লাহ্‌র ওলীদের কথা মানুষের মুখে মুখে ফেরে। তবে পিতা মিনহাজ উদ্দীন আহমদ একজর উঁচু দরের প্রভাবশালী বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁর মাতা জামিউন্নেসাও ছিলেন একজন পরহেজগার মহিলা। তিনি ছোটকাল থেকেই খুব বিনয়ী ও লাজুক প্রকৃতির ছিলেন। তখন থেকে নির্জনতাকে ভালোবাসতেন। প্রথমে ইংরেজি স্কুলে পড়াশোনা করেন। দশম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে তাঁর মধ্যে ভীষণ ভাবান্তর ঘটে। তিনি আল্লাহ্‌কে পাবার জন্য উদগ্রীব হয়ে যান। তাঁর পিতা পুত্রের এ ভাবান্তর লক্ষ্য করে তাঁকে তদান্তিন ভারতের শ্রষ্ঠ পীর মুজাদ্দিদে জামান হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (র.)-এর কাছে ফুরফুরা পাঠান। ফুরফুরার হুযূর তাঁকে দীনি শিক্ষা গ্রহণের নির্দেশ দেন। সে মতে তিনি দীনি 'ইল্‌মের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন।

পীরের খিদমতে তিনি দীর্ঘকাল থেকে 'ইল্‌মে তাসাউফের সবক গ্রহণ করে বিলায়াতের উচ্চ মাকামে অত্যন্ত সফলতার সংগে উন্নীত হন। তাঁর পীর তাঁকে খিলাফত নামা দিয়ে দেশে পাঠাবার সময় বলেন, 'বাবা, তুমি দেশে যেয়ে আল্লাহ্‌র চাকুরি করো গিয়ে। তোমার দ্বারা বৃহত্তর অঞ্চলের মানুষ দীনের আলো পাবে।

দেশে ফিরে তিনি গোমরাহীর অন্ধকারে নিমজ্জিত দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার বৃহত্তর এলাকার মানুষকে হিদায়েতের আলোয় উদ্ভাসিত করেন। দলে দলে লোক তাঁর কাছে মুরীদ হয়ে সত্য-সুন্দর পথের সন্ধান লাভ করে। ঐ অঞ্চলের মানুষ তখন বে-শর'আ ফকীরদের খপ্পরে পথভ্রষ্ট হয়েছিলো। এরা ন্যাড়ার ফকীর বিদ'আতী ফকীর বলে পরিচিত ছিলো। তারা শিরক ও বিদ'আতের বিষবাষ্প ছড়িয়ে সমাজটাকে কুসংস্কারের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিলো। মাওলানা তোয়াজ উদ্দীন আহমদ (র.) এদের বিরুদ্ধে এক বিপ্লবী মোর্চা গড়ে তোলেন। অনেক বেদ'আতী ফকীর, বে-শর'আ তথা ন্যাড়ার ফকীর তাঁর সংস্পর্শে এসে সত্যিকার ইসলামের আস্বাদন লাভ করে এবং তাঁর কাছে মুরীদ হয়। তিনি সকল মানুষকে সমানভাবে ভালোবাসতেন। তাঁর অসংখ্য হিন্দু ভক্তও ছিলো। তিনি বুঝেছিলেন শিক্ষিত সমাজ গড়তে না পারলে কুসংস্কার দূর হবে না। তাই তিনি তাঁর মুরীদানদের সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষা গ্রহণের জোর তাকীদ দিতেন। ফলে তাঁর মুরীদদের অনেকেই উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আজও দেশে-বিদেশে আনেক দায়িত্ব পালন করছে। তাঁরই দোয়ায় ও প্রেরণায় এলাকায় বেশকিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সামাজ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতা ও অনুদানে দ্বারিয়াপুরে একটি হাসপাতালও প্রতিষ্ঠিত হয়।

তিনি ছিলেন উঁচু স্তরের পরহেজগার ও আল্লাহ্‌র ওলী। তিনি সন্দেহযুক্ত মুবাহকেও বর্জন করতেন। 'ইল্‌মে তাসাউফের শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে খানকাহ্ স্থাপন করেন। দ্বারিয়াপুরে তাঁর পীরের নির্দেশে তিনি প্রতি বছর ৪ঠা মাঘ ইসালে সওয়াব ও ওয়াজ মাহফিল কায়েম করেন। ঢাকায় ২৭ নভেম্বর ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে সিদ্ধেশ্বরী রোডে খানকাহ্ স্থাপন করেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় এবং ভারত, পাকিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে তাঁর অসংখ্য মুরীদ রয়েছে।

এ মহৎপ্রাণ আল্লাহ্‌র ওলি ১৯৯২ খ্রীস্টাব্দের ১৬ জুন মঙ্গলবার অসুস্থ অবস্থায় দ্বারিয়াপুর থেকে এম্বুলেন্সযোগে ঢাকার পথে মানিকগঞ্জের নিকট ইন্তিকাল করেন। দ্বারিয়াপুরে তাঁর কবর বিদ্যমান।[৬১২]

হযরত নওয়াব আলী

মুজাদ্দিদে জামান আবু বকর সিদ্দিকী (র.)-এর খলীফা হযরত হাজী নওয়াব আলী (র.) পাবনা জিলার চাট মোহর উপজেলার ফৈলজানা ইউনিয়নের জগন্নাথপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 'হাদলের পীর সাহেব' নামে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি গান বাদ্য, খেলাধুলা, জাকজমক পছন্দ করতেন না। হাদল মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা ও কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর মুজাদ্দিদে যামান (র.)-এর হাতে বাই'আত হয়ে কঠোর রিয়াযত সাধনায় লিপ্ত হন এবং পরে খেলাফত প্রাপ্ত হন।

৬১২. এ. কে. এম. আমজাদ আলী এনায়েতপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮-১৪৯

Dhaka University Institutional Repository

মুজাদ্দিদে যামান (র.) এক জলসায় হাদলের পীর সাহেবের দুই বগলের নীচে হাত দিয়ে চাপ দিয়ে ধরে খাছভাবে দোয়া করেছিলেন। এ দু'আর বরকতেই তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে গিয়েছিলো। তিনি সুদীর্ঘ ২৩ বছর যাবত হাদল মাদ্রাসায় সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে গিয়েছিলেন। মাদ্রাসার উন্নতির জন্য তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করতেন। কোনো কোনো দিন এমনও ঘটেছে যে, বিভিন্ন জায়গা থেকে মাদ্রাসার জন্য সংগৃহীত দানের মালপত্রের বোঝা তিনি মজুরের মত নিজে মাথায় বহন করে এনেছেন। ঝড় বৃষ্টি আর রাতের অন্ধকারকে উপেক্ষা করে তিনি মাদ্রাসার উন্নতি কল্পে পাগল পারা হয়ে এদিক সেদিক ছুটতেন।

একদিনের ঘটনা। পদ্মা নদীর ওপাড়ে গেলেন মাদ্রাসার জন্য কিছু কালেকশন করার করতে। কালেকশনের কাজ শেষ হলে ভেড়ামারা রেলষ্টেশনে পৌঁছে দেখেন সিরাজগঞ্জগামী ট্রেনটি ছেড়ে চলে গেছে। সেখান থেকে হাদলের দূরত্ব ছিল ৩২ মাইল। মাদ্রাসায় জরুরী কাজ থাকায় বেশি দেরি করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলো না। অগত্যা হাঁটা শুরু করলেন। তখন রমজান মাস চলছিলো। রোজা মুখে হাঁটা যে কত কষ্টকর তা বলাই বাহুল্য। এদিকে হার্ডিঞ্জ ব্রীজের ওপর আসতেই ইফতারের ওয়াক্ত হয়ে গেলো। তাঁর কাছে একটি কাগজী লেবু ছাড়া ইফতার করার মতো আর কিছুই ছিলো না। তিনি ঐ লেবু দিয়েই ইফতারের কাজ শেষ করলেন। বাদ মাগরিব আবার হাঁটা শুরু করলেন। সুদীর্ঘ ৩২ মাইল পথ হেঁটে হাদলে পৌঁছতে গভীর রাত হয়ে গেলো।
এ মহান সাধক ১৩৯৫ বাংলা সনের ২৭ শে মাঘ ইন্তিকাল করেন।[৬১৩]

সূফী আবুল বারাকাত

হযরত সূফী মোহাম্মদ আবুল বারাকাত (র.) হযরত আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.)-এর খলীফা ছিলেন। ১৯১৮ সালে রাজগঞ্জের আলাদিনগর গ্রামের বিখ্যাত ফারায়েজি পরিবারে শবে বরাতের রাতে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা মোহাম্মদ আসলাম ফরায়েজি (র.) ছিলেন আল্লাহ্‌র অতি নেকবখত বান্দা। পিতার সাহচর্যে শিশুকাল থেকেই শাহ সাহেব আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম ভালোবাসা অর্জন করেন। বিভিন্ন কিতাবপত্র পাঠ করে এবং 'আলিম 'ওলামার সাহচর্যে গিয়ে দীন শরীয়তের বিভিন্ন দিকে তিনি বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করতে থাকেন এবং পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্‌র অনুশাসনে আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত বন্দেগীতে মশগুল থাকতেই পছন্দ করতেন বেশি। ১৯৩৬ সালে সূফী মোহাম্মদ আবুল বারাকাত কলকাতা যান। মোহিনী মিলে চাকরীকালে শ্রমিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন এবং বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

রাত জেগে ইবাদাত করার বিশেষ আনন্দ ছিলো তাঁর। এ সময় তিনি হযরত খিজির (আ.)-এর সাক্ষাত লাভ করেন। হযরত খিজির (আ.) তাঁকে দীনের পথে পরিপূর্ণ আত্মনিয়োগের নির্দেশ দেন। এরপর থেকেই তাঁর মনে পরিবর্তন আসে। দেশের বাড়ী নোয়াখালী ফিরে চল্লিশের দশকে তিনি তদানিন্তন ফুরফুরার বিশিষ্ট খলীফা আলাদিনগরের সূফী মোহাম্মদ অলি উল্লাহ (র.)-এর হাতে বাই'আত হন। আল্লাহ্‌র প্রেমে তিনি এমন বেকারার হয়ে গেলেন যে, মজ্জবী হালাতে হযরত শাহ সাহেব সিলেট কালিঙ্গা পাহাড়ের জঙ্গলে জঙ্গলে সাত বছর কাটিয়ে দেন। নিজের নফ্‌সকে জয় করার কঠোর সাধনায় রতো ছিলেন তিনি এ সময়। কালিঙ্গা পাহাড় থেকে আবার তিনি দেশে ফিরে পীরের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেন। পীরের নির্দেশে তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে দীনি কাজে ব্যাপৃত থাকেন। তাঁর মাধ্যমে বহুলোক শরীয়ত বিরোধী ও বিদ'আত কাজ ছেড়ে আল্লাহ্‌র দীনে দাখিল হন। এদের অধিকাংশ ছিলেন ইংরেজী শিক্ষিত। মরহুম স্পীকার আবদুল মালেক উকিল তাঁর মুরীদ ছিলেন।

মোহাম্মদ আবুল বারাকাত (র.) ফুরফুরার হযরত অবু নসর মুহাম্মদ আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.)-এর খিদমতে চলে গেলেন ১৯৬৫ সালে। প্রায় পাঁচ বছর ফুরফুরায় একাধারে খিদমত করে সূফী মোহাম্মদ আবুল বারাকাত তাসাউফের সবক সমাপ্ত করেন এবং খিলাফত প্রাপ্ত হন। পীর তাঁকে নির্দেশ দেন– "বাবা আপনি এখন দেশে ফিরে যান, বেশ কিছু লোক আপনার ওছিলায় আল্লাহ্‌র দীনে দাখিল হবে।" এ নির্দেশ পেয়ে তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং বিভিন্ন স্থানে খানকাহ্ স্থাপন করে আমৃত্যু লোকদেরকে দীনের দাওয়াত দিতে থাকেন।

৬১৩. মোঃ আতাউর রহমান কামালী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১

Dhaka University Institutional Repository

এক ঘর-ভিটা ছাড়া শাহ সাহেবের আর কোনো সম্পদ ছিলো না। সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র ওপর তাওয়াক্কুল করে তিনি চলতেন। কারো কাছে তিনি কখনো কিছু চাইতেন না। শাহ সাহেব তার দীনি মিশনে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঞ্চলে অঞ্চলেই শুধু নয়, ভারত পাকিস্তান এবং সুদূর সউদী আরবও গিয়েছেন। মানুষের মধ্যে বিশেষ করে মুসলমানদের মধ্যে ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ তাঁকে পীড়া দিতো। তিনি চাইতেন মানুষ আল্লাহ্‌র নবী (স.)-এর তরীকা অবলম্বন করুক। তিনি বলতেন, "নবী করীম (স.)-এর জাহিরী বাতিনী সুন্নাত অবলম্বন ছাড়া মানুষের মুক্তি কিংবা শান্তির আর কোনো পথ নেই।" মানুষ এবং প্রাণীকূল তাঁকে যেমন ভালোবাসতো ও সম্মান করতো তিনিও তেমনি তাদের ভালোবাভতেন। মানুষের ইহ ও পারলৌকিক মঙ্গল কামনায় তিনি ছিলেন সদা তৎপর। বিশেষ করে ইংরেজী শিক্ষিত সমাজ ও আলমরা তাঁর প্রতি ঝুঁকে পড়েছিলেন বেশি। হাজার হাজার লোক তাঁর হাতে হাত দিয়ে তওবা করে ধন্য হয়ে যায়। তাঁর নীতি ছিল, 'পীরের নকশায়ে কদম' চলতে না পারলে মুরীদ হওয়ার দরকার নেই। সংসার বিরাগী হওয়া তিনি পছন্দ করতেন না। শাহ সাহেব বলতেন, "সংসারের প্রতি কাজকেই আল্লাহ্‌র ইবাদতের সামিল করে নেয়া যায়। নিয়ত করে হালাল রোজগারের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র আমানত এ দেহটাকে বাঁচিয়ে রাখাও ইবাদাত।

১৯৮৮ সালের ৫ই জুলাই শাহ সাহেব রাজগঞ্জে ইন্তিকাল করেন। লাকসামের দক্ষিণে খিলা রেল স্টেশনের উত্তরে বারাকাতবাগ দরবার শরীফে তাঁর কবর বিদ্যমান।[৬১৪]

মুন্সী শাহাদাত হেসেন

আড়ুয়াকান্দির মরহুম মুন্সী শাহাদাত হোসেন (র.) হযরত বড় হুযূর আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.)-এর খাছ মুরীদ ছিলেন। তিনি ছিলেন জমিয়তুল মুসলিমীন হিযবুল্লাহ্‌র সাবেক ভারপ্রাপ্ত পরিচালক জনাব মাওলানা আবুল বাশার জিহাদী সাহেবের পিতা। 'আড়ুয়াকান্দির মুন্সীজী' নামে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। মুন্সীজী (র.)-এর জীবনের কয়েকটি স্মরনীয় ঘটনা এখানে তুলে ধরা হলো।

একবার তাঁর ভীষণ বিপদ এসে উপস্থিত হলো। শত্রুতাবশত তাঁর বিরুদ্ধে ৭/৮টি মামলা দায়ের করা হয়েছিলো। গ্রামের সবাই তাঁর বিপক্ষে ছিলো। এমন অবস্থার সৃষ্টি হলো যে, মনে করলেন তাঁকে গ্রাম থেকে চলে যেতে হবে। তাঁর ওপর যখন এমনই বিপদ, তখন একদিন শুনতে পেলেন, যশোরের ছাতিয়ান তলায় বড় হুযূর (র.)-এর জলসা হতে যাচ্ছে। তিনি উক্ত জলসায় গিয়ে হাজির হলেন। মুজাদ্দিদে জামান (র.)-এর খলীফা মাগুড়ার হাজী আবদুল হামিদ (র.) ও মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন। মাগুরার হুযূর তাঁর বিপদের কথা জানতে পেরে বললেন, মুন্সীজী, হুযূরের কাছে আপনার বিপদের কথাটা একবার বলুন না।' তিনি বললেন, আমি পীর ধরেছি আল্লাহ্ পাবার জন্যে। দুনিয়ার কথা পীরের কাছে বললে আমি আল্লাহ্ পাবো না। সুতরাং আমি আমার বিপদের কথা হুযূরের কাছে বলতে পারবো না।' মাগুড়ার হুযূর বার বার আমাকে নানাভাবে বুঝাতে লাগলেন। কিন্তু আমি দুনিয়ার কথা পীরের কাছে বলতে কিছুতেই রাজি হচ্ছিলাম না। পরিশেষে ওঁনার পিড়াপিড়িতে টিকতে না পেরে রাজি হলাম।

তাকরীর শেষে হুযূর হুজরায় ঢুকলেন। কিছুক্ষণ পর আমিও হুযূরকে আমার বিপদের কথা বলার জন্যে হুজরায় গেলাম। হুযূর শুয়ে ছিলেন। বহু লোক তাঁকে ঘিরে ছিলো। আমি হুযূরের পায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। সাথে সাথে হুযূর অন্যদের দিক হতে চোখ ফিরিয়ে আমার দিকে চাইলেন। প্রায় আধা ঘন্টা তিনি আমার দিকে চেয়ে রইলেন। কিন্তু আমি কিছুতেই পীরের কাছে দুনিয়ার কথা–বিপদের কথা বলতে পারলাম না। আমি আল্লাহ্ পাবার জন্যে পীর ধরেছি, তাঁর কাছে দুনিয়ার কথা বললে যদি আল্লাহ্ না পাই। এ ভয়ে দুনিয়ার বিপদের কথা না বলেই আমি হুজরা থেকে বেরিয়ে এলাম। মাগুড়ার হুযূর আমাকে দেখেই বললেন, 'কিগো বিপদের কথা বলেছেন?' আমি বললাম, 'না হুযূর, দুনিয়ার কথা আমি পীরের কাছে বলতে পারবো না।'

মুন্সীজী (র.)-এর বারো বছর বয়স্ক এক ছেলে ইন্তিকাল করলো। ছেলের শোকে মুন্সীজী (র.) অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এ সময় একদিন শুনতে পেলেন যে, বড় হুযূর এবং ন'হুযূর ঝিনাইদহে তাশরীফ আনবেন। পীরের

৬১৪. গোলাম মোর্তাজা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭-৭০

Dhaka University Institutional Repository

আগমন সংবাদ পেয়ে পীরের পাগল মুন্সীজী খুশিতে বাগ বাগ হয়ে গেলেন। জলসার দিন তিনি দু'জনকে বললেন, 'আমাকে একটু বড় রাস্তায় উঠিয়ে দিয়ে এসো। সেখান থেকে বাসে জলসায় যাবো।' মন্সীজী হাঁটতে পারছিলেন না। লোক দু'জনের কাঁধে ভর করে তিনি বড় রাস্তা পর্যন্ত গেলেন। তারপর বাসের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। ৩টা বেজে গেল। তবু বাসের দেখা পেলেন না। সঙ্গী দু'জনকে তখন বললেন, 'তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও। আমি হেঁটেই পীরের জলসায় যাবো।' তাঁকে ছেড়ে দিতেই তিনি এমনভাবে হাঁটা শুরু করলেন যে, সঙ্গী দু'জন দৌড়েও তাঁর সাথে পারছিল না। যে অসুস্থ মানুষটি ঠিকমত হাঁটতেও পারছিলেন না, তাঁর এমন হাঁটা দেখে সঙ্গীরা হতবাগ হয়ে গেলো। জলসায় পৌঁছে ন'হুযূরের খিদমতে উপস্থিত হলে, হুযূর তাঁকে দেখেই বলে ওঠলেন, 'কে, মুন্সীজী এসেছেন?' মুন্সীজী চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। ২/৩ দিন আগে যে তাঁর ছেলে মারা গেছে, সে সম্পর্কে পীরের কাছে কিছুই বললেন না। পীর ধরেছেন আল্লাহ্ পাবার জন্যে ছেলের মুত্যুর কথা পীরকে জানালে যদি আল্লাহ্ না পান, এ ছিলো তাঁর ভয়।

মুন্সী শাহাদাত (র.) প্রথম বিয়ে করেছিলেন এক জমিদারের মেয়েকে। কিন্তু বিয়ের কয়েক বছর পরই তাঁর স্ত্রী ইন্তিকাল করেন। তখন তিনি তাঁর বৃদ্ধা মাকে নিয়ে একাই গ্রামের বাড়ীতে দিন যপন করতে লাগলেন। কিছুদিন যেতে না যেতেই তাঁর মা ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সারাদিন রাত শুধু পায়খানা হতে লাগলো। তিনি মায়ের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। মা হেঁটে বাইরে পায়খানায় যেতে পারতেন না। তিনি অনেকগুলো ছালার চটের ব্যবস্থা করলেন। তাঁর মা বিছানায় চটের ওপর পায়খানা করতেন। একটি চট নষ্ট হলে সেটি সরিয়ে আরেকটি বিছিয়ে দিতেন। নোংড়া চটটি নিজ হাতে ধুয়ে পরিষ্কার করতেন। তারপর রোদে শুকিয়ে ব্যবহারোপযোগী করে পুনরায় বিছানায় বিছিয়ে দিতেন। কাজের লোক না থাকায় নিজ হাতে রান্না করে নিজে খেতেন এবং মাকে খাওয়াতেন। একদিনের ঘটনা। তিনি মাকে ধরে বসানোর সময় মা একটু ব্যথা পেলেন এবং 'উহ' শব্দ করে ওঠলেন। কুর'আনের আয়াতের কথা স্মরণ করে মুন্সীজী ভয়ে অস্থির হয়ে গেলেন। সারা জীবনেও তিনি এ কথা ভুলতে পারেননি। এমনকি মা মাফ করেন কি না এ ভয়ে তিনি বড় হুযূরকে এগারো বার মায়ের কবরের পাশে নিয়ে মার জন্য দু'আ করিয়েছিলেন। তাঁর মাতৃভক্তির দৃষ্টান্ত বর্তমান জামানায় সত্যিই বিরল।[৬১৫]

হযরত শাহ ফতেহ আলী ওয়সী

হযরত সূফী ফতেহ আলী ওয়সী (র.) ছিলেন মুজাদ্দিদে যামান হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (র.)-এর পীর এবং চট্টগ্রামের প্রখ্যাত ওলী সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী (র.)-এর খলীফা। তিনি ১৮২৫ খ্রীস্টব্দে চট্টগ্রাম জিলার ইসলামাবাদের সাতকানিয়া থানার আমীরাবাদের সৈয়দ মহল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হযরত মাওলানা সৈয়দ ওয়ারেস আলী (র.) ১৮৩১ সালের মে মাসে মুজাহিদে আজম হযরত সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী (র.)-এর নেতৃত্বে ঐতিহাসিক বালাকোট যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ইংরেজ সৈন্যদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে উভয়ে তথায় শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন। তখন তিনি মাত্র কয়েক বছরের শিশু।

ত্রয়োদশ বছরের বালক সৈয়দ ফতেহ আলী (র.) তাঁর মাতা পূণ্যবতী সৈয়দা খাতুনকে সাথে নিয়ে পবিত্র হজ্জে বায়তুল্লাহ্‌র পথে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে তাঁর আম্মাজান ইন্তিকাল করায় তিনি ইয়াতীম হয়ে যান। সংসারের বন্ধনহীন অবস্থায় হজ্জের পথ ছেড়ে অজানার পথে চলতে চলতে মাওলানা মুহাম্মদ রাশেদ (র.)-এর সাথে ফুরফুরায় উপস্থিত হন। মাওলানা রাশেদ (র.) ফুরফুরার বেলপাড়ায় বসবাস করতেন। সে সময় ফুরফুরায় 'দহলজী মাকতাবের ব্যবস্থা ছিলো।' তথায় কিছুদিন তা'লীম হাসিল করে তাঁরা উভয়ে হুগলী জেলার ধসা গ্রামে 'পানাহউল্লাহ মাদ্রাসায়' পড়তে থাকেন। তৎকালীন 'ধসা পানাউল্লাহ মাদ্রাসার' যথেষ্ঠ সুনাম ছিলো। উক্ত মাদ্রাসা থেকে তিনি আরবী ও ফার্সী ভাষায় যথেষ্ঠ বুৎপত্তি লাভ করেন।[৬১৬]

প্রথম জীবনে সূফী ফতেহ আলী ওয়সী (র.) কিছুদিন কলকাতা হাইকোর্টের ফার্ম বিভাগের কর্মকর্তা ছিলেন। পরে নওয়াব শাহ ওয়াজেদ আলী সাহেবের (মেটিয়াব্রুজ) প্রাইভেট সেক্রেটারী ও পলিটিক্যাল পেনশন অফিসের সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে চাকরী করেন। পরবর্তীতে তিনি চাকরী ছেড়ে দিয়ে নিজ এলাকা সাতকানিয়ায় খানকাহ্ ও

---

৬১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১-৮৩
৬১৬. মোহম্মদ রুহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩

Dhaka University Institutional Repository

মস্‌জিদ নির্মাণ করে ইসলামের সুমহান বানী মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেন। সেখানে বহু লোক তাঁর মুরীদ হন এবং যবতীয় অন্যায়, অনাচার বর্জন করে মহান আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভে ধন্য হন।

কলকাতার শেখ খোদাবক্‌শ দোকানদার থেকে ‘আল্লামা রুহুল আমীন (র.) বলেন, হযরত সূফী সাহেবর জনৈক মুরীদ তাঁকে বলতে থাকে, হুযূর! আমি এত পরিশ্রম করি, কিন্তু আমার ‘কল্‌ব’ জারি হচ্ছে না। তিনি বলেন, তুমি কি কোনো সুদখোরের জিয়াফত খেয়ে থাকো? সে ব্যক্তি বললো, হ্যাঁ, আমার জামাই সুদখোর, তার দাওয়াত খেয়ে থাকি। তিনি বলেন, এ জন্যই তোমার কল্‌ব জারি হচ্ছে না। অতঃপর তিনি তাকে লক্ষ্য করে বলেন, ‘তুমি এ বিছানার দিকে লক্ষ্য কর। উক্ত বিছানাটি তখন বিকম্পিত হতে থাকে। সূফী সাহেব বলেন, বিছানা আল্লাহ্‌ তা‘আলার নামের ফয়েজে বিকম্পিত হচ্ছে, কিন্তু হারাম ভক্ষণে তোমার হৃদয় এমন কুলুষিত যে, কম্পিত হলো না।’

খুলনা জেলার শোলপুর যুগিহাটী গ্রামের মরহুম মৌলভী সায়েম থেকে ‘আল্লামা রুহুল আমীন (র.) লিখেন, একদিন মাগরিবের নামাজের পর এক মস্‌জিদে আলো জ্বালানো ছিলো না। এ অন্ধকারের মধ্যে তালেবকে কে যেনো চপেটাঘাত করে। পাশের লোকটি মেরেছে ধারণায় তা‘লীমের শেষে সূফী সাহেবের খেদমতে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে; কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি অস্বীকার করতে থকে। হযরত সূফী সাহেব ইরশাদ করেন, একটি জ্বিন আমার কাছে তা‘লীম গ্রহণ করছিলো, আর তুমি তার শরীরে পা রেখেছিলে, এ জন্য সে জ্বিনটি রেগে চপেটাঘাত করেছে। হযরত সূফী ওয়সী সাহেবের বহু সহস্র জ্বিন মুরীদ ছিলো। কেউ জ্বিনগ্রস্থ রোগীর জন্য তাঁর কাছে উপস্থিত হলে তিনি বলতেন, আমার ছালাম তাকে বলে দাও, এতেই জ্বিন একেবারে চলে যেতো।

মাওলানা রুহুল আমীন (র.) আরও লিখেন যে, আরবী ও ফার্সী ভাষায় সূফী সাহেবের পান্ডিত্য অসীম ছিল। তিনি ‘দিওয়ানে ওয়সী’ নামে যে কিতাবখানা ফার্সী ভাষায় লিখেছেন, তা থেকেই তাঁর আরবী ও ফার্সী ভাষায় মহাযোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। এর প্রত্যেক ছত্রে ছত্রে যেরূপ প্রেম ও মহব্বাতের ফল্গুধারা উৎসারিত হয়েছে তা থেকেই তাঁর আল্লাহ্‌ ও রাসূলের মস্ত প্রেমিক হওয়া বুঝা যায়। হিন্দুস্তানে ‘দিওয়ান ওয়সীকে’ দিওয়ানে বাঙ্গালা নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। নবাব সিদ্দিকী হাসান ভূপালি সাহেব ‘শাময়ে আঞ্জুমান’ নামক কিতাবে তাঁকে শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে গণ্য করেছেন।

হযরত সূফী ফতেহ আলী ওয়সী (র.) মুর্শিদাবাদ জেলার পুনাশীতে বসবাস এখতিয়ার করেন। খাড়েয়া গ্রামের মুহতারিমা ফাতিমা খাতুনের সাথে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয়। শ্বশুরের উক্ত কন্যা ব্যতীত অন্য ছেলে মেয়ে ছিলো না। তাঁর স্ত্রীর নানার বাড়ী পুনাশীতে উভয়েই বসবাস করতেন।

হযরত ফতেহ আলী (র.)-এর একমাত্র মেয়ে বানু জোহরা খাতুন (র.) একজন মস্তবড় ওলী ছিলেন, ফুরফুরার পীর মুজাদ্দিদে জামান তাঁকে ‘বাংলার রাবেয়া বসরী’ বলে অভিহিত করতেন। তাঁর অসংখ্য কারামত বিদ্যমান। মুজাদ্দিদে জামান (র.) তাঁর মুরীদদের অনেককে জোহরা খাতুন (র.)-এর কাছে পাঠাতেন উচ্চ মার্গের তা‘লীম হাসিলের জন্য।

সূফী ফতেহ আলী ওয়সী (র.) তদীয় অন্যতম প্রধান খলীফা ফুরফুরার পীর মুজাদ্দিদে জামান (র.)-এর কোলে মাথা রেখে ৬ ডিসেম্বর’১৮৮৬ সালে, রবিবার বিকাল ৪টায় ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁকে কলকাতার মানিকতলায় ২৪/১ মুনশীপাড়া লেনে দিল্লীওয়ালাদের কবরস্থানে দাফন করা হয়।[৬১৭]

৬১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫-১০৮

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

পাক-ভারত, বাংলাদেশ উপমহাদেশের ইতিহাস অনেক পুরানো। এ উপমহাদেশের বহু মনীষীর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় মানব কল্যাণ ও ইসলামের প্রচার-প্রসারের কাজ চলে আসছে। প্রথিবীর এ অঞ্চলে মূলত মনীষীগণের ব্যক্তিগত দাওয়াতের ফলেই ইসলাম বিস্তার লাভ করেছে। আজ বাংলাদেশে যা কিছু ইসলামী কার্যক্রম জারি রয়েছে তা সবই দেশী-বিদেশী দীন ও সমাজ সংস্কারকগণের চেষ্টারই ফসল।

বাংলাদেশে যে সূফী-সাধক দীন প্রচার-প্রসার ও মানব কল্যাণের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ভারতের জৈনপুর ও ফুরফুরার মনীষীবৃন্দের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দীনী চেতনা ও চারিত্রিক মূল্যবোধ অবক্ষয়ের বর্তমান পর্যায়ে আমাদের সে সব পূর্বসূরিদের কর্মকান্ড আলোচনা আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দেবে। এতে করে মুসলিম উম্মাহ তাদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারে খানিকটা হলেও উদ্বুদ্ধ হতে পারে।

ইতিহাস থেকে যতদূর জানা যায়, বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ঘটে সপ্তম শতাব্দীতে আরব বণিকদের মাধ্যমে চট্টগ্রাম অঞ্চলে। একথা অনস্বীকার্য যে, রাষ্ট্রশক্তির সমর্থনে ইসলামের বিস্তার ঘটার আগেই ব্যবসায়ী, সূফী-দরবেশ ও ধর্মপ্রচারকদের মাধ্যমে এদেশের জনগণ ইসলামের সুমহান আদর্শের সাথে পরিচিত হয়। কালে কালে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্নভাবে ইসলাম এদেশের আনাচে-কানাচে বিস্তার লাভ করে এবং ইসলাম ধর্ম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ধর্মে পরিণত হয়। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ইসলাম এদেশের জনগণের ধর্মবিশ্বাসের পরিবর্তনই শুধু ঘটায়নি– জাতি হিসেবে স্বতন্ত্র সত্তা যোগ করেছে। অন্য কথায় ইসলাম এদেশের জনজীবনের সকল ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে একটি অভূতপূর্ব সামাজিক বিপ্লবকেই বাস্তবায়িত করেছে। আলোচ্য গবেষণায় সে বিষয়টিকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে একটি বিষয়ও আলোচনাসাপেক্ষ। তা হচ্ছে, ইসলামের ইতিহাস আর মুসলিমদের ইতিহাস আসলে এক কথা নয়। মুসলিমদের একটা রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস থাকতে পারে। সেটা ঠিক ইসলামের ইতিহাস নয়। ইসলাম একটি দেশের ও একটি জনগোষ্ঠির সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে কী প্রভাব বিস্তার করেছে, তাদের জীবনধারাকে কতদূর আল্লাহ্র আনুগত্যের পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে এবং দেশের অন্যান্য মতবাদ, আদর্শ ও ধর্মের সাথে তার সংঘাত কোন্ পর্যায়ে চলেছে–এ সবের বিবরণই ইসলামের ইতিহাস।

এ গবেষণায় বাংলাদেশে ইসলামের ইতিহাসের এ দিকটির সামান্য আভাস দেয়া হয়েছে মাত্র। ইসলাম একটি আলো ও জ্যোতি। যেখানে অন্ধকার ইসলামের আলো সেখানেই প্রবেশ করে। ইসলাম একটি 'আদল, ইনসাফ, ন্যায়নীতি ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থা। যেখানে যুল্‌ম, শোষণ, অন্যায় ও অত্যাচারে মানুষের জীবন ও পরিবেশ জর্জরিত সেখানে ইসলামের আগমন হয় শান্তি, মৈত্রী, সাম্য ও ইনসাফের বাণী নিয়ে। বাংলাদেশেও অন্ধকার, যুল্‌ম ও শোষণের এমন এক পর্যায়ে ইসলামের আগমন হয় যখন এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠি বর্ণবাদী, জাত্যাভিমানী, 'আলিম ও শোষক রাজা, সামন্ত ও বিভিন্ন শ্রেণীর শাসকগোষ্ঠির সীমাহীন অত্যাচারে মানবেতর জীবন যাপন করছিলো, যখন আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ আল্লাহ্কে ভুলে গিয়ে মুর্তিপূজা ও প্রকৃতি পূজার অতলস্পর্শী অন্ধকারে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলো। ইসলাম এ দেশের মানুষকে স্বরূপে আত্মপ্রকাশ ও অত্মপ্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছে। বাংলার ইতিহাসে ইসলামের ভূমিকা তাই মানুষের দেহে প্রাণের মতো। বাংলাদেশে ইসলামের এ বিশিষ্ট ভূমিকাই আমার এ গবেষণার মূল লক্ষ্য।

Dhaka University Institutional Repository

এ জন্যে এ গবেষণার প্রথম দিকে ইসলামের আগমন-পূর্বকালীন ঘটনাবলীর ওপর কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে। যুগে যুগে এবং দেশে দেশে মানব জাতিকে আল্লাহ্‌র দেয়া সত্য-সহজ-সরল জীবন বিধান থেকে বাংলাদেশের মানুষ কতদূরে সরে গিয়েছিলো এ আলোচনা থেকে তা অনুমান করা যাবে। ধর্মরাজ্যে এখানে চরম অনাচার ও পাপাচার স্থায়ী আস্তানা গেড়েছিলো। ধর্ম ও দেশ শাসনের নামে মানুষের ওপর মানুষ যে যুল্‌ম ও নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছিলো এবং দেশের বৃহত্তম মানবগোষ্ঠিকে যেভাবে একদল উচ্চবর্ণের মানুষ নিজেদের সেবাদাস ও নিকৃষ্ট ধরনের জীবে পরিণত করেছিল, ইসলামের আগমন না ঘটলে তাদের উদ্ধারে আর কোনো উপায়ই ছিলো না।

ইসলাম মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরিব্যপ্ত এমন এক কল্যাণময় বিধান যা সৎ ও সত্যানুসন্ধানী জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। এ কারণেই ইসলামকে বলা হয় পরিপূর্ণ জীবন-বিধান। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আমরা যে দায়িত্বেই নিয়োজিত থাকি না কেনো, প্রকৃত মুসলিমের জীবন কখনই ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। আমাদের মধ্যে যাঁরা ইসলামের প্রচার-প্রসার তথা জনগণকে দীনের রাস্তার হিদায়াতের কাজে ব্যাপৃত থাকেন, তাঁরাও কম-বেশি ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিদ্যমান সংকট বা অবক্ষয়ের মুকাবিলা থেকে দূরে থাকতে পারেন না। এটা ইসলামেরই অন্তর্নিহিত শিক্ষা। ইসলামের সূচনাকাল থেকে শুরু করে অদ্যাবধি এ কারণেই ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ তথা উলামা-মাশায়েখ দীনের প্রচার-প্রসারের পাশাপাশি অন্যান্য সংকট-সমস্যার মত রাজনৈতিক সংকট ও ঝড়-ঝঞ্ঝার মুহূর্তেও জাতির পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

সোয়া সাতশত বছরের এক সমৃদ্ধ, গৌরবময় ও ঈমানদীপ্ত ইতিহাস জড়িয়ে আছে মুজাহিদ, শহীদ, গাজী, অলিম, পীর ও আউলিয়াকিরামের পদস্পর্শে ধন্য পূণ্যভূমি ফুরফুরার সাথে। এ সুদীর্ঘ সময়ে ফুরফুরার প্রাচীন ইতিহাস-ঐতিহ্য, মুসলিম বিজয় কাহিনী, ফুরফুরায় জন্মগ্রহণকারী মুজাদ্দিদে যামান হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (র.) সহ তাঁর সাহেবজাদাগণ, ও অন্য দেশ থেকে আগত বুযুর্গানে দীন এবং এখানকার বুযুর্গদের সান্নিধ্যে এসে যাঁরা বিখ্যাত কামিল হয়েছেন তাঁদের কয়েকজনের পরিচিতি ও বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও ভূমিকা এ গবেষণায় ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে কিংবদন্তীর ওপরও নির্ভর করতে হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ঘটনাবলীকে ধরে রাখার জন্যে এ ছাড়া দ্বিতীয় উপায় ছিলো না। তবে এ বিয়য়টি এমন যেখানে বিস্তারিত গবেষণার আবকাশ রয়েছে। ইসলাম প্রচার-প্রসার ও ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠায় ফুরফুরার সূফী, দরবেশ, 'আলিম, মুজাহিদদের অবদান পৃথক পৃথক ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন স্থানে অনেক অলৌকিক ঘটনা আলোচিত হয়েছে। তবে এখানে সত্যটি মনে রাখতে হবে যে, ইসলাম তার বিজয়ের জন্যে যেমন কোনো তরবারির মুখাপেক্ষী নয় তেমনি কোনো কারামত বা অলৌকিক ঘটনারও মুখাপেক্ষী নয়। ইসলাম তার অন্তরের সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্বের জোরেই মানুষের হৃদয় জয় করে। কারামত এ বিজয়কে সুসম্পন্ন করতে সাহায্য করে মাত্র। অনেক ক্ষেত্রে এটি দুর্বল হৃদয় জয়ের প্রাথমিক ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। কিন্তু ইসলামের অন্তর্নিহিত দুর্বার সত্যই আসল কাজ করে যায়।

বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত প্রথম ইসলামী সমাজের কাঠামো এবং এ সমাজ প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন শ্রেণীর স্বনামধন্য 'আলিমগণ অবদান রেখেছেন, তবে এ গবেষণায় শুধুমাত্র ফুরফুরার 'আলিম, সূফী-সাধকগণের জীবন-কর্ম ও এদেশে ইসলামের প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান বেশ সতর্কতার সাথে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। তা ছাড়া ফুরফুরার আশপাশের বিস্মৃতপ্রায় ওলীগণের জীবন ও 'আমল সম্পর্কিত বিষয়ও গবেষণায় স্থান পেয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় সবত্রই ফুরফুরার পীর সাহেবগণের বহু মুরীদান ও ভক্তবৃন্দ রয়েছেন যাঁরা প্রতিনিয়তই দীনের প্রচার ও প্রসারের কাজে নিজেদেরকে ব্যাপৃত রেখেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে ফুরফুরার 'আলিমগণের অবদান শীর্ষক পর্যালোচনা এখানেই শেষ। এর মধ্যে যদি কোনো কল্যাণকর কিছু থাকে তবে তা করুনাময় প্রতিপালক আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহুর একান্ত দয়া। আর এর মধ্যে ভুলভ্রান্তি যা আছে তা সবই নিজের দুর্বলতা ও শয়তানের প্রবঞ্চনার কারণে। আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয়তম হাবীব ও খলীল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (স.), তাঁর পরিজন, সহচর ও অনুসারীগণের ওপর। আর প্রথমে ও শেষে, সর্বদা ও সর্বত্র সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্র নিমিত্ত।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

১. মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী : *পবিত্র কোরআনুল করীম*, অনুবাদঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, মদীনা মুনাওয়ারাঃ খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহদ কোর-আন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হিঃ

২. সাইয়েদ কুতুব শহীদ : *তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন*, অনুবাদঃ হাফেজ মুনির উ-দ্দিন আহমদ, লান্ডনঃ আল-কোরআন একাডেমী, ১৯৯৯

৩. সম্পাদনা পরিষদ : *আল-কুর'আনুল করীম*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলা-দেশ, ২০০৬

৪. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল আল বুখারী : *সহীহ আল বুখারী*, অনুবাদঃ অধ্যাপক মাওলানা সাইয়েদ মু-হাম্মদ আলী গং, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ২০১২

৫. ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী : *জামে আত-তিরমিযী*, অনুবাদঃ মুহাম্মদ মূসা, ঢাকাঃ বাংলা-দেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৪

৬. আবূ দাউদ সুলায়মান ইব্নুল আশ'আস সাজিসতানী : *সুনান আবূ দাউদ*, অনুবাদঃ ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৫

৭. ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী : *সহীহ মুসলিম*, অনুবাদঃ মাওলান আ. স. ম. নূরুজ্জামান গং, ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৫

৮. ইমাম আবূ আবদুর রহমান আহমাদ আন-নাসাঈ : *সুনান আন-নাসাঈ*, অনুবাদঃ আলহাজ্জ মাওলানা মুহাম্মদ-মূসা, ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৫

৯. আবূ আবদুল্লাহ ইব্ন মাজা : *সুনান ইবনে মাজা*, অনুবাদঃ মুহাম্মদ মূসা, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ২০০০

১০. ইমাম মালেক ইব্ন আনাস : *মুয়াত্তা* (আরবী), কায়রোঃ আল-মাকতাবাতুর রশীদিয়্যাহ, ১৯৫১

১১. অধ্যাপক মাওলানা হারুনুর রশিদ খান : *কুর'আন ও হাদীসের আলোকে পূর্ণাঙ্গ মানব জীবন*, ঢাকাঃ প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স, ২০০৪

১২. আলীয়া আলী ইজতেবেগোবিচ : *প্রাচ্য পাশ্চাত্য ও ইসলাম*, রুপান্তরঃ ইফতেখার ইকবাল, ঢাকাঃ আমান পালিশার্স, ১৯৯৬

১৩. ড. ইউসুফ আল-কারযাবী : *ইসলামে হালাল-হারামের বিধান*, অনুবাদঃ মাওলানা মুহাম্মদ-আবদুর রহীম, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৪

১৪. ড. খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর : *ইসলামী আকীদা*, ঝিনাইদহঃ আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২০০৭

১৫. আবদুল মান্নান তালিব : *ইসলামী জীবন ও চিন্তার পুনরগঠন*, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশ-নী, ১৯৯৪

১৬. খান মোসলেহ উদ্দিন আাহমদ : *মহানবী (স.) এর সীরাত কোষ*, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৪

১৭. ইমরান নযর হোসেন : *পবিত্র কুর'আনে জেরুজালেম*, অনুবাদঃ মোঃ এনামুল হক, ঢাকাঃ আর আই এস পাবলিকেশন্স, ২০০৪

১৮. অধ্যাপক মফিজুর রহমান : *কোরআনের আয়নায় বিম্বিত রাসূল (স.)*, চট্টগ্রামঃ মদীনা একাডেমী, ২০০৪

১৯. মাওলানা আশেক ইলাহী বুলন্দশহরী : *মৃত্যুর অন্তরালে*, অনুবাদঃ মুহাম্মদ আবুল বাশার আখন্দ, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬

২০. আল্লামা ইমাম নববী : *রিয়াদুস সালেহীন*, অনুবাদঃ মাওলানা এ.এম.এম সিরাজুল-ইসলাম, ঢাকাঃ ইসলামিয়া কুর'আন মহল, ২০০১

২১. ড. ইব্রাহীম মাদকূর : *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, দীওবন্দঃ কুতুবখানাহ হোসাইনি-য়াহ, ১৯৯৭

Dhaka University Institutional Repository

২২. লুইস মা'লূফ : *আল-মুনজিদ ফীল-লুগাহ*, বৈরূতঃ দারুল মাশরিক, ১৯৯৭
২৩. নঈম সিদ্দিকী : *মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসা-ল্লাম*, অনুবাদঃ আকরাম ফারুক, ঢাকাঃ শতাব্দী প্রকাশনী, ১৯৯৮
২৪. মোঃ মোবারক আলী রহমানী : *ফুরফুরা শরীফের ইতিবৃত্ত*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৩
২৫. আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান : *ফুরফুরার ইতিহাস*, ঢাকাঃ ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, দারুস সালাম, মীরপুর, ২০০৫
২৬. মুফতী আবূ জাফর সিদ্দিকী : *ফুরফুরা শরীফের ইতিহাস*, ঢাকাঃ সাগর্দী লাইব্রেরী, ১৩৪৩ বাং
২৭. আবূ ফাতেমা মোহাম্মদ ইসহাক : *ফুরফুরার পীর হযরত আবু বকর সিদ্দিকী*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০
২৮. মুবারক আলী রহমানী : *ফুরফুরা শরীফের ইতিবৃত্ত*, কলকাতাঃ নাসারীয়া প্রকাশনী ট্রাষ্ট, ১৯৮৪
২৯. আবদুল হক ফরিদী, আ.ফ.ম. সম্পা : *বিস্তারিত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১ম খন্ড, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬
৩০. আবদুল হাকিম, খান বাহাদুর সম্পা : *বিস্তারিত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খন্ড, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৭৬
৩১. ফকীহ মুহাদ্দিস আল্লামা রুহুল আমীন (র.) : *হযরত পীর সাহেবের বিস্তারিত জীবনী*, বসিরহাটঃ মুজাদ্দে-দীয়া লাইব্রেরী, ১৯৮৮
৩২. আবু ফাতেমা মোঃ ইসহাক : *হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮
৩৩. দিওয়ান মুহাম্মদ ইব্রাহীম তর্কবাগীশ : *হাক্বীকতে ইনসানিয়াত*, চট্টগ্রামঃ ছিরাতুল মুসতাকীম প্রকাশ নী, ১৯৯৯
৩৪. সৈয়দ বাহাউদ্দীন আলী ও শেখ মহিউদ্দীন : *ফুরফুরার পীর হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (র.)*, মুর্শিদাবাদ হোছাইনিয়া কুতুবখানা, ১৯৯০
৩৫. মাওলানা সুলতান আহম্মদ : *ফুরফুরা শরীফের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, চাঁদপুরঃ মজুমদার লাই-ব্রেরী, ২০০৭
৩৬. মাওলানা নূরুর রহমান : *তাজকেরাতুল আউলিয়া*, ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী ১৯৯২
৩৭. আল্লামা সাইফুদ্দিন সিদ্দিকী : *হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (র.)-এর জীবনী*, হুগলীঃ হেদা-য়াতুল মুসলিমীন লাইব্রেরী, ১৯৯৩
৩৮. ফজলুর রহমান মুন্সী : *সীরাতে আজীম*, ফেনীঃ আহসানিয়া লাইব্রেরী, ১৯৮৫
৩৯. মুহাম্মদ আবদুস সালাম : *মাওলানা রুহুল আমীন (র.) ঃ জীবন ও কর্ম*, ঢাকাঃ ইশা-ইসলাম কুতুবখানা, ২০০১
৪০. সম্পাদনা পরিষদ : *ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউ-ন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০
৪১. মাওলানা বাকীবিল্লাহ সিদ্দিকী : *ফুরফুরার পীর সাহেবের জীবনী*, ঢাকাঃ ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, ২০১১
৪২. মোঃ হালিম আরামবাগী : *আমীরুস শরীয়ত ফুরফুরার পীর সাহেব*, ঢাকাঃ আবদুল্লাহ প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স, ১৯৮৫
৪৩. হিযবুল্লাহ গবেষণা পরিষদ : *তাযকেরাতুল আউলিয়া*, ঢাকাঃ মুহাম্মদীয়া কুতুবখানা ১৯৮৮
৪৪. বজলুর রহমান দরগাহপুরী : *ইমামুল মুসলিমীন হযরত পীর সাহেবের জীবনচরিত*, হুগলীঃ হেদায়াতুল মুসলিমীন লাইব্রেরী, ১৯৮২

Dhaka University Institutional Repository

৪৫.	কুরআন হাদীস রিসার্চ সেন্টার	:	*হাকীকতে খলীফাতুল্লাহ*, ঢাকা: মারকাজে ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, সন নেই
৪৬.	আ. ক. ম. আলীম	:	*ভারতের মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস*, ঢাকাঃ হোসাইনিয়া কুতুবখানা, ১৯৮১
৪৭.	মহিউদ্দীন খান	:	*দরবারে আউলিয়া*, ঢাকাঃ নেছারিয়া কুতুবখানা, ২০০৮
৪৮.	গোলাম হোসাইন সলীম	:	*রিয়াজুস সালাতিন*, অনুবাদঃ রামপ্রাণগুপ্ত, কলকাতাঃ ন্যাশনাল লাইব্রেরী, ১৯৮৫
৪৯.	এ. কে. এম. আমজাদ আলী এনায়েতপুরী	:	*কারামতে আউলিয়া ও শাহ সাহেবের জীবনী*, কলকাতাঃ ন্যাশনাল লাইব্রেরী, ১৯৯৫
৫০.	পরিচালক দারুছ ছুন্নাহ লাইব্রেরী	:	*পীর মাওলানা নেছার উদ্দীন আহমদ (র.)-এর জীবনী*, বরিশালঃ দারুছুন্নাহ লাইব্রেরী, ১৯৮৮
৫১.	আল্লামা ইব্রাহীম হোসেন তর্কবাগীশ	:	*উত্তর বাংলার আউলিয়া প্রসঙ্গ*, রংপুরঃ মুহাম্মদী কুরআন মহল, ২০০১
৫২.	হাবীবুর রহমান	:	*আল্লামা রুহুল আমীন (র.)*, ঢাকাঃ ইশা'আতে ইসলাম কুতুখানা, ১৩৯৫ বাং
৫৩.	মাওলানা আতাউর ওহমান কালামী	:	*স্মরণীয় জীবন কথা*, কলকাতাঃ ন্যাশনাল লাইব্রেরী, ১৯৯৭
৫৪.	মাওলানা বাকীবিল্লাহ সিদ্দিকী	:	*হযরত ন'হুজুরের জীবন চরিত*, ঢাকাঃ ইশা‘‘আতে ইসলাম কুতুবখানা, ১৯৯৯
৫৫.	আবূ সালেহ মোঃ রেজওয়ানুল করীম	:	*মোমতাজুল মোহাদ্দেসীন ছাত্র পরিচিতি*, কলকাতাঃ আলীয়া মাদ্রাসা লাইব্রেরী, ১৯৭১
৫৬.	মাওলানা আবদুস সাত্তার	:	*তারিখ ই- মাদ্রাসা ই- আলিয়া*, ঢাকাঃ ইসলামিয়া লাইব্রেরী, ১৯৭৫
৫৭.	এম. ওবায়দুল হক	:	*বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ*, ফেনীঃ মুজাদ্দিদে আলফে সানী লাইব্রেরী, ১৯৬৯
৫৮.	ড. আবদুল গফুর সিদ্দিকী	:	*বালান্ডার পীর গোরাচাঁদ*, চব্বিশ পরগণাঃ মুহিত কুতুবখানা, ১৯৭৮
৫৯.	ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ	:	*রাজনীতিতে বঙ্গীয় ওলামার ভূমিকা*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫
৬০.	রাশিদুল ইসলাম	:	*মেজ হুজুরের জীবন চরিত*, চব্বিশ পরগণাঃ মুহিত কুতুবখানা, ১৩৯২ বাং
৬১.	ইয়াকুব ও খুরশিদ আনোয়ার	:	*বেহেশতের ফুলবাগিচা*, কলকাতাঃ মদিনা বুক ডিপো, ১৩৯৫ বাং
৬২.	মাওলানা রুহুল কুদ্দুস ও সিরাজুল ইসলাম	:	*হযরত আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.)-এর জীবনী ও বাণী*, কলকাতাঃ ন্যাশনাল লাইব্রেরী, ১৯৮৩
৬৩.	সৈয়দ আশরাফ হোসেন	:	*হযরত ন'হুজুর পীর কেবলার জীবন চরিত*, ঢাকাঃ ইসলামিয়া কুরআন মহল, ১৯৯৯
৬৪.	মাওলানা আবুল বাশার জিহাদী	:	*জিন্দা পীরের জীবনী*, বরিশাল দারুছ ছুন্নাহ লাইব্রেরী,২০১১
৬৫.	তারিক মুহাম্মদ মুত্তাকী বিল্লাহ	:	*এই সেই ফুরফুরা শরীফ*, হুগলীঃ হেদায়াতুল মুসলিমীন লাইব্রেরী, ১৯৮৫
৬৬.	ড. এনামুল হক	:	*বঙ্গে সূফী প্রভাব*, ঢাকাঃ আফতাবিয়া খানকাহ শরীফ, ১৪২০ হিঃ
৬৭.	পীরজাদা মাওলানা বাকী-	:	*শাহ সূফী পীর মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিকী (র.)- এর*

Dhaka University Institutional Repository

	বিল্লাহ সিদ্দিকী		*অসিয়ত এবং নসিহত*, ফুরফুরাঃ মুজাদ্দেদীয়া লাইব্রেরী, ১৩৯৯ বাং
৬৮.	নিজামুদ্দীন আউলিয়া	:	*রাহাতুল মুহিব্বীন*, অনুবাদঃ কফিল উদ্দীন আহমদ, ঢাকাঃ বারগাহে চিশতিয়া, ১৯৯৪
৬৯.	মুজাদ্দিদ আলফ সানী	:	*মাকতুবাত শরীফ*, অনুবাদঃ শাহ মোহাম্মদ মুতী আহমদ আফতাবী, ঢাকাঃ আফতাবিয়া খানকাহ শরীফ, ১৪০৬ বাং
৭০.	মোহাম্মদ রুহুল আমীন	:	*ফুরফুরা শরীফের পীর মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (র.)-এর বিস্তারিত জীবনী*, ঢাকাঃ ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, ১৩৯৬ বাং
৭১.	মুফতী আহমদ ইয়ার খান	:	*আউলিয়ায়ে কিরামের ওসীলায় খোদার রহমত*, চট্টগ্রামঃ মুহাম্মদী কুতুবখানা, ২০০৫
৭২.	আবু ফাতেমা মোহম্মদ ইসহাক	:	*ফুরফুরা শরীফের পীর হযরত মাওলানা শাহ সূফী আবু বকর সিদ্দিকী*, ২য় সংস্করণ, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলা-দেশ, ১৯৮৮
৭৩.	আল্লামা সাইফুদ্দীন সিদ্দিকী	:	*তালিমে তরিকত ও বাতেনী শিক্ষা*, হুগলীঃ হেদায়াতুল মস-লিমীন লাইব্রেরী, ১৯৮৪
৭৪.	আল্লামা সাইফুদ্দীন সিদ্দিকী	:	*ফুরফুরার পীর হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (র.)*, ৩য় সং-স্করণ, ফুরফুরাঃ মুজাদ্দেদীয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৩
৭৫.	সৈয়দ মোঃ বাহাউদ্দীন ও শেখ মোঃ মহিউদ্দীন	:	*ফুরফুরার পীর হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (র.)*, হুগলীঃ হেদায়াতুল মুসলিমীন লাইব্রেরী, ১৯৯৩
৭৬.	সৈয়দ বাহাউদ্দীন ও সৈয়দ মোঃ রওশন জমির	:	*হযরত ন'হুজুর পীর কেবলা*, কলকাতাঃ মুজাদ্দেদীয়া লাই-ব্রেরী, ১৩৯৯ বাং
৭৭.	অধ্যক্ষ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ	:	*ফুরফুরা শরীফের পীর কেবলার (মেজ হুজুর) জীবন চরিত*, ঢাকাঃ ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, ১৪১৪ বাং
৭৮.	দিওয়ান মোহাম্মদ ইব্রাহীম তর্কবাগীশ	:	*হযরত আবদুল হাই সিদ্দিকীর জীবনী ও বক্তৃতা*, রংপুরঃ জৈনপুর কুতুবখানা, ১৯৭৭
৭৯.	খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর	:	*কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা*, ঝিনাইদহঃ আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২০০৭
৮০.	খোন্দকাল আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর	:	*রাহে বেলায়েত*, ঝিনাইদহঃ আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২০০৯
৮১.	হযরত আবদুল হাই সিদ্দিকী (র.)	:	*খলিফাতুল্লাহ*, ঢাকাঃ ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, সন নেই
৮২.	ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর	:	*ফুরফুরার পীর আল্লামা আবু বকর সিদ্দিকী (রহ.) আল-মাউর্জুআত*, ঝিনাইদহঃ আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২০০৯
৮৩.	এ. কে. এম. নাজির আহমদ	:	*আল্লাহ্‌র দিকে আহবান*, ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ২০০২
৮৪.	হাফিজুল হাদীস আল্লামা রুহুল আমীন (র.)	:	*ফুরফুরা শরীফের পীর*, ঢাকাঃ ইশা'আতে ইসলাম কুতুব-খানা, ১৯৯৫
৮৫.	জুলফিকার আলী কিসমতী	:	*বাংলাদেশের সংগ্রামী ওলামা পীর মাশায়েখ*, কলকাতাঃ মুজাদ্দেদীয়া লাইব্রেরী, ২০০৬
৮৬.	ফজলুর রহমান মুন্সী	:	*সীরাতে আজীম*, ২য় খন্ড, ঢাকাঃ ইসলামীয়া কুতুবখানা, ২০০২
৮৭.	রুহুল আমীন	:	*মুজাদ্দিদে জামান (র.)-এর জীবনী*, ঢাকাঃ ইসলামীয়া কুতুব-

Dhaka University Institutional Repository

খানা, ১৩৪০ বাং

৮৮. হাবীবুর রহমান : *রুহুল আমীন (র.)-এর জীবনী*, বশিরহাট: আল্লাহওয়ালা লাইব্রেরী, ১৪০৫ বাং

৮৯. মোঃ আতাউর রহমান কামালী : *স্মরণীয় জীবন কথা*, ঢাকা: হিযবুল্লাহ প্রকাশনী, ১৪০৩ বাং

৯০. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার : *বাংলাদেশের ইতিহাস ঃ প্রাচীন যুগ*, চট্টগ্রাম: মুহাম্মদীয়া কুতুবখানা, ১৩৯২ বাং

৯১. মুন্সী গোলাম হোসাইন খান : *সিয়ারুল মুতাআখখিরীন*, হুগলী: হিদায়াতুল মুসলিমীন লাইব্রেরী, ২০০১

৯২. ইবনে বতুতা : *আজায়েবুল আসফার*, অনুবাদ: খান বাহাদুর হোসাইন এম.এ দিল্লী: সুলতানিয়া কুতুবখানা, ১৯১৩

৯৩. রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় : *বাঙ্গালার ইতিহাস*, ২য় খন্ড, কলকাতা: ন্যাশনাল লাইব্রেরী, ১৩৭৩ বাং

৯৪. গোলাম হোসাইন সলীম : *রিয়াজুস সালাতীন*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪

৯৫. শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী : *আল-বালাগুল মুবীন*, ২য় খন্ড, অনুবাদ: মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ঢাকা: ইসলামীয়া কুরআন মহল, ১৯৯৯

৯৬. কুরআন হাদীস রিস্যার্চ সেন্টার : *ওপেন সিক্রেট* (ফুরফুরা শরীফের পীর আবদুল হাই সিদ্দি-কীর কিছু জানা, কিছু অজানা ঘটনা ও বাণীর দুর্লভ সংকলন); ঢাকা: ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, প্রথম প্রকাশ, ২০০১

৯৭. কুরআন হাদীস রিসার্চ সেন্টরা : *সংবাদ পত্রের পাতায় ফুরফুরার পীর হযরত আবদুল কাহহা-র সিদ্দিকী (র.)*, ঢাকা: ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, ২০০৯

৯৮. গোলাম আহমদ মোর্তাজা : *ইতিহাসের ইতিহাস*, ভারত: বিশ্ব-বঙ্গীয় প্রকাশন, ১৯৭৮

৯৯. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর : *ইসলামের নামে জঙ্গীবাদ*, ঝিনাইদহ: আস-সুন্নাহ পাবলিকে-সন্স, ২০০৯

১০০ আবদুল মান্নান তালিব : *বাংলাদেশে ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮০

১০১. আল ইদ্রিসী : *নুজহাতুল মুশতাক*, কলকাতা: ন্যাশনাল লাইব্রেরী, ১৯৯০

১০২. ড. আবদুল করীম : *চট্টগ্রামে ইসলাম*, চট্টগ্রাম: মুহাম্মদীয়া কুতুবখানা, ১৯৮০

১০৩. ড. এনামুল হক : *পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম*, কলকাতা: আশরাফিয়া লাইব্রেরী, ১৯৭৫

১০৪. ড. আবদুল করীম ও ড. এনামুল হক : *আরাকান রাজসভায় বাঙলা সাহিত্য*, কলকাতা: ন্যাশনাল-লাইব্রেরী, ১৯৭৮

১০৫. আ. ন. ম. বজলুর রহমান : *পাকিস্তানের সূফী সাধক*, কলকাতা: আশরাফিয়া লাইব্রেরী, ১৯৮৮

১০৬. চৌধুরী শামসুর রহমান : *পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামের আলো*, বশিরহাট: আল্লাহওয়ালা-লাইব্রেরী, ১৯৭১

১০৭. ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ : *ইসলাম প্রসঙ্গ*, ঢাকা: ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, ১৯৬৩

১০৮. রমজান আলী : *ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেব (র.)-এর মত ও পথ*, পাবনা: আলামীন লাইব্রেরী, ১৯৭৭

১০৯. আনিসুজ্জামান : *মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্রিকা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯

Dhaka University Institutional Repository

১১০. সূফী আবদুল মাবুদ : *সওয়ানেহে ওমরী*, হুগলীঃ হেদায়াতুল মুসলিমীন লাইব্রেরী, ১৯৬৫

১১১. শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী : *ফায়জুল হারামায়েন*, দিওবন্দঃ কুতুবখানা হুসাইনিয়া, ১৯৯৭

১১২. শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী : *দোরছ ছমীন*, দিওবন্দঃ কুতুবখানা হুসাইনিয়া, ১৯৮৫

১১৩. **Sir Zadhunath Sarkar** : ***History of Bengal,*** **Kalkatta, 1972**

১১৪. **D. Enamul Haque** : ***History of Sufism in Bengal,*** **1955**

১১৫. **D. A. Rahim** : ***Social And Cultural History of Bengal,*** **Kalkatta: National Library, 1970**

Dhaka University Institutional Repository